মধুর অধরে মধুর মুরলী অতি সুমধুর তানে
বাজায়ে মোহন মুরলীবদন—মাধুরী জাগায়ে প্রাণে,
সবার অজানা ভাষায় কহিয়া কত কথা কাণে কাণে
আকুল করিয়া পরাণ আমার কি জানি কোথায় টানে।

একবিংশ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৪৯ { ১ম সংখ্যা

বর্ষ-বন্দনা

নূতন বরষ!—নূতন বরষ!
দাও গো এবার অভয়-পরশ।
সভয়ে আজ তাকাই তোমার পানে।
ছন্ন-ছাড়া গৃহ-হারা,
চক্ষে সবার অশ্রুধারা।
স্বস্তি-বাণী শোনাও কানে-কানে।

এসেছে আজ কি দুর্দ্দিন,
সবাই আজি স্বস্তি-হীন।
নাইকো অন্ন, নাইকো সুখ-হর্ষ।
আন গো তুমি অশন-বসন,
নাশ গো বিপদ বিপদ-নাশন;
এস গো তুমি—এস গো নূতন বর্ষ!

ঘরে-ঘরে আজ ভাবনা-ভীতি,
থামিয়ে দেছে বর্ষ-গীতি,
অন্ধকারে বন্ধ গৃহের দ্বার।
থামিয়ে দেছে বীণার যন্ত্র,
ভুলিয়ে দেছে পূজার মন্ত্র,
আতঙ্কে আজ উঠছে হাহাকার।

নাইকো পূজার কোন উপচার,
কণ্ঠ এবার নীরব সবার,
কাতরে আজ তোমার পানে চাহি।
সভয়ে আজ সঙ্গোপনে
বরণ তোমার মনে-মনে!
নূতন বরষ! ত্রাহি—ত্রাহি—ত্রাহি!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ঝক্‌মারি

বেশ ছিলাম বাবা! খামকা এক অনাসৃষ্টি যুদ্ধ বেধে যেন সৃষ্টিটা তোলপাড় ক'রে তুলেছে। সারা পৃথিবীতেই একটা 'সাজ সাজ' রব প'ড়ে গেছে। যুদ্ধে যাচ্ছে যারা তা'রা তো সাজবেই—বাকী লোকেরও কি দুর্ভোগ কম? সাজের ধূম প'ড়ে গেছে একেবারে।

বোমার ভয়ে লোকে ছুটোছুটিই ক'রে মরছে হরদম। পূবের লোক দৌড় দিচ্ছে পশ্চিমে, পশ্চিমের লোক ছুটছে দক্ষিণ লক্ষ্য ক'রে, দক্ষিণের লোক আবার পূবটাকেই নিরাপদ জ্ঞানে সেই দিকে ধাওয়া করছে—এমনি সব জগাখিচুড়ি কাণ্ড!

ব্রহ্মদেশ থেকে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত যে হেঁটে হেঁটে আসা যায়, আসা সম্ভব—কে কবে কল্পনা করেছে? লোকের নাজেহাল কাণ্ড দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করেছিলাম,

একটি পা-ও নড়ছি না কোন খানে। নির্দ্দয় বোমা যতক্ষণ না নেমে এসে মাথায় 'গোঁত্তা' মারছে, ততক্ষণ বেঁচে থাকা আটকায় কে?

সোজাসুজি ব'সে থাকি কলকাতায়, জমানো টাকাগুলো খরচ ক'রে আয়েস করি, ধার ক'রে খাই; ব্যস—ম'রে গেলেই তো মিটে গেল ঝঞ্ঝাট। সেই সব বাক্স-বিছানা, মোট-ঘাট, লট-বহর ইত্যাদি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার মনে করলেই যেন হৃৎকম্প সুরু হয়।

শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি, দেশভ্রমণ তো দূরের কথা, হাওড়া স্টেশনে কাউকে 'সি অফ্' করতেও যাই নি কখনও। ইস্টিশন মনে করলেই গায়ে জ্বর আসে আমার। কি ক'রে যে লোকে—একটা দেশ থেকে ঘর-সংসার উঠিয়ে নিয়ে আর একটা দেশে সংসার পাতছে—বুঝে উঠতেই পারি না।

কাজেই 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' গোছের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় ব'সেই ছিলাম কলকাতায়, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই 'দেশে' যাবার আগে সুপরামর্শ দিয়ে গেছে, কানেই তুলি নি। 'কাল' করলে—রেঙ্গুন থেকে গিন্নির এক ভাইপো এসে।

বোমা-বর্ষণের লোমহর্ষণ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে কি রকম ক'রে যে হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ের তলার চামড়া উড়ে গিয়ে শুধু হাড় আছে, খাদ্যাভাবে নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ হজম হ'য়ে সুধু পেট আছে, আর ডাকাতের হাতে প'ড়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে একটি হ্যাফ্প্যাণ্ট মাত্র অবশিষ্ট আছে, তারই বিশদ বর্ণনায় বাড়াসুদ্ধ লোকের নাড়ি ছাড়িয়ে দিয়ে গেল এবং কলকাতায় থাকলে যে একদিন আমাদেরও সেই অবস্থা হ'তে পারে, সে-কথা বোঝাতেও চেষ্টার ত্রুটি করলে না।

শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর লোকেই আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে বাড়ীছাড়া ক'রে ছাড়ল; মানে—(শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে) এগারোটি সন্তান-সন্ততি, দুটি অপোগণ্ড ভাইপো, তিনটি অনাথা ভাগ্নী, অথর্ব্ব দিদিমা, বদ্ধকালা পিসি, বিধবা দিদি, আর—সধবা গিন্নি। একযোগে সকলে এমনভাব দেখাতে সুরু করল—যেন ওদের প্রাণবধ করবারই একান্ত ইচ্ছা আমার।

সহ্য হ'ল না, সব ভয়-ভাবনা ছেড়ে, যাবার জন্যই প্রস্তুত হ'লাম। কিন্তু যাই কোথা? 'সাতপুরুষের ভিটে' বলতে যা বোঝায়, সাতজন্মেও সেখানে যাওয়ার পাট নেই। গভীর গণ্ডগ্রাম; দিনের বেলা শেয়াল বেড়ায়, রাস্তাঘাটে যখন-তখন সাপেরা হাওয়া খেতে বেরোয়।

কাজেই সে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একটি নির্ঝঞ্ঝাট দেশ আবিষ্কার করলাম। নামটিও ভাল—বিষ্ণুপুর; আপিসের এক ভদ্রলোকের শ্বশুরবাড়ী সেখানে—তিনিই চিঠিপত্র লিখে একখানি বাড়ী ঠিক করিয়ে দিলেন। মস্ত বাড়ী—বারোখানা ঘর, দালান, উঠান ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্য সময় টাকা পনের ভাড়া হ'ত বাড়ীটার, যুদ্ধের বাজারে—'কিছু' বাড়িয়ে পঞ্চান্ন টাকায় তুলেছেন বাড়ীর মালিক। যাক কি আর করা যাবে? তিন মাসের ভাড়া হিসাব ক'রে একশো পঁয়ষট্টি টাকা মনি-অর্ডার ক'রে রসিদটি যত্নে তুলে রেখে দিয়ে, সুরু হ'ল—সেই 'সাজ সাজ' কাণ্ড—যা দেখে এতদিন হৃৎকম্প হ'ত আমার।

সংসার করতে হ'লে যে এত জিনিসের দরকার হয় বা সংসারে যে এত জিনিস থাকে, এতদিন জানাই ছিল না। ছিলই বা কোথায় এই এক জাহাজ মাল!

ষোলটা ট্রাঙ্ক, ছ'টা সুটকেস্, আটটা বেডিং, পাঁচটা বেতের ঝাঁপি, দুটো হোল্ড-অল্, আর চার হাত লম্বা-চওড়া একটা প্যাকিংবাক্স নির্দ্দয়ভাবে ঠেসেও দেখা গেল প্রায় অর্দ্ধেক জিনিসই বাইরে প'ড়ে!

এইসব—বালতী, হ্যারিকেন, ঘড়া, পিলসুজ, শিল-নোড়া, আর কুলো-ডালা জাতীয় জিনিসগুলো যে কিসের ভেতর ঢুকিয়ে কি ভাবে নেওয়া যায়—ঈশ্বর জানেন সে-কথা। অথচ প্রত্যেকটি দ্রব্যই নাকি 'ভয়ানক দরকারী'—ভাঙা কড়া থেকে ফুটো এনামেলের কাঁসি পর্য্যন্ত; হবেও বা।

ছেলেমেয়েদের তো—জীবনেও যে সব বইতে হাত পড়ত না, সেই সব বই-পত্তরগুলো হঠাৎ এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ল যে, প্রত্যেকেরই আলাদা একটি ক'রে পুঁটুলী! বই, খাতা, পেন্সিল, ফাউণ্টেন, পেপারওয়েট, ব্লটিংপ্যাড্—কিছুটি বাদ দেওয়ার জো নেই।

এর ওপর আবার লুচির ঝোড়া আর মিষ্টির হাঁড়ি। রাত্রে গিয়ে খেতে হবে তো? কে আর ভাত বেড়ে ব'সে আছে সেখানে?

দুটো ঠেলা গাড়ীতে মাল আর তিনটে ঘোড়ার গাড়ীতে মানুষ বোঝাই দিয়ে যখন হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, তখন মনে হচ্ছিল—আমি যেন এক বিরাট সৈন্য-বাহিনীর সেনাপতি, চলেছি রণক্ষেত্রে শত্রুর উদ্দেশ্যে।

কি উপায়ে যে সেই বাহিনীকে সামলে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত পৌঁছেছিলাম—সে আর

বলতে চাই না, দুঃখের স্মৃতি চাপা দেওয়াই ভাল। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ী উদ্ধার ক'রে ডাকাডাকি করতেই বাড়ীওলা বেরিয়ে এলেন, একটু দেঁতো হাসি হেসে বললেন—"ও আপনি, আপনারই আসবার কথা ছিল বুঝি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন দেখিয়ে দিন বাড়ীর কোথায় কি ব্যবস্থা। ভাল কথা—হোয়াইট ওয়াশ করিয়েছিলেন তো?"

"হোয়াইট ওয়াশ?" ব'লে, ভদ্রলোক এমন ক'রে চোখ কপালে তুলে তাকালেন—মনে হ'ল বুঝি বা চীনে ভাষা শুনলেন।

বিরক্তভাবে বলি—"হ্যাঁ হোয়াইট ওয়াশ, সাদা বাঙলায় যাকে বলে—চূণকাম করা।"

—"সে তো বুঝলাম—বলি 'হোইটোশ' করার কথা ওঠে কেন মশাই? 'হোইটোশ' আমি কস্মিনকালেও করি না; বাপ-পিতমো যেমন রেখে গেছেন ঠিক তেমনটি আছে।"

—"বাঃ চমৎকার, পূর্ব্বপুরুষের ওপর ভক্তি অচলা দেখছি! তা' যাক—ধোয়ানো আছে তো বাড়ীটা?"
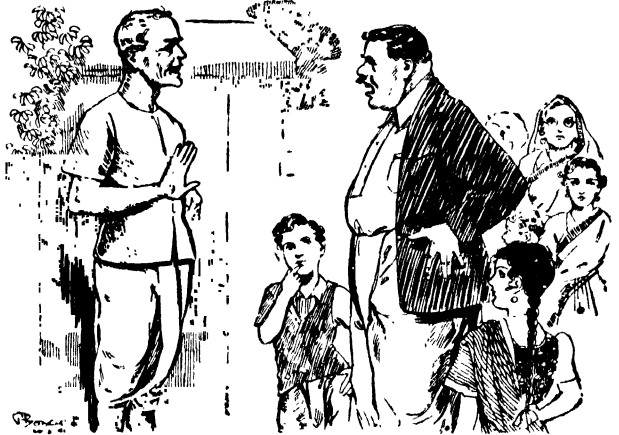
—"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়, ধোয়ানো—উনুন পাতানো সব ঠিক। আমি মশাই সে রকম লোক নই—" ব'লে, ভদ্রলোক সদর-দরজাটা আর একটু চেপে দাঁড়ালেন।

—"আচ্ছা তা' হ'লে সরুন, মেয়েরা ঢুকবেন—"

মেয়েরা ইতিমধ্যেই গাড়ী ছেড়ে রাস্তায় নেমেছেন।

ভদ্রলোক কিন্তু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। গম্ভীরভাবে বলেন—"বিলক্ষণ, আসবেন বই কি, তা' ভাড়ার রসিদটা—"

—"ভাড়ার রসিদ?"

এইবার চোখ কপালে তোলার পালা আমার।

—"ভাড়ার রসিদ আবার আনতে হয় না কি? আমাকে কি 'আমি' নয় ব'লে

সন্দেহ হচ্ছে আপনার? আমি দুর্গাপদ বাড়ুয্যে নগদ করকরে একশো পঁয়ষট্টি টাকা পাঠালাম—এখন এসব কি গোলমেলে কথা?"

—"কথা অতি সরল—দুর্গা বাড়ুয্যের টাকা, রসিদ দিয়েছি আমি, সবই সত্যি; কিন্তু আপনিই যে দুর্গা বাড়ুয্যে সেইটির প্রমাণ পেলেই মিটে গেল গোলমাল।"

'আমি' যে 'আমি' তার প্রমাণ এখন কি ক'রে দিই তা' বল তোমরা! সেজ ছেলেকে ডেকে তেড়েমেড়ে বলি—"হ্যাঁরে কেষ্ট, আমার নাম কি?"

—"তোমার নাম?"

এবার কেষ্টর পালা চোখ কপালে তোলার।

—"হ্যাঁ খোকা, বল তো তোমার বাবার নামটি"—অমায়িক হাসি হাসেন ভদ্রলোক।

—"বাবার নাম? বাবার নাম তো তিনু।"

দিদিমা আর পিসিমা যে হতচ্ছাড়া নামে ডাকেন চিরকাল,—হতভাগা ছেলে সেই নামটাই ব'লে বসে।

—"বেশ বেশ, 'তিনু'? তিনকড়িই হবেন বোধ করি?" ব'লে, ভদ্রলোক আবার সেই দেঁতো হাসি হেসে, দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে শিকল তুলে দেন।

ভয়ানক চটে যাই—ঠাস্ ক'রে কেষ্টোর গালে একটা চড় বসিয়ে ব'লে উঠি—"মশাই, দোর খুলুন শিগ্‌গির, ভাল হবে না বলছি, এটা ইয়ার্কির সময় নয়।"

—"নয়ই তো। আমিও তো তাই বলছি—মানে মানে স'রে পড়ুন এখন।"

—"কক্ষণো যাব না—দেখি কি ক'রে আটকান? তিন মাসের ভাড়া গণে দিয়েছি—এ বাড়ী এখন আমার।" বীরবিক্রমে এগোতে যাই।

ভদ্রলোক চট ক'রে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা চাবি-কুলুপ বা'র ক'রে দরজার কড়ায় লাগিয়ে চাবিটি ফতুয়ার পকেটে ফেলে বলেন—"আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ তালাটা ভাঙুন, আমি পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে আনি।"

বলে কি লোকটা? মারবে না কি? এবার বীরত্ব ছেড়ে কাতরভাবে বলি—"এই মোট-ঘাট নিয়ে মেয়েছেলেদের নিয়ে আমাকে এখন কি করতে বলেন?"

ওদিকে গাড়োয়ানরা 'সোয়ারি' নামিয়ে ভাড়ার জন্যে তারস্বরে চীৎকার করছে, আর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা মালপত্র রাস্তায় ফেলতে সুরু করেছে।

বাড়ীওলা ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বলেন—"সে কি কথা—মা-লক্ষ্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে

থাকবেন কেন ? আমার বাড়ীতে চলুন না। ঘণ্টাখানেক ব'সে জিরিয়ে নেবেন, সাড়ে পাঁচটায় একটা ফিরতি ট্রেন আছে।"

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল। যাক্ আমার দু'শো টাকা জলে, এ ছোটলোকের বাড়ী থাকা নয়। তড়বড় ক'রে ফিরে গিয়ে বললাম—"এই গাড়োয়ান, সোয়ারি তোল।"

সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগে গেল।

গিন্নি ঘোমটা খুলে ভীষণ রাগারাগি সুরু করলেন। দিদি তেড়ে এলেন। পিসিমা বকবক করছেন, দিদিমা ভাঙা কোমর নিয়ে দাঁড়াতে রাজী ন'ন ব'লে মাটিতে ব'সে পড়েছেন, আর ছেলেরা একসঙ্গে প্রশ্ন-বাণ নিক্ষেপ করছে এবং সর্ব্বশেষ গাড়োয়ানের দল মরিয়া হ'য়ে প্রায় মারতে ওঠে আর কি! যুদ্ধের বাজারে দিনরাত লোক আসছে দাঁড়ানো চলে না তাদের।

রেগেটেগে নিজেই আবার মোট-ঘাট ঠেলে তুলি, ফিরতি ট্রেনে ফিরেই যাব।

গদাই ব'লে উঠল—"বাবা, আমার যে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে কানাই, হাবলা, অনিলা, অমলা, লক্ষ্মী, ফুটি, শান্তি একযোগে আক্রমণ ক'রে বসল—ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম এবং আরও অনেক কিছু পেয়েছে তাদের; গরমে গাড়ীর মধ্যে ঢোকার ইচ্ছে তাদের আদৌ নেই।

এক রকম মারতে মারতেই তাদের গাড়ীতে তুললাম। এক ঘণ্টা বিষ্ণুপুর স্টেশনে ব'সে থেকে আবার ট্রেন ধরলাম।

দিদি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"তুই যাই হাঁদা, তাই এই রাম-ঠকানটা ঠকালে।"

পিসিমা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"হাবা কালামানুষ কিছুই বুঝি না, হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে আনাই বা কেন—নিয়ে যাওয়াই বা কেন?"

গিন্নি নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—"হায় ভগবন, সকল দেশই মগের মুল্লুক হ'য়ে দাঁড়াল!"

দিদিমা কাতর নিঃশ্বাসে বলেন—"ব'সে ব'সেই কোমরটা ভেঙে গেল, একটু শুতে দিলে না মুখপোড়া।"

কেষ্ট, গদাই, কানাই, হাবলা ইত্যাদি ইত্যাদি একযোগে এগারটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ব'লে ওঠে—"খাবারের হাঁড়িটা আর লুচির ঝুড়িটা বিষ্ণুপুরেই প'ড়ে রইল বাবা!"

কারুর মুখে আর কোন কথা নেই, শুধু নাবালক দু'-তিনটি খিদেয় কেঁদে কেঁদে

শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। বাকী সকলে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন আমি ইচ্ছে ক'রেই তাঁদের বিপদে ফেলবার জন্যে সাধের কলকাতা ছেড়ে বেরিয়েছি।

আমি এ পর্য্যন্ত একটিও কথা বলি নি, একটিও নিঃশ্বাস ফেলি নি, ফেললাম কখন জানো?

যখন হাওড়া স্টেশনে এসে ভীড়ের চাপে চিঁড়ের মত চেপ্টে কোন রকমে নাক-মুখ ছেঁচে সব ক'টাকে বাইরে এনে কুলিকে পয়সা দিতে গেলাম, দেখি কোটের ইন্‌সাইড পকেটে সেই একশো পঁয়ষট্টি টাকার রসিদখানা ব'সে আছে আরামে!

নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কি করবার আছে বল?

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

টিপু সুলতানের উদারতা

টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁহার হিন্দু প্রজাগণের সহিত সদ্‌ব্যবহার করেন নাই। তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরের ও তীর্থস্থানের অমর্য্যাদা করিয়াছেন। অভিযোগ করিয়াছেন শত্রুপক্ষীয় লোকেরা। মহীশূর রাজ্যে একবার ঘুরিয়া আসিলেই বুঝা যায় যে, এই অভিযোগ আদৌ সত্য নহে। টিপু সুলতানের শত্রুগণের মধ্যে হিন্দুরও অভাব ছিল না। মালাবারের হিন্দুদিগের ও মারাঠাগণের সহিত তিনি অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধ উপলক্ষে বিরুদ্ধপক্ষের হিন্দুদিগের প্রতি তিনি দুর্ব্যবহারও করিয়াছেন; কিন্তু হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী, হিন্দুদের মন্দির বা তীর্থ-স্থানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।

টিপু সুলতানের রাজধানী ছিল শ্রীরঙ্গপত্তনে। এখন আর শ্রীরঙ্গপত্তনের সাবেক শোভা ও সমৃদ্ধি নাই। কিন্তু জায়গাটি দেখিলেই আর সন্দেহ থাকে না যে, আত্মরক্ষা করিবার এমন স্থান সহজে পাওয়া যায় না। কাবেরী হঠাৎ এখানে পশ্চিমবাহিনী হইয়া একটি দ্বীপ রচনা করিয়াছে। সুতরাং নদী পার না হইয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে কোন দিক দিয়াই প্রবেশ করিবার পথ নাই। নদীর পারেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, তারপর গভীর পরিখা, ভিতরে আবার প্রাচীর। নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল। প্রকৃতির কৃপায় ও মানুষের পরিশ্রমে শ্রীরঙ্গপত্তনে বাস্তবিকই একটি অজেয় দুর্গ রচিত হইয়াছিল। এই দুর্গেরই একটি দ্বারের নিকট যুদ্ধ করিতে করিতে মহাবীর টিপুর মৃত্যু হইয়াছে।

টিপুর পিতা মহীশূরের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গপত্তনে হিন্দুরাজবংশের রাজধানী ছিল। সুতরাং দুর্গের মধ্যে দেবমন্দিরের অভাব নাই। এখনও শ্রীরঙ্গদেবের ও নরসিংহ-দেবের বিরাট মন্দিরে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীরঙ্গপত্তনে একটি জৈন মন্দিরও আছে। ইচ্ছা করিলে টিপু সুলতান এই সকল মন্দির অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিতেন; দেবমূর্ত্তি কলুষিত করিতে পারিতেন। তিনি তাহা ত করেন নাই-ই, বরঞ্চ শ্রীরঙ্গদেবের সেবার জন্য তিনি কয়েকটি রূপার বাটি দিয়াছিলেন। টিপুর নাম লেখা সেই বাটিগুলি এখনও শ্রীরঙ্গদেবের মন্দিরে আছে। নরসিংহদেবের মন্দিরের পূজারী আমাকে বলিলেন যে, মহীশূরের লোকেরা টিপু সুলতানকে "ধর্ম্মানুশীলনপটু বাদশা" বলিয়া সুখ্যাতি করিয়া থাকে। সমসাময়িক একজন নিন্দক লেখক লিখিয়াছেন যে, 'যুদ্ধযাত্রা-প্রাক্কালে টিপু মহীশূরের ব্রাহ্মণগণকে তৈল ও তাম্র দান করিতেন;

টিপু সুলতান, হায়দর আলী ও হায়দরের মাতার কবর

তাঁহাদের দ্বারা হোম করাইতেন।' ইহাতেই তিনি সুলতানের কুসংস্কারের পরিচয় পাইয়াছেন! কিন্তু যিনি হিন্দু দেবতার পূজার জন্য রৌপ্যপাত্র দান করিয়াছেন, সুব্রাহ্মণদিগকে তৈল ও তাম্র দান করিয়াছেন, হোম অনুষ্ঠান করাইয়াছেন—তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বলা যায় না।

এক্ষণে যেখানে টিপু সুলতানের মসজিদ, আগে নাকি সেখানে হনুমানজীর একটি মন্দির ছিল। সুলতানের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, 'এখানে মসজিদ করিতে হইবে।' তিনি হনুমানজীর জন্য অন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ জায়গাটি পূজারীদিগের নিকট চাহিয়া লইয়াছিলেন।
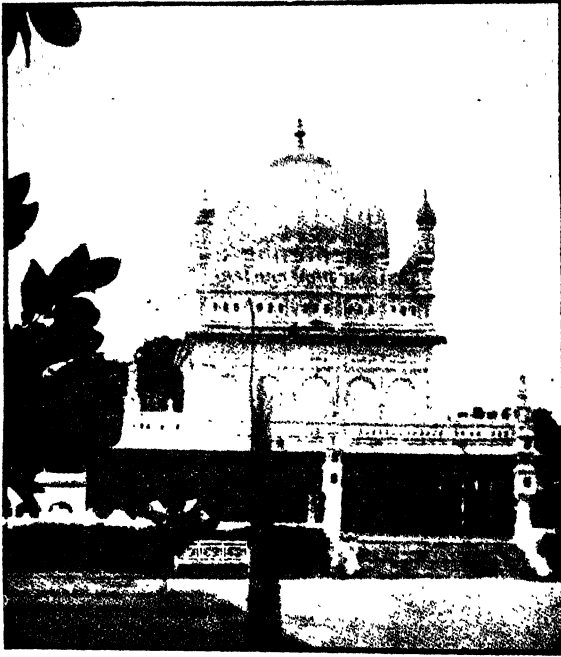
টিপু সুলতানের সমাধি-সৌধ

মহীশূর সহর হইতে পঁচিশ মাইল দূরে কাবেরীর তীরে নঞ্জনগড়ে একটি প্রসিদ্ধ শিব-মন্দির আছে। মহর্ষি অগস্ত্য নাকি প্রচীনকালে এখানে শিব-লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরে এখনও প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়। নঞ্জনগড় মন্দিরে সবুজ পাথরের নির্ম্মিত একটি ছোট শিবলিঙ্গ আছে। পুরোহিতেরা "বাদশাহলিঙ্গ" বলিয়া ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রবাদ—টিপু সুলতান এই লিঙ্গটি নঞ্জনগড়ের মন্দিরে উপহার দিয়াছিলেন।

মহীশূরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরীতে ৺শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত একটি মঠ ও শারদা দেবীর মন্দির আছে। মারাঠারা একবার এই মঠ লুণ্ঠন করিয়া এই মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল। তখন টিপু সুলতান মঠ-সংস্কার ও দেবীর পূজার জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন।

শিশুসাথী

একবিংশ বর্ষ—১৩৪৯

সূচীপত্র

(বর্ণানুক্রমিক)

সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থকিলেও তিনি প্রজার হিতচিন্তা হইতে বিরত হন নাই। াহীশূর হইতে দশ মাইল দূরে নদীতে এক বিরাট বাঁধ দিয়া এক বিস্তীর্ণ জলাশয় নির্ম্মিত ইয়াছে। এই জলাশয় হইতে সেচের খালের সহযোগে ক্ষেতে ক্ষেতে জল বিতরণ গরিয়া কৃষির অসাধারণ উন্নতি করা হইয়াছে। বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়ার ারিকল্পনায় মহীশূরের পরলোকগত মহারাজ কৃষ্ণরাজ উদায়ারের রাজত্বকালে এই াধ ও সরোবর রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই বাঁধের কল্পনা প্রথমে আসিয়াছিল টপু সুলতানের মনে। তিনি একখানি শিলা-লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন—'বাঁধ আরম্ভ গরিলাম আমি। শেষ হওয়া ভগবানের ইচ্ছা। যদি শেষ হয় এই সরোবরের জল ্যবহারের জন্য যেন কৃষকের নিকট অতিরিক্ত কর লওয়া না হয়।'

টিপু সুলতান যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, মহীশূরের র্ত্তমান রাজগণও তেমনই তাঁহার স্মৃতির অমর্য্যাদা করেন নাই। হায়দর ও টিপুর সমাধি-সৌধের সকল ব্যয় মহীশূরের মহারাজের সরকার হইতে বহন করা হয়।

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ.,
পি-এইচ্. ডি., বি. লিট্.

বিষের শেষ

হে নীলকণ্ঠ, সব হলাহল
কেন কর নাই পান?
পুড়াইয়া নয়, ছড়াইয়া তারে
করিয়াছ বলবান।
সে গরল যেন জানে নাকো শেষ,
জাতি ও ধর্ম্মে আনে বিদ্বেষ,
হিংসা-ঘৃণার কারবার তার
হয় নাকো অবসান।

ফল হ'য়ে বিষ তরুতে ফলিছে,
ফুল হ'য়ে লতিকায়।
সে বিষ লইয়া সুদূরে যেতেছে
বহিত্র অতিকায়।
সে বিষ ছুটিছে সাগরের তলে,
সে বিষ গগনে হুঙ্কারি চলে,
সে বিষ চলেরে ধ্বংসের পথে
মানবের প্রতিভায়।

ধরণী উঠিছে কলুষিত হ'য়ে
সে বিষের ব্যবসায়,
দিনে দিনে শুধু দেবতা ও নরে
ব্যবধান বেড়ে যায়।
গরল-সিক্ত অসি আর মসী
স্পৃহনীয় যাহা দিতেছে ঝলসি,
কৃপার তরণী ডুবায়ে দিতেছে
দম্ভের মোহানায়।

জাগো তুমি জাগো হে নীলকণ্ঠ,
জাগো তুমি মহাকাল,
গঙ্গার স্রোত বহাইয়া দাও
নিঙারিয়া জটাজাল।
পিনাকি, তোমার বাজাও বিষাণ,
সব বিষ কর নিঃশেষে পান,
নেত্রার্চ্চিতে ভস্ম কর হে
ভীতিময় জঞ্জাল।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভি (V) অক্ষর বিজয়-ব্যঞ্জক

পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, বড় বড় বাড়ীর গায়ে, দোকানের সুসজ্জিত সো-কেসে, মোটরের সামনে ও পিছনের কাঁচের উপর—এমন কি কারও কারও কোটের বোতামে পর্য্যন্ত ছোট-বড় নানা আকারের V (ভি) লেখা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। কোথাও বা পুরাপুরি 'V for Victory' লেখাও দেখে থাকবে। এর অর্থ কি জানবার জন্য নিশ্চয় তোমাদের মনে কৌতূহল জাগে। তাই এ সম্বন্ধে কিছুটা সংবাদ তোমাদের দেব।

গত তিন বছর ধ'রে যে মহাসমরে সমগ্র পৃথিবী লিপ্ত হয়েছে, তার খবর নিশ্চয় তোমরা জান। এখন তো যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছে। এই যুদ্ধে যে কি পরিমাণ লোকক্ষয় ও অর্থনষ্ট হচ্ছে তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। তবে খবরের কাগজে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ডুবি এবং বোমারু বিমান ঘায়েলের কথা তোমরা প্রায়ই শুনে থাক। সেগুলোতে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়। যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের বেতন ও রসদের হিসাব বাদ দিলেও যুদ্ধাস্ত্রের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় হয়, তার একটা সাধারণ ধারণা করতে পারবে—যদি নিম্নলিখিত যুদ্ধাস্ত্রসমূহের আনুমানিক দামের তালিকাটির দিকে তাকাও। এই তালিকা আমি নিজের অনুমানে লিখছি না, সরকারী সংবাদের ওপর ভিত্তি ক'রেই বলছি—

বুলেট (গুলি) একটা	/০
বালির বস্তা একটা	৵০
পিস্তল একটা	৫০৲
রাইফেল (সৈন্যদের হাতে যে বন্দুক থাকে) একটা	১০০৲
মেসিনগান (কলের বন্দুক) একটা	১৮০০৲
ব্যারেজ বেলুন (যা দিয়ে কোন সহরে আক্রমণকারী বিমানের পথ আটকে রাখা হয়) একটা	১০,০০০৲
হালকা ধরণের বিমান-ধ্বংসী কামান একটা	৪০,০০০৲
যোদ্ধৃ বিমান (যে বিমান যুদ্ধ করে) একখানি	১,৪০,০০০৲
বোমারু বিমান (যে বিমান বোমা ফেলে) একখানি	২,৭০,০০০৲
ডেষ্ট্রয়ার (অতি দ্রুতগামী রক্ষী যুদ্ধজাহাজ) একখানি	৬০,০০,০০০৲
ক্রুজার (ডেষ্ট্রয়ারের বড় সংস্করণ) একখানি	২,৫০,০০,০০০৲
ব্যাট্‌ল শিপ্‌ বা যুদ্ধজাহাজ (ভাসমান কেল্লা বিশেষ) একখানি	১০,৫০,০০,০০০৲

এগুলো বাদে রসদবাহী জাহাজ, বড় ধরণের দূরপাল্লার কামান ও অসাধারণ বড় যুদ্ধজাহাজ, ডুবো জাহাজ (Submarine), টর্পেডো, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র এবং যে সকল বিবিধ প্রকারের বোমা বৃষ্টির মত ছড়ানো হয়—তার দামও অনেক। সুতরাং তোমরা বুঝতেই পারছ, প্রত্যহ যে খবরের কাগজে যুদ্ধের বিবরণ পড়, তার জন্য

অগণিত মনুষ্যজীবন আর অজস্র অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে। এ যুদ্ধে যে সমগ্র জগতেরই প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে তা বুঝতেই পারছ। যে ধন অর্জ্জনের জন্য মানুষের কত ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, সেই ধন চক্ষের নিমেষে ভস্মে পরিণত হচ্ছে অথবা সাগরের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে! চোখ বুজে যদি ভাবতে চেষ্টা কর, এ ক' বছরে কত কত জাহাজ ডুবি হয়েছে, তবে চমকে যাবে। সাগরের তলায় হাজার হাজার জাহাজ ডুবে প'ড়ে আছে—মানুষের এত শ্রমে গড়া এত মূল্যবান সম্পদ্ মানুষেরই খেয়ালে আবার তার হাতছাড়া হ'য়ে সাগরের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেছে অসংখ্য মানুষ। এই পৃথিবীধ্বংসী যুদ্ধের শান্তি কে না চায়?

'ভি' (V)-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এম. ডি. লেভ্‌লে

V for Victory কথাটি এই যুদ্ধ জয়েরই দ্যোতক। যাতে প্রতিক্ষণ একটা জয়ের আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে জাগরিত থাকে, তারই প্রেরণা যোগাতে এই সঙ্কেতের সৃষ্টি হয়েছে।

এই 'ভি'-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক কে জান? তিনি একজন বেলজিয়ান, নাম **এম. ডি. লেভ্‌লে**। ওপরে তাঁর ছবি দেওয়া হ'ল। জার্ম্মানরা বেলজিয়াম অধিকার করলে লেভ্‌লে লণ্ডনে পালিয়ে যান। তাঁর প্রবর্ত্তিত 'ভি'-আন্দোলন নাৎসী অধিকৃত দেশসমূহেও ছড়িয়ে পড়েছে, আর ইংলণ্ডে এবং আমেরিকাতেও গৃহীত হয়েছে। ভারতবর্ষে V (ভি) চিহ্নের সমাদর তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ।

শ্রীসন্তোষকুমার দে, বি. এ.

সভ্যতায় রবার

অনেক জিনিসকে আমরা অতি সামান্য মনে করি; কিন্তু একটু হিসাব ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, তা মোটেই সামান্য নয়, বিশেষ ক'রে এই রবার জিনিসটা। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে এর অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

স্কুলের ছেলেদেরও রবার চাই ড্রইং করতে, জ্যামিতির রেখা টানতে, এমনি হাতের লেখা লিখতেও। তা ছাড়া, রবার না হ'লে তো ফুটবল খেলাই চলে না। ফুটবলের যে এত উৎসাহ ও এত উত্তেজনা, এত হৈ-হৈ—রৈ-রৈ, তার মূলে তো রবার। রবার না হ'লে সাইকেল চাপা যায় না, কারণ সাইকেলের টায়ার, টিউব তো রবারেরই। মোটরগাড়ী, বাস্, লরী ইত্যাদি যান-বাহনের কি মোটা মোটা রবারের টায়ার!

যাতায়াতের ক্ষিপ্রতা, দ্রুততা ও আরাম খুব বেশী হওয়াটাই হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার মস্ত বড় একটা উন্নতি। লরীগুলো লাখ লাখ মণ মাল কত কম সময়ে, কত সহজে, কত দূরে নিয়ে যায়! এ যুগে রবার না হ'লে একটুও চলে কি?

রবার সব চেয়ে বেশী জন্মায় মালয়দেশে। সেখানে কেবল রবার গাছের বড় বড় বাগান, আর বন। এই সব বাগান থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি মণ রবার পাওয়া যায়! মালয়দেশ এখন জাপানের কবলে, সুতরাং বর্ত্তমানে আমেরিকা আর ইংলণ্ডে কাঁচা রবারের আমদানি অসম্ভব রকম ক'মে গেছে।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অবস্থা এমন হয়েছে যে, এখন যে তিন তিন কোটি নূতন টায়ার বিক্রয় করা হয়েছে, সেগুলো পুরাণো হ'য়ে গেলে আর নূতন টায়ার পাওয়া যাবে না; পাওয়া গেলেও তিন কোটি কিছুতেই পাওয়া যাবে না ব'লে বিশেষজ্ঞগণ বলছেন। যুদ্ধে লরী, বাস্, মোটরগাড়ী না হ'লে তো একেবারেই চলে না। অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য-পানীয়, সৈন্য প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো তো একেবারেই অসম্ভব,—যদি না প্রচুর পরিমাণে রবার পাওয়া যায়! যুদ্ধের সময়ে রবারের অভাব তো কম বিপদ নয়।

এই জন্য বিজ্ঞানের বড় বড় পণ্ডিত বহুদিন থেকেই রবার নিয়ে নানা রকমের গবেষণা কচ্ছেন। এর মধ্যে দুইটি গবেষণা সব চাইতে বেশী মূল্যবান। একটি হচ্ছে—রবারের আয়ুর্বৃদ্ধি, আর একটি—কৃত্রিম রবার।

এমন দিনও ছিল যে, একটা নূতন টায়ার মাত্র ৫০ মাইল চললেই জখম হ'য়ে পড়ত। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের কৃপায় রবারের আয়ু ও শক্তি যথেষ্ট বেড়ে গেছে, সুতরাং মোটরগাড়ী পূর্ব্বের চেয়ে আজকাল ঢের বেশী নিরাপদ হয়েছে। টায়ার মেরামত করাও এখন এত সহজ ও সুবিধাজনক হয়েছে যে, যেখানটা মেরামত করা হয় সেখানটা আর সহজে নষ্ট হয় না। টায়ারটি ফুটো হ'লে রবারে গন্ধক মিশিয়ে গালিয়ে ঢেলে দিয়ে ফুটোটি ভরাট ক'রে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ একেই বলা হয় ভল্‌ক্যানাইজ
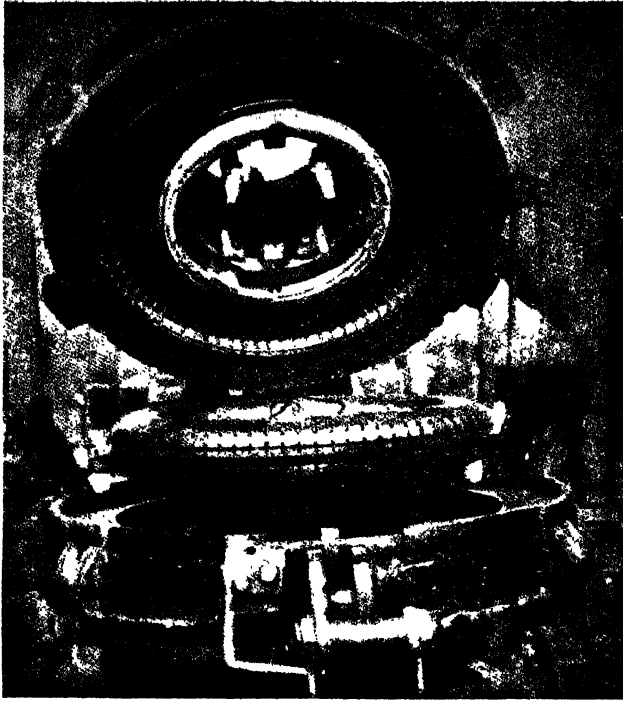
রবার দ্বারা মোটরগাড়ীর টায়ার প্রস্তুত হচ্ছে

করা। রবার গ্রীষ্মকালে নরম ও চট্‌চটে এবং শীতকালে স্বভাবত শক্ত হয়; কিন্তু গন্ধক মেশানোর ফলে, অর্থাৎ ভল্‌ক্যানাইজ করায় রবারের এই দোষ দূর হ'য়ে গেছে।

আমাদের দেহের পুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য যেমন খাদ্যে ভিটামিন দরকার, তেমনি রবারের আয়ু ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যও বিজ্ঞানীরা নানা রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে একটা বস্তুর আবিষ্কার করেছেন এবং রবারে তা মিশিয়ে দিয়ে চমৎকার ফল পেয়েছেন।

এই বস্তুর নাম ডিউরামিন (Duramin)। রবারের স্থায়িত্ব এতে বেড়ে গেছে অত্যন্ত বেশী।

রবারে ডিউরামিন মেশানো সহজ ব্যাপার নয়। রান্নায় যেমন নুন, তেল ও অন্যান্য মসলা ঠিক পরিমাণমত এবং ঠিক সময়ে দিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। একটু কম-বেশী হ'লে, অথবা একটু আগে-পরে দিলেও রবারটি ঠিক তৈরি হয় না। প্রকাণ্ড দুটো লোহার রোলার প্রবলবেগে ঘুরতে ঘুরতে রাশি রাশি রবারকে পিষে পিষে যখন একেবারে কাদা ক'রে ফেলে, তখনই এই রাসায়নিক মিশ্রণটি ঢেলে দেওয়া হয়।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেই গড়ে বছরে ৬,৪৮,৫০০ টন কাঁচা রবারের প্রয়োজন হয়। এই রবার দিয়ে নানা রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি করতে কত বড় বড় কারখানা, বড় বড় বাড়ী আর অফিসের দরকার। খরচও হয় কোটি কোটি ডলার, আর লোকও দরকার হয় হাজার হাজার।

কৃত্রিম রবার আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন কম লোক নিয়ে, কম খরচে এবং কম কারখানায় চলবে, অন্য দিকে মালয়ের রবারের উপরও নির্ভর করতে হবে না। কৃত্রিম রবারের শক্তি আসল রবারেরই মত। আসল রবার যেমনি টানলে বাড়ে, এ রবারও তেমনি টানলে বাড়ে। একে বলা হয় সিন্‌থেটিক্ রবার। আসল রবারে যে সব উপাদান আছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সব উপাদান মিশ্রিত ক'রেই এই রবার তৈরি করা হয়।

এই রবার দিয়ে আসল রবারের অভাব অনেকটা আগেই মিটেছে, পুরোপুরি মিটবে অল্প দিনের মধ্যেই। গত বছর আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে ৬০০০ টনের টায়ার, টিউব ইত্যাদি এই রবার দিয়েই তৈরি হয়েছে এবং ব্যবহার ক'রে খুব সুফলও পাওয়া গেছে।

মোটকথা, বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার অগ্রগতি খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর কচ্ছে এই রবারের উপর ; সুতরাং সভ্যতার সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

বৈশাখ

পিঙ্গল জটা-জাল, উদ্ধত মহাকাল
ভীষণ বৈশাখ, আসে ঐ আসে রে।
শঙ্কিত দশদিক্ সঙ্গীতে থামে পিক,
প্রদীপ্ত ভাস্কর হাসে ঐ হাসে রে।
পলাতকা কুহেলিকা স্তম্ভিতা নীহারিকা
ভয়েতে লুকায় আজ ভূধরে ও সায়রে।
ভীষণ গ্রীষ্মে হেরে ধরণী লক্ষ চিরে,
অনল মিশিল নীরে নীর যে শুকায় রে!
রুদ্র ভয়াল মাস ত্রাহি ত্রাহি হা-হুতাশ,
দগ্ধা ধরণী কাঁদে, "কোথা তুমি নারায়ণ,
সংবর বহ্নির মেলা সংহর মারণ-খেলা,
চক্র-গদায় আজ নাহি আর প্রয়োজন।
শঙ্খ বাজাও ধীরে, পদ্ম শীতল নীরে
ভাসিয়া হাসিয়া জীবে বিতরুক শান্তি।"
সর্পের ফণাতলে খেলে ভেক কুতূহলে,
বৈশাখে অরি ও হরি ভুলে যাক্ ভ্রান্তি।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পঞ্চতীর্থ

ত্রিচিনপল্লী

তঞ্জনের কথা তোমরা গেল মাসে পড়েছ। তঞ্জনের এক ছেলে ছিল, নাম তার ত্রিশিরা। ত্রিশিরা ছিল বাপকা বেটা! শক্তিতেই বল, আর অত্যাচারেই বল—বাপের চেয়ে সে কোন অংশে কম ছিল না—বরং বাপের ওপরেই যেত সে। তার বাসস্থান ছিল ঐ অঞ্চলের আর একটা বনে।

বাপের মৃত্যুর খবর যখন সে শুনল, তখন ক্ষোভে, উত্তেজনায়, রাগে সে যেন পাগলই হ'য়ে উঠল। কিন্তু স্বয়ং বিষ্ণু তার পিতৃহন্তা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান ক'রে কোন লাভ ত নেইই—

উপরন্তু তাঁর চক্রের মুখে নিজের মাথাটিও রেখে আসতে হবে। সুতরাং ত্রিশিরা সেদিকও মাড়াল না।

আর কোনরূপে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে না পেরে—অবশেষে সে বাপের মতই উপদ্রব সুরু করল। বাপরে বাপ্! সে কী ভীষণ অত্যাচার! যেন সে পিতার অসম্পূর্ণ কার্য্য শেষ করতে উঠে-প'ড়ে লেগে গেছে।

তেমন নিষ্ঠুর প্রাণিহত্যা চোখে দেখা ত দূরের কথা, কেউ কোন দিন কল্পনা করতেও পারে নি। মানুষের ওপরই তার আক্রোশ বেশী। কচি কচি শিশু, এমন কি গর্ভস্থ শিশুকে পর্য্যন্ত মায়ের পেট চিরে বের ক'রে সে পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করতে লাগল।

উপদ্রুত ও অত্যাচারিত মানবগণ সকলে মিলে যাগ-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে রাক্ষস-বিনাশের জন্য দেবতাদের আহ্বান করতে লাগল।

কিন্তু আহূত দেবতারা তাঁদের অক্ষমতা জানিয়ে দৈববাণী করলেন—'ত্রিশিরাকে নাশ করা আমাদের সাধ্যাতীত। যেহেতু তার প্রতি দেবাদিদেব মহাদেবের বর আছে যে, তাঁর শক্তি ভিন্ন অন্য কোন শক্তি তাকে পরাজিত বা নিহত করতে পারবে না।'

তখন সকলে ভারি চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। তাই ত, কি করা যায়? ত্রিশিরার উপদ্রবে, গ্রামের পর গ্রাম—নগরের পর নগর যে একেবারে মরুভূমি হ'য়ে উঠল। রাক্ষসের অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করবার কি তবে আর কোন উপায়ই নেই?

এদিকে কিন্তু তখন বেশ একটা মজার কাণ্ড ঘটে গেল।

তোমরা কার্ত্তিকেয়ের নাম অবশ্যই শুনেছ এবং পূজার সময় তাঁর প্রতিমূর্ত্তিও নিশ্চয়ই দেখেছ। তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র এবং স্বর্গের দেব-সেনাপতি। তিনি মহাবীর এবং মহাশক্তিমান্। দুর্দ্দান্ত এবং অত্যাচারী তারকাসুরকে বিনাশ ক'রে ত্রিভুবনে শান্তিস্থাপন করবার জন্যেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। বড় হ'য়ে তোমরা যখন তাঁর জন্ম-ইতিহাস পড়বে—তখন বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় তোমাদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠবে।

ত্রিশিরার অত্যাচারে দেশ যখন যায় যায়, তখন দেব-সেনাপতি মহাবীর কার্ত্তিকেয় স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে এসে মানুষের ছদ্মবেশে, নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি হঠাৎ একদিন ত্রিশিরার উপদ্রুত অঞ্চলে উপস্থিত হ'লেন। তখন বেলা শেষ; সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাবার উপক্রম করছেন। ত্রিশিরা সারাদিন ধ'রে অসংখ্য প্রাণিহত্যা ক'রে, আরও হত্যা করবার আশায় রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বসেছিল।

সহসা মানুষরূপ-ধারী দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে দেখে সে লোভে ও হিংসায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠল এবং দিনশেষে চমৎকার একটা শিকার জুটেছে মনে ক'রে, হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে গিয়ে তার বিশাল শরীর নিয়ে কার্ত্তিকেয়ের পথ আগলে বললে—"আর যাবে কোথায়?"

ঘুরতে ঘুরতে সেই তল্লাটে পা দিয়েই কার্ত্তিকেয় ত্রিশিরার নাম এবং তার অত্যাচারের কথা শুনেছিলেন। এক্ষণে এক বিরাট ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে সামনে উপস্থিত হ'তে দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন—পথরোধকারী রাক্ষস ত্রিশিরা ছাড়া আর কেউ নয়।

তিনি প্রথমে বেশ ভাল ক'রেই বললেন—"দেখ ত্রিশিরা, তুমি অনেক নিরীহ মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রাণ নাশ করেছ। আর এখন আমাকেও হত্যা করতে এসেছ। কিন্তু যদি কল্যাণ চাও এবার থেকে এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড হ'তে ক্ষান্ত হও। নচেৎ"—

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই বিকট অট্টহাস্যে চারদিক কাঁপিয়ে ত্রিশিরা ব'লে উঠল—"তুই কে-রে? তোর মত এমন কত মানুষ যে এই পেটে হজম হ'য়ে গেছে! কোন্ সাহসে তুই আমায় ভয় দেখাস্?" বলতে বলতে সে মুখ ব্যাদান ক'রে কার্ত্তিকেয়কে গ্রাস করতে গেল।

অমনি কার্ত্তিকেয় প্রচণ্ড বলে ত্রিশিরার টুঁটি টিপে ধ'রে বললেন—"তবে রে অত্যাচারী রাক্ষস, আজ তোর অত্যাচারের শেষ করব।"

বলা বাহুল্য ত্রিশিরার শরীরেও শক্তি কম ছিল না। সেও পাল্টে কার্ত্তিকেয়ের টুটিটি টিপে ধ'রে গর্জ্জন ক'রে উঠল।

দেখতে দেখতে দু'জনে বাধল ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। দু'জনের দাপাদাপি আর লাফালাফিতে মাটি কেঁপে উঠতে লাগল। উভয়ের দেহই ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে অজস্র রক্তধারা ছুটতে লাগল।

অবশেষে দুরন্ত রাক্ষসকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর ব'সে মহাবীর কার্ত্তিকেয় বললেন—"ওরে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস, আর তোর রক্ষা নেই। বিধাতা তোর বিনাশের জন্যেই আজ তোকে আমার সম্মুখে ফেলে দিয়েছেন।" বলতে বলতে তিনি ত্রিশিরার মুখে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন।

যন্ত্রণায় বিকট আর্ত্তনাদ করতে করতে ত্রিশিরা প্রাণত্যাগ করল।

কার্ত্তিকেয় আর বিলম্ব না ক'রে ত্রিশিরার মৃতদেহটাকে টেনে দূরে ফেলে দিয়ে, দেবলোকে চ'লে গেলেন। ... ...

পরদিন সকাল হ'তে—ত্রিশিরার বিরাট মৃতদেহ পথের পাশে প'ড়ে থাকতে দেখে সকলে সাশ্চর্য্যে ভাবল—তাই ত, একে হত্যা করলে কে? এত বড় বীর পৃথিবীতে ছিল নাকি?

অনেকে ভয়ে তার মৃতদেহের কাছেও এগিয়ে যেতে পারছিল না—কি জানি রাক্ষসটা যদি ছল ক'রে মরার মত প'ড়ে থাকে !

হঠাৎ দৈববাণী হ'ল—'ত্রিশিরা নিহত হয়েছে। দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৃষ্টির কল্যাণের জন্য রাক্ষসকে নিধন করেছেন।'

দৈববাণী শুনেই সকলে পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রে উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল—"জয় দেব-সেনাপতি মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের জয় !"

তারপর বহুদিন পরে, ত্রিশিরা যেখানে কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক নিহত হয়েছিল—সেখানে এক নগর গ'ড়ে উঠল এবং ত্রিশিরার নাম অনুসারেই তার নাম হল 'ত্রিশিরাপল্লী'।

সেই 'ত্রিশিরাপল্লীই' ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে হ'য়ে আজকাল **ত্রিচিনপল্লী** নামে অভিহিত হয়েছে। কার্ত্তিকেয়ের বীরত্ব ও জন-হিতৈষণার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য এখনও ঐ অঞ্চলে প্রতিবৎসরই 'সুব্রহ্মণ্যদেব' নামে মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের পূজা হ'য়ে থাকে।

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

বেঙ্গল টাইম

আদিমকাল হইতে মানব যে কেমন করিয়া অসুবিধাগুলিকে একে একে দূর করিয়াছে,—বাধা-বিপত্তিকে কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে জয় করিয়াছে—প্রকৃতিকে কেমন করিয়া একটির পর আর একটি শৃঙ্খলে ক্রমাগতই বাঁধিয়া এখন একেবারে তাহার প্রভু হইয়া বসিয়াছে, তাহা যদি ভাবা যায়, তবে বিস্ময়ে হতভম্ব হইতে হয়।

মানুষ স্মরণাতীত যুগ হইতেই অনুভব করিয়াছে যে, সময়টাকে মাপিবার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে ; তবে সময় নির্দ্ধারণ করিবার প্রথা কোন্ সময় হইতে জগতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না।

জানি না, মানব সভ্যতার কোন্ শৈশবকালে মানব লক্ষ্য করিয়াছিল যে, সূর্য্য প্রত্যহ প্রাতঃকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া তাহার নিয়মমত ঠিক সমান গতিতে সমস্ত আকাশটি পরিভ্রমণ করিয়া দিনের শেষে আবার পশ্চিম দিক্চক্রবালে ঢলিয়া পড়ে। অমনি মানব সূর্য্যের অবস্থিতি-স্থান লক্ষ্য করিয়া সময়ের পরিমাণ

নির্ণয়ে ব্যাপৃত হইল। তাই ক্রমে সূর্য্য-ঘড়ির জন্ম হইল। সম্ভবতঃ প্রস্তর যুগের মানুষেরা পাথর কিংবা অনুরূপ বস্তুর সাহায্যে যে সময় নিরূপণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা যে সূর্য্য-ঘড়িই, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দেয়।

ক্রমে জগতের ইতিহাসের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সময় দেখিবার অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীন যুগের সূর্য্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের হাত-ঘড়ি এবং আংটি-ঘড়ি ও বিদ্যুৎ-চালিত ঘড়ি পর্য্যন্ত আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। যান্ত্রিক যুগে, অভিনবত্বই আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া দেয়। সময় দেখিবার অবলম্বন ঘড়িরও যে আরও নব নব কলেবর দেখিতে পাইব না তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতে সময় নিরূপণ করিবার আধুনিক প্রণালীর ইতিহাস এবং ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি—মনে হয় অতি অল্পদিনের এবং অনুমিত হয় যে, ইহা ভারতীয় প্রাক্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জনেরই সৃষ্টি। এইরূপ কথিত আছে যে, লর্ড কার্জ্জন ভারতে এক 'সাধারণ সময়' (Standard Time) নির্ব্বাচন করেন—ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক মহলে যাহার মূল্য সেই সময়ে যথেষ্ট ছিল বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। ভারতে ডাকবিভাগ ও রেলপথের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই এখানে যে একটি সাধারণ সময়ের আবশ্যক তাহা বেশ উপলব্ধি করা গিয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশে যেরূপ সময় নিরূপণের প্রথা প্রচলিত ছিল, তদনুরূপ প্রথা লর্ড কার্জ্জনের পূর্ব্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন প্রদেশ নিজস্ব সময়ানুযায়ী কার্য্য করিত, হয়ত তদ্দ্বারা তাহাদের কার্য্যের ব্যাঘাতও ঘটিত না। কার্জ্জন-যুগের প্রারম্ভে, ভারতীয় রেলসমূহে, অধুনা কালের মন্দ্রসময়ই (Madras Time) প্রবর্ত্তিত ছিল—যাহা বর্ত্তমান ভারতীয় সাধারণ সময় হইতে প্রায় ৯ মিনিট ন্যূন। এইরূপ বৈষম্যে তাহাদের কার্য্যের কোন অসুবিধা হইত না বোধ হয়; নচেৎ তাহারা একটি সাধারণ সময় প্রবর্ত্তনের চিন্তাও করিতে পারিতেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্র হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবর্ত্তিত সময়ের প্রচলন, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করিলেন। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০° ডিগ্রী ঘুরিতেছে; অতএব ১° ডিগ্রী ঘুরিতে ৪ মিনিট সময় লাগিবে। সুতরাং ৮২°৩০´ পূর্ব্ব-দ্রাঘিমানুযায়ী যে সময় হওয়া উচিত তাহাই ভারতের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির

হইল। সেইজন্য ভারতীয় নির্দ্দিষ্ট সময় বিশ্বপ্রবর্ত্তিত গ্রীন্‌উইচ্ (Greenwich) সময় হইতে ৫॥ ঘণ্টা অগ্রে যাইবে, ইহাই ঠিক হইল এবং আরও ব্যবস্থা করা হইল যে, আমাদের ভারতীয় সময়, কেন্দ্রীয় ইউরোপীয় সময় হইতে ৪॥ ঘণ্টা অগ্রে যাইবে; ২ ঘণ্টা এবং ৯ মিনিট যথাক্রমে তদানীন্তন এলাহাবাদ ও মাদ্রাজ সময় হইতে দ্রুত যাইবে। পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাদেশিক প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে হইল এবং সর্ব্বত্র এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রথার প্রতিপত্তি কার্য্যে পরিণত হইল। কিন্তু আমাদের কলিকাতা মহানগরীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল—কলিকাতার জন্য স্বতন্ত্র সময় ধার্য্য হইল। কলিকাতার নিজস্ব সময়—বিধিমত ভারতীয় সময় হইতে ২৪ মিনিট অধিক পূর্ব্বে চলিবে স্থির হইল।

বিশ্বের সময় নিয়ন্ত্রণে গ্রীন্‌উইচ্ প্রথা কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গের উত্থাপন অসঙ্গত হইবে না। এক্ষণে জগতের বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ গ্রীন্‌উইচ্ সময়ের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। প্রধানতঃ আমেরিকাই উপলব্ধি করে যে, সমগ্র জগতের একটি মাত্র নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিবে। অপর দিকে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের রেলবিভাগসমূহ যথাক্রমে গ্রীন্‌উইচ্ ও প্যারিসের সময় মানিতে সুরু করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার মধ্য ও পশ্চিম দেশীয় রেল-বিভাগসমূহ 'ওয়াশিংটন্ সময়' যে মানিবে, ইহাও আশা করা গেল না। এইরূপ বৈষম্যের প্রতিকারের প্রচেষ্টা প্রথমে স্যাণ্ডফোর্ড ফ্লেমিং (Sandford Fleming) নামক একজন কানাডাবাসী দ্বারা সাধিত হয়। তিনি ১৮৭৮ খৃঃ অঃ সমগ্র পৃথিবীটাকে ২৪টি নির্দ্দিষ্ট মধ্যরেখায় বিভক্ত করিলেন—যাহাদের দ্রাঘিমার ব্যবধান হইল স্বভাবতঃই ১৫° ডিগ্রী করিয়া। গ্রীন্‌উইচ্ হইতে মাপকার্য্য সুরু হওয়াতে ইহার দ্রাঘিমা হইল ০° ডিগ্রী। হল্যাণ্ড ব্যতিরেকে সমগ্র ইউরোপ তিনটি নির্দ্দিষ্ট সময়ানুযায়ী বিভক্ত হইল, যথা গ্রীন্‌উইচ্ কাল, মধ্য-ইউরোপীয় কাল (গ্রীন্‌উইচ্ কাল হইতে ১ ঘণ্টা দ্রুত) এবং পূর্ব্ব-ইউরোপীয় কাল (গ্রীন্‌উইচ্ কাল হইতে ২ ঘণ্টা দ্রুত)। উত্তর আমেরিকায় পাঁচটি স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট সময় বিদ্যমান—অতলান্তিক (গ্রীন্‌উইচ্ কাল হইতে ৪ ঘণ্টা বিলম্ব), প্রাচ্য (৫ ঘণ্টা বিলম্ব), মধ্য (৬ ঘণ্টা বিলম্ব), পার্ব্বত্য ও প্রশান্তীয় (যথাক্রমে ৭ ঘণ্টা ও ৮ ঘণ্টা বিলম্ব)। অষ্ট্রেলিয়ায় গ্রীন্‌উইচ্ হইতে ৮ হইতে ১০ ঘণ্টা—দ্রুত সময় মানা হয়। রাশিয়ায় ন্যূনাধিক নিজস্ব ৪টি নির্দ্দিষ্ট সময় প্রবর্ত্তিত আছে।

বেতারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্বের নির্দ্দিষ্ট কাল নির্ণীত হইতেছে—ঐ বেতারের সাহায্যে। বেতারের মারফতই আমাদের কলিকাতাস্থ আলিপুর মানমন্দির হইতে দিনে দুইবার করিয়া আন্তর্জাতিক প্রথানুযায়ী কালনির্দ্দেশক নিশানা (Time-Signal) দেওয়া হয়। তোমরা যদি কখনও এরোপ্লেনের আড্ডাখানা এরোড্রোমে যাও, তবে লক্ষ্য করিবে যে, সেখানের দপ্তরের ঘড়িতে দুইটি বিভিন্ন সময় নিরূপণের ব্যবস্থা আছে,—ঘড়ির একটি হাত ভারতীয় নির্দ্দিষ্ট সময় এবং অপর হাতটি গ্রীনৃউইচ সময় নির্ণয় করিতেছে।

বর্ত্তমান আলোক-নিয়ন্ত্রণের ফলে, কলিকাতা এবং উপকণ্ঠে, সন্ধ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে লোক চলাচলের মাত্রা হ্রাস পায়, তার জন্য বাংলা সরকার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন। সুতরাং সকল পথিক ও কেরাণীকুল যাহাতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে স্ব স্ব আবাসস্থলে পঁহুছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইল। সূর্য্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারায় অগত্যা ঘড়ির কাঁটাই ১ ঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া স্থির হইল। সেই জন্য ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার সময়কে আরও ৩৬ মিনিট আগাইয়া যাইতে হইল, যাহা ভারতীয় নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে ১ ঘণ্টা দ্রুত হইল এবং হিসাবও পূর্ব্বাপেক্ষা সরল হইয়া গেল। ইহাই এক্ষণে, আমাদের 'বঙ্গীয় কাল' বা 'বেঙ্গল টাইম' বলিয়া অভিহিত এবং প্রচলিত। এক বাংলাদেশেই আজ তিন রকম সময় লক্ষ্য করা যায়—'ভারতীয় সময়' (I. S. T.), 'কলিকাতা সময়' (Calcutta Time) এবং 'বঙ্গীয় সময়' (Bengal Time)। এই অভিনব প্রথার পথপ্রদর্শক এই বাংলাদেশ। বাংলার দেখাদেখি আজ বিহার এবং আসামও তাহাদের নিজস্ব সুবিধানুযায়ী 'বিহার টাইম' এবং 'আসাম টাইম' করিয়াছেন। এক্ষণে তীক্ষ্ণধী মহামতি গোখলের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইতেছে—"What Bengal think to-day, whole of India will think to-morrow," অর্থাৎ আজ বাংলা যাহা চিন্তা করে, সমগ্র ভারত কল্য তাহা চিন্তা করিবে। আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি—যেদিন সমগ্র ভারত, সকল কার্য্যেই বাংলাকে পুরোভাগে রাখিয়া অগ্রসর হইবে।

শ্রীশশাঙ্কমোহন কর, এম. এস্-সি.

নববর্ষের পণ

দুর্গম পথে নির্ভয়ে মোরা চলিব নবীন যাত্রী,
করিব না ভয় বিভীষিকাময় গভীর তিমির রাত্রি।
মেরু-মরু-গিরি-সাগরের ডাকে হ'ব চির-চঞ্চল,—
বদ্ধ ঘরেতে রুদ্ধ র'ব না আমরা সবুজ-দল।
বিজয়পতাকা উল্লাসে বহি' উন্নত করি' শির—
দেশ-দেশান্তে ছুটিয়া চলিব আমরা তরুণ বীর!

জগতের যত সঞ্চিত ব্যথা বেদনার ইতিহাস
মানুষের দুঃখ-দৈন্য আমরা সকলি করিব নাশ।
আমরা ঘুচাব মানুষের ভেদ দ্বন্দ্ব বিরোধ দ্বেষ,—
মানবের মাঝে আছে যে দানব তাহারে করিব শেষ।
বিশ্ব হইতে নিঃশেষে মোরা মুছায়ে রক্তধারা
গড়িব নূতন প্রেমের রাজ্য মর্ত্ত্যে স্বরগপারা।

নববর্ষের প্রথম প্রভাতে করিনু নূতন পণ ;
হৃদয়ে ভক্তি বাহুতে শক্তি দাও, দাও ভগবন্!

শ্রীনীলরতন দাশ, বি. এ.

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

দ্বিতীয় ভাগ

সাগরের বুকে

পূর্ব্ব ঘটনার এক বৎসর পরের কথা। রাজেন বড়ুয়া ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টানিল ; ঢং ঢং করিয়া পাগলা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আওয়াজ শুনিয়া মাল্লারা ছুটিয়া ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বনমালী এবং সুরেশ রায় ছুটিয়া আসিল, ব্যাপার কি জানিতে।

রাজেন আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—"জাহাজখানার ভারী বিপদ।"

বনমালী বলিল—"কি অবাক্ কাণ্ড ! ওটা ওরকম কি ক'রে হ'ল ?"

সুরেশ দেখিল তাহাদের ঠিক সম্মুখে অনেক দূরে সমুদ্রের বুকে একখানি ছোট্ট পালের জাহাজ বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ঢেউয়ে আন্দোলিত হইতেছে। আরও নিকটে উপস্থিত হইবার পর সকলেই জাহাজখানা দেখিয়া বিস্মিত হইল।

দেখিয়া মনে হয় প্রবল এক ঝঞ্ঝা জাহাজের পাল, মাস্তুল সব ওলট-পালট করিয়া দিয়া গিয়াছে, দড়িগুলি ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে; ছেঁড়া পালের ও দড়ির টুকরাগুলি বাতাসে উড়িতেছে। ছোট ছোট কতকগুলি পালের টুকরা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কোনমতে ধীরে ধীরে জাহাজটিকে চালান হইতেছে।
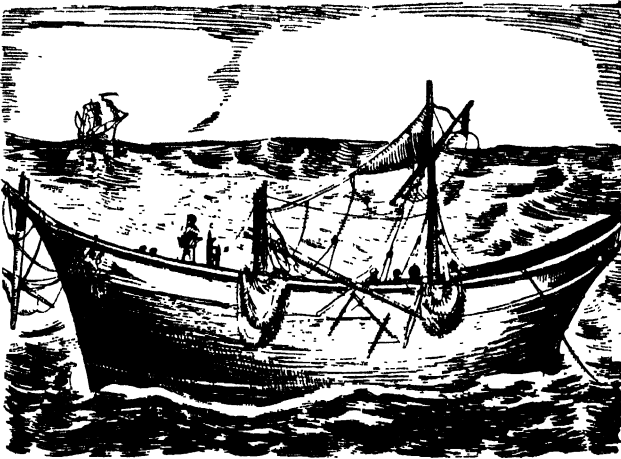
সুরেশ বলিল—"ব্যাপার কি, কোন ঝড়-ঝাপ্টা তো এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নি! রাত্রে কি ঝড় হয়েছে রাজেন ?"

বনমালী বলিল—"তা ঝড় বা ঝড়ের কোন লক্ষণই তো দেখা যায় নি!"

—"তবে এর এরকম অবস্থা কি ক'রে হ'ল ?"

দেখা গেল ছয়-সাতজন মাল্লা জাহাজটার ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের পাশে লম্বাচৌড়া একজন সাহেব। সাহেবটি হয়তো জাহাজের মালিক বা প্রধান কর্ম্মচারী। জাহাজের প্রধান কর্ম্মচারী ইউরোপীয় মনে হওয়ায় সুরেশ ইংরাজীতে বলিল—"খবরদার, আমি তোমাদের জাহাজে আসছি।"

সুরেশ নিজ জাহাজের রেলিং ধরিয়া একলাফে অপর জাহাজে উঠিল।

সুরেশ বলিল—"কাপ্তেন, কি বিপদ হয়েছে ?"

—"আমরা একদল বোম্বেটের হাতে পড়েছিলাম।"

—"অ্যাঁ, তাই নাকি!" বলিয়া সুরেশ কতক্ষণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। সে এপর্য্যন্ত জলদস্যুর কথা চিন্তাও করে নাই। তাহার চক্ষু দুইটিতে অর্থহীন দৃষ্টি দেখিয়া

সাহেব বলিল—"কতকগুলো বদমাস বোম্বেটে, তাদের নয়জন ছিল অসভ্য, চেহারা দেখে দেখে মনে হয় আর তিনজন অসভ্যজাতের লোক নয়—কিন্তু অসভ্য সেজে এসেছিল। আমি নিকোবর দ্বীপ থেকে দশ টন ফোপরা (নারিকেলের শাঁস) নিয়ে আসছিলাম। রাস্তায় ওরা সব লুঠে জাহাজ অচল ক'রে রেখে গেছে। আমরা বুঝবার আগেই তা'রা কি রকম ক'রে জাহাজে উঠে আমাদের বেঁধে, সব নিয়ে চ'লে গেল! আমি বন্দুক নিয়ে রুখে দাঁড়াতেই তাদের একজন এসে আমায় পেছন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে,

বন্দুক কেড়ে নিলে। পাজীরা মুখে কালি মেখে এসেছিল যেন চিনতে না পারি!" এই পর্য্যন্ত বলার পর, ক্রোধে, ক্ষোভে মুহ্যমান সাহেবের গলার স্বর যেন বন্ধ হইয়া গেল।

—"তা'রা কিসে এসেছিল?"

—"একটা বড় লম্বা নৌকোয়। ব্যাটারা আমার হাত মুচড়ে দিয়ে বলল, আমার নাকি পরম সৌভাগ্য যে হাত ভেঙ্গে ছিঁড়ে দেয় নি। তারপর রিভলভার দেখিয়ে আমারই লোকদের বাধ্য করল তাদের নৌকোয় মাল তুলে দিতে। সব মাল নেওয়া হ'লে জাহাজের এই অবস্থা ক'রে দিয়ে নৌকো বেয়ে পালাল।"

সাহেব জাহাজের কাপ্তেন; নাম জন ফ্রিম্যান। ফ্রিম্যান সাহেব তাহার কাহিনী বলিতে বলিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ আলাপের পর ফ্রিম্যান বলিল—"আমরা বোধ হয় রেঙ্গুনের নিকটে এসেছি, আমায় রেঙ্গুন পৌঁছে দিতে পারেন কি?"

সুরেশ বলিল—"বেশ, দেওয়া যাবে। যে সকল বোম্বেটে জাহাজ আক্রমণ করেছিল তাদের কাউকে কি চেনা ব'লে মনে হ'ল?"

—"না মোটেই না। অসভ্যদের তো চেনার কোন কারণই নেই। বাকী তিনজনও কালি মেখে এরকম হ'য়ে এসেছিল যে, কা'র সাধ্য তাদের দেখে চেনে!"

—"তা'রা লুঠ ক'রে কোন্ দিকে গেল লক্ষ্য করেছিলেন কি ?"

—"আমি তাদের দক্ষিণে যেতে দেখেছি। যদি তা'রা পেনাং কি সিঙ্গাপুরের দিকে গিয়ে থাকে, তবে যুদ্ধজাহাজের গোলা খেয়ে মরবে। তবে নৌকোয় যে পরিমাণ মাল বোঝাই হয়েছে, তাতে তা'রা খুব তাড়াতাড়ি ক'রে যেতে পারবে না, এই যা ভরসা।"

—"আচ্ছা আপনার জাহাজ আমি রেঙ্গুনে টেনে নেবার ব্যাবস্থা করছি, এখন তবে আসি।"—বলিয়া, সুরেশ অতি চিন্তিতভাবে নিজ জাহাজে উঠিল। অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজখানাকে সুরেশের জাহাজ বেণীমাধবের সহিত বাঁধিয়া লওয়া হইল।

সুরেশ জাহাজে ফিরিয়া বনমালীকে বলিল—"এ তো দেখছি নূতন ক'রে আবার সেই সেকালের স্প্যানিয়ার্ড জলদস্যুদের দিনকাল আরম্ভ হ'ল! যদি ব্যাটারা সিঙ্গাপুরের দিকে যায়, তবে আর বাঁচতে হবে না।"

—"তা'রা কি আর সেদিকে যাবে ?"

—"সত্যি এত বোঝাই নৌকো নিয়ে তা'রা কি ক'রে অতদূর যাবে ? আর যাবেই বা কোথায় ? একবার এসব কথা প্রকাশ হ'লে তো আর উদ্ধার নেই !"

—"কোন্ দিকে যাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

—"আমার মনে হয় ওদের পেছনে জাহাজ আছে। জাহাজে মাল বোঝাই দিয়ে নৌকো ডুবিয়ে ফেলে পালাবে। তারপর কোথাও গিয়ে সাধু সেজে মালগুলো বিক্রি ক'রে ফেলবে।"

—"হয়ত তাইই।"

—"তা হ'লে লাভটা এক রকম মন্দ হবে না। ফোপরা দশ টন ছিল, তিনশো টাকা ক'রে যদি টন হয়, তবে মোট তিন হাজার টাকা পাবে। আমাদের এরকম ছোট ছোট জাহাজে এক এক ক্ষেপ মাল বওয়ার চেয়ে একটু সাহস ক'রে যদি ঐ রকম এক একটা বাগড়া মারা যায় তবে মন্দ কি !"

—"আমার মনে হয় এই ওদের ব্যবসার সুরু। যদি ধরা না পড়ে, বেশ চালিয়ে যাবে। এখন থেকে আমাদেরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

বনমালী একটু হাসিয়া বলিল—"বেণীমাধবের ওপর নজর দিলে ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা হবে। একবার যদি আসত আমাদের জাহাজে—" (ক্রমশঃ)

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

গৈবীনাথ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের লুপ্ লাইনের উপর সুলতানগঞ্জ একটি ছোট স্টেশন। এই স্থানটি ভাগলপুর জিলার অন্তর্গত এবং ভাগলপুর সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

সুলতানগঞ্জ স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে গঙ্গানদী বহিয়া গিয়াছে। সেই স্থানে গঙ্গার বুকে একটি ছোট দ্বীপ আছে। দ্বীপটি শৈলময়—তাহাতে গাছপালা বিশেষ কিছুই নাই। উহার আধুনিক নাম 'জহনগিরা'। দ্বীপটির এইরূপ নাম হইলেও সম্রাট্ জাহান্গীরের সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই জহনগিরাতে গৈবীনাথ নামে এক শিবের মন্দির আছে।

জহনগিরা একটি ছোট শৈলময় দ্বীপ হইলেও উহার প্রত্যেক শিলাখণ্ড সেই পুরাতন দিনের বিপুল কাহিনী বুকে ধরিয়া আজও সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বীপের উপরে কৃষ্ণপাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে মহাযোগী ধ্যানমগ্ন; আর নিম্নে গিরির পদমূল ধুইয়া জাহ্নবীর পূত সলিল শত শত যুগ ধরিয়া প্রবাহিত। দ্বীপের চারিদিকে গঙ্গার সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই, সেই ভীম গর্জ্জন নাই, কেবল কল-কল্লোল নিয়ত দূরদূরান্তে ভাসিয়া যায়। একদিকে গঙ্গার সীমান্তরেখা দিক্চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে স্নিগ্ধ শ্যামল হরিৎক্ষেত্র তাহার নিস্তরঙ্গ কোলে গড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর দ্বীপের নির্জ্জনতা ও মহাযোগীর সাধনার উপযোগী ধ্যানিভাব—গঙ্গার শান্ত স্নিগ্ধ মাধুর্য্যকে অতীব মনোরম করিয়াছে। এই স্থানে আসিলে মানব সংসারের শোকতাপ দুঃখকষ্ট সবই ভুলিয়া যায়। তাহার বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্ত কিসের আকর্ষণে কোথায় কোন্ স্বপ্নলোকে চলিয়া যায়।

সেই পৌরাণিক যুগের এক অপূর্ব্ব পুণ্যময়স্মৃতি এই 'জহনগিরা' আজও বহন করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দ্বীপটির আধুনিক নাম 'জহনগিরা'; কেহ কেহ ইহাকে 'জাহানগিরি'ও বলিয়া থাকে। জহন বা জাহান 'জহ্নু' শব্দেরই অপভ্রংশ। কাজেই এককালে ইহার নাম জহ্নুগিরিই ছিল—তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রবাদও এইরূপ যে—এই দ্বীপটি রাজর্ষি জহ্নুর আশ্রম ছিল এবং তাঁহার নামানুসারে এই

দ্বীপটির নাম হইয়াছিল 'জহ্নুগিরি'। রাজর্ষি জহ্নু অতিশয় তপঃপরায়ণ ছিলেন এবং সর্ব্বদা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। কথিত আছে যে, সেই পৌরাণিক যুগে সগর-বংশ উদ্ধার করিবার জন্য ভগীরথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা আনয়ন করেন। গঙ্গা আনয়নকালে পথে রাজর্ষি জহ্নুর যজ্ঞভূমি গঙ্গাজলে প্লাবিত হইয়া যায়। তাহাতে রাজর্ষি রোষাবিষ্ট হইয়া তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। পরে ভগীরথ ও দেবগন্ধর্ব্বাদির স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজর্ষি জানু বিদারণ করিয়া গঙ্গাকে মুক্তিদান করেন। মুক্তিলাভের পর গঙ্গা এই স্থান হইতে জাহ্নবী নাম গ্রহণ করিয়া ভগীরথের অনুগমন করেন। সুতরাং জহ্নুগিরি সেই পৌরাণিক যুগের পুণ্যস্মৃতি হিন্দুর হৃদয়ে জাগাইয়া তোলে। তাই আজও জহ্নুগিরি হিন্দুর একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের দৃষ্টিও এই দ্বীপটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা ইহার একটা ঐতিহাসিক মূল্যও নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোতে যখন ভারতভূমি প্লাবিত, তখন হইতেই এই নির্জ্জন ও সুরম্য স্থানটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সময় হইতে দলে দলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া এই দ্বীপ ও তাহার নিকটের স্থানগুলিতে তাহাদের বিহার নির্ম্মাণ করে। যদিও সেই বিহারগুলি বহুকাল পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তবু স্থানে স্থানে উচু উচু মৃত্তিকা-স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্তূপগুলির মধ্যে একটিতে প্রায় ৬ ফুট উচু একটি তামার বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েন্‌সান্ যখন ভারতে আসেন, তখন এই বিহারগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই স্তূপগুলি খনন করা হয়, তখন ঐগুলির মধ্যে কোন একটিতে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত স্বর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক, নীলকান্তমণি, মরকতমণি, চুণি, পান্না পাওয়া যায়। ধর্ম্মের দিক দিয়া এই দ্রব্যগুলি বৌদ্ধগণের বড় আদরের বস্তু। এই দ্রব্যগুলি ছাড়া দুইটি মুদ্রাও পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে একটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের। সুতরাং উহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই স্থানটি বৌদ্ধ বিহাররূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কাজেই জহ্নুগিরিও সেই সময়ে এই পারিপার্শ্বিক বৌদ্ধপ্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাই আজ আমরা জহ্নুগিরির প্রত্যেক শিলাখণ্ডকে বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য-শিল্প-চিত্রে সমৃদ্ধ দেখিতে পাই। কোন কোন শিলাখণ্ডে গুপ্ত বর্ণমালাও উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের সঙ্গে জহ্নুগিরি প্রাচীন হিন্দুজাতির

অধিকারে আসে। তাহার ফলে প্রাচীন হিন্দুর ভাস্কর্য্যধারাও জহ্নুগিরিগাত্রে মুদ্রিত হয়।

আধুনিক হিন্দুপ্রভাব এই জহ্নুগিরির উপর কখন যে পতিত হয়, তাহার কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে প্রবাদ এই যে, হরিনাথ নামে এক সিদ্ধযোগী এইখানে তপস্যা করিতেন। তিনি প্রতিদিন উত্তরবাহিনী জাহ্নবীর পূতসলিলে অবগাহন করিয়া যোগবলে প্রায় শত ক্রোশ দূরে গমন করিয়া বৈদ্যনাথধামে মহাদেবের পূজা করিয়া আসিতেন। ইহাতে হরিনাথের যথেষ্ট কষ্ট হইত। ভক্তের কষ্ট আর মহাদেবের সহ্য হইল না। তাই মহাদেব একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়া হরিনাথকে বলিলেন, "দেখ হরিনাথ, তোমাকে আমার পূজার জন্য কষ্ট করিয়া আর অতদূর যাইতে হইবে না। কাল প্রাতঃকালে তোমার আশ্রমের নিকটে আমার যে মূর্ত্তি পাইবে তাহাকেই তুমি পূজা করিবে।" উহার পরদিন প্রাতঃকালে হরিনাথ নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক শিবলিঙ্গ পাইলেন। সেই শিবলিঙ্গকেই তিনি গৈবীনাথরূপে জহ্নুগিরির শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পর তিনি তথায় এক মঠ স্থাপন করিয়া উহার অধিপতি হন। কিন্তু ইহা বহুদিনের কথা নয়; কারণ ডাক্তার হ্যামিলটন্ যখন জহ্নুগিরি দেখিতে যান, তখন দিগম্বর উক্ত মঠের অধিকারী ছিলেন। দিগম্বর বলিয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত মঠের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে অনন্ত উক্ত মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজ আমরা যে সকল মন্দির দ্বারা জহ্নুগিরিকে সুশোভিত দেখিতে পাই তাহা অনন্তেরই কীর্ত্তিধ্বজা বহন করে।

এই সকল নানা কারণে জহ্নুগিরি হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং যতদিন হিন্দুজাতি বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন এই জহ্নুগিরি হিন্দুর তীর্থক্ষেত্ররূপে পূজা পাইয়া আসিবে। যদি তোমাদের কখনও সুযোগ হয়, যদি তোমরা কখনও গঙ্গানদী দিয়া নৌকা কিংবা ষ্টিমারে করিয়া ঐ পথ দিয়া যাও অথবা রেলগাড়ী করিয়া সুলতানগঞ্জ ষ্টেশন দিয়া যাও, তাহা হইলে এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্র একবার দেখিয়া আসিতে ভুলিও না। *

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সিংহ, বি. এ.

* গত আশ্বিন মাসের শিশুসাথীতে এই নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে ঐতিহাসিক বিষয় অতি অল্পই ছিল। তাই এই লেখাটি মুদ্রিত হইল। শিঃ সাঃ সঃ

নববর্ষে

আজি নববর্ষে
নূতনের 'পর্শে
গুঞ্জরে শত অলি
ভারতীর কুঞ্জে।
শত নব ছন্দে
উছল আনন্দে
উতরোল সৌরভ
ফুলদল-পুঞ্জে॥
অমিয়ার বৃষ্টি!
সচেতন সৃষ্টি;
শিহরিছে অম্বরে
পূর্ণিমা-ইন্দু।
তরুশিরে—শষ্পে—
লতিকায়—পুষ্পে—
উথলিছে হিল্লোলে
পুলকের সিন্ধু॥

অসীমের সঙ্গে
নেচে চলে রঙ্গে
মাতোয়ারা উৎসবে
আনমনা বিশ্ব।
অমৃতের লক্ষ্যে
দ্বিধাহীন বক্ষে
মন্দিরে মিলিয়াছে
কি ধনী, কি নিঃস্ব॥
খদ্যোতে—সূর্য্যে—
বংশীতে—তূর্য্যে—
সমভাবে সংহত
অর্চ্চনা ছন্দে।
সিন্ধুর আহ্বানে
বিন্দু মাতিছে গানে
স্পন্দিত অন্তরে
বন্দনানন্দে॥

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

পবিত্র তুলসী

উদ্ভিদের মধ্যে কতিপয় উদ্ভিদ্ আছে, যাহাদিগকে হিন্দুগণ দেবতা জ্ঞানে সেবাপূজা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের মধ্যে তুলসী অন্যতম, এমন কি সর্ব্বপ্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সারা ভারতের হিন্দুগৃহেই তুলসীর সেবাপূজা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ উহার নিত্যসেবা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। নববর্ষে বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখ হইতে হিন্দুগৃহে তুলসীগাছের উপর জলধারা প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। পল্লীগ্রামে তুলসীমঞ্চ অতি পবিত্র স্থান। এমন কি সহরের

পাকা বাড়ীতেও, টবের ভিতর বৰ্দ্ধিত তুলসীর মূলে গৃহিণীগণ সন্ধ্যাবেলা ধূপদীপ দান করিয়া ভক্তিভাবে সেবাপূজা করিয়া থাকেন।

উদ্ভিদের মধ্যে তুলসীর স্থান এত উচ্চে কেন? পৌরাণিক কাহিনীতে জানা যায় যে,—শঙ্খচূড় দানবের পত্নী তুলসী অতি পতিব্রতা রমণী ছিলেন। তাঁহার পাতিব্রত্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে এই বরদান করেন যে—'তুমি উদ্ভিদ্‌রূপে আমার সেবকদিগের নিকট অতিশয় ভক্তিভাবে পূজিত হইবে। তোমার সেবাপূজা দ্বারাই মানব আমার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইবে।' পৌরাণিক কাহিনী নহে—উদ্ভিদ্ হিসাবে উহার বৈশিষ্ট্য কতটুকু সে-কথারই এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রকারভেদে তুলসী বহু রকমের; যথা—রামতুলসী, বনতুলসী, ভুঁইতুলসী, পবিত্র তুলসী প্রভৃতি। উহাদের মধ্যে পবিত্র তুলসীর সহিতই আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। স্বাদে, গন্ধে, গুণে ও আকারে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও বিভিন্ন রকম তুলসীর পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিকট। পবিত্র তুলসীর বর্ণ-পার্থক্যে, সাধারণতঃ তাহাদিগকে শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যাহার পাতার রং ফিকে সবুজ তাহাকে শ্বেত, আর যাহার পাতার রং কালো তাহাকে কৃষ্ণ তুলসী বলা হয়। এই উভয় তুলসীই হিন্দুগৃহে সমভাবে পূজিত হইতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও উহারা তুল্যগুণবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাতা এবং পুষ্পগুচ্ছের সুগন্ধের দরুণ তুলসীগাছ সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ফল ও ফুল—ক্ষুদ্র বলিয়া উহাদের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে চক্ষে পড়িবার কথা নহে। সেজন্য উহার ফল, বিশেষভাবে উহার ফুল, লেন্স সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। উহার প্রত্যেক ফুল হইতে চারিটি করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের উৎপত্তি হয়। ফুল হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া পাকিয়া গেলেও উহার ফলগুলি বহিরাবরণের (calyx) ভিতরে সংরক্ষিত থাকে। সেই বহিরাবরণের উপর পিন কিংবা নখ দ্বারা চাপ দিলেই চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল বাহির হইয়া আসিবে।

আয়ুর্ব্বেদমতে তুলসী উষ্ণবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, দাহজনক ও পিত্তকারক। উহা কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বমূল, কফ ও বায়ুনাশক। উহার পাতা, ফুল, মূল প্রভৃতি নানারকম রোগের আশু ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সাধারণ সর্দ্দি-কাশিতে উহার পাতার রস প্রায় সময়েই ব্যবহার করিতে দেখা যায়। চুনের সঙ্গে

তুলসীপাতার রস মিশ্রিত করিয়া দক্রু-আক্রান্ত স্থানে প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রোগবিশেষে উহার প্রয়োগের যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহাদের মধ্যে আরও কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে।

তুলসীপাতার রস ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠ পরিষ্কারের একটি বিশেষ ঔষধ। তাহাদের সাধারণ পেটব্যথাতেও তুলসীপাতার রস মধুসহ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তুলসীপাতার রস দুই-এক ফোঁটা কানের ভিতর প্রয়োগ করিলে কর্ণশূলের প্রথম অবস্থায় ব্যথার উপশম হয়। তুলসী ফুলের সঙ্গে আদা ও পেঁয়াজের রস মিশ্রিত করিয়া মধুসহ সেবন করিলে গলা ও ফুস্‌ফুসের ভিতরকার কফ, কাশির সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। উহার কচি ফুল, মূল ও পাতার রস সর্প-বিষের প্রতিষেধক। তুলসীর পবিত্র গন্ধে চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুর পবিত্রতা সাধিত হইয়া থাকে।

সার জর্জ বারউড নামক একজন ইংরাজ মনীষী, তুলসীগাছের গুণাবলী সম্পর্কে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিলের 'টাইমস্' পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন সে-সব কথা সংক্ষেপে এখানে বলা হইল—'বোম্বাইনগরে যখন ভিক্‌টোরিয়া উদ্যান ও এলবার্ট নামক যাদুঘর (Museum) স্থাপন করা হয়, তখন সেই স্থানে মশার প্রবল প্রাদুর্ভাব ছিল ; ফলে শ্রমিকদের ভিতর ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণ দেখা দিল। স্থানীয় কার্য্যাধ্যক্ষের উপদেশ অনুসারে, বাগানের চতুর্দ্দিকে পবিত্র তুলসী ও অন্যান্য তুলসী বহু সংখ্যায় রোপণ করা হয়। তৎপর দেখা গেল যে, মশার সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণও কমিয়া আসিল। ইতিপূর্ব্বে সে স্থানে ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব থাকিলেও কালক্রমে তাহা একেবারে লোপ পাইয়া গেল।' মশাই যে ম্যালেরিয়ার বাহন সে সময় অবশ্য তাহা নির্ণীত হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, শয়নের পূর্ব্বে শয্যার উপর তুলসীর নির্য্যাস (extract) ছড়াইয়া দিলে মশার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তুলসীর নির্য্যাস গৃহে পোড়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, সে স্থান হইতে মশা অবিলম্বে দূরীভূত হইয়া যায়।

তুলসীর এই সকল গুণের কথা আলোচনা করিলে মনে হয় যে, হিন্দুর তুলসী-সেবা কোন উদ্ভিদ্-বিশেষের পূজা নহে—উহা গুণের পূজা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম. এ.

কক্ষচ্যুত নক্ষত্র

স্কুলে যেয়েই সংবাদ পেলাম একটি নূতন ছেলে ভর্ত্তি হয়েছে আমাদের ক্লাসে। মাইনরে স্কলার। রেকর্ড মার্ক পেয়ে প্রথম হয়েছে। নাম সমুদ্রকৃষ্ণ সেন। চমৎকার নাম। বড় ভাল লাগল। সমুদ্রের মত সুনীল রং। সমুদ্রের মত অতলস্পর্শ গভীরতা। কল্পনায় ছেলেটির একটি ছবি আঁকলাম; বড় ভাল লাগল।

ক্রমে পরিচয় হ'ল। ডাকনাম সাগর। সংসারে কেউ নাই; একেবারে একা। আহা, বাবা, মা, ভাই, বোন—কেউ নাই। মানুষ হয়েছে মামার সংসারে—যেন কাকের বাসায় কোকিলের দিনাতিপাত।

ছোট সহর। তারই উপকণ্ঠে পশুপতিবাবুর বাস। সংসারবিরাগী মানুষ। পাশের গ্রামের জমিদার-বাড়ীতে কি চাকরী করেন। প্রতি মাসের মাইনে ভাইদের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটান।

কি সূত্রে পশুপতিবাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল জানি না। তবে সাগর পশুপতিবাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পেল। সেখান হ'তেই স্কুল করে। সামান্য যা হাত-খরচের দরকার হয়, পশুপতিবাবুই চালান। ক্রমে আরও জানতে পারলাম—পশুপতিবাবুকে সাগর 'বাবা' ব'লে ডাকে।

অতি সাধারণভাবেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের পথ ধ'রে একটি বছর কেটে গেল। বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল—সাগর ফার্ষ্ট তো হয়েছেই, তার উপরে সেকেণ্ড বয়ের চেয়ে তার নম্বর প্রায় একশোর বেশী। এক সংস্কৃত ছাড়া আর সব বিষয়েই সে ফার্ষ্ট।

হেড মাষ্টার অত্যন্ত রাশভারী লোক। কদাচিৎ তিনি কথা বলেন—তাও অতি সংক্ষেপে। সেই হেড মাষ্টার ক্লাস-প্রমোশন ডাকতে এসে সাগরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন; বললেন—"Sagar is the brightest star in the firmament of my teaching life."

Brightest star! উজ্জ্বলতম নক্ষত্র! কথাগুলো আমাদের বুকে যেন অমর অক্ষরে লেখা হ'য়ে গেল। স্মৃতির পাতায় আজও সে লেখা জ্বলজ্বল করে। কিন্তু কোথায় সাগর? কোথায় সে প্রদীপ্ত নক্ষত্র?

অদ্ভুত প্রতিভাবান্ ছেলে। ওর স্মৃতি-শক্তি অসাধারণ। মনে পড়ে—সেদিন এ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের ক্লাস। সবাই বাড়ী হ'তে লিখে এনেছি টাস্ক্। খাতা দেখে তাই একের পর এক দাঁড়িয়ে ব'লে যাচ্ছি। আমাদের লেখা স্যানটেন্সগুলো প্রায়ই ক্লাস-টিচারের পছন্দ হচ্ছে না। এ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশনের ব্যবহার বোঝাবার জন্য তিনি বড় বড় লেখকদের সব লম্বা লম্বা কটমট স্যান্টেন্স (sentence) ব'লে দিচ্ছেন। আমরাও সেগুলো টুকে নিচ্ছি বাড়ীতে মুখস্থ করব ব'লে।

সাগরের হাত কিন্তু স্তব্ধ। ও লিখছে না একটি শব্দও—শুধু হাঁ ক'রে শুনে যাচ্ছে। ক্লাস-টিচার দুই-তিন বার লক্ষ্য করলেন, তারপর একটু শ্লেষ ক'রে বললেন—"সাগর যে হাত গুটিয়ে ব'সে আছ? তুমি কি একেবারে বিদ্যাসাগর বনে গিয়েছ নাকি?"

সাগর সোজা দাঁড়িয়ে বলল—"না স্যার, পেন্সিলটা হারিয়ে গেল কিনা পথে, তাই। তবে আপনি যা বললেন, তা তো মনেই আছে, বাড়ী যেয়ে একেবারে ফেয়ার খাতায় তুলে নেব।"

ক্লাস-টিচার ক্ষেপে উঠলেন—"কি বললে? চার-চারটে স্যান্টেন্সই তোমার মনে আছে? এসব ছেলেখেলা পেয়েছ?"

সাগর নির্ব্বিকারকণ্ঠেই জবাব দিল—"তা কেন স্যার। মনে আছে, তাই বললাম।"

ক্লাস-টিচার দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—"মনে আছে তাই বললাম! আচ্ছা, বলো দেখি কি কি স্যান্টেন্স আমি বলেছি, বুঝি কেরামতী।"

যেন এ-বি-সি-ডি পড়ছে, এমনি সহজে সাগর চার-চারটে লম্বা স্যান্টেন্সই অবিকল ব'লে দিল।

আমরা তো বিস্ময়ে হতবুদ্ধি। ক্লাস-টিচারের মুখ কালি। কিছুক্ষণ সাগরের মুখের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তিনি বই বন্ধ ক'রে ক্লাস থেকে চ'লে গেলেন। ··· ···

প্রায় বছরখানেক পরের কথা। সবে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছি। সে-কালে অপ্‌সন্যাল সাবজেক্ট নেবার ব্যবস্থা ছিল। তাই কি কি বিষয় যে নেব তাই নিয়ে স্কুলে জটলা চলেছে নিজেদের মধ্যে। অনেকেরই ইচ্ছা, সাগর যে কম্বিনেশন নেয়, তাই নেবে। মনের ভাবটা এই—ও যদি একটু সাহায্য-টাহায্য করে, তা হ'লে চাই কি দুস্তর পরীক্ষা-সাগরটা কোনমতে অতিক্রম ক'রেও যেতে পারব। অতএব সাগর স্কুলে আসা পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রইল।

কিন্তু সাগর সেদিন স্কুলে এল না এবং আর কোন দিনই এল না। অকস্মাৎ সমুদ্র শুকিয়ে গেল। উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিটকে গেল আমাদের চেনা আকাশ হ'তে। সাগর নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল।

কেন? ··· ···
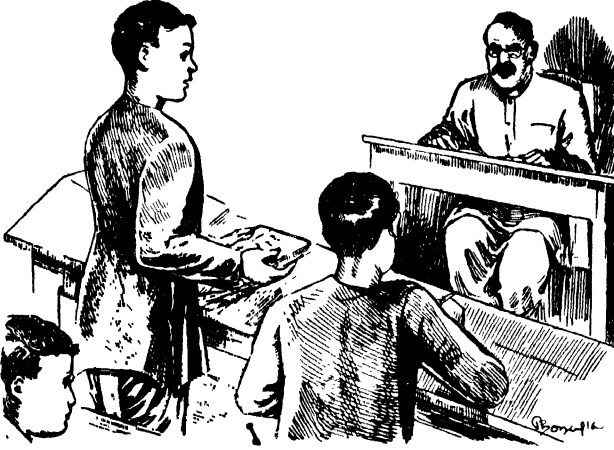
পশুপতিবাবুর ছোট ভাইয়ের শ্বশুর এসেছেন জামাই-বাড়ী বেড়াতে। কেমন ক'রে তাঁর কোটের পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানি নোট গেল উধাও হ'য়ে। প্রথম কুটুম-বাড়ী এসেছেন, চক্ষুর্লজ্জায় প্রথমটা তিনি কথাটা বললেন না কাউকে। কিন্তু কথায় কথায় সবই বেরিয়ে পড়ল। বাড়ীময় হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। ছিঃ ছিঃ! নূতন কুটুম! তাঁর পকেট থেকে নোট চুরি! লজ্জায় সকলের মাথা কাটা যেতে লাগল। শ্বশুর মশায় যত বলেন—"আহা, থাক্ থাক্, পাঁচটা টাকাই তো", সকলে ততই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন—"আজ্ঞে না, টাকার কথা শুধু নয়, এ যে মান-মর্য্যাদার কথা। একটা হিল্লে এর করতেই হবে।"

বিকেল বেলা। স্কুল থেকে ফিরে সাগর উঠানে পা দিয়েছে। বাইরের ঘরে অনেক লোকের জটলা—বাড়ীর ছেলে-বুড়ো অনেকে; আশে-পাশের লোকও রয়েছে। এদিকে-ওদিকে কয়েকটা খোলা স্যুটকেস-তোরংগ।

সাগরকে দেখেই ছেলেমেয়েরা কলরব ক'রে উঠল—"এই যে সাগরদা এসেছে। এসো সাগরদা, এবার তোমার পালা।"

পশুপতিবাবুর মেঝ ভাই গম্ভীর নির্দ্দেশে বললেন—"তোমার স্যুটকেসটা নিয়ে এসো সাগর, সকলের সামনে একবার খুলে দেখাও।"

দপ্ ক'রে সাগরের রক্তে আগুন জ্বলে' উঠল। সমস্ত শরীর জ্বালা করতে লাগল তার তীব্র দহনে। শুধু ছোট একটি প্রশ্ন করল—"কেন?"
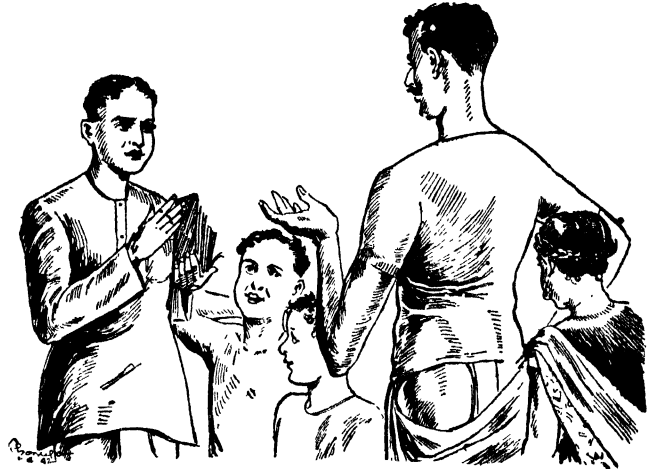
—"তাওই মশায়ের কোটের পকেট হ'তে পাঁচটা টাকা পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে—"

সাগর বাধা দিল—"আপনার কি ধারণা যে, সে টাকা আমি চুরি করেছি?"

—"না, ঠিক তা নয়। তোমাকে আমরা সে রকম ছেলে মনে করলে বাড়ীতে থাকতে দিতাম না।"

সত্যি তো, সাগর এ-বাড়ীর কেউ নয়। আশ্রিত কুকুরের চেয়ে তার মর্য্যাদা এখানে এক তিলও বেশী নয়। তবু সাগর শুধাল অতি কষ্টে—"তবে?"

—"টাকাটার কোন আস্কারাই যখন অন্যভাবে হ'ল না, তখন বাধ্য হ'য়ে সকলকেই খানাতল্লাসী করা হচ্ছে।"

ঢোক গিলে সাগর প্রশ্ন করল—"আর সব ছেলেদের স্যুটকেস-বাক্স দেখা হয়েছে ?"

কে-একজন অধৈর্য্য-কণ্ঠে বলল—"হ্যাঁ-হ্যাঁ হয়েছে। শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও।"

"ওঃ" ব'লে সাগর চুপ করল। একটু পরে বলল—"বাবার ট্রাঙ্ক-স্যুটকেসও দেখা হয়েছে ?"

পশুপতিবাবুর মেঝ ভাই এবার অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন—"তাতে তোমার কাজ কি ? তোমার কাজ যা তাই ক'রে ফেল চটপট।"

সাগর তীক্ষ্ণ দৃপ্ত-কণ্ঠে বলল—"না। বাবার স্যুটকেস খানাতল্লাসী না হওয়া পর্য্যন্ত আমার স্যুটকেস খোলা হবে না।"

অকম্পিত অগ্নি-শিখার মত সাগর বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেল। পিছনে হ'তে কে যেন বলল—"ইস্—বাবা! কি আমার ছেলেরে! তবু যদি তিনকুলে কেউ থাকত!"

মেঝ ভাই আত্মসম্মানের জ্বালায় টং। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—"দাদা নাই দিয়েই তো এই করেছেন। আসুক দাদা ফিরে, হয় ওই সাধের পুত্তুরই থাকুক এ বাড়ীতে, নয় আমরা থাকি। এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মুখের উপর কথা—"

জল-খাবার না খেয়েই সাগর বেরিয়ে গেল বাড়ী হ'তে। মাঠের একপাশে শুয়ে পড়ল চিৎ হ'য়ে। বেশ একটু শীত পড়েছে। শিশিরে ঘাসগুলো গেছে ভিজে। শুক্লা ষষ্ঠীর বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারই পানে চেয়ে চেয়ে সাগরের বুক হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল। কেউ নাই, ওর কেউ নাই। কিন্তু ওর বাবা ? পশুপতিবাবু ? তাঁর স্নেহ ? তাঁর ভালবাসা ?··· সাগরের দু'চোখ বেয়ে নামল অঝোর অশ্রুধারা।···

একটু রাত ক'রেই সাগর বাড়ী ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হ'ল কথার অগ্নি-বাণ। মেজ ভাই পাড়া মাথায় ক'রে বলছেন—"তখনই বলেছিলাম, কাজ নেই ওসব হা-ঘরে ছেলে বাড়ীতে এনে। তা দাদা একেবারে পুত্রস্নেহে গ'লে গেলেন। বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলো পর্য্যন্ত পর হ'য়ে গেল। এখন ঠেলা সামলাও। মায় বাড়ীটাকে চোরের আড্ডাখানা ক'রে তোল।"

ব্যাপার বুঝতে বেশী দেরী হ'ল না। সাগরের অনুপস্থিতিতে তার স্যুটকেস খোলা হয়েছে এবং তার মধ্যে পাওয়া গেছে আড়াইটে টাকা। এ টাকা যে অপহৃত পাঁচ টাকারই ভগ্নাংশ, বাকী টাকা উড়েছে ফূর্ত্তিতে, সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। নইলে হা-ঘরে ছেলে আড়াই টাকার মুখ দেখবে কোত্থেকে। অতএব সাগর চোর।

নিঃশব্দে সাগর তার ছোট ঘরটিতে ঢুকল। ঘর কি সত্যি তার ? না—না—না। সাগরের বিক্ষুব্ধ প্রাণ তীব্রকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এ ঘর তার নয়—এ বাড়ী তার নয়—এখানকার কেউ তার নয়। একবার সাগরের ইচ্ছা হ'ল, এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে দূরে—বহুদূরে।

কিন্তু বাবা? পশুপতিবাবু? নিজের মনের কাছেও সাগর জবাব খুঁজে পায় না। বাবাও কি সত্য তার কেউ নয়? অসহায় আবেগে সাগর বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। বুকের ভিতরে ঝড় ওঠে বুঝি। দু'চোখে অবিরল বর্ষণ। একি করলে ভগবান—শেষে চোর অপবাদ!

রাত্রেও সাগর কিছু খেল না। দরজায় খিল লাগিয়ে অন্ধকার ঘরে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে রইল। কেউ কেউ খেতে ডাকল, কেউ বা করল শাসন। নির্ব্বিকার সাগর বিছানা ছেড়ে উঠল না—নীরবে শুয়ে রইল।

শেষ রাতের ট্রেনে পশুপতিবাবু ফিরে এলেন। অনাহারক্লান্ত সাগর তখন নিদ্রাচ্ছন্ন। মেঝ ভাই ডালপালা লাগিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অবিলম্বে তাঁর কানে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, এসব হা-ঘরে চোর-বদমাসের সঙ্গে তা'রা ছেলেপিলে নিয়ে থাকতে পারবেন না। এতে কপালে যা থাকে তাই হবে।

পশুপতিবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আহত পিতৃ-হৃদয় রক্তাক্ত হ'য়ে উঠল এ ভয়ঙ্কর আঘাতে। একি করলে ভগবান—শেষে চোরের পিতৃত্ব!

পকেটে হাত দিয়ে বের করলেন একটি বাঁশী। সুন্দর বাঁশের একটি আড়বাঁশী—ফুল-লতা কাটা। সাগর বাঁশী বাজাতে বড় ভালবাসে।

এক মোচড়েই বাঁশীটি ভেঙে দুইখান হ'য়ে গেল। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের ওপারে। পশুপতিবাবুর চোখে তখন ধ্বংসের আগুন জ্বলছে।

ব্যর্থশিকার সিংহের মত পশুপতিবাবু দাঁড়ালেন এসে সাগরের ঘরের সামনে; ডাকলেন—"সাগর—সাগর—দরজা খোল।"

ধড়মড়িয়ে উঠে সাগর দরজা খুলে দিল। শুধাল ব্যগ্রকণ্ঠে—"কখন এসেছেন আপনি?"

—"তোমার বিরুদ্ধে চুরির চার্জ, তুমি জান?"

—"হ্যাঁ।"

—"কি তুমি বলতে চাও এ সম্পর্কে?"

—"আপনার কি মনে হয়?"

পশুপতিবাবু জ্বলে' উঠলেন—"আমার কি মনে হয় না হয় সে-কথা থাক। তোমার কি বক্তব্য তাই বল। বল এসব সত্যি কিনা?"

এখানেও সন্দেহ? পুত্র হ'তে যে প্রিয়তর, সামান্য পাঁচটা টাকার জন্যে তার উপরেও অবিশ্বাস? তবে কি সবই মুখোস? হ্যাঁ, তাই। নইলে পশুপতিবাবু তো দৃঢ়কণ্ঠে এ অভিযোগকে মিথ্যা ব'লেই উড়িয়ে দিতেন। তারপর অভিযোগমুক্ত পুত্রের মুখে শুনতে পারতেন প্রকৃত কাহিনী। তা তো তিনি করেন নি। বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসটাই তাঁর চোখে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সবই মুখোস—সব শেষ।

তীব্র অভিমানে সাগর বিবেচনার সাগরে খেই হারিয়ে ফেলল। পিতৃতুল্য পশুপতিবাবুর এই অবিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃত কাহিনী ব'লে বিচারে খালাস পাবার রুচি তার হ'ল না। অথচ তা হ'লে কত সহজেই সব মিটে যেত। কত অনায়াসেই সাগর বলতে পারত প্রকৃত কথা।

......থার্ড ক্লাস থেকে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েই সাগর কয়েকখানি পুরাণো অকেজো বই বিক্রি করেছিল—আর একটি ছেলেকে; পেল গোটা আড়াই টাকা। কাউকে না জানিয়ে টাকাটা সে রেখে দিল তার রংচটা টিনের স্যুটকেসটায়। কয়েক মাস পরেই তো চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা। সার্কাস আসবে, বায়স্কোপ আসবে, আসবে কত রকমের জিনিসপত্র। সে সময় আড়াইটে টাকা হাতে থাকলে কী মজাই না হবে। এই সব ভবিষ্যৎ আনন্দের স্বপ্নে বিভোর হ'য়েই সাগর টাকাটা রেখে দিল লুকিয়ে। কেউ জানে না—পশুপতিবাবুও না।

এই কথাটা বললেই বুঝি ঠিক হ'ত; কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যা ঠিক, ভাবের জগতে তা অচল। সাগর কিশোর, স্বপ্নময়, ভাবুক। আসামী সে নয়। ধীর সহজ গলায় সে বলল—"হ্যাঁ, সব সত্যি।"

"সত্যি?"—পশুপতিবাবু বিস্মিত-বেদনায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন। একটু পরে—ঝাঁঝালো গলায় বললেন—"আমারই ভুল হয়েছিল। বিধাতার ইচ্ছায় আমি অপুত্রক। তাই আমি থাকব —আজ হ'তে আমি পুত্রহীন। তোমার সঙ্গে আর আমার পিতা-পুত্র সম্পর্ক রইল না। চোরের বাবা আমি নই, হ'তে পারি না।"

আরও একটু পরে পশুপতিবাবু বললেন—"তবে হ্যাঁ, তার জন্যে একথা মনে ক'রো না যে, এখানে তোমার আশ্রয়ের অভাব হবে। আমি যতদিন উপার্জ্জনক্ষম থাকব, এ বাড়ীর দরজা তোমার সামনে কেউ বন্ধ করতে পারবে না।"

সাগর ভিজে গলায় বলল—"আপনার অনুগ্রহই আমার পরম ভাগ্য।"

পশুপতিবাবুর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে সাগর প্রণাম করল গভীর আবেগে। তারপর দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিল। পশুপতিবাবুর ভিজে চোখের সামনে আকাশ হ'তে একটি তারা ছিটকে গেল অসীম কালো অন্ধকারে।

পরদিন হ'তেই সাগর নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল।

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত, এম. এ.

অসুখী

আপনার স্বার্থ-হেতু অন্যের অ-হিত নিতু
অহর্নিশ চিন্তা বসি করে যেই জন,
জগতে তাহারে কভু শান্তি নাহি দেন বিভু ;
সুখের সংসার মাঝে অসুখী সেজন।

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী পুরাণরত্ন

সবুজ কারখানা

কারখানা তো কত রকমের আছে ; কত হাজার হাজার কুলি, মজুর, বাবু সেখানে খাটছে। এ ছাড়া ম্যানেজার, সেক্রেটারী, পাইক-পেয়াদার অভাব নাই। সেই সব কারখানায় আমাদের অশন বসন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাজসরঞ্জাম তৈরি হয়। তোমাদের মধ্যে যারা সহরে বাস কর তারা এ রকম কলকারখানার সহিত পরিচিত। কলিকাতার আশেপাশে কাপড়, চট, তেল ও কাগজের বড় বড় কারখানা আছে ; সেই সব কারখানার বড় বড় চিমনি, লোকজনের কোলাহল, কল চলার শব্দ সর্ব্বদাই তাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তোমাদের চোখের সামনে শ্যামল স্নিগ্ধ গাছপালার সবুজ অঙ্গে যে বিরাট কারখানা আছে এবং তাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে যে কাজ হয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ তোমরা রাখ কি ?

আমাদের শরীর ধারণ ও পোষণের জন্য খাদ্য চাই। খাদ্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে শ্বেতসার (stárch), প্রোটিন প্রভৃতি। সেগুলি কোথায় তৈরি হয় জান ? পৃথিবীতে মানব-চালিত এমন কোন কারখানা আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নি যেখানে মাটি থেকে জল (H_2O) ও বাতাস থেকে কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (CO_2) আহরণ ক'রে পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণীর প্রাণধারণের খাদ্য এবং খাদ্যোপকরণ শ্বেতসার

তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। অথচ অগণ্তি গাছের অগণ্তি কারখানায় সেই কার্য্যটি দিনের পর দিন হয়ে চলেছে।

তোমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাবে আটা, ময়দা, চাল, দাল, শাক-সব্জি, তেল, মসলা প্রভৃতি আমরা গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সংগ্রহ করি। খাবার সময় এগুলিকে আমরা নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে মুখরোচক ক'রে লই মাত্র।

শিকড়ের সাহায্যে গাছ মাটি থেকে জল শোষণ করে; তারপর পাম্প ক'রে সেই জলকে মোটা মোটা পাইপ দিয়ে সবুজ পাতায় নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সবুজ পাতার ত্বক-প্রাচীরের হাজার হাজার দরজা খুলে যায় আর তাদের ভিতর দিয়ে বাতাসের কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস প্রবেশ করতে সুরু করে। আবার এমনই ব্যবস্থা যে, দরকার হ'লে গাছ দরজাগুলি বন্ধ ক'রে দিতেও পারে।

এদিকে যেখানে মাটি থেকে জল বেশী উচুতে টেনে তুলতে হয়, সেখানে আবার ব্যবস্থা আরও ভাল। তোমরা নিশ্চয় ই. আই. রেলের গ্রাণ্ড কর্ড লাইন দিয়ে গয়ার দিকে গিয়েছ। যারা যাও নি, একবার যেও। কোডার্মা পেরিয়ে গাড়ী যখন পাহাড়ে ওঠে তখন গাড়ীর সামনে ও পিছনে দুইখানা ইঞ্জিন লাগান হয়। এখানেও তেমনই পাইপগুলির নীচে থেকে পাম্প করা হয়, আর পাতার দিক থেকে সেই জল টেনে তোলার ব্যবস্থা করা হয়।

জল তো পাতায় এলো, এদিকে বাতাসের কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসও পাতার ভিতর এসেছে, এখন এদের দুইএর মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটাবে কে? সেইটাই তো হ'ল কারখানার আসল কাজ। তোমরা জান পাটগাছ কেটে জলে পচিয়ে পাটের আঁশগুলি পৃথক্ ক'রে শুকিয়ে বেঁধে বাজারে চালান দেওয়া হয়। সেখান থেকে বড় বড় কারখানার মালিকরা সেগুলি কিনে নিল, কারখানায় এনে চটকলে বুনে তাদের চটে পরিণত ক'রে বাজারে বিক্রির জন্য ছেড়ে দিল। পাটের আঁশকে চটে পরিণত করতে কারখানায় কত লোক খাটল, কতখানি বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হ'ল তার ঠিকানা করতে গেলে হিসাব বেড়ে যায়।

কিন্তু লাখ লাখ গাছের কোটি কোটি পাতার অভ্যন্তরে যে সবুজ কারখানায় নীরব কৌশলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর খাদ্য তৈরি হচ্ছে, তার তুলনা মানবের সমবেত উদ্যমের মধ্যে নাই। মানব তার সমস্ত বৈজ্ঞানিক সম্পদ নিয়েও আজ পর্য্যন্ত জীব

জগতের প্রধান মৌলিক খাদ্য শ্বেতসার প্রস্তুত করার কল-কারখানা উদ্ভাবন করতে পারে নি, কখনও পারবে কিনা সন্দেহ।

মাটির জল আর বাতাসের কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ কে করে জান? রাসায়নিকের গবেষণাগারে এ সংযোগ ঘটাবার জন্য চাই শক্তি, যন্ত্র, আর চাই রাসায়নিক—যিনি এই সংযোগ ঘটাবেন। গাছের সবুজ কারখানায় শক্তি যোগায় সূর্য্যরশ্মি, তাই দিনের আলো ছাড়া এখানে কাজ হয় না। সংমিশ্রণের আধার হচ্ছে প্রাণবস্তুর বা প্রোটোপ্লাজমের কণাগুলি—যাদের আশ্রয় ক'রে থাকে গাছের সবুজবর্ণ এবং যাদের অবস্থিতির জন্যই গাছের পাতার রং সবুজ। আর রাসায়নিক হচ্ছে সকল কাজের আসল যন্ত্রী—প্রাণবস্তু বা প্রোটোপ্লাজম্ যা সমস্ত জীব-জগতের প্রাণাধার, যার কার্য্যকরী শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় বৈজ্ঞানিকগণ আজও দিতে পারেন নি।

কি ক'রে প্রোটোপ্লাজম দিনের আলোয় এত বড় একটা কারখানা চালিয়ে যাচ্ছে তার আভাষ মাত্র আমরা দিতে পারি, কারণ ল্যাবরেটারিতে সেটা আমরা তৈরি করতে পারি না। যাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করেছেন তাঁরা বলেন—প্রাণবস্তু সূর্য্য-রশ্মি থেকে শক্তি আহরণ ক'রে জল ও কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের সংমিশ্রণে প্রথমে ফরম্যাল্‌ডিহাইড নামক একটি জৈব পদার্থ তৈরি করে। আর সেই সময় উপোৎপাদন (bye-product) হিসাবে যে অক্সিজেন বেরিয়ে আসে, সেটা বাতাসে ছেড়ে দিয়ে গাছ বাতাসকে শ্বাসগ্রহণোপযোগী ক'রে তোলে; নতুবা জীব-জগতের নিঃশ্বাসের ফলে সমস্ত বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠত—আর আমরা সবাই অক্সিজেনের অভাবে দম আটকে মারা যেতাম।

যখন এই রকমে খানিকটা ফরম্যাল্‌ডিহাইড তৈরি হয়ে জমা হয়েছে, তখন কোন অজ্ঞাত উপায়ে প্রোটোপ্লাজম সেগুলিকে একত্র ক'রে শর্করা প্রস্তুত করে। কোন কোন স্থানে, যেমন পেঁয়াজে, সবুজ কারখানায় শর্করা প্রস্তুত ক'রেই প্রোটোপ্লাজম শ্বেতসার প্রস্তুতের দিকে আর অগ্রসর হয় না, তাই পেঁয়াজ-কলি খেতে মিষ্টি লাগে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যখন যথেষ্ট শর্করা প্রস্তুত হয়েছে—তখন প্রাণবস্তু সেগুলিকে একত্র ক'রে বৈজ্ঞানিক (?) উপায়ে শ্বেতসার প্রস্তুত ক'রে নিজের দেহে সঞ্চিত করে। আমরা প্রাণীরা সেই সঞ্চিত খাদ্য নিজের প্রাণধারণের জন্য গাছের পাতা ছিঁড়ে, ডাল ভেঙ্গে, মূল উৎপাটন ক'রে ফুল, ফল, বীজ আহরণ করি।

তোমরা মনে রেখো প্রত্যেকটি সবুজ পাতা শ্বেতসার প্রস্তুতের এক একটি বিরাট কারখানা। আর পৃথিবীর কোটি কোটি গাছের সবুজ পাতা কত বড় বিশাল কারখানা প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোমাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছে—সে কথা অযথা গাছের পাতা বা ডালপালা ভাঙ্গার সময় একটু চিন্তা করো।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

সাধক কবি জেলালুদ্দিন রুমি

ধর্ম্ম নিয়ে আমরা কত মারামারি করি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন—"কেহ বলে জল, কেহ বলে পানি, কেহ বলে ওয়াটার—নামে কি আসে যায়? পান কর, পিপাসা মিটিবে।"

সাধক জেলালুদ্দিনও তাঁর 'মসনবি' গ্রন্থে একটি উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে এই পরম সত্যই প্রচার করেছেন। গল্পটি এই—

"বাজারের পথে তিনটি লোকের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। তর্ক উঠল, কোন্ ফল সকলের চেয়ে সুস্বাদু। পারস্যদেশবাসী একজন বলল—'আঙ্গুর।' আরববাসী একজন অমনি ব'লে উঠল—'উঁহু! ইনাব।' তৃতীয় জন, সে ছিল গ্রীক—সে বলল—'স্তাফিলী।'

অনেক তর্কবিতর্ক এবং ঝগড়া হ'ল; কিন্তু কেউ নিজের মত ছাড়ল না। শেষে সকলে মত স্থির করল—চল বাজারে গিয়ে খেয়ে দেখা যাক কার ফল বেশী মিষ্ট।

বাজারে তিনজন একই দোকানে উপস্থিত। পারসী বলে—'এই দেখ আমার আঙ্গুর'; আরববাসী ব'লে—'এই ত আমার ইনাব'; গ্রীক বলে—'বাঃরে! এই ত আমার স্তাফিলী!' ফল একই, কিন্তু ভাষা-ভেদে কত ঝগড়া!"

ধর্ম্ম কথাটির অর্থের স্থান-বিশেষে পার্থক্য হ'য়ে থাকে। যেমন, আলোর ধর্ম্ম কিরণ দেওয়া, আগুনের ধর্ম্ম দহন করা ইত্যাদি। এখানে ধর্ম্ম অর্থে—স্বাভাবিক কার্য্যকারিতা

বা শক্তি। আবার অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক বলতে আমরা কিন্তু তার স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তির কথা মনে করি না। সেখানে আমরা বুঝি, সে ব্যক্তি জীবে দয়া করেন, মিথ্যা বলেন না, ঈশ্বরে ভক্তি করেন ইত্যাদি। ধর্ম্ম কথাটির ইংরেজি করা হয়েছে—'Religion'; কিন্তু 'রিলিজিয়ন' বলতে ইংরেজিতে যা বুঝায়—বাংলার 'ধর্ম্ম' কথাটিতে কিন্তু ঠিক তা বুঝায় না।

কথার অর্থ স্থান-বিশেষে যাই হোক্, ধর্ম্ম বলতে আমরা বুঝব—যে জিনিসটাকে কোন ব্যক্তি বা বস্তু ধ'রে থাকে, সেই তার ধর্ম্ম। আগুন তার দাহিকাশক্তিকে ধ'রে আছে—সেই তার ধর্ম্ম। মানুষও তার মনুষ্যোচিত যে গুণগুলি ধ'রে থাকে সেই তার ধর্ম্ম।

তা হ'লে মানুষের ধর্ম্ম কি?

পশুর যে ধর্ম্ম নয়, তাই মানুষের ধর্ম্ম।

হিংসা-দ্বেষ, কাটাকাটি, মারামারি এগুলি পশুদের মধ্যেই দেখা যায়। স্বার্থ নিয়ে—এমন কি, কখনও কখনও কোন কিছু না নিয়ে রক্তারক্তি ব্যাপার, বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়—ওটা পশুর ধর্ম্ম। অজানাকে জানা, সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা করাই মনুষ্য-ধর্ম্ম।

জেলালুদ্দিন রুমি ছিলেন এইরূপ একজন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। আমাদের দেশের শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে এই জেলালুদ্দিন রুমির কতখানি মিল রয়েছে ভাবলে অবাক্ হ'তে হয়!

নদীয়ার অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব, গয়ায় গিয়ে যখন পুণ্যাত্মা ঈশ্বরীপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন ভক্ত পুরীর অপার্থিব ভক্তির উচ্ছ্বাস ও সারল্য দর্শনে কোথায় গেল নিমাইয়ের বিদ্যার অহঙ্কার—আর কোথায় গেল তাঁর জ্ঞানের দম্ভ! প্রেম-ভক্তির স্রোতে নিমাই যেন ভেসে গেলেন! পরম বিদ্বান যশস্বী অধ্যাপক নিমাই একেবারে দীন-হীন সন্ন্যাসীতে পরিণত হ'লেন।

এই প্রেম-ধর্ম্মের অবতার সন্ন্যাসী নিমাই প্রবর্ত্তন করলেন বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের পদাবলী ও গীতি-কবিতা থেকে বাংলা ভাষা লাভ করল কত মূল্যবান সম্পদ।

জেলালুদ্দিন রুমিও ছিলেন মস্তবড় পণ্ডিত। ছাত্রাবস্থায়ই রুমি বিভিন্ন শাস্ত্রে

এমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন যে, কারও কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হ'লে সে ছুটে আসত রুমির কাছে।

দামাস্কাস ও আলেপ্পো নগর (বর্ত্তমান 'সিরিয়ার' অন্তর্গত) তখনকার দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র ব'লে পরিগণিত ছিল। রুমি এইসব জায়গায় অনেক-দিন ধ'রে শিক্ষালাভ করেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হ'য়ে ফিরে এলেন এবং নিমাইয়ের মতই অতি অল্পকাল মধ্যে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন অধ্যাপক ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

তারপর তাঁর মিলন হ'ল সামস্-ই-তাব্রেজ নামক সাধকের সঙ্গে। তাব্রেজের শিশুর মত সরল ব্যবহার ও ভক্তি দেখে রুমির বিদ্যা ও জ্ঞানে দম্ভ কোথায় গেল ভেসে! পণ্ডিত রুমি ফকিরের সাজ গ্রহণ করলেন। তারপর পূর্ণপ্রভাবে গ'ড়ে উঠল 'সুফী' সম্প্রদায় এবং কবিতায় ও ভাবসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করল পারস্য ভাষা!

হজরত মহম্মদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন ধর্ম্মবীর আবু বকর। এই আবু বকরের বংশেই ১২০৭ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত বালাখ নগরে জেলালুদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাহাউদ্দিন ছিলেন একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। বাহাউদ্দিন এসিয়া মাইনরে গিয়ে বাস কচ্ছিলেন। তখনকার দিনে এসিয়া মাইনরকে 'রুম রাজ্য' বলত। এর থেকেই জেলালুদ্দিন 'রুমি' আখ্যা লাভ করেন।

রুমির কয়েকজন শিষ্য ও তাঁর এক পুত্র রুমি সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিখে রেখে গেছেন। বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন্-ই-বাতুতা তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও রুমি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। সেই সব থেকে আমরা জানতে পারি, রুমির বাইরের আচরণ দেখে কেউ বুঝতেই পারত না যে, তিনি একজন পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ফকির ছিলেন। সামস্-ই-তাব্রেজের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার পর তিনি একেবারে নূতন মানুষ হ'য়ে যান। অধ্যাপনা তিনি ছেড়ে দেন এবং সামস্এর সঙ্গে নির্জ্জনে কেবল ধ্যানরত হ'য়ে কালাতিপাত করতেন। সকলে সেই সময়ে বলত—একটা পাগল এসে রুমির মত বড় পণ্ডিতকে বিগ্ড়ে দিয়েছে। সামস্-ই-তাব্রিজকে শেষে পাঁচজনে মিলে তাড়িয়ে দেন; কিন্তু হ'লে কি হবে—রুমি একদিন এক স্বর্ণকারের দোকানের সম্মুখে গিয়ে তার হাতুড়ীর শব্দের তালে তালে বালকের মত নাচতে লাগলেন। স্বর্ণকার (সালাহুদ্দিন) এসে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে, বিলিয়ে দিল তার যা কিছু ছিল গরীব-দুঃখীকে এবং সঙ্গ নিল রুমির।

রুমির জীবনীকার এইস্থানে লিখেছেন—

"তাব্রিজে মোরা দিলাম তাড়ায়ে তখন কি জানি হায়,
'নুর' হবে দূর, তার ঠাঁই শেষে জুড়িয়া বসিবে ছাই!
শিষ্যেরা সদা করে কাণাকাণি গুরুরে আসিয়া বলে—
বিদ্যা-বিহীন এই দিনজন কেন রবে তব দলে ?"

শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে একবার যে এসেছে, সে যত বড় পাপীই হ'ক—তার হৃদয়ে জেগে উঠেছে প্রেম ও ভক্তি। রুমির সান্নিধ্যেও যারা একবার এসেছে, তা'রাই হয়েছে ফকির—তা'রাই ছেড়েছে পাপ। রুমির যেমন ছিল বন্ধু-প্রীতি তেমনি তিনি ভাল-বাসতেন শিশুদের। রুমি ছিলেন নির্লোভ। কতজনে তাঁকে কত জিনিস উপহার দিয়েছেন, কিন্তু রুমি তা স্পর্শও করতেন না।

মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনলেই শ্রীচৈতন্য যেমন আত্মহারা হতেন, রবাবের ঝঙ্কার শ্রবণ মাত্রেই রুমিরও তেমনই বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। অধিকাংশ সময়ই রুমি ধ্যানে (ওয়াজদ্) মগ্ন থাকতেন। বাহ্যজ্ঞান তখন তাঁর একেবারেই থাকত না।

শেষের দিকে নীলাচলে যেমন মহাপ্রভুর এসেছিল দিব্যোন্মাদভাব, রুমির সাধক জীবনেও তেমনি এসেছিল একটা উন্মাদনা। অন্নে তাঁর রুচি ছিল না, চোখে ছিল না ঘুম। যখন তখন তিনি ভাবাবেশে তন্ময় হ'য়ে থাকতেন। নিদ্রা সম্বন্ধে রুমি নিজেই লিখে গেছেন—

"নিখিল ঘুমায় কেহ জেগে নাই
আমি যে আত্মহারা—
বসিয়া বসিয়া সারা নিশি জাগি
গণি আকাশের তারা।
নয়নের নিদ লয়েছে বিদায়
আসিবে না কোনও ছলে,
তোমার বিরহ-গরল খাইয়া
ডুবেছে মরণ জলে!"

রুমি যে কোন প্রাণীকেই কষ্ট দেওয়া অন্যায় মনে করতেন। অন্য ধর্ম্মের লোককে তিনি যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখতেন। রুমি ছিলেন বিনয়ের অবতার। এত বড় পণ্ডিত ও সাধু হ'য়েও তিনি উপাসনা-মন্দিরে কখনও সকলের আগে দাঁড়াতেন না। রুমি

ছিলেন একাধারে ধার্ম্মিক ও কবি। তিনি তাঁর নিজের লেখা 'মসনবি' কাব্য গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

"নিজেরে কর দীন, নিজেরে কর হীন,
তাহারি মাঝে শুধু হইয়া যাও লীন।
প্রচার করি নিজে, বাড়াও মান মিছে—
বিজ্ঞাপন-বেড়ি পরিলে রবে পিছে!"

রুমির সমাধিভূমি বহুকাল পর্য্যন্ত সম্মানিত হ'য়ে এসেছে। পরিব্রাজক ইবন্-ই-বাতুতা যখন কোনিয়ায় উপস্থিত হন, তখন তিনি এই সমাধির নিকট এক মস্ত-বড় ভোজনাগার (লঙ্গরখানা) দেখেছিলেন। সেই ভোজনাগারে যে কোনও অতিথি আগমন করলেই আহার্য্য পেত।

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

ধাঁধা

১। কোন বর্ণ সাথে তুমি লাগাও যদি আলো—
উজ্জ্বল না ক'রে তারে ক'রে ফেলে কালো?

শ্রীউমা রায়

২। বাড়ে কমে যেই পুর তথা মোর ঘর,
লেখাপড়া শিখি আমি আবৃত নগর;
পাওয়ার আশা কিছু যে সহরে নাই,
তথা আমি মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাই।
সাথীরা সকলে মিলি বল দেখি মোরে—
আবাস, প্রবাস মোর কি কি নাম ধরে?

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

দ্রষ্টব্য: ধাঁধার উত্তর **১০ই বৈশাখের** মধ্যে পাঠাইতে হইবে। দুইটি ধাঁধার উত্তর ঠিক না হইলে নাম ছাপা হইবে না

Printed and Published by A. Dhar at the Sri Narasimha Press
5, College Square, Calcutta.

একবিংশ বর্ষ   জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯   ২য় সংখ্যা

চাঁদের ঘরে একটা পরী

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

চাঁদের ঘরে একটা পরী কর্‌তো সুখে বাস,
সাঁঝ হ'লে সে আস্‌তো চ'লে ছড়িয়ে মধুর হাস।
পরণে তার সবুজ শাড়ী, ওড়না গায়ে তার,
গলায় ছিল সাগর-সেঁচা মুক্তারাশির হার।
ছেলেমেয়ে সবার চোখে আস্‌লে নেমে ঘুম ;
কতই ভালোবেসে তাদের নিত্য দিত চুম।
ঘুমের ঘোরে নিয়ে যেতো চাঁদ-তারকার দেশে,
আদর ক'রে বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌তো ঘুরে শেষে ;
দেশ-বিদেশের নানান্ রকম গল্প করার পর,
সকাল হ'বার আগেই আবার ছুট্‌তো আপন ঘর

শ্যামল সিপাই

শ্রীসুরুচিবালা সেন-গুপ্তা

জয়মল রাজার রাজ্য। রাজ্যে ক্ষেত্রভরা শস্য, রাজ্যময় সম্পদ, গৃহে গৃহে শ্রী, প্রতি প্রাণে আনন্দ, প্রতি অধরে হাস্য-রেখা। রাজায় প্রজায় সৌহার্দ্দ্য, প্রজায় প্রজায় ভ্রাতৃভাব।

রাজার গৃহদেবতা শ্যামল-সুন্দর। শ্যামল-সুন্দর অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিগ্রহ মূর্ত্তি; মস্তকে শিখিপাখা, ললাটে অলকা তিলকা, চরণে সোনার নূপুর, হস্তে মোহন বাঁশরী। দেবতার শ্যামরূপে রাজার সমস্ত প্রাণমন গেছে মগ্ন হ'য়ে; প্রেমে তিনি হ'য়ে গেছেন পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত, কৃতার্থ।

রাজা তিনি, রাজকার্য্য কোর্‌তে হোতো তাঁর নিয়মিত; শাসক তিনি, শাসনকার্য্য কোর্‌তে হোতো তাঁর প্রতিদিন; সংসারী তিনি, সংসারের খুঁটিনাটিতে যোগ দিতে হোতো তাঁর নিয়ত; কিন্তু শ্যামল-সুন্দরের শ্যামরূপ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল অনুক্ষণ, সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল কোরে তাঁর শ্যামল-সুন্দর তাঁর অন্তরে ছিল বিরাজিত।

উষাকালে শয্যাত্যাগ কোরে শীতল জলে অবগাহন কোরে রাজা যেতেন শ্যামল-সুন্দরের পূজা কোর্‌তে। পুষ্পপাত্রে সুগন্ধি পুষ্প সজ্জিত হোতো, ধূপের সুবাসিত ধোঁয়ায় মন্দিরের আনাচে কানাচে গন্ধময় হোয়ে উঠ্‌ত মঙ্গল আরতির পঞ্চপ্রদীপের স্নিগ্ধ আলোক-শিখায় দেবতার উজ্জ্বল কান্তি ঝল্‌মল্ ক'রে উঠ্‌তো; ঘণ্টার মৃদু নিনাদের সঙ্গে তাঁর ললিত কণ্ঠেও গীত হোতো:—

মঙ্গল আরতি যুগল-কিশোর—
মঙ্গল সখীগণ জোড়হি জোড়।
মঙ্গল বাজতহি খোল করতাল
মঙ্গল সখীগণ নাচত ভাল।
রতন প্রদীপ কুরু দিক উজোর
ঝলকত বিধুমুখ শ্যাম সুগোর।

দশদণ্ড বেলা পর্য্যন্ত আত্মভোলা পূজক পূজা কোর্‌তেন তাঁর প্রাণের দেবতার, আশ মিটিয়ে রূপসুধা পান কোর্‌তেন তাঁর প্রিয়তমের ; সাধ মিটিয়ে সজ্জিত কোর্‌তেন সেই কমনীয় বিগ্রহ। তখন সংসার থাক্‌ত বাইরে, রাজ্য থাক্‌ত দূরে, স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা মর্ম্মের মাঝখান থেকে যেতো একেবারে মুছে। কিছুতেই এই সময় পূজারি পূজার আসন ত্যাগ ক'রে অন্য প্রসঙ্গে নিযুক্ত কোর্‌তেন না নিজকে।

প্রতিবেশী রাজার লোলুপদৃষ্টি ছিল এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যটীর দিকে, কিন্তু সাহস হয়নি একে করতলগত কোর্‌তে, শুধু প্রতীক্ষা ক'রে ছিল সুযোগের।

সুযোগ এলো। দূত গিয়ে শোনালে তাদের অভয়-বাণী। উষাকাল থেকে দশদণ্ড পর্য্যন্ত রাজা থাকেন নিভৃতে, পূজার আসনে ; সে ধ্যান তাঁর কিছুতেই ভাঙ্‌বেনা ; এই সুযোগেই রাজ্যটিকে কুক্ষিগত কোর্‌তে হবে।

উষার পূর্ব্বাকাশ যখন রক্তরাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে, শুকতারাটি দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলে নিভে যাবে ভাব্‌ছে, রাজার হাতে মঙ্গল-প্রদীপ উঠ্‌ল জ্ব'লে, ঘণ্টা উঠ্‌ল বেজে, সেই সময় দুর্গ-দুয়ারে বিপক্ষ সৈন্যের রণবাদ্য তুল্‌লে সিংহনাদ।

সৈন্যগণ হাতে তুলে নিলো অস্ত্র, বুকে বাঁধ্‌লো বল, দেহে জাগালো শক্তি, প্রিয়জনের কাছে চাইলো বিদায় ;—কিন্তু নিঃশব্দে তারা দাঁড়িয়ে রইলো। যুদ্ধের অনুমতি দিবেন কে? কোথায় রাজা?

সৈন্যের দৃঢ় পদশব্দ ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো মন্দির-দ্বারে, অস্ত্র উঠ্‌লো ঝন্‌ঝনিয়ে, কণ্ঠে জাগ্‌লো মিনতি,—"মহারাজ, শত্রু-সমাবৃত পুরী, যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করি।" —ঘণ্টার মৃদু মধুর শব্দে তাদের কণ্ঠ ডুবিয়ে দিল। হতাশপ্রাণে তারা ফির্‌লো।

রাণীর কঙ্কনধ্বনি বাজ্‌লো পূজা-গৃহের দ্বারে, তাঁর অশ্রু ও কাতর প্রার্থনাও ব্যর্থ হ'য়ে এলো।

রাজমাতা এসে মন্দির-দ্বারে কোর্‌লেন করাঘাত, "বাছারে, রাজ্য যে গ্রাস কোর্‌ছে শত্রু, সর্ব্বনাশের যে দেরি নেইরে, বেরিয়ে এসে রাজ্য রক্ষা কর্—"

মায়ের কণ্ঠ পুত্রের কণ্ঠে সাড়া জাগালো—'মাগো, যিনি রাজ্য দিয়েছেন, তিনিই যদি আজ সেটা কেড়ে নেবার যোগার ক'রে থাকেন, আমার সাধ্য কি মা সে সর্ব্বনাশ রোধ কোর্‌বো ?'

সৈন্যগণ রইলো স্তব্ধ হ'য়ে নতশিরে বোসে, ধমনীতে বইতে লাগ্‌লো উষ্ণরক্ত, অকারণে অস্ত্র উঠ্‌তে লাগ্‌লো ঝন্‌ঝনিয়ে, রাজমাতা ললাটে কোর্‌লেন করাঘাত, রাণী দিলেন চোখে আঁচল ; কিন্তু নগরদ্বারে শত্রুর আস্ফালন, অস্ত্রের আর্ত্তনাদ ক্রমেই যেন কোমে আস্‌তে লাগ্‌লো। পূজার নির্দ্দিষ্ট সময় গেল অতীত হ'য়ে। শিরে নির্ম্মাল্য, কণ্ঠে প্রসাদী ফুলমালা, ললাটে চন্দন-বিন্দু, কণ্ঠে হরিগুণ গান,—রাজা এলেন বেরিয়ে। চারদিক্ থেকে সৈন্যগণ জয়ধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো।
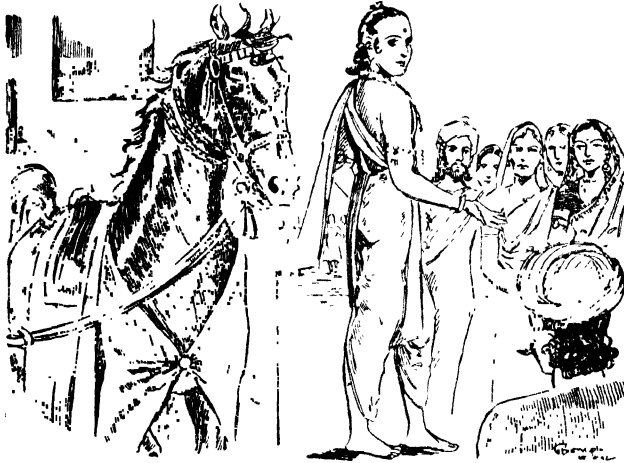
রাজা গম্ভীর স্বরে বোল্‌লেন, "আমার অশ্ব আন্‌তে বল ! সৈন্যগণ প্রস্তুত হ'য়ে যুদ্ধে চল।" অশ্বের হ্রেষাধ্বনি শুনে সবাই বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌ল, রাজার কৃষ্ণবর্ণ সুগঠিত অশ্ব মন্দির-গাত্রে রজ্জুবদ্ধ, ললাটে শ্বেত-চন্দ্র-রেখা, স্কন্ধে নিবিড় রোমাবলি। অশ্বের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত, ফেন ঝর্‌ছে মুখ দিয়ে,—অশ্ব ক্লান্ত, পীড়িত।

"আমার অশ্ব এখানে কে আন্‌লে,"—রাজা বিস্মিত হ'য়ে চাইলেন সকলের মুখের দিকে ; "কে অশ্বকে যুদ্ধ সাজে সাজিয়েছে, কেন সে এত ক্লান্ত ?"

প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনে অশ্ব বারবার হ্রেষাধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো। অপরাধীর মত

সৈন্যগণ রইল নির্ব্বাক হোয়ে, তারা তো রাজ-অশ্ব স্পর্শও করেনি। আর বাক্যব্যয় না ক'রে অন্য তেজীয়ান অশ্বে চ'ড়ে জয়মল চল্‌লেন যুদ্ধক্ষেত্রে, সৈন্যগণ চল্‌ল পশ্চাতে। কিন্তু কোথায় বিপক্ষ-সৈন্য ? সমস্ত সৈন্য হতচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে, শুধু রাজা বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে আছেন।

জয়মলকে দেখে রাজা এলেন এগিয়ে, "তুমিই কি এদেশের ভাগ্যবান রাজা ?"—তাঁর কম্পিত কণ্ঠ উচ্চারণ কোর্‌লে।

জয়মলের চোখেও বিস্ময় ঘনিয়ে এলো। রাজা সহসা ছুটে এলেন জয়মলের কাছে, দুই হাতে তার দুটি হাত জ'ড়িয়ে ধোরে বোল্‌লেন, "ভাই, আমার রাজ্য-সম্পদ যা' আছে সব তুমি নাও, শুধু তোমার শ্যামল সিপাইকে আর একবার দেখাও ; দেখাও ভাই, দেখাও,—"

"এ আপনি কি বোল্‌ছেন ?" জয়মল বিমূঢ়ের মত বল্‌লেন।

"তোমার শ্যামল সিপাই তোমার কৃষ্ণ অশ্বে চ'ড়ে যুদ্ধ কোর্‌তে এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই আমার সৈন্যেরা চেতনা হারিয়েছে ; আমার সৌভাগ্য, তাই চেতনা না হারিয়ে সেই রূপ দু'চোখ্‌ ভরে দেখে নিয়েছি। তবু আমার আশা মেটেনি, আমাকে আরেকবার তাঁকে দেখাও ভাই !—আমি আর কিছু চাইনে, শুধু তোমার শ্যামবর্ণের সেপাইকে একবার দেখ্‌তে চাই।" জয়মলের চোখে বইলো ধারা, দুইহাতে রাজাকে আলিঙ্গন কোরে বোল্‌লেন, "ভাই, আমি ভাগ্যবান নই, ভাগ্যবান তুমি, আমার শ্যামল-সুন্দর সিপাই হ'য়ে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে গেছেন। তুমিই দয়া ক'রে তাঁকে একবার দেখাও আমাকে।"

শত্রুভাব আর রইলো না। দু'জনে দু'জনের পরম মিত্র হ'লেন, আর শ্যামল-সুন্দরের পূজা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন একসঙ্গে।

"ভবিষ্যতে"

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মানুষ যে কল্পনা করতে ভালবাসে, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? গল্প, রূপকথা, এ সব তো কল্পনাই বটে। আজকাল আজগুবি গল্প—যা'কে 'এ্যাড্‌ভেঞ্চার' বলা হয়—তা'র চল তো খুবই বেশী দেখা যায়। মঙ্গলগ্রহে মানুষ, চাঁদে চক্কর, আজব আকাশযান, নিরুদ্দেশের রহস্য, ভয়ঙ্কর ভূত, মারাত্মক মারামারি, অমানুষিক মানুষ, ডানপিটে ডিটেক্‌টিভ্, চীনেদের চক্রান্ত, চোর চর, আজগুবি আড্ডা, বাঘের বাসায়, কালান্তক কামান, দানবের দেশে, ডাকাত ডাক্তার—আরো কত কিছু! নাম যত অদ্ভুত হবে, পড়ার কৌতূহলও তত বেশী হবে। কাজেই বুঝতে পারছ, কল্পনার খোরাক জুট্‌লে কত লাভ!

যা' সত্যি নয়, তা' নিয়েই কত কিছু লিখ্‌ছে মানুষ; আর, যা' সত্যি, বা সত্যি হবার সম্ভাবনা, তা' নিয়ে তো লিখ্‌বেই। সে জন্যই আমরা অনেক সময় দেখি, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা ক'রে পণ্ডিতেরা পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। এর অধিকাংশই, বিজ্ঞানের উন্নতি কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়ে চলেছে তাই দেখে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আন্দাজ ক'রে লেখা। সেই রকমের দু' চারটি কথা আমি বল্‌বো।

আমরা সংবাদপত্রে বা বইএ ভবিষ্যতের যে সব আলোচনা বা জল্পনা-কল্পনার বিষয় পড়ি সে সব প্রায়ই সাহেবদের লেখা, এবং সেজন্যই তাঁদের কল্পনা বিলাতের নানা ব্যাপার নিয়ে। তখন নাকি কাচের বাড়ী হবে; রাতদিনই সে বাড়ীতে আলো থাক্‌বে—দিনে সূর্য্যের তেজ, রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোর তেজ। বিলাতে না হয় এটা সম্ভবপর। আমাদের এই গরম দেশে ঐ রকমের বাড়ী হ'লে কি ব্যাপার হবে একবার ভেবে দেখ তো! সারাদিন রোদের ঝাঁঝে একেবারে অস্থির হয়ে যেতে হবে! কাজেই, আমাদের দেশের ব্যবস্থা এ বিষয়ে অন্য রকম হ'তেই হবে। অবশ্যি বাড়ীতে কাচের ব্যবহার অনেক বেড়ে যাবে। এখনই কাচের টালি, অভঙ্গুর মজবুত কাচ প্রভৃতির চল হয়েছে; ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে ব'লে আশা করা যায়।

তখনকার বাড়ীতে নাকি জানালা থাক্‌বে না। কিন্তু আমাদের দেশে বিনা-পয়সায় সুন্দর ফুরফুরে বাতাস বন্ধ করবার কোনও কারণ হবে ব'লে তো মনে হয় না; বিলাতে না হয় ঠাণ্ডার ভয়ে জানালা তুলে দেওয়া যায়। তখন নাকি বাঁড়ীর মধ্যে সর্ব্বত্র বাতাস খেল্‌বার, এবং খারাপ বাতাস টেনে বের ক'রে নেবার কৃত্রিম ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের দেশে থাকবে দ্বিতীয়টি। প্রথমটি অনেক সময়ই আবশ্যক হবে না, কারণ প্রকৃতিই তা'র ব্যবস্থা করেছেন। বৈদ্যুতিক পাখার

চল তখন অনেকটা কমে যাবে, ঘর ঠাণ্ডা রাখার কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রীষ্মকে অনেক সময়েই শীত বা বসন্তে পরিণত কর্‌বে।

তখন নাকি "কৃত্রিম সূর্য্যালোক" প্রত্যেক বাড়ীতে থাক্‌বে। সেটি হলো এক রকমের বৈদ্যুতিক আলো, যা'র মধ্যে সূর্য্যের আলোর উপকারী রশ্মি পাওয়া যাবে। ইচ্ছামত সেই আলো গায়ে লাগালে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচা যাবে; স্বাস্থ্যলাভও হবে। আমাদের এই সূর্য্যালোকের দেশে আবার "কৃত্রিম সূর্য্যালোক" কেন?—এসব কথা বিলাতের জন্যই খাটে। তবে, আমাদের দেশে রোদ পোহাবার ভাল বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হ'বে এবং কা'র কতখানি রোদ লাগান দরকার তা'রও একটা বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম হয়তো হবে।

মেঘ তাড়িয়ে বৃষ্টি বন্ধ করা হয়তো তখন কতক পরিমাণে সম্ভব হবে;—কতটা হবে ঠিক বলা যায় না। তবে, তখনকার জুতা, কাপড়-চোপড় এমন হবে যে, বৃষ্টি পড়্‌লেও ভিজ্‌বার ভয় থাক্‌বে না। সে রকমের কাপড়-চোপড় এখনই তৈরী হ'তে আরম্ভ হয়েছে। তখনকার লোহায় জল লাগ্‌লে মরচে ধরবে না; রাস্তায় কাদার ভয় থাক্‌বে না, বন্যার ভয়ও থাক্‌বে কিনা সন্দেহ;—কাজেই বৃষ্টিকে ভয় পাবার বিশেষ কারণ থাক্‌বে না। চাষীরা বৃষ্টির উপর তত বেশী নির্ভর কর্‌বে না। কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির নকল করা হ'বে; অনাবৃষ্টিতে মেঘ তাড়িয়ে এনে বৃষ্টির ব্যবস্থা হ'তে পারে, কিংবা মাটির তলার জল নলকূপের সাহায্যে তোলা যেতে পারে।

চাষীরা তখন বিজ্ঞানের সাহায্যে চাষের অনেক উন্নত প্রণালীতে ফসল জন্মাতে পার্‌বে। বোতলের মধ্যে, মাটির সাহায্য না নিয়ে, শুধু জল এবং 'খাদ্য' দিয়ে বীজ থেকে চারা জন্মান হবে। কোনও অনিষ্টকারী পোকা বা দৈবদুর্ব্বিপাক ফসলকে নষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না। বিদ্যুতের সাহায্যে এবং কৃত্রিম আলো প্রভৃতির সাহায্যে চারাকে খুব কষ্ট-সহিষ্ণু এবং বাড়ন্ত করা হবে—যা'তে অতি অল্প সময়ে প্রচুর ফসল জন্মানো যায়। এসব বিষয় নিয়ে এখন নানা রকমের পরীক্ষা চল্‌ছে। ফলের উন্নতি এত বেশী হবে যে, এখন হয়তো সে সব ধারণায়ই আসে না। এখনই এ বিষয়ে নানা পরীক্ষা চল্‌ছে। ফলের আকার বড় করা, বীচি ছোট করা, খোসা পাতলা করা, আঁশ দূর করা, স্বাদ ভাল করা, রং সুন্দর করা—এসব বিষয়ে এখনই অনেক উন্নতি হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও ঢের হবে। তখন হয়তো ল্যাংড়া আম ফজ্‌লির মত বড় হবে, আঁঠি লিচুর বীচির মত হবে; লিচু হয়তো ল্যাংড়া আমের মত বড় হবে, বীচি কুলের বীচির মত ছোট হবে;—আরও কত কি হবে কে বল্‌তে পারে!

তখনকার দিনে ঘরে ব'সে রেডিওর সঙ্গে চলন্ত রঙ্গিন ছবিও দেখা যাবে—অর্থাৎ রঙ্গিন 'টকি' শোনা যাবে। ফুটবল খেলা, ঘোড়দৌড়, তামাসা, সবই ঘরে ব'সে 'টেলিভিশন' যন্ত্রে দেখা যাবে—অর্থাৎ, পৃথিবীর যত ভাল ভাল খেলা, গান, তামাসা, সিনেমা, সব ইচ্ছামত ঘরে ব'সে দেখা যাবে, শোনা যাবে। তখন নাকি 'টেলিভিশন' যন্ত্রের সাহায্যে চিঠিপত্র মুহূর্ত্তের

মধ্যে বিদেশে পাঠান যাবে;—অবশ্যি, গোপনীয় চিঠিপত্র নয়। নানা ঘটনার 'রেডিও ফটো' মুহূর্ত্তের মধ্যে 'টেলিভিশন' যন্ত্রে বিদেশে পাঠিয়ে সংবাদপত্রের অনেক সুবিধা ক'রে দেওয়া হবে।

সেকালের সংবাদপত্রে হয়তো অনেক রঙ্গিন ছবি থাক্‌বে। কেউ কেউ বলেন, 'টেলিভিশন' যন্ত্রে খবর দেবার ব্যবস্থা থাক্‌বে; রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিনা পয়সায় সে খবর শোনা যাবে এবং দেখা যাবে। তখনকার রাস্তায় গাড়ী চলাচল করবে না—তার জন্যে তো আলাদা রাস্তাই থাকবে;—কাজেই, হাঁ ক'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সংবাদ পড়্‌লেও কোনও বিপদ থাক্‌বে না।

এত কল-কারখানা সে যুগে হবে, যে, তা'র জন্য অনেক শক্তির আবশ্যক হবে;—অর্থাৎ, সে সব কল চালাবার জন্য অনেক মোটর, এঞ্জিন প্রভৃতির আবশ্যক হবে। তা'র জন্য কয়লা খরচ আর করা হবে না—কয়লা তখন রাসায়নিকের কাজেই বেশীর ভাগ ব্যবহার করা হবে। সূর্য্যের শক্তি (তাপ), সাগরের ঢেউয়ের শক্তি, নদীর জলের প্রবাহের শক্তি বাতাসের শক্তি, আকাশের বিদ্যুতের শক্তি—এমন কি, চাঁদের শক্তি—এ সবের সদ্ব্যবহার ক'রে তখনকার পৃথিবী এক বিরাট কারখানার মত ব্যাপার হবে। কিন্তু তখন ধোঁয়া থাকবে না, ঝুল-কালী থাকবে না; ধূলো অনেক পরিমাণে কমে যাবে, কাদাও থাকবে না।

ভবিষ্যতে মানুষ দোতলা, তেতলা, চারতলা রাস্তা তৈরী করবে। নীচে থাকবে মালগাড়ীর রাস্তা, তার উপর মোটর-চলার রাস্তা, তার উপর মানুষ হাঁটার রাস্তা। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম হবে। মোটরের রাস্তাগুলি থেকে আবার প্রত্যেক বাড়ীতে উঠ্‌বার রাস্তা থাক্‌বে। এই রাস্তা ঘুরে ঘুরে বাড়ীর চারিদিকে পাক খেয়ে ক্রমশঃ উঁচুতে উঠ্‌বে। দোতলা, তেতলা, চারতলার লোকেরা তাদের দরজার সামনেই মোটর থেকে নামতে পার্‌বেন। তখনকার মোটর খুব নিঃশব্দে চল্‌বে, তার গতির বেগ খুব বেশী হবে, হঠাৎ টায়ার ফেটে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকবে না, মোটর খুব মজবুত ইস্পাতের চাদর দিয়ে তৈরী হওয়ায় দুর্ঘটনায় জখম হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাক্‌বে; মোটরে চল্‌তে চল্‌তে টেলিফোনে কথা বলা চল্‌বে।

তখনকার জলের জাহাজও অন্য রকমের হবে। তার আকার অনেকটা ডুবো-জাহাজের (Submarine) মত হবে, মাস্তুল থাক্‌বে না, চোঙা থাক্‌বে না, চলার সময় কোনও ধোঁয়া উঠ্‌বে না। সে জাহাজ যখন বেশী জোরে চল্‌বে তা'র অধিকাংশ অংশ শূন্যে থাকবে। আর তা'র গতির বেগ হবে প্রায় মোটর গাড়ীর সমান; কাজেই, মহাসাগর পার হ'তে বেশী সময় লাগবে না।

আকাশ-পথে চলাফেরা তো তখন মোটর-চড়ার মতনই ব্যাপার হবে। ছোট ছোট এরোপ্লেন বিদ্যুৎবেগে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করবে; এক বাড়ীর ছাদ থেকে উঠে অন্য বাড়ীর ছাদে নামবে। বড় বড় এরোপ্লেন ট্রেন, জাহাজ প্রভৃতির বদলে ব্যবহার

করা হবে। অবশ্যি তখন ট্রেন, জাহাজ প্রভৃতিরও চল থাকবে। এরোপ্লেন যদি নাক বরাবর সিধা পথে ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে চল্‌তে পারে, তবে, নিতান্ত গরিব লোক ছাড়া কে আর তখন জাহাজ বা ট্রেনে চড়ে সময় নষ্ট কর্‌বে বল?

তখনকার অধিকাংশ কাজই কলের সাহায্যে হবে; ঘরের কাজও অধিকাংশই 'সুইচ' টিপে করা যাবে। কলের সাহায্যে হিসাব রাখা, গোণা, প্যাক্ করা, মাপা, গোছানো, সাজানো ইত্যাদি সবই হবে; কলের পাহারাদারও হবে।

তখনকার দিনে 'আগুন-সহা' কাপড় আর কাগজের চল হবে; হঠাৎ আগুন লেগে গেলেও বিপদের সম্ভাবনা কম থাকবে। রান্না-বান্না, গরম করা ইত্যাদি বিদ্যুতের সাহায্যেই হবে।

সবই তো হ'ল; কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে যে তখন কি হবে সে কথা আর কেউ বলেন না দেখছি। এখনই যুদ্ধ যে রকম মারাত্মক আর নিষ্ঠুর ব্যাপার হয়েছে, এভাবে চল্‌লে তখন তো পৃথিবী ধ্বংস হ'তেও সময় লাগবে না ব'লে মনে হয়।

তা' ছাড়া প্রকৃতির ব্যাপার—ভূমিকম্প, ঘূর্ণি-ঝড় এসব থেকে মানুষ একেবারে অব্যাহতি পাবে, এ-কথা কেউ বল্‌তে সাহস করে না। প্রকৃতির দেখ্‌ছি জয়-জয়কার।

উল্টা কথামালা

—ইঁদুর ও সিংহ—

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

একদা একটি নেংটি ইঁদুর
খেয়ে তিন মণ গম ও ধান,
নাসিকাধ্বনি করিয়া বেজায়
বনের মাঝারে নিদ্রা যান।

একটি সিংহ খেলায় মাতিয়া
করে ছুটাছুটি তাহার বুকে।
খেলিতে খেলিতে হঠাৎ সিংহ
ইঁদুরের নাকে পড়িল ঢুকে।

ইথে মূষিকের হইল হঠাৎ
গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হায়!
হ'য়ে রাগান্ধ মূষিক সিংহে
দুই হাতে ধরি' খাইতে যায়।

সভয়ে সিংহ কাঁপিতে কাঁপিতে
কহিল কাতরে—"মূষিক-রাজ!
আমি ছোট প্রাণী, অতি নগণ্য,
দয়া কোরে ছেড়ে দিন্ গো আজ।"

শুনিয়া মূষিক ছেড়ে দিল তা'রে ;
দয়া হোল তাঁর উদার বুকে।
সিংহ পালালো তিন লাফ দিয়া,
মূষিকে তিনটি সেলাম ঠুকে।

কিছুদিন পরে পড়িল ইঁদুর
বনমাঝে এক ব্যাধের ফাঁদে।
সঙ্গে সঙ্গে সারা অরণ্য
কাঁপিয়া উঠিল মূষিক-নাদে।

সেই ভীম রব—কিচির্‌-মিচির্‌—
সিংহের কানে পশিল গিয়া।
ভাবিল—বিপদে পড়েচে মূষিক !
ব্যথিয়া উঠিল তাহার হিয়া।

ছুটিয়া সিংহ মূষিকের কাছে
আসিয়া দেখিল বিপদ তা'র।
তীক্ষ্ণ দন্তে কাটিয়া রজ্জু
দিল প্রাণ দান প্রাণদাতার।

যদিও সিংহ ক্ষুদ্র প্রাণী,
বাঁচালো সে আজ মূষিকরাজে
এ জগতে সবে জানিবে তোমরা—
এই মত হয় সকল কাজে।

বঙ্গোপসাগরের জলদস্যু

সন্দেহের ছায়া

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

প্রায় এক সপ্তাহ পর বেণীমাধব রেঙ্গুন হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়াছে। রেঙ্গুনের জলপুলিশ টেলিগ্রাম করিয়া চারিদিকে বোম্বেটেদের খবর জানাইয়া দিয়াছে। এর মধ্যে যে কয় যায়গায় বেণীমাধব মালপত্র লইয়া গিয়াছে, সর্ব্বত্র বন্দরের লোকদের এই জলদস্যুর আবির্ভাবের খবর দিয়াছে। আর তাহাদের কোনও খবর পাওয়া যায় নাই।

বেণীমাধব চলিয়াছে টেনেসেরিমের একটি ছোট গ্রামে ; গ্রামটা সমুদ্রের তীরে, নাম আকারা। আকারার সব অধিবাসী অর্দ্ধসভ্য, ইহাদের মধ্যে একটী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বাস করেন, তাহার নাম সুন্দর সিং। সুন্দর সিং আজ প্রায় কুড়ি বৎসর

ধরিয়া এখানে বাস করিতেছেন। চারিদিকে সব অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য লোকদের মধ্যে এই সুন্দর সিং কি করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহা আলোচনা করিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

পূর্ব্বে মাপু নামে একটি সর্দ্দার ছিল আকারার রাজা। মাপুকে হত্যা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রজা তেইবো সর্দ্দার হয়। তেইবোকে সুন্দর সিং তামাক, মদ, রঙ্গীন কাপড় প্রভৃতি উপহার দিয়া ভাব করিয়া লইল। লোকে জানিত সুন্দর সিং অতি খারাপ লোক; যত মাল স্থলপথে দস্যু-তস্করেরা লুঠতরাজ করে, সে অল্পমূল্যে সেই সব কিনিয়া লয়। রেঙ্গুন হইতে তাহার জন্য কিছু মালের চালান লইয়া সুরেশ আসিয়াছিল। মাল বহিয়া লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ, সুতরাং উপযুক্ত ভাড়া পাইলে সৎ বা অসৎ দেখিবার তাহার কোনও দরকার নাই।

আকারার পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার মুখে ছিল একটি পাহাড়। পাহাড় ঘুরিয়া ভিতরে ঢুকিয়াই সুরেশ তাঁহার জাহাজের মত আরও একটি ছোট জাহাজ নোঙ্গর করা আছে দেখিতে পাইল। জাহাজটার মধ্যে কতকগুলি লোক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বেণীমাধবকে লক্ষ্য করিতেছিল। নিকটে গেলে দেখা গেল জাহাজে কয়েকজন জোয়ান লোক হাফপ্যাণ্ট পরিয়া কাজকর্ম্ম দেখিতেছে। বেণীমাধবকে দেখিয়া তাহারা কি যেন আলোচনা করিতে লাগিল ও বারবার এদিকে নজর করিতে লাগিল।

বনমালী বলিল,—"আমাদের দেখে ওরা যেন বেশ একটু চঞ্চল হোয়ে পড়্লো!"

সুরেশ বলিল,—"ছোট্ট যায়গা, এখানেতো জাহাজ প্রায় আসেই না, তার ওপর একসঙ্গে দু'খানা জাহাজ দেখে ওরা অবাক। সুন্দর সিং আজকাল ভালই কিছু দাঁও মারছে, মনে হয়।"

বেণীমাধব সেই জাহাজটার পাশ দিয়া যাইবার সময় হাফ্‌প্যাণ্ট পরা একটা লোক হাত তুলিয়া বলিল,—"ওহে শুন্‌ছো!"

"কেন, বলোতো!" বলিয়া সুরেশ জবাব দিল।

"তোমাদের জাহাজতো চাটীগাঁয়ের বেণীমাধব?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের কোথাকার জাহাজ?"

"আমাদের ভাইজাগের সুন্দরম। তোমরা এখন পারে নেমো না কিন্তু।" লোকটার কথা শুনিয়া তাহাকে উড়িষ্যাদেশবাসী মনে হইল।

"কেন ব্যাপার কি?"

"পারের লোকগুলো খেপেছে। সুন্দর সিং আমাদের খবর দিয়েছে, তাই আমাদের মালিক কাকেও নামতে বারণ করেছে।"
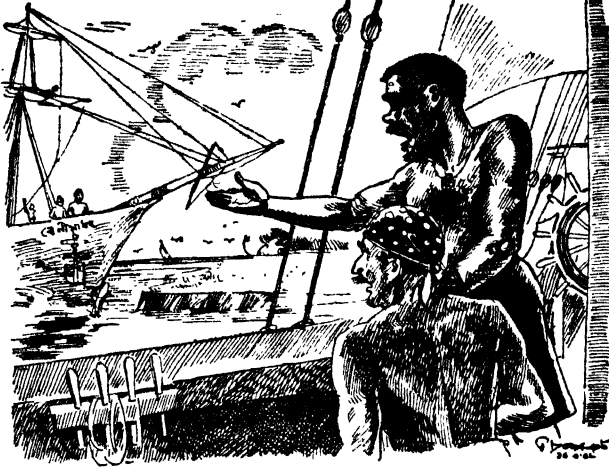
জাহাজের আর একজন লোক অগ্রসর হইয়া বলিল,—"খবরদার, পারের লোকগুলি কিন্তু খেপে গেছে, যাকে পায় তাকেই খুন করে। যদি তোমরা নামো, তবে কিন্তু আর মাথা নিয়ে ফিরতে পারবে না।"

"ধন্যবাদ, আমরা সাবধান থাকবো।"

জাহাজটীকে অতিক্রম করিয়া বেণীমাধব তীরের দিকে অগ্রসর হইল। জাহাজের লোকগুলি অবাক হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল,—"বুঝতে পারা গেল যে ভাইজাগের জাহাজ, তাতে একজন উড়ে, আর একজন বাঙ্গালী, আবার মাল্লারা সব তেলিঙ্গী। জগাখিচুরী দেখে মনে হয় একটা কিছু রহস্য আছে। ওরা আমাদের নামতে বারণ কোচ্ছে, আবার ওদের মালিক কিন্তু পারে নেমেছে, ঐ দেখ জাহাজের বোটখানা পারে বাঁধা রয়েছে।"

বনমালী বলিল,—"সুন্দর সিং শুনেছি লোক সুবিধের নয়, আর সব গাঁটকাটাদের সঙ্গেই তার কারবার। এ যায়গার লোক ভাল নয়; যারা এখানে যাতায়াত করে তারাও তেমনি। এটা একটা বড় বাটপারের আড্ডা!"

"যা-ই হোক, ওরা আমাদের দেখে বিশেষ সুখী হয়নি। এদিকে পারের লোকদের মধ্যেও তো কোন গোলমালের লক্ষণ দেখছি না।" বলিয়া সুরেশ তীরের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিল সুন্দর সিংএর বাংলোখানার একটু দূরে গ্রাম, গ্রামের লোক কাজকর্ম্মে ব্যস্ত; কিন্তু মারামারি, কাটাকাটি বা গোলমালের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। যদিও শুনা যায় আকারায় প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়া থাকে, কিন্তু দেখিয়া মনে হইল তখন সেখানে যেন কোন গোলযোগই নাই।

আরও দেখা গেল, সুন্দর সিং বাংলোর বারান্দায় বসিয়া আছে এবং তাহার পাশে আছে আর একজন মোটা লোক।

সুরেশ জানিত যে এখানে কোনও জাহাজ আসিলে সুন্দর সিং তাহার ডিঙ্গি লইয়া অগ্রসর হইত ও জাহাজে উঠিয়া সকলকে আদর করিয়া নামাইত। স্থানটীর দুর্নাম যথেষ্ট ছিল, আশ্বাস না পাইলে কেহ জাহাজ হইতে নামিত না। এবার কিন্তু সে রীতির ব্যতিক্রম হইল, যদিও দেখা গেল সুন্দর সিং বারবার জাহাজের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

সুরেশ বলিল,—"বনমালী, এখানে কি একটা কাণ্ডকারখানা লেগে গেছে মনে হচ্ছে! সুন্দর সিং যেন আমাদের এখানে আসায় বিব্রত হোয়েছে। আর ঐ মোটা লোকটার ভাব দেখে মনে হয় যেন পালাতে পারলে বাঁচে। মাঝে মাঝে এখানে সব নিষিদ্ধ পণ্যের আমদানী রপ্তানী হয়; লোকের যা দেখা উচিত নয়, তেমনি একটা কিছু হোচ্ছে মনে হয়।"

"একটা কিছু হোচ্ছে নিশ্চয়ই, যা' লোককে দেখাবার উপযুক্ত নয়। এখানকার সুনাম তো মোটেই নেই।"

"যা হোক আমার এখনি নেমে যেতে হবে, আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে থাকতে পারি না।"

জাহাজের ডিঙ্গিখানা নামানো হইল।　　(ক্রমশঃ)

নেক্‌টানিবাস্‌

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ.

এক্ষণে বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সমস্ত অত্যদ্ভুত কার্য্য সমাধা করিতেছেন, প্রাচীন মুনিঋষিগণ নিদারুণ তপস্যার প্রভাবে নানাবিধ মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া তদপেক্ষা নাকি অনেক অধিক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত কবচ, কুণ্ডল, মাদুলী প্রভৃতির শক্তি ছিল নাকি অমোঘ। তবে

তাঁহারা যখন-তখন অকারণে কাহাকেও পূর্ব্বোক্ত বস্তু সকল প্রদান কিংবা মন্ত্র কখনও বিনা হেতুতে প্রয়োগ করিতেন না। অনধিকারীকেও তাঁহারা কখনও কোন গুরুতর বিষয়ে শিক্ষা দিতেন না। তাহাতে জগতে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই অধিক অনুষ্ঠিত হইবে,—ইহাই তাঁহারা আশঙ্কা করিতেন। অথচ সেইজন্য অনেকে তাঁহাদিগকে পক্ষপাত দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের উক্ত অদূরদর্শিতার জন্যই নাকি ঐ সব মূল্যবান বিদ্যা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রাচীনকালে অনেক দেশের লোকই মন্ত্রশক্তি, তাবিজ, কবচ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদের দেশের প্রাচীন কালের তালবেতাল-সিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় অন্যদেশেরও অনেক সিদ্ধ ও শক্তিমান্ নরপতির সম্বন্ধেও অনেক বিস্ময়জনক গল্প আমরা মাঝে মাঝে শুনিতে পাই। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সেই সকল কাহিনী শুনিয়া কেহ বা ঢোক গিলেন, কেহ বা——যা'ক্—

সেক্ষপীয়রকে আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি। তিনি কিন্তু লিখিয়াছেন,—"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." অর্থাৎ— ওহে হোরেসিও,

এমন অনেক আছে স্বর্গ ও ধরায়,
স্বপ্নেও 'দর্শন' যা'র দর্শন না পায়।

সেই ভরসায় তোমাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই স্থানে মিশরের অতি প্রাচীন কালের একটি মহাবিস্ময়কর কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।

কাহিনীটি ফারাও নেক্‌টানিবাস্ সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে। আকাশের গ্রহ তারকা প্রভৃতি নাকি নেক্‌টানিবাসের নখদর্পণে ছিল। রজনীতে গগনে তারকাসকল উদিত হইলে, তাহাদিগের প্রতি তাকাইয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, ভবিষ্যতে কি সব ঘটনা সংঘটিত হইবে।

নীলনদের অভ্যন্তরে কোথায় কি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন। প্রবাহিত নদীর সলিলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি দেশবাসীর মঙ্গলামঙ্গল নির্ভুলভাবে বলিয়া দিতে পারিতেন। অমঙ্গল প্রতিরোধ করিবার অলৌকিক শক্তিও—সব না হইলেও—অনেকখানি তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

মিশরের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া তখন অনেকেই মিশরের ধনরত্ন লুণ্ঠনের

আশায় আগমন করিত ; কিন্তু নেক্‌টানিবাসের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইত।

একবারকার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। দূত আসিয়া ফারাও নেক্‌টানিবাস্‌কে সংবাদ দিল যে, বিপক্ষগণ বহু সৈন্য লইয়া জলপথে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দূতের কথা শুনিয়া তিনি প্রাসাদ-মধ্যস্থিত একটি বিশেষ কক্ষে একাকী প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ, ঢিলা এবং বিস্ময়জনক একটি পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। সেই কক্ষে অপর কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। সেই কক্ষে কি থাকিত বা না থাকিত তাহাও কেহই জানিত না। ঘন যবনিকার দ্বারা কক্ষের প্রবেশপথ এবং বাতায়ন প্রভৃতি আচ্ছাদিত থাকিত। পরদায় নানা প্রকারের চিহ্ন গ্রথিত ছিল।

অতঃপর নেক্‌টানিবাস্‌ কালো বর্ণের স্ফটিক নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড পাত্র, মন্ত্রপূত পবিত্র জলের দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। পরে হস্তে একখণ্ড সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট মোম লইয়া অঙ্গুলী চালনায় অতি সুন্দর একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁড়, পাইল ও মিশরীয় সৈন্য প্রভৃতি সমস্তই তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া উক্ত জাহাজে সংস্থাপন করিলেন। তিনি অতিশয় সুদক্ষ শিল্পীও ছিলেন, কাজেই তাঁহার নির্ম্মিত দ্রব্যসকল দেখিতে বেশ সুন্দর ও নিখুঁত হইল। সে যাহা হউক, এইবার ফারাও নেক্‌টানিবাস্‌ পাত্রস্থিত মন্ত্রপূত জলে সেই জাহাজখানি ভাসাইয়া দিলেন।

ইহার পর তিনি আরও কয়েকখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই পাত্রেই ভাসাইয়া দিলেন, কিন্তু ইহাদের গঠন প্রভৃতি পূর্ব্বেকার জাহাজ এবং লোকজন হইতে একটুখানি স্বতন্ত্র করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতঃপর আবলুস কাঠের তৈরী একটি দণ্ড গ্রহণ করিয়া ফারাও উহা জলের পাত্রের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া অপূর্ব্ব মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া কাহাদিগকে যেন আহ্বান করিতে লাগিলেন।

মোমের নির্ম্মিত পুতুল-সৈন্যগুলি নড়িতে লাগিল। তাহারা জীবন্ত হইয়া উঠিল, জাহাজের উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিল, দাঁড় টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে, কি আশ্চর্য্য! সেই খেলার জাহাজের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলির মধ্যে সত্য-সত্যই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সেই যুদ্ধের ফল এই হইল যে, মিশরের শত্রুপক্ষীয় খেলার

জাহাজগুলি একে একে ডুবিয়া গেল! তখন ফারাও নেক্‌টানিবাস্ সেই কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া সভায় গমন করিয়া সেই দূতকে এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন যে, মিশরীয় সৈন্যগণের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহারা নির্ভয়ে অবস্থান করুক।

পূর্ব্বোক্ত ক্রীড়াযুদ্ধের শেষ পরিণতি কি হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বেই আমরা অবগত আছি। আসল যুদ্ধের ফলাফল এইবার বলা হইতেছে।

দূতের কথামত সত্যসত্যই নীলনদের মোহানা দিয়া মিশরের শত্রুপক্ষীয়দিগের জাহাজগুলি ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখা গেল। জাহাজগুলি চমৎকার। তাহাতে সৈন্যও রহিয়াছে অসংখ্য।

ফারাও নেক্‌টানিবাসের জাহাজগুলিকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেখিয়া তীরস্থিত দর্শকদিগের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। একি ব্যাপার! বিনা বাধায় উহারা আসিয়া পড়িল যে!

কোন স্থানেই কোন কিছু নাই; সহসা ভীষণ ঝটিকা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিল। উত্তাল তরঙ্গও ক্ষিপ্ত হইয়া ঝটিকার সহিত তাল দিতে সুরু করিল। সঙ্গে সঙ্গে মিশরের শত্রুজাহাজগুলি নাচিতে আরম্ভ করিল। ধীরে ধীরে একে একে তাহারা ডুবিয়া গেল। মিশরের জাহাজগুলির কিন্তু কিছুই হইল না। তাহাদিগের শত্রু-জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইবামাত্রই জলরাশি শান্ত হইয়া কুলু কুলু রবে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে নীলনদ যে কি ভীষণ প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, এখন দেখিয়া তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। সকলেই তখন বুঝিতে পারিল যে ফারাও নেক্‌টানিবাসের মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই এইরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে।

অতি শক্তিমানেরও কিন্তু সময়ে সময়ে পরাজয় হয়। নরপতি নেক্‌টানিবাস্‌ও পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে পরের কথা।

বিচিত্র জগৎ

সেকালের ছড়ি

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম্. এ., এইচ্. ডিপ্. এড্. (ডাবলিন),
সার্টিফিঃ সাইকঃ (এডিনবর্গ)

এর আগের বার তোমাদের সেকালকার ঘড়ির কথা বলেছি, এবার বলব ছড়ির কথা। ঘড়ির পর ছড়ির কথাই বোধ হয় হবে খুব সঙ্গত। ছড়ি ত তোমরা সকলেই দেখেছ, এবং তোমাদের বাবা-দাদারা অনেকেই ব্যবহার করে থাকেন ; কিন্তু আমরা বাঙালীরা যেমন দুর্ব্বল, আমাদের ছড়িগুলোও সেই রকম সরু ও হাল্কা। আমাদের চেয়ে পশ্চিমে খোট্টারা ভারী ও মজবুত বাঁশের বা কাঠের লাঠি ব্যবহার করে' থাকে। সেগুলো শুধুই যে বাহারের জন্যে ব্যবহার করা হয় তা নয়, দরকার হ'লে তা দিয়ে রীতিমত আত্মরক্ষাও করা চলে ; কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে লাঠি ব্যবহার করি, তার নাম দিয়েছি ছড়ি এবং সেগুলো শুধু আমাদের সৌখিনত্বের পরিচয় দেয়, আসল কাজ তা দিয়ে খুব কমই পাওয়া যায়। আমাদের ছড়িও নানান আকারের হ'য়ে থাকে, বিশেষ করে' তার হ্যাণ্ডেলগুলো। আমাদের দেশের বিভিন্ন সময়ের ও প্রদেশের ছড়ি বা লাঠিগুলো সংগ্রহ করবার উপায় থাকলে, সেগুলো নিশ্চয়ই সংগ্রহশালায় রাখবার মতন হ'ত এবং তার থেকে হয়ত পুরাতন দিনের অনেক রীতিনীতি জানবার সুবিধাও হ'ত।

কতকগুলো বিলিতি ছড়ির কথা ব'লব। ছড়ির ব্যবহার অবশ্য আজকাল ইংলণ্ড থেকে একরকম উঠেই গিয়েছে ব'লতে হবে। বিলেতের বড় বড় সহরগুলোয় এত মানুষের ও গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় যে, সেখানে ছড়ি নিয়ে হেলেদুলে বেড়ানর অসুবিধে হয় অনেক। অবশ্য খোঁড়া ও বেতো লোকেরা এখনও লাঠি ব্যবহার করে' থাকে ; কারণ লাঠি তাদের কাছে পায়ের মতনই কাজ দেয়। পাহাড়ে পর্ব্বতে উঠতে হ'লে, বরফের মধ্য দিয়ে চলতে হ'লে, এখনও লাঠি অপরিহার্য্য ; কাজেই সহরে লাঠির ব্যবহার উঠে গেলেও, গ্রামে গ্রামে, বনে জঙ্গলে যে লাঠির ব্যবহার নেই, একথা বলা চলে না। একশ বছর আগেও ডাক্তার জন্‌সন, অলিভার গোল্ডস্মিথ্

প্রভৃতি বড় বড় লেখকদের লাঠি ছিল প্রিয় সঙ্গী, এবং তাঁরা বল্‌তেন, গায়ের গরম কোটের মতনই লাঠি তাঁদের প্রিয় বন্ধু। এই সমস্ত বড় বড় লোকের ব্যবহৃত লাঠিগুলো আজ যদি কেউ সংগ্রহ করতে পারে, তা হ'লে সেগুলো বড় বড় মিউজিয়মে স্থান পাবার যোগ্য হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, এবং সেগুলো থেকে তাঁদের স্বভাব ও রুচির পরিচয় বোধ হয় অনেকটা মিলবে।

একশ বছর আগেও ইংলণ্ডের প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তা ও গৃহিণী সোনা-বাঁধান লাঠি ব্যবহার করতেন। রাণী এলিজাবেথও বরাবর ছড়ি ব্যবহার করেছেন, ইতিহাসে সে-কথা লেখা আছে। অবশ্য এলিজাবেথ ছড়ি ব্যবহার করতেন অনেকটা নিজের পদমর্য্যাদা ও কর্ত্তৃত্বের ভাব দেখানর জন্যেই। এই কর্ত্তৃত্বের ভাবই ফুটে ওঠে রাজার হাতে রাজদণ্ডে ও শেরিফ্‌, বিসপ বা মেয়রের হাতের দণ্ডে। পার্লামেণ্টের স্পীকার এখনও পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সময় সোনার গদার (mace) সঙ্কেতে বিবদমান সভ্যদের বাক্‌বিতণ্ডা মুহূর্ত্তের মধ্যে থামিয়ে দেন।

আগেকার দিনে ইংলণ্ডের ধনীরা কিংবা বড় বড় জমিদারেরা যখন গাড়ি করে' রাস্তায় বেড়াতে বার হ'তেন, তখন তাঁদের গাড়ির দুধারে দুজন করে' বার জন পাইক গাড়ির সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে চ'লত। এদের কাজ ছিল, গাড়ি যদি কাদায় আটকে যেত, তা হ'লে সেই কাদা থেকে গাড়ি টেনে তোলা কিংবা চোর-ডাকাত যদি আসত, তাদের হাত থেকে আরোহীকে রক্ষা করা। এই সব পাইকদের হাতে থাকৃত খুব ভারী ও মজবুত লাঠি। সেই পুরাণ রীতি এখনও যে ইংলণ্ড থেকে একেবারে লোপ পেয়েছে, তা বলা যায় না। এখনও রাজা যদি ঘোড়ার গাড়িতে মিছিল করে' বের হন, তাহ'লে ঠিক সেই আগেকারই মতন পাইক বরকন্দাজ লাঠি-সোটা নিয়ে গাড়ির দুই ধারে চ'লতে থাকে।

আমাদের দেশেও হয়ত একদিন এইরকম ব্যবস্থা ছিল; কেননা দেবদেবীর শোভাযাত্রায়, বা করদ রাজাদের বিবাহ ও জন্মোৎসবের সময় যে মিছিল বের হয়, তাতে রূপার বা সোনার যেসব 'আশাসোটা' থাকে তাতেও এইরকম অদ্ভুত আকারের অনেক লাঠি দেখা যায়। কলকাতায় পরেশনাথের যে মিছিল বের হয়, তাতেও দেখ্‌তে পাবে মাড়োয়ারীরা অনেক রূপার আশাসোটা বের করে। এগুলো কাঠের ওপর রূপার পাত দিয়ে মোড়া থাকে এবং রাক্ষস, বাঘ প্রভৃতি নানা জীব-

জন্তুর মুখের আকারে তৈরি হয়। কিন্তু এগুলোর নাম 'আশাসোটা' হওয়ায় এবং উৎসব ও মিছিলের সঙ্গে বের হওয়ায়, আমরা বুঝতে পারিনে যে, এগুলো আসলে লাঠি এবং একদিন রাজরাজরারা রাস্তায় বের হ'লে, তাঁদের রক্ষার জন্যেই পাইক বরকন্দাজেরা দল বেঁধে এগুলো সঙ্গে নিয়ে যেত।

এখানে যে কয়টি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠির ছবি দেওয়া হ'ল, সেগুলো একশ বছর আগে লোকে ব্যবহার করত, এবং এখনও কোন কোন লাঠি-ছাতা-বিক্রেতা তাদের দোকানের সাইনবোর্ডে এগুলো ব্যবহার করে' থাকে, যাতে সাধারণে সহজেই লাঠি-ছাতার দোকান বলে' জানতে পারে। এখনকার দিনে এই লাঠিগুলো অদ্ভুত বলে' মনে হবে; কিন্তু একশ বছর আগে এইগুলিই ছিল অতি সাধারণ লাঠি। তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা রাস্তায় বেড়াতে বের হ'লে, তাদের পিছনে পিছনে দীর্ঘাকৃতি লাঠিয়ালেরা এইসব লাঠি নিয়ে চ'লত। লাঠির মুখগুলো রাক্ষসের মুখ, কিংবা কুকুর কি বাঁদরের মুখের অনুকরণে তৈরী হ'ত। এইটেই ছিল তখনকার দিনের ফ্যাসান এবং যে লাঠি যত অদ্ভুত আকারের হ'ত, সেইটেই হ'ত তত ভাল। এখানে এইরকম তিনটা অদ্ভুত আকারের লাঠির ছবি দেওয়া হ'ল।
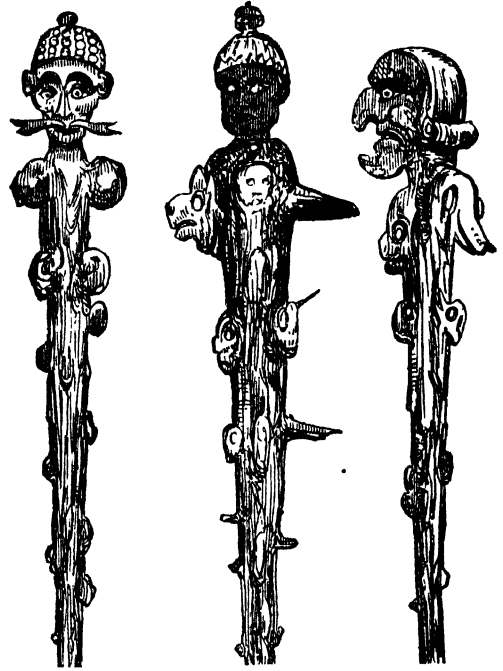
এই লাঠিগুলো হ'ত খুব শক্ত কাঠের তৈরি এবং লম্বায় পূরা ছয় ফিট্। লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে প্রভৃতি নানা চটকদার রংএ চিত্র-বিচিত্র করা থাকত। মাঝের লাঠিটা হ'ল এল্‌ম্ কাঠের তৈরি, ডালের গোড়ায় যে গাঁট্‌টা ছিল, সেইটে কেটে একটা মূরের মাথা তৈরি করা হ'য়েছে, আর এই ডালটায় যতগুলো গাঁট ছিল, প্রত্যেকটি চেঁচেছুলে এক একটি ভীষণাকার মুখ তৈরি করা হ'য়েছে, তারপর কাঁচ

দিয়ে চোখগুলো তৈরি করে', তাতে রং ধরান হ'য়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাস্তায় Mohawk গুণ্ডাদের হাত থেকে ভদ্রঘরের মেয়েদের রক্ষা করবার জন্যে লাঠিয়ালরা এই রকম লাঠি নিয়ে পেছন পেছন যেত। তারপর দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম লাঠিয়াল সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া বন্ধ হ'য়েছে এবং সেই সঙ্গে এই রকম অদ্ভুত আকারের লাঠিও লোপ পেয়েছে। এই রকম লাঠির কথাও লোকে হয়ত একেবারে ভুলে যেত, যদি না লাঠি-বিক্রেতারা এই ধরণের লাঠির ছবি দোকানের সাইনবোর্ডে এঁকে রাখত।

আমার মনে ভাবনা কবে আসবে শিশু-সাথী

আবুল হোসেন মিয়া

পথের পানে চেয়ে থাকি আগ্রহেতে মাতি,
আমার মনে ভাবনা কবে আসবে শিশু-সাথী।
দিনে দিনে দিন চলে যায় এক এক করে গণি,
তবু যেন দিন কমে না, কেবল সোম আর শনি।
ভাবতে ভাবতে মাস চলে যায় আসে মাসের শেষ
পয়লা তারিখ ভাবতেই সুখ, আনন্দের একশেষ!
মাসপয়লায় চেয়ে থাকি পথের পানে আশে—
শিশু-সাথী হাতে করে পিয়ন কখন আসে!

বনস্পতির বৈঠক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

মহাযুদ্ধের মহাসঙ্কটে কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। লোকে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া কাঠ কিনিতেছে। একদা চৈত্র-শেষের অপরাহ্নে মুকুলিত আম্র এবং শাখায়িত পনস তরু, পল্লবিত নিম্ব এবং ফলিত বিল্ববৃক্ষ সখেদে বনস্পতি সেগুনের নিকট আবেদন করিল,—'মহারাজ, অসময়ে এই কুঠারাঘাত আর সহ্য হয় না—অবিলম্বে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করি।'

বৃক্ষরাজ দুই একটি শুষ্কপত্র ফেলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। 'দেখ, অতিরিক্ত চিন্তায় আমার দেহ রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে—অসময়ে বার্দ্ধক্য দেখা দিল বলিয়া মনে হইতেছে। মানুষ কখন আমাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, এখন তাহাই ভাবিতেছি।'

'বনস্পতি, তবে আমাদের উপায়?'

দিঙ্মণ্ডল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

সেগুনকে বনস্পতি বলায় ডুমুর বৃক্ষের কিছু অভিমান হইয়াছে। গম্ভীরভাবে তিনি মন্তব্য করিলেন,—'বনস্পতি? বনস্পতি কাহাকে বলে জানো? কেবল একটা বিরাট দেহ হইলেই সে বড় হইবে? কৌলীন্যের একটা মর্য্যাদা নাই? পণ্ডিতদের কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তাঁহারা বলিবেন, 'বিনা পুষ্পং ফলং দ্রুমে'—সেই-ই বনস্পতি।' বট তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন,—'নিশ্চয়, তবে কেবল বিনা পুষ্পে ফল হইলেই তাহাকে বনস্পতি বলিব না—দ্রুম অর্থাৎ বৃহৎ বৃক্ষ হওয়া চাই।'

মনোহর রঙিন বস্ত্র পরিহিত গাব বৃক্ষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'দেখুন, এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া জাতি ও কৌলীন্যের গর্ব্ব শোভা পায় না। আপনাদের গায়ে এখনও কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই বলিয়া নিজেদের অত নিরাপদ মনে করিবেন না। উপস্থিত বিপদ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যায় এখন তাহাই বিবেচনা করুন।'

সহসা একটা ঘূর্ণীবাত্যা দিগ্বিদিকে ধূলি উড়াইয়া, পথিককে কাণা করিয়া, শুষ্ক পত্র উড়াইয়া যেন একটা অট্টহাসি হাসিয়া গেল! চটকা বৃক্ষ 'রণং দেহি' ভঙ্গীতে অসি ঝন্ ঝন্

শব্দে উত্তর করিল,—'না, মানুষের এই অত্যাচার আমরা সহ্য করিব না। বাঙ্গালী আজ যে কয়লার অভাবে আমাদেরে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নির্বংশ করিতে বসিয়াছে, এজন্য দায়ী সে নিজে।' বংশতরু মাথা তুলিয়া তাহার বংশী-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল,—

শ্রদ্ধাস্পদ বনস্পতি এবং উপস্থিত ভদ্র তরু ও তরুপত্নীগণ!

সহর থেকে কতকগুলি ভদ্রলোক আকস্মিকভাবে পল্লীগ্রামে এসে যে ভাবে আমাকে সমূলে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন, তাতে মনে হয় আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে! এদের ধারণা, আমার জন্যই ম্যালেরিয়া এবং আমিই নাকি পল্লীধ্বংশের কারণ!

সহরবাসী কি জানবেন যে, বাঁশ না হ'লে বাস হয় না? খনা ব'লেছেন, "পূবে হাঁস উত্তরে বাঁশ"—পাড়াগাঁয়ে বাস করতে হ'লে এ নিয়ম মেনে চলতে হবে। পল্লীর জীবন আমিই, আমিই লোকের ঘর বেঁধে দিই, আবার আমিই দিয়ে দিই বেড়া। গৃহস্থ-ঘরের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাকে দিয়েই তৈরী হয়, অথচ আমি কত অবহেলিত! ডোম, মুচি এদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে আমাকে! আমাকে দিয়ে চেয়ার, টেবিল, মোড়া, ডালা, কুলা, চাটাই, ধানের গোলা—না হয় কি? আমি বোমার আকারে মাটি ফুঁড়ে যখন বেরিয়ে আসি, অনেকে তখন আমার মাথায় হাঁড়ি চাপা দিয়ে আমার 'কোড়া' থেকে বাঁধাকপির মত তৈরী করেন। এই খাদ্যটা কেবল এদেশেই নয়—আমেরিকাতেও চলেছে।

আমিও ফুল-ফলে সুশোভিত হ'য়ে থাকি—তবে সেটা খুব দীর্ঘকাল, এমন কি, ৫০-৭৫ বা ১০০ বছর পরেও ঘটে। চীন দেশে আমার প্রায় পাঁচশো রকম জাতি আছে। তা হ'লেও আমাকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—যারা মাটি ফুড়ে বেড়িয়ে আসে এবং ঝাড় বাধে না—যেমন তল্লা বাঁশ, আর যারা ঝাড় বেঁধে হয়—যেমন ভাল্‌কো বাঁশ। চীন ও জাপানে একমাত্র আমাকে অবলম্বন ক'রেই বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। টুথ ব্রাসের হ্যাণ্ডেল হয় আমাকে দিয়ে—আমাকে দিয়েই তৈরী হয় কাগজ। অথচ বাঙ্গালী আমাকে পিছনেই ফেলে রাখল! দেশবাসী আমাকে একান্ত "গেঁয়ো" মনে করে!—অথচ জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড কোন্ দেশে আমি নেই? ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে আমার শ্যামলিমা। য়ুরোপে বরফের উন্মুক্ত প্রান্তরের পিছনে সবুজ বংশকুঞ্জ নয়নানন্দকর। সে সব কথা যাক্। খাঁটি বাংলার রূপটি চিন্তা করুন ত' একবার আপনারা—পুঁইয়ের মাচায় আমি, আবার ময়নার খাঁচায় আমি। শস্যের জমি

বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখি আমি ; পাচনি হাতে রাখাল গরু নিয়ে যায়, টোকা মাথায় চাষী যায় চাষ করতে। বাঁশের চালুনীতে খৈ চালা হয়, আবার শস্য ঝাড়তে হয় কুলো দিয়ে। সহরের বাবুরা কেবল ছিপ দিয়ে মাছ ধরতেই জানেন, কিন্তু পল্লীতে পোলো, দোঁয়াড়, বিত্তি, হোচা এসব দিয়েও মাছ ধরা হয়। আমিই "চিক" রূপে এখনও পর্দ্দা-প্রথাটা বজায় রেখেছি। নৌকা বাইতে বৈঠায় আমি, গাছে উঠতে মইয়ে আমি। ইমারত তৈরী করতে ভারায় আমি, তীর ছুঁড়তে ধনুকে আমি, আম পাড়তে লগায় আমি, নৌকা ঠেল্‌তে লগিতে আমি, ফুল তুল্‌তে সাজিতে আমি, নদী পার হ'তে সাঁকোয় আমি, আবার ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলোতেও সেই আমি! কোথায় আমি নেই? শিশু জন্মালে তার নাড়ীকাটা থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধকে চালি বেধে শ্মশানে নেওয়া পর্য্যন্ত আমি!

সহরের বাবুরা যদি পল্লীতে বাস করতে চান তবে বাঁশ রক্ষা করুন। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করতে আমি। কাউকে 'বাখারি' দিয়েই ঠ্যাঙ্গাও আর 'বাঁক' দিয়েই পিটাও সে আমি। কথায় বলে লাঠি যার মাটি তার! হায়, বাঙ্গলার লাঠি! হায় বঙ্কিমচন্দ্র,—কে আর আমার সে শক্তিমত্তার কথা বিচিত্র ভাষায় বর্ণনা ক'রবে?—

আমি ভীষণ, আমি ক্রূর, আমি শয়তান—
আমি শক্তিহীনের মাথা ভেঙ্গে করি শক্তিমানের জয়গান।
আমি রক্ত-পিপাসু বুর্নিস্—
আমি করিনে কাহারে কুর্নিশ।
(আবার) আমি যমুনার কূলে কালো ছায়া
শ্যামরায় তাঁর বাঁশরীর তানে আনে মায়া!
আমি উদাসী-বিরাগী একতারা
অকারণে কেঁদে হই সারা!

সমাগত উদ্ভিদ্‌মণ্ডলীর মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বংশলোচনের ওজস্বিনী বক্তৃতায় কদলী, নারিকেল, মালঞ্চ, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ মোহিত হইয়া ঘন ঘন করতলধ্বনি করিতে লাগিল।

গয়াতীর্থ

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে ৪ টাকা কয় আনা খরচ করিলেই থার্ড ক্লাসে গয়া আসা যায়। বাংলার এত কাছে এত বড় একটা তীর্থক্ষেত্র না দেখিবার কোন মানে হয় না। শিশু-সাথীর পড়ুয়ারা যেন সর্ব্বদা মনে রাখে, যে কোন ছুটিছাটার সুযোগে বাপ-মায়ের অনুমতি লইয়া একবার গয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবে। ষ্টেশনের নিকটেই ভারত সেবাশ্রমের নাতিবৃহৎ ধর্ম্মশালা শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর আশীষ মস্তকে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। আশ্রম-সন্ন্যাসীগণের দয়ায় যাত্রিগণকে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

তোমরা হয়ত অনেকেই গয়ার উৎপত্তি জান না। জান কি ?—

অনেক দিন আগে সত্যযুগে গয়া নামে এক অসুর বাস করিতেন। উপস্থিত যেখানে গয়া সহর সেইখানে তাঁহার রাজ্য ছিল। গয়াসুর ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও সদাচারী। জীবের দুঃখে তিনি সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন, আর চিন্তা করিতেন, কি করিলে জীবের নরক দর্শন বন্ধ করা যায়। শেষ পর্য্যন্ত স্থির করিলেন, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত একটা সিঁড়ি তৈয়ার করিবেন। পরমবৈষ্ণব গয়াসুরের শক্তির কোন অভাব ছিল না। ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বদা তাঁহার ভয়ে অস্থির থাকিতেন। যমরাজ নালিশ করিলেন, তাঁহার অধিকারে গয়াসুর হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ব্রহ্মা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধে গয়াসুরকে পরাজিত করা সুদূরপরাহত ব্যাপার। ব্রহ্মার চারিকপাল ঘামে ভিজিয়া গেল। দেবগণ সকলে ক্ষীরসাগরে নারায়ণের দরবারে হাজিরা দিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবানের অনেক স্তবস্তুতি করিবার পর তাঁহার কপট নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, গয়াসুরকে কৌশলে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। গয়াসুর অমর।

একদিন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা গয়াসুরের রাজ্যে গেলেন। তিনি পরম ভক্তিভরে ব্রহ্মাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রহ্মাকে সিংহাসনে বসাইয়া করজোড়ে বলিলেন, "আমার প্রতি কোন আদেশ, দেবতা ?"

দাঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে ব্রহ্মা বলিলেন, "তাইতো হে গয়াসুর, কি করেই বা তোমাকে সে কথা বলি! নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য তোমাকে অযথা কষ্ট দেওয়া—।"

গয়াসুর আরেকবার ব্রহ্মার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আপনাদের কাজে নিজের শরীর পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারি, পিতামহ!"

কয়েকবার শুষ্ক কাশি কাশিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা ছিল একটা যজ্ঞ করব। কিন্তু সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে কোন পবিত্র স্থান পেলাম না যেখানে যজ্ঞ করতে পারি। অনেক ভেবেচিন্তে ধ্যান করে' দেখলাম সে পবিত্র স্থান মাত্র একটিই আছে, সেটি তোমার বক্ষ—।" এইটুকু বলিয়া ব্রহ্মা হঠাৎ চুপ করিলেন। গয়াসুরের বুঝিতে কিছুই বাকী থাকিল না। কিন্তু কিছু পূর্ব্বেই কথা দিয়াছেন। গয়া রাজী হইলেন।

দেবলোকে আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলিয়া গয়াসুরের বিশাল বক্ষে যজ্ঞ সুরু করিয়া দিলেন। হুতাশনের প্রচণ্ড তাপে গয়াসুরের মস্তক নড়িতে লাগিল। যজ্ঞের ব্যাঘাত হওয়ায় একটি পর্ব্বত তাঁহার মাথার উপর রাখা হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মস্তক আন্দোলন বন্ধ হইল না। গয়াসুরের নিকট পরামর্শ চাওয়া হইল। গয়াসুর বলিলেন, "বিষ্ণুর চরণ আমার মস্তকে রাখুন।" অনাদি অনন্ত শ্রীভগবান নিজের পরম ভক্ত গয়াসুরের মস্তকে শ্রীচরণ রাখিলেন। বিষ্ণুর চরণ যে স্থানে একবার স্থাপন করা হয়, সেই স্থান হইতে আর তোলা হয় না। এইরূপে কৌশলে গয়াসুরকে বন্দী করা হইল। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপনের পর দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া গয়াসুরকে বর দিতে চাহিলেন। গয়াসুর বলিলেন, "আমার মাথার উপর স্থাপিত ভগবানের শ্রীচরণে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করিলে আত্মার যেন সদগতি হয়।" দেবগণ বলিলেন "তথাস্তু।"

পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, "বাছা, তোমার বাসস্থান আজ হতে গয়াধাম বা গয়াক্ষেত্র নামে অভিহিত হবে। এখানে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দান করলে মৃত আত্মা সদগতি লাভ করবে এবং সেই পিণ্ডের রস তোমার দেহে সঞ্চারিত হওয়ায় তোমারও ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ থাকবে না।" গয়াসুর অনুযোগ করিয়া বলিলেন—"কিন্তু একদিন যদি দৈবাৎ পিণ্ডদান না হয়, সেইদিন কিন্তু আমি সমস্ত সংসার ধ্বংস করে ফেলব।"

ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তথাস্তু।" দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গয়াসুর এইরূপে চিরকালের জন্য বন্দী হইলেন।

অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী গয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। শোনা যায়, ত্রেতাযুগে সীতাদেবীর শাপে নাকি ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা হইয়াছেন। ফল্গুর জল পবিত্র বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন। অল্প বালুকা সরাইলেই ফল্গুর জল পাওয়া যায়। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস কালে পিতা দশরথের মৃত্যু হয়। তিনি পিণ্ডদান মানসে গয়াধামে উপস্থিত হন। ফল্গুতীরে সীতাকে বসাইয়া তিনি পিণ্ডের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ নদীগর্ভ হইতে দশরথের একখানি হাত বাহির হইয়া সীতার নিকট পিণ্ড চাহিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া সীতাদেবী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ফল্গুর বালুকাদ্বারা পিণ্ড করিয়া দশরথকে অর্পণ করিলেন। পিণ্ডদান কালে ফল্গুকে সাক্ষী রাখা হয়। রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিলে সীতাদেবী সমস্ত ঘটনা বলিলেন। অবিশ্বাস ভরে রামচন্দ্র ফল্গুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কৌতুক দেখিবার জন্য ফল্গু বলিলেন, "আমি তো জানি না।" রুষ্টা সীতাদেবী তৎক্ষণাৎ শাপ দিলেন, "আজ থেকে তুমি হবে জলহীনা।" ফল্গু কাঁদিতে লাগিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সীতাদেবী তাঁহার শাপের কিছুটা কমাইয়া বলিলেন, "জলহীনা একেবারে হবে না—হবে তুমি অন্তঃসলিলা।"

বৌদ্ধদের নিকট গয়ার মূল্য কোন অংশে কম নয়। ভগবান বুদ্ধ এইখানে দীর্ঘদিন ধরিয়া অনশনে তপস্যা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সহর হইতে সাত মাইল দক্ষিণে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর অনেক ধর্ম্মপিপাসু ভক্ত ভগবান্ বুদ্ধের পবিত্রভূমি দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন। সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত বুদ্ধগয়ার বিরাট মন্দির দর্শনে অন্তরে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। বর্ত্তমানে ঐ মন্দির ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি একজন হিন্দু মোহান্তের পরিচালনাধীনে আছে। সেখানে একটি ছোট মিউজিয়মও দেখা যায়। কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি ভালভাবেই এখানে দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির কোন না কোন অংশ নষ্ট করা হইয়াছে। রামশিলা, ব্রহ্মযোনি, প্রেতশিলা, মঙ্গলাগৌরী, আকাশগঙ্গা, সীতাপাহাড় প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বড় পাহাড় গয়ার এখানে-ওখানে অবস্থিত আছে। অধিকাংশ পাহাড়ের উপরে উঠিবার বাঁধান সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়ায়ই মন্দির এবং দেব-বিগ্রহ দেখা যায়।

গয়া সহরে বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্পই বলিতে হইবে। বাঙ্গালীদের দুর্গাবাড়ী অর্থের অভাবে অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় কয়েক বৎসর হইতে পড়িয়া আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে দলাদলি বিশেষ নাই, তবে মিলও যে বিশেষ আছে এমনও বোধ হয় না। বাঙ্গালী তরুণদের লইয়া গঠিত Alliance Club এবং Kumar Sporting Club ফুটবল খেলায় বেশ নাম করিয়াছে।

বাঁচবার উপায়

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

"শিশু-সাথীর" আমার ছোট ছোট বন্ধুরা!

নতুন বছরের নতুন দিনে আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে এলাম। নতুন কথা শুনাতে নয়; চিরপুরাতন কয়েকটি কথা নতুন করে শুধু শুনিয়ে যেতে,—গল্প নয়, রূপকথা বা ভৌতিক কাহিনী নয়। তোমার কথা, আমার কথা, সকলের কথা।

কবি বলেছেন—"হায় রে! প্রকৃতি সনে বাঁধা আছে মানবের মন।"

শুধু যে প্রকৃতি সনে মানবের মনই বাঁধা আছে তা নয়; মানুষের দেহটাও সেই সঙ্গে খুব শক্ত করেই বাঁধা আছে, যা হয়ত অনেকেই জানে না। আজ সেই কথারই আলোচনা করব।

প্রকৃতি বা 'নেচার' বলতে আমরা কী বুঝি? মোটামুটি প্রকৃতি মানে, বাপ-পিতামহ হইতে আমরা যাহা কিছু পাই, এবং আমাদের চারিদিকে যাহা যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখে থাকি। এই প্রকৃতির হাতেই আমরা গড়ে উঠি;—তিল তিল করে সহজ স্ফূর্ত্তিতে। আমাদের জীবনে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে আমরা অনেক জিনিস পাই। তার কোনটা ভাল, আবার কোনটা মন্দ। সেই পাওয়া অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন ধর—সুস্থ বা নীরোগ দেহ, সুস্থ মন, অর্থ, বাঁচবার প্রচুর উপায় ইত্যাদি; অথবা অসুস্থ দেহ মন, দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা। কিন্তু তা সত্বেও যে আপনাকে বাঁচবার মত করে গড়ে তুলতে পারে, সকল কিছু বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সে-ই হ'ল প্রকৃত মানুষ! এ পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার একমাত্র তারই আছে।

অনেক সময় দেখা যায়, অনেক সংসারে অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকার জন্য তাদের কম ভাড়ায় আলো-বাতাসহীন ঘরে ঠেসাঠেসি করে থাকতে হয়। তার ফলে স্বাস্থ্য যায় নষ্ট হয়ে, নানা

প্রকার রোগ এসে শরীরে বাসা বাঁধে। প্রত্যেক বড় বড় সহরেই এধরণের অসংখ্য গৃহস্থ এইভাবে মরণের মুখে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকবার প্রহসন করছে দেখা যায়।

এই কারণেই ইংলণ্ডে ১৯৩০ সনে একটা আইন পাশ হয়েছিল যে, দুইজন প্রাণী নিয়ে যার সংসার তার বাড়ীতে বসবাসের জন্য থাকবে দুটি ঘর, আর চারজন প্রাণী হলে থাকবে তিনটি ঘর। কিন্তু আইন পাশ করলে হবে কী? ১৯৩৯ সনের লোক-গণনার সময় দেখা গেল, প্রায় আড়াই কোটি লোকই এক ঘরে দু'জন করে' থাকে; সাত কোটি লোক এক ঘরে তিন চারজন পর্য্যন্ত বসবাস করে। এই ভাবে একটি ঘরে তিনজন বা ততোধিক লোক ঠেসাঠেসি করে বাস করবার ফলে স্বাস্থ্য যায় ভেঙ্গে, এবং যখন সামান্য জায়গার মধ্যে শোয়া, স্নান, রান্না ইত্যাদি সব চলে, তখন নানারকম রোগের বিস্তার সহজেই হয়। এই ধরণের অধিবাসীদের মধ্যেই দেখা গেছে সব চাইতে বেশি ক্ষয়রোগ হয়, যাকে আমরা বলি টি. বি. (T. B.)।

যে ঘরে জায়গা কম, সেখানে কাঁচা বা রান্না-করা খাদ্য রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক—কেননা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সেই ঘরের খাদ্য দূষিত বায়ুপূর্ণ উষ্ণ জায়গায় থাকার দরুণ এবং সেইঘরে যারা থাকে সেই সব মানুষের ঘাম, মূত্র, থুতু ইত্যাদির সঙ্গে যে সব দূষিত পদার্থ নির্গত হচ্ছে তাদের দ্বারা দূষিত হয়ে পড়ে। সেই জন্য একই ঘরের মধ্যে শোয়া, বসা, খাওয়া ইত্যাদি চালান উচিত নয়।

পরিমিত সূর্য্যের আলো ও প্রচুর হাওয়া যে ঘরে না যাতায়াত করে, সেটা বাসের একেবারেই অনুপযুক্ত। সূর্য্যের আলো মানুষের শরীরকে তাজা ও সহজ করে তোলে, নানা বিষাক্ত বীজাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষকে বাঁচায়।

সর্ব্বদাই ঘরের দরজা জানালা যতটা সম্ভব খুলে রাখা উচিত। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যাতে থাকে সে দিকে নজর রাখতে হয়।

প্রত্যহ স্নান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরলে মন ও দেহ দুটোই বেশ সুস্থ ও আনন্দপূর্ণ থাকে। সামান্য ব্যায়াম সুস্থ ও সবল দেহের জন্য একান্তই প্রয়োজন।

সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে—খাদ্য বা আহার্য্য।

গত পনের ষোল বছর ধরে বহু বিজ্ঞানী মানুষের উপযোগী স্বাস্থ্যপ্রদ আহার সম্পর্কে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁদের সে গবেষণা হ'তে এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি, আহার্য্যের মধ্যে কতকগুলি বস্তু আমাদের শরীরের জন্য এত প্রয়োজনীয় যে, সেগুলো খাদ্য-তালিকা হ'তে বাদ দেওয়াই চলে না।

যে শক্তির সাহায্যে আমরা হাঁটি, চলি, বসি, পরিশ্রম করি এবং যা না হলে আমাদের এক মুহূর্ত্তও বাঁচা চলে না,—সেই শক্তি বা এনার্জি আমরা পাই—প্রোটিন বা আমিষ, শর্করা বা কার্ব্বোহাইড্রেট ও চর্ব্বি বা ফ্যাট্ জাতীয় খাদ্য হতে।

একটা দালানের চুণ, বালু, ইট প্রভৃতি যত দিন যায় একটু একটু করে ক্ষয় হয় এবং তার জন্য মিস্ত্রী ডেকে নূতন ক'রে আবার চুণ বালু ইত্যাদি লাগাতে হয়। আমাদের শরীরও তেমনি যেমন কাজ করে তেমনি ক্ষয় হয়, এবং ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ করে দেয় আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। সেই জন্যই প্রত্যহ প্রায় এক শত গ্র্যাম প্রোটিন আমাদের শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য দরকার হয়। জান্তব পদার্থ হতেই প্রোটিন জাতীয় খাদ্য মিলে; যেমন ধর—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। মাছমাংস ছাড়া, মটরশুটি, ছোলা, গম ইত্যাদিও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছোলা, রুটি ইত্যাদি খেয়েও আমাদের মধ্যে যারা গরীব তারা দেহের প্রোটিনের অভাব অনায়াসে মিটাতে পারে।

মেসিনে যেমন কয়লা কাজ করে, আমাদের দেহ-মেসিনেও শর্করা বা কার্ব্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তেমনি কয়লার কাজ করে, অর্থাৎ জ্বালানীর যোগান দেয় শর্করা জাতীয় খাদ্যগুলিই। এই জ্বালানী হতেই শরীরে তাপের উদ্ভব হয়। দেহে প্রত্যহ অন্ততঃ ৫০০ শত গ্র্যামের কম শর্করার যোগান হওয়া উচিত নয়। শীতকালে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে দেহকে গরম রাখবার জন্য আরো বেশী তাপ অর্থাৎ আরো বেশী কার্ব্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। সাধারণতঃ শুটি, ময়দা, চাল, আলু, শাকসবজী প্রভৃতি হতেই শর্করা আমরা পাই। চর্ব্বিজাতীয় খাদ্যও শরীরে আবশ্যকীয় তাপের যোগান দেয়, এবং চর্ব্বি আমরা মাছ, সবজী, দুধ, মাখন, ঘি ইত্যাদি হতে পেতে পারি।

এসব ছাড়াও বাঁচতে হলে খাদ্যপ্রাণ নামে একটি খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন। একটু একটু করে তোমাদের সব বলব, আজ এই পর্য্যন্ত।

গহন গিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালিপদ চট্টোপাধ্যায়

—এক—

আরম্ভ

গাড়ি চলেছে ঝড়ের বেগে।

সেই গাড়িতে রঞ্জিত যাচ্ছে দিদির বাড়ি।

দিদি! দিদি ব'লে সত্যই কি তার নিজের কেউ আছে?—নিজের রক্তমাংসের সম্পর্কের কেউ? কেউ নেই তার।

রঞ্জিত চলেছে গাড়িতে; কিন্তু মন নেই তার বাইরে ছুটে-চলা গাছগুলোর দিকে, দৃষ্টি নেই তার দূরের ছুটন্ত সবুজ প্রান্তরের দিকে, খেয়াল নেই এক এক ক'রে পালিয়ে যাওয়া টেলিগ্রামের খুঁটি গোণার দিকে।

মন তার আট্‌কা পড়েছে ভারি এক দুর্ভাবনায়—দূর অতীতের বেদনা-ভরা এক স্মৃতিতে।

রঞ্জিতের কেউ নেই। শুধু দিদিরই তার অভাব তাই নয়, সংসারে সত্যিকার আপনার জন একটিও তার নেই।

রঞ্জিতের ছোটবেলার কথা।

ঘটনাটা মনে ক'রে আজও সারা শরীর তার শিউরে উঠ্‌ছে, বুক উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে। এ ঘটনা নিয়ে কেঁদেছে সে অনেক। আজ কাঁদার ক্ষমতা আর নেই; চোখের জল সব ফুরিয়ে গেছে যেন।

তার বাবাও ছিলেন মাও ছিলেন। সে ছিল তাঁদের বুকজোড়া ধন, একটিমাত্র ছেলে।

তখন থাকৃত তারা বীজগাঁয়ে। রঞ্জিত সেখানকার স্কুলে পড়্‌ত নীচের শ্রেণীতে। তার বাবা ছিলেন সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

বাড়িতে থাকত তা'রা তিনটে লোক—বাবা, মা আর রঞ্জিত, নিশ্চিন্তে—নিরুপদ্রবে—সুখে।

একদিন রঞ্জিত গিয়েছিল নরেশদের বাড়ীতে। নরেশের চেয়ে বড়ো বন্ধু রঞ্জিতের নেই—থাকৃতে পারে না।

একটা পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। তাই বইয়ের দিকে মনটা বড়ো ছিল না; পাঁচ-সাতদিন পরেই আসছিল গরমের ছুটি।

নরেশের পড়ার ঘরে ব'সে দুই বন্ধু উঠেছিল গল্পে মেতে। সন্ধ্যা যে নেমে আস্‌ছিল ধীরে ধীরে, রইল না সে হুঁশ, রইল না মনে যে সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে বাড়ি ফিরতে রঞ্জিতের কষ্ট হবে। বাইরে আকাশের বুক যে উঠ্‌ছিল কালো মেঘের রাশে ছেয়ে, তার আড়ালে চল্‌ছিল তুমুল ঝড়ের তোড়জোড়, সেদিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ ধুলো পাতা উড়িয়ে, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড় ছুটল, একটু পরেই এলো জল—একেবারে ঝমঝম্ ক'রে। দশদিকে ঝড়ের আর বৃষ্টির মাতামাতি সুরু হ'য়ে গেল। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আর জলের ঝাপ্‌টা এসে যখন হাড় অবধি কাঁপিয়ে তুল্‌ল, তখন তা'দের হুঁশ হ'ল। বাইরের দিকে চেয়েই রঞ্জিত ব'লে উঠ্‌ল,—সর্ব্বনাশ!

কিন্তু বাড়ি যাবার উপায় তখন একেবারেই ছিল না।

নরেশের মা, বাবা, দিদি—সবাই রঞ্জিতকে খুব স্নেহ করেন চিরদিন। কাজেই রঞ্জিতকে অগতিতে পড়্‌তে হোল না। ভাবনারও কিছু ছিল না; বাড়ি থেকে সে তো আর না ব'লে আসেনি।

ক্রমে সন্ধ্যা গিয়ে এলো রাত; সাতটা বাজলো—আটটা বাজলো—নয়টাও গেল বেজে; কিন্তু একঘেয়ে সেই জলঝরা আর থামল না। অগত্যা সেখানেই খেয়েদেয়ে নরেশের সাথে এক বিছানায় শুয়ে পড়্‌লো রঞ্জিত লেপ মুড়ি দিয়ে। গরম দিনের ঠাণ্ডা রাত। শোয়া মাত্রই এমন বেমালুম সে ঘুমিয়ে পড়্‌ল যে, নরেশ যে গল্পটা বল্‌তে বল্‌তে জড়িয়ে আসা গলায় ঘুমিয়ে প'ড়েছে, তার এক বর্ণও তার কানে যায়নি।

পরদিন ভোর না হতেই রঞ্জিত জেগে গেল। তাড়াতাড়ি নরেশকে জাগিয়ে সে বিদায় নিয়ে নাম্‌ল এসে পথে।

সূর্য তখনো ওঠে নি। আকাশ জুড়ে ছিল তখনো কালো-কালো, থোলো-থোলো আর ধোঁয়ারঙের ছেঁড়া-ছেঁড়া, সারি-সারি, রাশি-রাশি মেঘের টুক্‌রা। সূর্যের আসার বার্তা নিয়ে যে রক্তরঙ্ ছড়িয়ে পড়্‌ল সারা পূব আকাশের মেঘের রাশির ভাঁজে-ভাঁজে, তা দেখে মনে হচ্ছিল রক্তের সাগরে বুঝি ঢেউ উঠেছে। সব দিকে থম্‌থমে ভাব, ঠাণ্ডা হাওয়া। মাঝে-মাঝে এক-এক ঝাপটা জোর হাওয়া গাছের ডাল দুলিয়ে, রঞ্জিতের বুক কাঁপিয়ে শোঁ-শো ক'রে ব'য়ে যাচ্ছিল। সব দিকে একটা ভয়াল ভাব। সবখানে পড়ে আছে গত রাতের দুর্ঘটনার চিহ্ন। রঞ্জিতের কেমন ভয় কর্‌ছিল। সে তাড়াতাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল।

বাড়িতে এসে দেখ্‌ল, ফটক খোলা। এমন সময় ফটক খোলা থাক্‌বার

কারণ কি, সে বুঝ্‌তে পার্‌ল না। বাবা-মাতো এত ভোরে জাগেন না। তাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেন হয়তো বাবা।

সে বাড়িতে ঢুক্‌ল। ঘরেরও যে দরজা খোলা! উঠানে দাঁড়িয়ে সে ডাক্‌ল,—বাবা!

ডাক্‌ল আরো বার কয়েক। জবাব পেল না। নিশ্চয় বাবা বেরিয়েছেন তারই খোঁজে।

ডাক্‌ল সে মাকে,—মা, মা! বাবা বুঝি আমায় খুঁজ্‌তে গেছেন নরেশদের বাড়ি?

মায়ের কোনো সাড়া নেই।

রঞ্জিত ঘরের ভিতরে গেল। ভিতরটায় তখনো আবছা আঁধার। জানালা খুলে দিতে বাইরের আলো ঘরে ঢুক্‌লো। সেই আলোয় বিছানার দিকে চেয়ে রঞ্জিত শিউরে উঠ্‌ল।

এ কী! এ কি গো!! সারা বিছানা রক্তে লাল হ'য়ে গেছে, তারই মাঝে প'ড়ে আছে রঞ্জিতের বাবার আর মায়ের দেহ!

ওগো! এ কী হোল গো! চীৎকার কর্‌তে গেল সে। পার্‌ল না। চোখের সামনে সব ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌ল। মাথার ভিতর তোল্‌পাড় সুরু হোল।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, রঞ্জিত চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌ল মাসিমার—নরেশের মা'র কোলের উপর শুয়ে আছে সে।

সেদিন থেকে মাসিমার অনন্ত স্নেহভরা বুকে, নরেশের পাশে তারও ঠাঁই হ'ল।

পুলিশের লোক অনেক খোঁজ কর্‌ল; কিন্তু কে যে সেই দুর্যোগের সুযোগে তার বাবা-মাকে খুন ক'রে গেল তার কিনারা কর্‌তে পার্‌ল না।

তার ঠাকুরদা ছিলেন বীজনগর থানার দারোগা। রঞ্জিত শুনেছে, তার জন্মেরও অনেক আগে তাঁকেও নাকি এক রাত্রে এমনি গোপনে কে খুন ক'রে গিয়েছিল। সে খুনীকেও পাওয়া যায়নি।

সেদিন থেকে নরেশের বাবা-মা-দিদি রঞ্জিতেরও বাবা-মা-দিদি। সেদিনের পর ছয় বছর কেটে গেছে। আদরে, যত্নে, আত্মীয়তায় বাবা-মায়ের অভাব বুঝতে মাসিমায়েরা তাকে দেননি।

আজ দিদির—নরেশের দিদির বাড়িতে সে বেড়াতে চলেছে।

সময়মতো গাড়ি এসে পৌঁছালো।

লট-বহর নিয়ে রঞ্জিত উঠ্‌ল গিয়ে দিদির বাড়িতে। দিদি তো যেন চাঁদ পেলেন হাতে।

খেয়ে-খেয়ে পেট তার ঢাক হয়ে ওঠার উপক্রম আর কি।

চার-পাঁচ দিন পরে দিদিদের বাড়ি, তার আশপাশ, জামাইবাবুর অফিস—সব যখন পুরাণো হয়ে গেল, তখন বহুদূরের ও-ই আকাশে মাথা-তোলা পাহাড়টাতে একবার ঘুরে আসার জন্য রঞ্জিতের মন আন্‌চান্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

পাহাড়টার নাম শর্‌দাই।

একদিন জামাইবাবুকে মনের ইচ্ছাটা সে জানাল। শুনেই তিনি আঁত্‌কে উঠ্‌লেন। চোখ ছুটো হয়ে উঠ্‌ল তাঁর অত্যন্ত বড়ো। বল্‌লেন,—সর্বনাশ! অমন কাজও মানুষে করে?

হেসে রঞ্জিত জিজ্ঞেস কর্‌ল,—কেন, মানুষের অপরাধ?
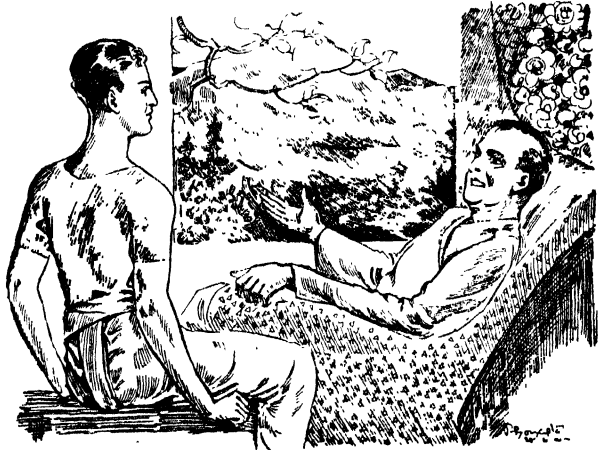
—ওরে বাপরে!—জামাইবাবু বল্‌লেন,—ওখানে অনেক মানুষ-খেকো জন্তু-জানোয়ার আছে যে।

রঞ্জিত বল্‌ল,—তা পাহাড় যখন, আর তা'তে বনই যখন র'য়েছে, তা'তে জানোয়ার না থাকাটাই তো বেখাপ্‌পা।

জামাইবাবু আরেকবার শিউরে উঠ্‌লেন বল্‌লেন,—ওঃ, সেদিন এখানকার একজন লোক গিয়েছিল ওই পাহাড়ে। তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি।

তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে শরদাই পাহাড়ের ভীষণতা সম্বন্ধে এমন সব গল্প তিনি বল্‌লেন যে তা শুনে' রঞ্জিতের মন খানিকটা দ'মেই বুঝি-বা গেল। (ক্রমশঃ)

কৃপণের দান

শ্রীনীলরতন দাশ, বি. এ.

নওগাঁর দাশু [illegible] জাসু, কেবা তা'রে নাহি জানে?
তা'র নাম প্রাতে কেহ নাহি করে, নাহি চায় মুখপানে।
তিন কুলে তা'র কেহ নাই, তবু দাশু কেন খেটে মরে?-
পল্লীবাসীরা বুঝিতে পারে না এত শ্রম কা'র তরে।
বঞ্চিত হ'য়ে সর্ব্বসুখ হ'তে সঞ্চিত করে টাকা,—
জীবনের সেরা ব্রত তা'র হায় শুধু টাকা জমা রাখা!
কেহ কোনোদিন দেখে নাই তা'রে কড়িটি করিতে দান
ছেলেরা র'চেছে তা'র নামে কত ছড়া ও হাসির গান।
রাস্তায় যবে বাহিরায় দাশু লাঞ্ছনা সহে কত,—
কেহ বা তাহারে টিট্‌কারি দেয়, কেহ গালি শত শত!
নীরবে সে সব সহ্য করিয়া দাশু খাটে নিশিদিন,
বর্ষাবাদলে শীতে ও গ্রীষ্মে সমান ক্লান্তিহীন।

সহসা একদা র'টে যায় গ্রামে দাশুর মৃত্যু-কথা,—
চক্ষে কাহারো ঝরে না কো জল, বক্ষে বাজে না ব্যথা !
পরদিন সবে বিস্ময়ে শুনে—দুঃস্থে করিতে ত্রাণ
পঁচিশ হাজার সঞ্চিত টাকা দাশু করিয়াছে দান !
জীবন-প্রভাতে কত দিন হায়, অভাবের তাড়নায়
অনাহারে দাশু ঘুরিয়াছে পথে নিঃস্ব পাগল প্রায় !
কৃপণের বুকে লুকায়ে ছিল যে হিয়াখানি দয়াময়—
মৃত্যুর মাঝে লভিল সবাই খাঁটি তা'র পরিচয়।
মৃতদেহ তা'র সাজা'য়ে পুষ্পে ঘটা করি' সারাদিন
উল্লাসে করে পল্লীবাসীরা নগরা প্রদক্ষিণ।
একদা যাহারা দাশুরে ক'রেছে লাঞ্ছনা অপমান
তাহারাই আজি গাহে জয়গান লভি' কৃপণের দান।

টোড বা কট্‌কটে ব্যাঙ

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

এ্যামফিবিয়ান (amphybian) একটি গ্রীক শব্দ—এর অর্থ হচ্ছে দ্বৈত জীবন যাপন করা। ব্যাঙকে এ্যামফিবিয়াস (amphybious) বা উভচর শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে—কারণ এরা জলে স্থলে উভয় স্থানেই বাস করে। ব্যাঙাচি অবস্থায় এরা প্রধানতঃ জলচর—তখন এরা মাছের মত ফুলকার (gills) সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং লেজের সাহায্যে সাঁতার কাটে। কিন্তু স্থলচর অবস্থায় এরা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য নিষ্পন্ন করে এবং তখন এদের লেজও থাকে না।

ভেক-জগতে দুটো বড় বিভাগ আছে—ইংরেজী সাধারণ ভাষায় তার একটিকে বলে ফ্রগ (frog) আর একটিকে বলে টোড (toad)। আমাদের ভাষায় ফ্রগ ও টোড উভয়কেই আমরা ব্যাঙ্‌ বা ভেক বলতে অভ্যস্ত। শুধু একটু রকমফের করবার জন্য কোনটিকে কুনো ব্যাঙ, কোনটিকে কট্‌কটে ব্যাঙ, কোনটিকে গেছো ব্যাঙ প্রভৃতি নামে অভিহিত করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফ্রগ ও টোডের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান।

ফ্রগের দেহ সাধারণতঃ মসৃণ আর টোডের দেহ খসখসে এবং আঁচিলের মত গুল্মে ভরা। টোডের চোখের পিছনে প্রায় ঘাড়ের কাছে শীষের বীচির মত গঠন দেখা যায়—যা' ফ্রগের নেই। এসব ছাড়া আরও অনেক খুঁটিনাটি পার্থক্য আছে।

কাজেকাজেই ব্যাঙ, ভেক প্রভৃতি কথা ফ্রগের জন্য রেখে 'টোড'কে 'কটকটে ব্যাঙ' বলে অভিহিত করাই সমীচীন। সচরাচর যে সমস্ত টোড দেখা যায় তার নাম 'বিউফো ভালগারিস' (Bufo Vulgaris)। এদের ইউরোপ, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন অংশ ও ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। বয়স্ক মেয়ে টোড বয়স্ক পুরুষ টোডের চেয়ে আকারে বড় হয়। পৃথিবীতে বহু প্রকারের টোড আছে।

টোডের দেহ ফোলাফোলা, বেশ ভারী—মুখ থ্যাবড়া এবং উপর নীচ চ্যাপটা। মাথার উপর শক্ত কালো হাড়ের উঁচু রেখা দেখা যায়। এদের চোখের পিছন থেকে এক প্রকার তিক্ত রস নিঃসৃত হয়। এদের দাঁত নেই। সামনের পায়ে চারটে আঙুল আর পিছনের পায়ে আঙুলের সংখ্যা পাঁচটি এবং ঈষৎ পর্দাযুক্ত। ফ্রগের তুলনায় এদের পা ছোট বলে এরা লাফাতে পারে না। এরা থপথপ্ করে চলে—তার চেয়ে বলা ভাল একরকম হামাগুড়ি দিয়েই চলে। পুরুষদের চীৎকারকে দুরাগত "ছোট কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের" সঙ্গে, আর মেয়েদের ডাককে "ভেড়ার ছানার একঘেয়ে ডাকের" সঙ্গে তুলনা করা যায়। ডিম পাড়বার সময় হলে মেয়েরা দিবারাত্রি অশ্রান্ত ঐভাবে চীৎকার করে।

টোডেরা সাধারণতঃ ডাঙ্গার বাসিন্দে। দিনের বেলা অন্ধকারময় স্যাঁৎসেতে গর্ত্ত, বৃক্ষকোটর, ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকে—আর রাত্রে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে শিকারের সন্ধানে বের হয়। এরা কেঁচো, গুগুলি, শামুক, বীটিল্ (beetle) ও অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গাদি খেয়ে বাগানের ও চাষীদের ক্ষেতের ফসলের যথেষ্ট উপকার করে। এরা জিভের সাহায্যে শিকার ধরে। আমাদের জিভ যেমন পিছনে আটকান, এদের জিভ তেমনি সম্মুখভাগে সংলগ্ন থাকে। বের করবার সময় জিভ উল্টিয়ে বের করে। জিভের অগ্রভাগ খুব আঠাল—কীটপতঙ্গের গায়ে লাগলে আর নিষ্কৃতি নেই। এরা ত্বকের সাহায্যে জলপানের কার্য চালায়।

এদের দেহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মাথা আর দেহকাণ্ড। এদের ঘাড় বা লেজ বলে কিছু নেই। এদের চোখ খুব উজ্জ্বল—চোখের মণি লাল অথবা পীতাভ। প্রত্যেক চোখের উপরে নীচে ঢাকনি আছে—এছাড়াও আর একটি পাতলা মেমব্রেন্ বা পরদা দ্বারা চোখের মণিকে ঢেকে রাখে। জলে অবস্থানকালে এই মণি চোখের উপর টেনে দেয়। এরা এক সময় একটি মাত্র চোখ একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে। চোখ তখন একেবারে মাথার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। চোখের পিছনে যে উঁচুমত গঠন দেখা যায় তাকে কর্ণপটহ বলে। এদের মুখের কাছে মাথাতে যে দু'টো ছিদ্র দেখা যায় তার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের চামড়া

মাংসপেশীর সঙ্গে দু' চার জায়গায় সংযুক্ত। সময় সময় এরা এই আবরণ নির্মোচন করে—বয়স্কেরা বছরে একবার এবং শিশুরা অন্ততঃ পক্ষে চারবার। সম্পূর্ণভাবে আবরণ মোচন করতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে এবং পরিত্যক্ত খোলসকে দলা পাকিয়ে মুখে পুরে গিলে ফেলে।

এদের জীবনের ইতিহাস খুব কৌতূহলজনক। ডিম থেকে যে বাচ্চা বের হয় বয়স্কদের আকৃতির সঙ্গে তার কোন অংশেই মিল নেই। বর্ষাকালে এরা জলে ডিম পাড়ে—যে কোন বদ্ধ জলাশয়েই নয়; এরা প্রিয় স্থানের উদ্দেশ্যে বহু দূর প্রদেশে যায়। রাত্রেই প্রধানতঃ এরা পথ চলে। এই সময় এরা ঘণ্টায় দু'শত গজ অতিক্রম করে।

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা খুব কম—প্রায় দশটি পুরুষের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে থাকে।

এদের প্রসূত ডিমের সংখ্যা তিন হাজার থেকে বারো হাজার। সূতার মত নলের মধ্যে অর্ধেক কালো অর্ধেক সাদা মটরদানার মত ডিমগুলো সাজান থাকে এবং ডিমগুলোতে জেলির মত পদার্থ মাখান থাকে। ডিম পাড়তে দশ থেকে বার ঘণ্টা সময় লাগে।

কয়েকদিনের মধ্যে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়। প্রথমে এদের মাথার কাছে পাখার মত দু'পাশে ফুলকা থাকে। কিন্তু শীঘ্রই তা খসে যায় এবং গলার ভেতরের ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য্য চালায়। জলের মধ্যে সবুজ পদার্থ খেয়ে এরা বেঁচে থাকে—শিলাগাত্রের শ্যাওলাও এদের অতি প্রিয় খাদ্য। তোতাপাখীর মত এদের ছোট কঠিন ঠোঁট আছে—এর সাহায্যেই এরা খাবার খায়। এই সময় এদের মুখের মধ্যে কয়েক সারি দাঁত থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙাচির পিছনের পা দেখা দেয়। তারপর সামনের একটি এবং শেষে শেষটিও। ব্যাঙাচিকে এবার শ্বাসকার্য্যের জন্য ফুসফুসের সাহায্য নিতে হয়। এরা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে। এখন আর এদের ব্যাঙাচি বলা চলে না—বলতে হবে সলাঙ্গুল ভেককুমার। চোখ মুখ—সব পূর্ণ গঠিত। লেজ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে হ'তে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। লেজ খসে যায় না—লেজের খাদ্য শোষিত হয়ে এদের দেহের পুষ্টিবিধান করে।

ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ টোড হ'তে প্রায় দীর্ঘ দু'টি মাস অতিবাহিত হয়।

টোডরা হাজার হাজার ডিম পাড়ে—অথচ মাত্র কয়েকটির পরিণতি লাভ করবার সৌভাগ্য হয়। হাঁস, মোরগ, অনেক প্রকার পতঙ্গ ও বীটল্ এদের ডিম খেয়ে ফেলে। ডিম থেকে যে ব্যাঙাচি বের হয় তারাও আবার হাঁস, মোরগ, সাপ, পেচক প্রভৃতির পেটে চলে যায়। এইভাবে তিন চার হাজার ডিমের মধ্যে মাত্র তিনটি কি চারটি বড় হয়ে টোডে পরিণত হয়।

টোডেরা খুব কষ্টসহিষ্ণু। ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড কেটে ফেলে দিলেও এরা কয়েক সপ্তাহ বেঁচে থাকে। এমন কি মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে না।

ভেক জগতে টোডরাই যা কিছু বুদ্ধিমান—এরা পোষ মানে। অথচ পৃথিবীতে এমন খুব কম প্রাণীই আছে যাদের লোকে এত ভুল বুঝেছে। এদের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অসম্ভব ও

অবাস্তব মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, মহাকবি সেক্স্পিয়র পর্য্যন্ত টোডকে কদর্য্য ও বিষাক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

অনেকের বিশ্বাস, এদের অনেক রহস্যময় অলৌকিক শক্তি আছে। মানুষের নাক থেকে অনবরত রক্তপাত হ'তে থাকলে এরা নাকি তা' বন্ধ করতে পারে। তা'ছাড়া এরা বিষ উদ্‌গীরণ করে—এদের নিশ্বাস বিষাক্ত। কিন্তু টোডের নিশ্বাস আদৌ ক্ষতিকর নয়—এদের বিষ উদ্‌গীরণ করবার ক্ষমতাও নেই। অর্থাৎ কোন ক্রমেই এরা মানুষের অহিত করে না। এরা গরুর বাঁট চুষে দুধ পান করে বলা হয়। অথচ এদের চোষণ করবার ক্ষমতা নেই এবং পান করবারও ক্ষমতা নেই।

জীন রোষ্টাণ্ড—"Toad and Toad life"-নামক পুস্তকে এদের বিষ সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন। এদের এক প্রকার বিষ হচ্চে বর্ণহীন চট্‌চটে তরল পদার্থের মত—ইহা টোডের চামড়াকে সব সময় সিক্ত রাখে। জলের সঙ্গে মেশালে এই বিষ ফেনান্বিত হ'য়ে ওঠে। এই বিষ স্বল্প পরিমাণে স্বাদযুক্ত বা একেবারে স্বাদহীনও বলা যেতে পারে, এবং এর গন্ধ ছত্রকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই কারণেই অপরিণামদর্শী কোন কুকুর টোড খেলে তা' ফেলে দিয়ে পালাতে পথ পায় না—এদের মুখ ফেনময় হয়ে ওঠে। কাজে কাজেই কুকুরেরা সর্বদাই এদের সংসর্গ দুর্জন সংসর্গের মত পরিহার করে।

টোডদের দ্বিতীয় বিষ হচ্চে ক্রীমের মত হলদে—তীব্র গন্ধ ও কটু স্বাদযুক্ত। এই বিষ এরা কদাচিৎ নির্গত করে—খুব বেশী নিপীড়িত না হলে নয়। কিন্তু এই দু'প্রকারের বিষই মানুষের পক্ষে তত ক্ষতিকর নয়। অবশ্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করলে বা চোখে বা কোন ক্ষত স্থানে লাগলে কিছুটা যন্ত্রণা দেয়। অল্প পরিমাণে এই বিষ খেলে ঘুমের ওষুধের কাজ করে।

এদের চেহারা যত খারাপ বলা হয় তত খারাপ নয়। এরা বিষধরও নয়। অবশ্য এরা মণি ধারণ করে এই রকম একটা কাণাঘুষা সর্বদেশে প্রচলিত থাকলেও চাক্ষুষ কেহ প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানা যায়নি। টোডের সাহায্যে আগে নাকি ক্যানসার ভাল করা হোত।

আগে টোডের বিষজর্জরিত ব্যক্তিকে অদ্ভুত উপায়ে চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা ছিল। একটা জীবন্ত ঘোড়াকে কেটে তার মধ্যে লোকটিকে বসিয়ে রাখা হোত যতক্ষণ না মৃতদেহ ঠাণ্ডা হোত। যদি এইভাবে লোকটির দেহ থেকে বিষ ঘাম দিয়ে বেরিয়ে না যেত, তবে আর একটি প্রাণীকে হত্যা করে পূর্বোক্ত প্রণালীর পুনরাবৃত্তি করা হোত।

কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে টোডের সম্বন্ধে যতপ্রকার অদ্ভুত ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল, তার সবগুলোই প্রায় ভ্রান্ত।

"সোনার দোয়াত কলম হোক"

শ্রীহরিপদ সেন, এম্. এ.

১লা বৈশাখ, ১৩১৭। নববর্ষের প্রথম দিনেই মা-বাবাকে প্রণাম করিবার পর ঠাকুরমার ঘরে গিয়া দেখি তিনি ধানদূর্ব্বার থালা সাজাইয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। গড় হইয়া প্রণাম করিবার জন্য পায়ে হাত দিতে না দিতেই মাথায় ধান দূর্ব্বা দিয়া বুড়ি বিড়্ বিড়্ করিয়া "পাকা চুলরাশির সমান পরমায়ু" হইতে আরম্ভ করিয়া কত যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তার আর ইয়ত্তা নাই। সবচেয়ে এই কথাটাই বড় বেশি কানে বাজিল, মনেও ঘা দিল—"তোর সোনার দোয়াত কলম হোক।" তখনও তাল-পাতার 'পাত,' মাটির দোয়াতের ভূষাকালি ও খাগের কলমের সীমা ছাড়াইতে পারি নাই, সোনার দোয়াত কলমের লোভটা বড় কম হইল না।

কথাটা মার কাছে বলিলে, মা হাসিয়াই আকুল হইলেন; বাবার কানে গেলে বাবা বলিলেন--বেশ, সোনার দোয়াত কলম দেওয়া হইবে বড় হইয়া যখন তুমি ক্লাসের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান দখল করিতে পারিবে তখন।

সোনার দোয়াত কলম তখন হইতেই আমাকে পাইয়া বসে। এখন এই প্রবন্ধটি লেখার সময়ও সোনার দোয়াত কলমই আমার হাতে চলিতেছে। সোনার দোয়াত কলমই বটে, তবে যে অর্থ কথাটা শুনিলেই মনে হয় ঠিক সেই অর্থে নয়; সোনার দোয়াতে সোনার কলম দিয়া কালি লইয়া তোমাদের জন্য এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না, লিখিতেছি আধুনিক কালের ঝরণা-কলম অর্থাৎ ফাউন্টেন পেন দিয়া। যেই দোয়াত সেই কলম এবং লেখনী বা নিবটি ইহার সোনার, সুতরাং ইহা সোনার দোয়াত কলম; নয় কি?

কলম মানুষ খুব বেশি দিন যাবৎ ধরিতে বোধ হয় শিখে নাই। আধুনিক বিজ্ঞানীরা যা বলেন তাতে আমরা জানিতে পারি, এখনকার মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঠিক হুবহু মানুষ ছিল না,—না আকারে, না ব্যবহারে, না বিদ্যায়, না বুদ্ধিতে। তারপর যখন তাহারা ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল, তখনও তাহাদের হাতে কলম উঠে নাই, উঠিয়াছিল মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরা বা গাছের ডাল অস্ত্ররূপে।

মানুষ যখন প্রথম তাহার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিল, আকার ইঙ্গিত যখন ভাষায় পরিণত হইল, তখন সে উহা ধরিয়া রাখিতে চাহিল স্থায়ী ইঙ্গিতরাশির সাহায্যে। সেজন্য সে যাহার সৃষ্টি করিল তাহা বর্ণ বা অক্ষর। বর্ণ আগে না অক্ষর আগে তাহার ইতিহাস লইয়া লিপিতত্ত্ববিশারদেরা ঝগড়া করিতে থাকুন, আর মাটির নীচ হইতে পাথুরে বা ধাতব প্রমাণ বাহির করিয়া 'বড় বিদ্যা জাহির করিতে' থাকুন; আমরা বর্ণ ও অক্ষর হইতে যে ইঙ্গিত পাই তাহাতে অন্ততঃ এটুকু বুঝিতে পারি যে, ভাষার যে বাহন ক্রমে ক্রমে সভ্য মানব সমাজ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেগুলিকে দুই রকমে প্রকাশ করা হইত। এক, রং প্রভৃতির সাহায্যে চিত্রণদ্বারা—ইহাকেই বলা হয় বর্ণ; আর, শক্ত কোন কিছুর সাহায্যে খোদাই করিয়া—এই জন্যই ভাষা প্রকাশের সঙ্কেতগুলির অপর নাম হইয়াছে অক্ষর। বর্ণ সমাবেশের জন্য প্রথমে বোধ হয় চিত্রকরের মতই তুলির সাহায্য লওয়া হইত এবং অক্ষরের উদ্ভাবকেরা হয়ত অস্থি বা প্রস্তরের তীক্ষ্ণাগ্রের সহায়তা গ্রহণ করিতেন।

তারপর মানুষ কাজের সুবিধার জন্য সাহায্য লইল গাছের এবং পাখীর। খাগ বা ঐ জাতীয় নলের সূক্ষ্মাগ্র কলম এবং পাখীর পালকের ঐরূপ কলম এখনও যে না চলিতেছে তাহা নহে, তবে শতেক বৎসর আগে ঐগুলিই ছিল লিখিবার একমাত্র উপকরণ। এই খাগের ও পাখের কলম দিয়াই ঐতিহাসিক যুগেও বহু ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

পরে মানুষ লোহার ব্যাপক ব্যবহার আরম্ভ করার পরে নিবও তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ধাতব কলমের ব্যবহার জনসমাজে খুব বেশি প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু মানুষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে বেশি সময় লাগে না। বার্ম্মিংহাম ইংলণ্ডের একমাত্র বড় লোহার জিনিষ তৈরীর কেন্দ্রস্থান। প্রকাশ, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেও সেখানকার কারিগরেরা নিব ব্যবসায়টিকে চালু করিয়া তুলিতে পারেন নাই। আবার ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দেই সেই বার্ম্মিংহামেই দুই হাজারেরও বেশি লোক প্রতিদিন প্রায় দশহাজার গ্রোস নিব বানাইয়াও বাজারের চাহিদা মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তোমরা এখনও যে জি মার্কা নিব, রিলিফ নিব প্রভৃতি ব্যবহার কর, সেগুলি ঐ বার্ম্মিংহামের কারখানায়ই তৈরী হইয়া থাকে।

সোনার নিব খুব বেশিদিন যাবৎ তৈয়ার হয় নাই। আমেরিকায় ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে

প্রথম সোনার নিব তৈয়ার হয়। কিন্তু সেটা খুব কাজের বলিয়া প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং উহার দুর্ম্মূল্যতার জন্য উহা অচলই থাকিয়া যায়।

মানুষ অনেকদিন পর্য্যন্ত দোয়াত হইতে কলমের সাহায্যে কালি লইয়া লিখিয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহার উৎকর্ষ সাধন না করিয়া সে শান্তি পাইতে পারে না, তাহা মানুষের স্বধর্ম্মই নহে। সেই কারণেই দেশে দেশে বিজ্ঞানীদের মাথা এজন্য ঘামিতে লাগিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রথম ঝরণা-কলম বাহির হয়; কিন্তু উহা বড় খট্‌মটে ছিল; উহা ব্যবহারে সুখ পাওয়া গেল না, দামও বড় বেশি পড়িল, সেজন্য উহা চলিল না। আর এখন ঝরণা-কলম ঘরে ঘরে জনে জনে ব্যবহার করে। স্কুলের ছেলেরা পর্য্যন্ত এই কলম পকেটে করিয়া ক্লাসে বসিয়া কত কি করে।

বর্ত্তমানের ঝরণা-কলমগুলিকে মোটামুটি ৪টি ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া যায়;— (১) কালির পাত্র বা কলমের মূল অংশ বা ব্যারেল, (২) নিব, (৩) কালির প্রেরণ যন্ত্র, (৪) ঢাকনা। মূল অংশ (barrel), ঢাকনা (cap) এবং প্রেরণযন্ত্র (spoon feed) একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ দিয়া প্রস্তুত হয়, আর নিবটির মূল উপাদান সোনা।

ঝরণা-কলমের মূল অংশ ও ঢাকনা প্রভৃতি তৈরীর রাসায়নিক দ্রব্যটির মূল উপাদান রবার। ভাল ভাল কলম তৈয়ার করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা, জার্ম্মাণী ও জাপান প্রভৃতি দেশে বাছাই করা সেরা রবার ব্যবহৃত হয়। এই রবার প্রথমে ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত গরম জলে ভিজাইয়া রাখা হয়, তারপর তাহার মণ্ড করিয়া যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিষ্কার করা হয়। শেষে পরিমাণ মত গন্ধক (sulphur) মিশাইয়া এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঐ মিশ্রণকে শক্ত অথচ কালি না পড়িয়া যায় এরূপভাবে নমনীয় করিয়া তোলা হয়। সাধারণতঃ বেশি দামের কলমের অংশগুলি হাতে তৈয়ার করা হয়।

তারপর নিবের কথা। লোহা বা অন্য ধাতুর নিব বেশিদিন ব্যবহার করা যায় না। কালিতে ডুবাইয়া রাখিলে বা কয়েকদিন ব্যবহার না করিলে ঐ সমস্ত মরিচা ধরে, এবং নষ্ট হইয়া যায়। সোনার একটা গুণ উহাতে মরিচা ধরে না। বৎসরের পর বৎসর কালিতে ডুবাইয়া রাখিলেও সোনার নিব নষ্ট হয় না। কিন্তু খাঁটি সোনার নিব দিয়া লেখাও যায় না। সোনা এত নমনীয় যে গহনা খাঁটি সোনা দিয়া হয় না, সেজন্য একআনি দেড়আনি পরিমাণ তামা মিশাইয়া উহা শক্ত করিয়া লইতে হয়। নিব তৈরীর

জন্যও সোনার সহিত পরিমাণ মত রূপা মিশাইয়া উহাকে ১৪ ক্যারেট সোনায় পরিণত করা হয় এবং সাধারণতঃ ঐ সোনা দিয়াই নিব তৈরী হয়।

এই সোনার নিবও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল না। ইহা বেশি টেঁকসই নয়; কিছুদিন লিখিলেই ক্ষয় হইয়া যায়, মোটা হয় ইত্যাদি। সেজন্যই বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক নিরস্ত হইতে পারিল না।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ কলম-প্রস্তুতকারক ইরিডিয়ম (iridium) নামে এক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু দিয়া কলম তৈরীর চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয় না। তিনি দেখিলেন, উহা এত শক্ত যে উহা দিয়া কোন কাজ করা যায় না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে জন্ আইজাক হকিন্স (John Isaac Hawkins) নামে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার হীরক টুকরার সাহায্যে এক বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা এই অতি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ধাতু ইরিডিয়মকে সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করিতে সমর্থ হইলেন।

তখন হইতে সোনার নিবের অগ্রভাগে এই ইরিডিয়ম-কণিকা সংলগ্ন করিয়া মূল্যবান ঝরণা-কলমের নিব তৈয়ার করা হইতেছে। এক একটি নিবে মাত্র দুই গ্রেণ পরিমাণ ইরিডিয়ম কণিকা লাগান হয়।

একাধারে দোয়াত ও কলম প্রস্তুত করিয়াই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও বিলাস-লালসা মিটিয়া গেল না। এই সাধারণ ঝরণা-কলমের একটা অসুবিধা রহিল। ছোট পিচকারীর সাহায্যে উহাতে কালি ভরিতে হয়। সেজন্য মুখ খুলিতে ও আট্‌কাইতে হয় বারে বারে।

চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। মানুষের বুদ্ধি সে অসুবিধাও দূর করিল। ব্যারেলের মধ্যে রবারের নল লাগাইয়া এবং তাহাতে টিপিবার যন্ত্র বসাইয়া কালি ভরিবার ব্যবস্থা হইল। আর বারে বারে মুখ খুলিয়া পিচকারীর সাহায্যে কালি ভরিতে হয় না। রবার নলিকাটি নানা রকমের ঝঞ্ঝাট বাধাইতেছিল। সুতরাং উন্নতির আর এক ধাপে শোষকযন্ত্র লাগাইয়া সেই অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। নিবের মধ্যে নানারকম কারিগরি করা হইয়াছে; আজকাল এক ধরণের ঝরণা-কলমের নিবকে নয় রকমে পরিবর্ত্তিত করারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আছাড় পড়িলেও নষ্ট হয় না এমন নিবও তৈয়ার করা হইয়াছে। জামায় আটকাইবার ক্লিপের ত কত বাহার, কত নমুনা দেখা যাইতেছে। কালে কালে এই কলমের আরও কত উন্নতি হইবে কে জানে।

বিদায়! বন্ধু কলিকাতা! বিদায়

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

ভানু ওরফে দিলীপকুমারকে তোমরা চেন না?

ঐ যে একেবারে নির্জ্জলা বালিগঞ্জ—ষোলআনা খাস সাদার্ণ এভিনিউ।

ওর কাকা জ্ঞানবাবু আমার বন্ধু। সেদিন ওদের বাড়ি বেড়াতে যাই। ওর কাকা বোধ হয় আগেই ভাইপোর নমুনা টের পেয়েছিলেন। তাই অতি সন্তর্পণে ভ্রাতুষ্পুত্রের অধ্যয়নাগারের দিকে গমন করে' যা দেখলেন তাতে তার চক্ষু স্থির।

ভ্রাতুষ্পুত্রটি তার এক মহাকাব্যের খসড়া ক'রছেন। জোর করে চিঠিখানা ওর হাত থেকে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

চিঠিখানার বিষয় হচ্ছে কলিকাতা-বিলাপ। তোমাদের জন্য এখানে একটা অনুলিপি দেওয়া হ'ল।

ঢাকা,

১লা এপ্রিল, ১৯৪২

ভাই কলিকাতা,

তোমার শোকে মুহ্যমান, ব্যথায় জর্জ্জরিত, সন্তপ্ত হ'য়ে তোমাকে এ পত্র দিচ্ছি।

বাবার আদেশ, মার ধমকানি, দাদার চোখ-রাঙ্গানি, বোনের উস্‌কানি খেয়ে আমাকে সকলের সাথে তল্পিতল্পা নিয়ে এ মফস্বল সহরে আস্‌তে হ'য়েছে। তোমার সাম্‌নে নাকি ভারি বিপদ! লোকে বলে, তোমার বুক নাকি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে, ফিন্‌কি দিয়ে ছুট্‌বে তোমার বুকের রক্তরূপ পাইপের জল, ভেঙ্গে যাবে তোমার সব সার্সির কাঁচ, মানুষ নাকি ঢুক্‌বে গর্ত্তে, আরো কত কি নাকি হবে! সে বিপদের মুখে তুমি নাকি, ভাই, অপ্রয়োজনীয় লোকদের রাখ্‌তে চাও-না। কত বল্‌লুম সবাইকে যে আমি তোমার কাছে মোটেই অপ্রয়োজনীয় নই, আমাকে তুমি বড্ড ভালোবাসো—কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমাকে চলেই আস্‌তে হলো!

কোথায় গেল সাধের ট্রাম, বাস্‌, আমার ক'লকাতা! তাই ভাসি নয়নের জলে—চোখ হ'য়ে গেল রাঙ্গা।

শুনেছি প্রাচীনকালে রাজাদের ঘুম ভাঙ্গত বন্দীদের স্তবগানে; চারদিকে মুখরিত হ'য়ে উঠত তাদের বন্দনা-গীতি। আমরা ক'লকাতা-বাসীরা চারদিকের এই মুক্তিমন্ত্রের' যুগে—মানবকে ছেড়ে দিয়ে কলকব্জাকে দাস করে নিয়েছি। এ যান্ত্রিক

যুগে যন্ত্ররাই—বিভিন্ন রাগিণীতে সুর তুলে ঘুম ভাঙ্গাত আমাদের। শুনতে পেতাম চারদিকে অপূর্ব্ব সুর, কর্পোরেশনের ধাঙ্গরদের পাইপের জল-নিষ্কাশনের শব্দ, রাস্তায় ফিরিওয়ালার রুটি-মাখন হাঁক—আর গঙ্গাযাত্রীর মুখে হরিনাম।

বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকতাম—মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'তাম; কিন্তু আজ মনে হয়—ছিলেম বড় ভালো, পার্কের চারিদিকে বেড়ান, লেকের জলে সাঁতার, ডাইভিং,—কোথায় গেল সে সব!

তারপর মনে পড়ে চায়ের আসর, ফিরপো মাখনের কথা। এখানে মাখন খেতে হয় রোজ গয়লার কাছে থেকে। কাকা বলেন, এই নাকি ভাল টাটকা জিনিষ। কাকা এটা মোটেই বোঝেন না যে এর টিকিট নেই যে উপহার পাওয়া যাবে, মাখনের মধ্যে একটুও নোনতা স্বাদ নেই।

অধ্যয়ন পর্ব্ব শুন্‌বে?

এখানে জুটেছেন আমার এক কাকা স্কুলের মাষ্টার। ভারিক্কি মেজাজের—বেজায় কড়া। মা ছাড়া বাড়ির সবাই কি ভয় করে! বাবা আবার এখানে আমাকে রেখেই বলে গেছেন—"প্রাইভেট মাষ্টার আর রাখা হবে না—কাকার কাছেই পড়তে হবে তোমার।" অবস্থাটা যে কি পরিমাণ সঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে সেটা তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারব না, ভাই কল্‌কাতা! প্রাইভেট টিউটারের কাছে "মা ডাক্‌চেন" বলে ভিতরে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দিয়ে আসা চলত। এখানে কিছু বলতে গেলেই—কাকা ডাক দিবেন—"বৌদি, তুমি ভানুকে ডেকেচ নাকি?" তারপর যদি একটা মারাত্মক ভুল কিছু করে বসি (মানুষের পক্ষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক—মানুষ অভ্রান্ত নয়—এই তো বইতে পড়ি)—কাকা অমনি মাকে ডাক দিবেন—"বৌদি, শুনেছ তোমার ছেলের কাণ্ড!" আমি তখন বলি মনে মনে—"হে ধরিত্রি! সীতার ন্যায় তুমিও আমাকে গ্রহণ কর!—যাক এসব ভূগোল—অঙ্ক শেষ হয়ে এক নিমিষে।" আর নয়তো ভাবি, হায়! কাকার দল পৃথিবীতে জন্ম নেয় কেন? কাকারা না থাকলে পৃথিবীটা কি সুখেরই না হ'ত।

কাকার হচ্ছে সব কাজে সময় বাঁধা—তাতেই বাড়ে আমার আরও ধাঁধা। যদি বলি—"কাকা, স্নানের সময় হয়েছে", কাকা বলবেন—"মোটে সাড়ে নয়টা, আরও আধঘণ্টা বেশ পড়া চলবে।" ভয় হয়, উঠতে পারিনে'—উঠলেই কাকা দিবেন কানটি কসে মলে। ঘড়ির দিকে তাকাই, কাকার দিকে তাকাই, বাজে দশটা।

স্নানের সময়ও বাঁধা—কাকা বলেন বেশী ডুবালে হবে জ্বর—তাতেই বাড়ে আমার ডর। দু'তিনটা ডুব দিয়ে উঠে পড়ি বুড়িগঙ্গার জলে।

কোনও রকমে ছুটি স্কুলের দিকে।

এখানকার মাষ্টার মশায়দের কথা কি আর বল্‌ব! এক একজনের হাতে বেত—নয়তো এক একখানা শ্যাম-চিমটি। কি যে সাতটা পিরিয়ড—কাটেই না! ছেলেগুলো আবার তেমনি হতচ্ছাড়া নচ্ছারের দল। দেখলেই ব'লবে ঃ—

আসুন ইভাকু, বসুন ইভাকু
এনে দিই, পান গুবাকু।

অতিষ্ঠ হ'য়ে গেল প্রাণ!

একটু যা আনন্দ আছে একমাত্র খেলার মাঠটায়। সুধীনবাবু, ড্রইং মাষ্টার আনোয়ার সাহেব, ভালওবাসেন আমাদের সবাইকে খুব। রোজই খেলেন আমাদের সঙ্গে—তাতেই সন্ধ্যাটা আসে যেন দ্রুত চলি।

রাত্তিরে আরম্ভ হয় কাকার কাছে তপস্যা। কাকা যতই পড়াতে চেষ্টা করেন—আমার চোখ ততই করে আমায় ছলনা। সর্ষে তৈল, পিপারমেণ্ট কিছুতেই কুলোয় না—আমি বসে বসে টোপ গিলতে থাকি!

আমার এ শোকের কাহিনী তুমিও হয়তো বুঝবে না—জানবে না আমার প্রাণে কী মর্ম্মন্তুদ আঘাত পেয়ে আজ এই অশ্রু-নির্ঝর বেরিয়ে আসছে, অথচ এখনও তুমি তেমনই হাস্‌চ!.........................

চিঠিখানা শ্রীমান্ যে আর শেষ করতে পারেনি একথা বলাই বাহুল্য।

এর পরের ইতিহাস আরও করুণ!

কাকা অতি নিদারুণরূপে শ্রীমানের কর্ণদ্বয়ে তার হস্তবল পরীক্ষা করলেন এবং ছন্দ করেও বল্লেন—

"উঠ বৎস, কর তব শোক পরিহার
বীরশোক অশ্রু নহে কলমের ধার!"

তোমরা কেউ ভানুর ব্যথায় সমব্যথী আছ কি?—

খেলাধূলা

বেটন্ কাপ প্রতিযোগিতা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

কলিকাতার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে খুব বড় বড় খেলাও বেশ জম্‌তে পাচ্ছে না। আদ্ধেক লোকতো আগেই পালিয়ে গেছে; কাজেই একটা বড় প্রতিযোগিতায় সারা কলিকাতায় যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ত, এবার তা বড্ড কম। এই অবস্থার মধ্যে এবারকার হকি খেলা শেষ হ'ল।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হকি-প্রতিযোগিতা বেটন্ কাপের ফাইনাল গত ২৫শে এপ্রিল শেষ হ'য়ে গেছে। কলিকাতার হকি-লিগের দলগুলিই প্রধানতঃ এবারকার বেটন্ কাপ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। এবারকার এই দলগুলির মধ্যে কাষ্টম্‌স্, বি. এন্. আর., রেঞ্জার্স, মিলিটারী মেডিক্যাল্‌স্ ও পোর্ট কমিশনার দলই খুব শক্তিশালী ছিল। কাষ্টম্‌স্ দল হকি-লিগ্ ও বেটন্ কাপ অন্য যে কোন দলের চেয়ে ঢের বেশীবার জয় ক'রে হকি খেলায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে; কিন্তু এই দুর্দ্ধর্ষ কাষ্টম্‌স্ দলই এবার সেমি-ফাইনালে হেরে গেল রেঞ্জার্স দলের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে ২—০ গোলে। এদিকে বি. এন্. আর. সেমি-ফাইনালে মিলিটারী মেডিক্যাল্‌স্ দলকে অতি সহজেই হারালে ৩ গোলে। রেঞ্জার্সের সঙ্গে বি. এন্. আর. দলের ফাইনাল খেলা হয়। সকলেই মনে করেছিল যে, বি এন্. আর. অতি সহজেই এবার বেটন্ কাপ বিজয়ী হবে, কারণ এই দলে ট্যাপ্‌সেল ও আর. কার প্রভৃতি অলিম্পিক্ হকি খেলোয়াড় রয়েছেন। ভারতবর্ষের যে হকিদল পৃথিবীর সকল দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে বিশ্ব-বিজয়ী হয়েছেন, এই দু'জন সেই টিমের খেলোয়াড়।

খেলার প্রথম দিকেই অনেকটা অতর্কিতভাবে রেঞ্জার্স্ ফাঁকতালায় এক গোল দিয়ে ফেলে। এরপর রেলদল রেঞ্জার্স্ দলকে সর্বক্ষণ কোণঠাসা ক'রে রাখে। রেঞ্জার্সের গোলরক্ষক ফেরিস্ সেদিন অসংখ্য অব্যর্থ গোল যে ভাবে বাঁচিয়েছেন তাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। এরকম গোল-বাঁচানো সচরাচর দেখা যায় না। রেলদল সর্বক্ষণ চেপে খেলার ফলেই খেলার শেষ সময়ে রেঞ্জার্স দল ফাঁকতালায় আর একটি গোল দেয়। এমনি ক'রে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই এবার রেঞ্জার্স্ দল বেটন্ কাপ বিজয়ী হয়েছে।

এর পূর্বেও রেঞ্জার্স্ দল বেটন্ কাপ বিজয়ী হয়েছিল ১৮৯৫, ১৮৯৬, ১৮৯৯, ১৯১১, ১৯১৩, ১৯১৫, ১৯১৭ এবং ১৯৩৪ সালে। এই কৃতিত্বের তুলনাই কি সহজে মিলে?

এবার কলিকাতায় ফুটবল লিগের খেলা সুরু হবে। তোমরাও অন্য যে কোনও খেলার চেয়ে ফুটবল খেলার বিবরণটাই ভালবাস বেশী। এরপর থেকে ফুটবলের বিবরণই তোমরা পাবে।

—আমাদের কথা—

যুদ্ধ আজ আমাদের দরজায় আসিয়া হানা দিয়াছে। কয়েক মাস যাবৎ কলিকাতা থেকে অনবরত লোক মফস্বলে চলিয়া যাইতেছে। শিশুসাথীর যে সকল পাঠক-পাঠিকা কলিকাতায় ছিলেন, তাহাদের অনেকেই আজ কলিকাতায় নাই। আমরাও জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শিশুসাথীর কার্য্যালয় ঢাকায় সরাইয়া আনিয়াছি। এখন হইতে শিশুসাথী ঢাকার আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত হইবে এবং ইহার কার্য্যালয় হইবে **৩।৮নং জনসন্ রোড, ঢাকা**। এখন হইতে শিশুসাথীর গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং লেখক-লেখিকা আমাদের ঢাকার ঠিকানায় চিঠি-পত্র লিখিবেন এবং প্রবন্ধাদি পাঠাইবেন।

সিঙ্গাপুর, মালয়, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মদেশের বহু স্থান আজ শত্রুর কবলে পড়িয়াছে। এই সকল স্থানে শিশুসাথীর অনেক পাঠক-পাঠিকা ও লেখক-লেখিকা ছিলেন। তাঁহাদের এই অশেষ দুঃখ ও বিপদে আমরা গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। প্রবাস হইতে বাঙ্‌লা মায়ের শ্যামল কোলে ফিরিয়া তাঁহারা যেন স্বাস্থ্য, সম্পদ্ ও শান্তি লাভ করেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

আমাদের আশা আছে, শিশুসাথীর কার্য্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন হইলেও পাঠক-পাঠিকা ও লেখক-লেখিকাগণের অযাচিত অনুগ্রহে শিশুসাথীর উত্তরোত্তর উন্নতিই হইতে থাকিবে। শিশুসাথীকে সর্ব্বরকমে সুন্দর, সুললিত ও সুপাঠ্য করিয়া তোলাই হইবে আমাদের একমাত্র সাধনা।

শিশুসাথীর প্রতি শিশুদের সত্যিকার দরদ ও প্রাণের টান আছে বলিয়াই, কাগজ ও কালির এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে এবং দেশের এই ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আমরা পূর্ব্ব মূল্যে নির্দ্দিষ্ট মাস-পয়লায় শিশুসাথীকে তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি। শিশুসাথীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

যে সকল কৃতী লেখক-লেখিকার সাহায্যে শিশুসাথী আজ শিশুদের মনোরঞ্জন করিতেছে, তাহাদের কাছে আমরা বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আমাদের নূতন কার্য্যালয়ের ঠিকানায় তাঁহাদের লেখা পাঠাইয়া দিয়া, শিশুসাথীকে আরো বেশি সুন্দর, আরো বেশি মনোরম করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন।

আত্মোৎসর্গ

শ্রীহরেকৃষ্ণ অধিকারী

ফুলবনে ফোটে ফুল থরে বিথরে
গন্ধ বিলায় নিতি আজীবন ভ'রে।
দিয়ে যায় অন্যেরে সবটুকু প্রাণ,
কভু নাহি চায় তবু তার প্রতিদান।
জীবন-সাধনা তার করিছে সফল—
আপনা বিলায়ে পরে—পুলকে বিহ্বল।
ফুল সম ফুটে রও প্রিয় শিশুগণ—
সুষমায় ভ'রে দাও বিশ্ব-কানন!

গল্প প্রতিযোগিতা

এই মাসের শিশুসাথীর মুখপত্রে যে ছবি আছে তাহাতে দৃশ্যগুলি পর পর সাজান নাই—ইতস্ততঃ দেওয়া আছে। দৃশ্যগুলি পর পর সাজাইয়া সেগুলি দেখিয়া একটি গল্প লিখিতে হইবে।

গল্প লেখার নিয়মাবলী

(১) কেবল শিশুসাথীর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ গল্প লিখিতে পারিবেন।

(২) গল্পের শেষে লেখক বা লেখিকার পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও **গ্রাহক-নম্বর** উল্লেখ পূর্ব্বক উহা **৩০শে আষাঢ়** তারিখের মধ্যে **শিশুসাথী কার্য্যালয়, ৩।৮নং জনসন্ রোড, ঢাকা**—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

(৩) গল্পটি যেন শিশুসাথীর চারি পৃষ্ঠার মধ্যে ছাপান যাইতে পারে সে ভাবে লিখিতে হইবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা চলিবে না।

দ্রষ্টব্য :—শিশুসাথীর **গ্রাহকদের** লিখিত গল্পের মধ্যে যে দুইজনের লেখা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে যথাক্রমে ৩৲ টাকা ও ২৲ টাকা মূল্যের পুস্তক এবং **গ্রাহিকাদের** মধ্যে যে দুইজনের লেখা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকেও অনুরূপ মূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গত মাসের ধাঁধাঁর উত্তর

১। ক। ২। চাঁদপুর, (দৌলতপুর, শান্তিপুর) ; ঢাকা ও পাবনা।

উত্তরদাতাদিগের নাম

তরুণ, তাপস, অসিত, বকু, ছকু ও উষা, ফরিদপুর ; দেবীপ্রসাদ মুখার্জ্জি, বেলফুলিয়া ; খোকন, অনু, টুকু, বলাই, কানাই ও মীরু, কল্যাণপুর ; শান্তি, শিশির, সনৎ ও বেলু, ভাগলপুর , দ্বারিকানাথ মিত্র, বর্দ্ধমান ; শিশির, শেফালী, সমীর, পবিত্র ও পুরবী, পাটনা ; ইন্দু, বিশ্বনাথ, শানু, শান্তি, সুশীল, শচী, বরুণ, মুঙ্গের ; অলকা বসু, পাটনা ; শ্রীলেখা মজুমদার, দ্বারভাঙ্গা ; সুহাস, ভুঁদু, তকাই, কল্যাণী, এমু, জুবিলী, বুড়ী, দুর্গা, গোপাল, জগাই, মাধাই ও আরতি, নতিবপুর ; নীলিমা, মণিকা, সাধন, প্রভাত, ডলু, মঞ্জু, মুকুল, শুভ্রা, বিটলভাই, গৌতম, তেজপুর ; মনীশ রায় ও ধ্রুবজ্যোতি দাশগুপ্ত, মাণিকগঞ্জ ; পূর্ণিমা রায় মিত্র, বর্দ্ধমান ; অজিত দাশগুপ্ত, ময়মনসিংহ ; হৃষীকেশ কর, দাঁতন ; রাধারাণী বসু, বারিপদা ; সবিতা, স্নেহলতা, ফণিভূষণ, ইন্দুভূষণ, বিভূতিভূষণ, শিবপুর ; মঞ্জু, তৃপ্তি, সুকু, খুকু, মুক্তি, মলিনা, মিত্রা, রাখাল, গোপাল, শ্যামল, অশোক, সাধনা, তাপস, অর্চ্চনা, তপন, তরুণ, রেণু, অলোক, সন্ত, বৈদ্যনাথ, আদিত্য, মাণিক, পবিত্র ও দীপু, রাজসাহী ; রবি, নানু, বিনু, ডলু, মাঞ্জু, বাবলু, পরিমল ও নন্দিতা, লাহোর ; তেজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পিংনা ; গোপালকৃষ্ণ বসু, কলিকাতা ; গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর ; সুনীল, রাণু, পিন্টু, বুবু, খুকু, হাবলু, পাকু, ছাকু, কানু, বুলু, ময়মনসিংহ ; গৌরচন্দ্র বিশ্বাস, হীরেন্দ্র রায়, দীনেশ, শুকদেব, কানাই, নিতাই, চৈতন্য, বলাই ও উপেন, উলপুর ; পান্না ও অণিমা সেন, একদুয়ারিয়া ; কবিতা, নমিতা, সবিতা, শীলা, সুনীল, সুভাষ, অজিত, অসীম, অনিল ও সুধাকর, কটক ; গালিমপুর টি. সি. এম. ই. স্কুলের জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার সভ্যবৃন্দ; চিন্তাহরণ মালো, ভাঙ্গা ; মঞ্জুলা স্যানাল, রাঁচি ; অণিমা ঘোষ, লক্ষ্ণৌ ; গীতা বসু, ২০২০২ গ্রাহক ; মধু, সিদু, শক্তি, শ্যামা, তারা, সুধীর, অসিত, আহম্মদ, ছোটবৈনান ; অমল মিত্র, গৌহাটী ; শেফালী, গীতা, ছবি, উমা, অণিমা, বোয়ালমারী ; নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিহার গবর্ণরের ক্যাম্প (রাঁচি) ; চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামপুর ; সবিতারাণী ও সুব্রত মজুমদার, মধুপুর ; গৌরীরাণী দেবী, মুঙ্গের ; কুমারী আভা ও ইভা মুখার্জ্জী, দিলীপ মুখার্জ্জী, বেরেলী ; লক্ষ্মীনারায়ণ, নির্ম্মলাবালা, অনিল, সাবিত্রী, কানাইলাল, সত্যনারায়ণ, অজিত, সুধীর, অধীর, সন্তোষ, তপন, প্রভাত, নীহারবালা, ইলারাণী, ছবিরাণী, নির্ম্মল, বিমলেন্দু, অমলেন্দু, শ্যামসুন্দর, হরিপদ, ভীমপদ, মতিলাল, সুশীল, চিত্তরঞ্জন ও কালীপদ, পোদ্দারডিহি ; মিহির, তাতা, হেলেন, মাণিক, মিলন, জহর, তিনু, মিনু, বাচচ ও মট, কুড়ালী ; অজিতকুমার মণ্ডল, মুকুন্দপুর ; সুনীতি, হিমাংশু ও মিনতি, খড়দহ ; রবীন্দ্র, দেবেন্দ্র, রতন, অর্জ্জুন, অক্ষয়, পশুপতি, তারাগুণিয়া ; সোনা, শচীন, ফুলটুস, দিলীপ, তাতাই, দেবীরাণী দেবী, বড়বাজার থানা,—কলিকাতা ; প্রদীপকুমার রাহা, কালনা ; অশোক ও গায়ত্রী মজুমদার, ১৫৯৭২নং গ্রাহক ; মৃণাল, শরদিন্দু, সুকুমার ও কাজল, দার্জ্জিলিং ; আলোরাণী দেবী, কটকস্থল ;

বীরেশ্বরী লাহিড়ী, পূর্ব্বধলা; রউফ উদ্দিন, জিয়াউদ্দিন, আলতাফ উদ্দিন, হাসি, মায়া, ছায়া, মোসারফ, নূরজামান, ধুবড়ি; রত্না ঘোষ, ঢাকা; রাজেন্দ্রনাথ সেন, বোদা; বিপিন, খোকন, কঁহরী, বেবী, বিজন ও রেণুকা গুপ্তা, চুঁচুড়া; গীতুন, ছায়া, তন্দ্রা, ও মুকুল, হলুদবাড়ী; সঞ্জয়, নীলিমা, ইলা, প্রবীর, হরেন্দ্র, মীরা, যাদু, বীণাপাণি, মোক্ষদা মজুমদার, কুরুমগ্রাম; সৌরীন্দ্র চৌধুরী, ঈশ্বরগঞ্জ; বিমলেন্দু, অমলেন্দু, প্রতিভা, সবিতা, অনিল, সুনীল, অণিমা, দুর্গেশনন্দিনী, সাধু, নির্ম্মলেন্দু, চাঁদু, সুকুমারী, কুরুমগ্রাম; অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা; নির্ম্মাল্যপ্রসাদ রায়, মাণিকগঞ্জ; কুমারী গীতা পাল, কলিকাতা; তারাদেবী, গীতা, ইরা, গায়ত্রী, বাণী, কৃষ্ণানন্দ, বৈশম্পায়ন, সর্ব্বানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য্য, নবদ্বীপ; শঙ্করপ্রসাদ চন্দ্র, ১৪০৩৮নং গ্রাহক; অরুণা মিত্র, বাঁকুড়া; অনিলাবালা দেবী, অভয়াপুরী; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রবৃন্দ, রামচন্দ্রপুর; বিমান ও বিধান, অভয়াপুরী; করুণা ব্রহ্মচারী, বগুড়া; ইল্লী পোঁ, লাগডুম চোঁ, আঁকু পাঁ বিল্লীগাঁ, দার্জ্জিলিং; রেণু, উষা, সাবিতা, নিভা, সন্তু, মুঙ্গের; বিনয়েন্দ্র, গৌরী, কানু, ভানু, বেণু, ইনু, শুভু, মনু, মঞ্জু, ফণী ও মণ্টু, অভয়াপুরী; লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী, রাণু ও সবিতা, মালদহ; রাণু, ছবি, আদিত্য, মণ্ট, পিণ্টু, নন্তু, রডা ও তারা, বর্দ্ধমান; গৌরী, উমা, সতী, প্রতিমা, বিশ্বতোষ, দেবীতোষ, মীরা, পিপু, তৃপ্তিময়, পূরবী ও কুমারী গীতা রায়, এলাসীন; সন্ধ্যারাণী ও গীতারাণী ঘটব, খুমটাই টি ষ্টেট; বাবু, মণ্টু, সোমেন, সাধন সান্যাল, ঝরিয়া; কুমারী উমা, প্রতিমা, গৌরী ও কল্যাণী, কালীঘাট; অমিয়, মৃগাঙ্ক, বেবী, নীলিমা, লক্ষ্মী, অণিমা, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বেনারস; প্রমোদরঞ্জন বর্ম্মন, বড়খলা; চেরাগ আলি, কমলপুর; অসমঞ্জ, মীনা, ছন্দা ও সুজাতা প্রামাণিক, শান্তিপুর; কামাখ্যাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ১৭৫১৭নং গ্রাহক; বিভু, কিশু, কপিল, মিণ্টু ও কালী, পাবনা; গোবিন্দ, ভগবানশরণ, রাম, লক্ষ্মণ, বাসুদেব, বলদেব, রঘুনাথ, নারায়ণদাস, ঢাকা; বিধুভূষণ সরকার, আবুল হোসেন মিয়া, রাজৈর; সেকেন্দার আলী সিকদার, আজাহার উদ্দিন সিকদার ও মেহেরুন্নেছা, আলমদস্তার; চেরাক আলী, সরদার কুঠিবাড়ী; রাইমোহন সাহা, মাফিজ শেখ, রাজৈর; জগদীশচন্দ্র দে, কলিকাতা; শেখ কুতুবুদ্দিন, এনায়েৎপুর; দীপ্তিময় লাহিড়ী, জ্যোতি, ডলি, সুবীর, গৌতম, শঙ্কর, চন্দন, মীরা, রুবি, প্রতিভা, গগন, সতু, উতু, হাবলা ও মুকুল, সাহেবগঞ্জ; রুবী ও ভণ্টু বাবু, সাতালী চা বাগান; ছায়া মিত্র, বহুবাজার; সোমনাথ বাগচী, ১৯৫৭৭নং গ্রাহক; সবিতা, আশীষ ও নমিতা আইচ, মহিশাদল; বিজন, পরেশ, শম্ভু, দেবেন, চৈতন্য, চন্দ্র, হরেন, নলিনাক্ষ, বীরেন, অজিত, মাধব ও অনন্ত, নারায়ণগড় রাজা হৃষীকেশ লাহা মধ্যইং স্কুল।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Sankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

Misses Neelaa & Bella Dutt

একবিংশ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৪৯ ৩য় সংখ্যা

বাদ্‌লা দিনে

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, পুরাণরত্ন

আজ সারাদিন বাদল ঝরে
ঝর্‌ঝরা ঝর্‌ ঝর্‌।
হাসলো নাকো নিমেষ-তরে
নিঠুর দিবাকর।

মেঘের পরে মেঘ ঝেঁপেছে,
বাদ্‌লা হাওয়া তাই ক্ষেপেছে,
সকাল হ'তে জল ছুটেছে
তর্‌তরা তর্‌ তর্‌।
আজ সারাদিন বাদল ঝরে
ঝর্‌ঝরা ঝর্‌ ঝর্‌।

পুকুর-বিলে জল ধরে না,
পথিক আজি পথ চলে না,
কাজ্‌লা মেঘে ডাকছে ঘন
কড়্‌কড়া কড়্‌ কড়্‌
আজ সারাদিন বাদল ঝরে
ঝর্‌ঝরা ঝর্‌ ঝর্‌।

দু'চোখে আজ ঘুম ধরেছে,
দুষ্টু ছেলে চুপ করেছে ;
ঘরের কোণে ওই কেঁপেছে
থর্‌থরা থর্‌ থর্‌।
আজ সারাদিন বাদল ঝরে
ঝর্‌ঝরা ঝর্‌ ঝর্‌।

লাখ দাদুরী প্রাণ পেয়েছে,
কণ্ঠে আজি গান এয়েছে ;
সেই গানেতে ঘুম নেমেছে
আমার আঁখির 'পর।
আজ সারাদিন বাদল ঝরে
ঝর্‌ঝরা ঝর্‌ ঝর্‌।

মা

শ্রীঅশ্বিনীকুমার শর্ম্মা

(১)

পাঞ্জাবী মেয়ে, বহুদিন বাংলাদেশের পল্লীতে থাকায় চেহারাখানা বাঙালী-ঘেষা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম ; পরনে ঘাগরা, তার উপর উত্তরীয়—মোটা কাপড়, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পিঁজরাপোল থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে সে হাওড়া স্টেশন পর্য্যন্ত ভোর সাড়ে ছয়টায়। খালি পা—পৌষ মাসের হিমে আর পথের কাঁকরে মিলে আঙ্গুলের ডগাগুলোকে রক্তিম ক'রে তুলেছে। হাতে একটি খাবারের ঝুড়ি, একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা।

স্টেশনের কাছে আসতেই খেলে সে দরোয়ানের ধমক—"সাবধান! লাইন পার হ'তে যেয়ো না ; এক্‌খুনি গাড়ী চাপা পড়বে।"

থতমত খেয়ে সে বললে—"আমি ত লাইন পার হ'তে যাচ্ছিনে বাবা! অনেকদূর থেকে এসেছি, ইস্টিশনে ঢুকতে চাই। আমার ছেলে আসচে বোম্বে মেলে। একমাত্র সন্তান সে আমার। মানুষটি মারা গেল তাকে কোলে রেখে। বিধবা মানুষ, পরের চাকরি ক'রে তাকে মানুষ করেছি। আজ পনের বছর সে কেপ্‌ টুনে বড় সাহেবের আর্দালী। বড় সাহেব ত মারা গেল বুয়রদের সাথে লড়াই লেগে। সে ফিরে

আসচে মায়ের কাছে। সে ছাড়া ত কেউ নেই আমার সংসারে। আজ বোম্বে মেলে সে এসে পৌঁছুবে।"

গ্রাম্য মায়ের সরল কাহিনীতে রেলওয়ে স্টেশনের এত বড় দরোয়ানের কান দেবার অবসর কোথায়? শুধু সে স্টেশনের গেইটটা দেখিয়ে দিয়ে আপন কাজে চ'লে গেল।

স্টেশনে সে চেয়ে দেখলে—প্রতীক্ষা-ঘর, আপিস ঘর, চায়ের দোকান; ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল কারও কারও কাছে; শুধালে—"হাঁগা! আপনারা কেউ আমার মতিলালকে দেখেছেন? লম্বা ছিপ্‌ছিপে সুন্দরপানা ছেলেটি। কোঁকড়া চুল, টঙ্‌টঙে নাক, ডাগর চোখ, কপালে একটা কাটার দাগ। আজ বোম্বে মেলে তার আসবার কথা।"

অনেকেই তার কথার জবাব দিলে না; হয়ত দেওয়ার প্রয়োজনও দেখলে না। কেউ কেউ দরদ দেখিয়ে মৃদু হেসে বললে—"বোম্বে মেল ত এখনও এসে পৌঁছয়নি!"

সকলের চাইতে বেশী দরদ দেখালে যে, সে একটি বুড়ো কাশ্মিরী বামুন। তার গাড়ী সন্ধ্যার পর; তাই সারাদিন তাকে স্টেশনে ব'সে কাটাতে হবে। পাঞ্জাবী মেয়েটিকে সে তার বেঞ্চির একপাশে বসতে ব'লে তার কথাবার্ত্তায় মন দিলে;—তবু ত সময়টা কেটে যাবে।

ধুঁয়া উড়িয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, বোম্বে মেল প্ল্যাট্‌ফর্মের পাশে এসে দাঁড়াল। বিধবা মা টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে গাড়ীর প্রত্যেকটি কামরার দিকে চাইতে লাগল। নেমে এল অনেক লোক; কিন্তু কই, তার ছেলেকে ত দেখা যায় না।

কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ দয়ার্দ্র হয়ে বললেন—"হয়ত বা দিল্লী হয়ে আসচে তুফান মেলে।"

—"সে কখন আসবে?"

—"রাত দশটার আগে না। তুমি ততক্ষণে বাড়ী যাও। ধীরে সুস্থে খেয়ে-দেয়ে আসবে সন্ধ্যার একটু পরেই।"

মা বললে—"না! আর খাওয়া-দাওয়া হবে না। এখানে ব'সেই অপেক্ষা করব। একবার গেলে যদি বা ফিরে আসতে দেরী হয়। আমাকে এখানে দেখতে না পেলে তার কি দুঃখটাই হবে, ভেবে দেখুন ত! দেশে ফিরে আসচে সে পনের বছরের পর!"

ব'সে পড়ল আবার দু'জনাতে সেই বেঞ্চিখানার উপর। মা বলতে লাগল তার ছেলের কাহিনী :—মতিলালের বাবা সেপাই ছিল; তার হাতে পায়ে তিনটা, আর বুকে ছিল দুইটা গুলির দাগ। অই দাগগুলো দেখেই সে তাকে ভালবেসেছিল। বিয়ের পর সৈনিকের কাজ থেকে অবসর নিয়ে সে আসে কলিকাতা এক রাজবাড়ীর দরোয়ান হয়ে। এখানে মতিলালের জন্ম হয়। রাজাবাবু জন্মের সময় তাকে একখানা সোনার ঝিনুক উপহার দিয়েছিলেন। যত্ন ক'রে এখনও সেখানা সে বুকের কলিজার মত রক্ষা ক'রে আসচে। আজকার দুর্দ্দিনে যখন এবেলা খেলে ওবেলা খাবার নেই, তখনও ঝিনুকখানা বেচে ফেলবার প্রশ্নও তার মনে ওঠেনি। রাজাবাবুদের সুপারিশেই মতিলাল সরকারের সেপাই হয়—তার পর নিজের গুণে অল্পবয়সেই সুবেদার হয়ে যায়। মণিপুরের যুদ্ধে তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল বন্দুকের গুলি লেগে। সেই অবধি সে বড় সাহেবের আর্দালী।—এমনি আরও কত কথা!

সময় চ'লে যায়। অবশেষে ব্রাহ্মণটি বললেন—"এস, কিছু খাওয়া যাক।"

সে বললে—"আপনি খান। আমার ত ক্ষিধে নেই। ছেলে এসে পৌঁছুলে তার সঙ্গে একত্তরে খাব'খন। খাবার আমার ঝুড়িতেও প্রচুর আছে। ছেলের জন্যই এনেছি। পণ্ডিতজীর যদি আপত্তি না থাকে, তিনজনে ভাগ ক'রে খাব। অবশ্য, যদি সে আসে।"

পণ্ডিতজী ভরসা দিয়ে বললেন—"আসবে বই কি! হয়ত কোন কারণে এদিককার গাড়ী ধরতে পারেনি; তুফান মেলে নিশ্চয়ই আসবে।"

(২)

যাত্রীরা কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে; কেউ কেউ কোন গাড়ীর প্রতীক্ষা করছে।

একটা দুটা ছোট গাড়ী এল। প্রত্যেকবার মা তাদের বাঁশী শুনে চমকে উঠল—টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। শেষখানা চ'লে গেলে সে স্টেশন-মাষ্টারের কাছে গিয়ে সাহস ক'রে বললে—"অপরাধ নেবেন না; কখন আসবে সে?"

"কখন কে আসবে?"—স্টেশন-মাষ্টার শুধালে।

—"আমার ছেলে—কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না।"

—"জানি না-ই ত। কোত্থেকে আসবে?"

—"কেপ্ টুন থেকে।"

—"কেপ্ টুন—?"

—"হ্যাঁ—অই যে আফ্রিকা মুল্লুকে—"

—"ও! কেপটাউন বুঝি? সে ত আসবে বোম্বে থেকে গাড়ীতে। সকালের গাড়ী হয়ত ধরতে পারেনি। রাত এগারোটাতে যে গাড়ী এসে পৌঁছুবে, তাতে খোঁজ ক'রো।"

—"আর আজ যদি না আসে, কাল কখন আসবে?"

"বোম্বে মেল ত রোজ একই সময়ে আসে।"—ব'লে স্টেশন-মাষ্টার চ'লে গেল।

পৌষের দিন, দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ঘড়িতে একটা বেজে গেল। কাশ্মিরী বামুন বললেন—"এস মা, খানিকটা খেয়ে নেওয়া যাক। আমার কাছে দু'জনার পক্ষে যথেষ্ট খাবার আছে।"

কিন্তু ছেলের দেখা না পেয়ে মা খায় কি ক'রে?—আজ পনের বছর পরে ছেলে আসচে মায়ের বুকে!

বামুন খায়। মা ব'সে থাকে ধূসর অনুজ্জ্বল আকাশের দিকে চেয়ে।

ঝুড়ির ভিতর থেকে একটা সন্দেশ বের ক'রে পণ্ডিতজী বললেন—"নেও মা, এ বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। মুখে দিয়ে এক চুমুক জল পান কর।"

বিধবা এককণা নম্রহাসি হাসলে। হিন্দুর মেয়ে, প্রসাদ না নিয়ে পারে না। খেতে খেতে বললে—"পরের গাড়ীটা বুঝি রাত্রি এগারোটাতে।"

—"হ্যাঁ। কিন্তু পনের বছর—সে ত অনেক কাল! তোমার ছেলের চেহারা হয়ত একদম বদ্‌লে গেছে।"

"বদ্‌লে গেছে!"—মা চম্‌কে উঠল। সে ত কখনও তা ভাবেনি। ছেলে যে একই রূপে মায়ের চোখে ফুটে আছে—সেই হাল্কা সুন্দরপানা কিশোর!—কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, কপালে কাটার দাগ।—ছেলের নূতন চেহারা মা ভাবতে চেষ্টা করে।

"একখানা রুটি খেয়ে নাও মা!"—ব্রাহ্মণ আবার জেদ করলেন।

কিন্তু সে আবার ছেলের কথা সুরু করল:—"বেশ ছেলে; স্বভাবটি ভাল। লেখাপড়া একেবারে শেখেনি, কেউ বলতে পারবে না। বন্দুক ধরতে বাপ্‌কা বেটা! তবু পেট-মারা, হাল্কা। এবার ফিরে এলে দেশের হাওয়ায় হয়ত শরীরটা একটু শোধরাবে।"

—"হয়ত টাকাকড়ি কিছুটা সঙ্গে আনবে।"

—"এক পয়সা আনলেই মন্দ কি? যার কিছু নেই, তার এক পয়সাই লাখ টাকা।"

টুন্ টুন্ ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও লাফিয়ে উঠল; তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"এ কি বোম্বের গাড়ী?"

শুনে একদল ছেলে হি-হি ক'রে হেসেই খুন। বামুনও মৃদু হেসে বললেন—"এখনও যে চারটাও বাজেনি মা! গাড়ী রাত এগারোটাতে।"

(৩)

অপরাহ্ণও কেটে গেল। কাশ্মিরী বামুন ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়লেন বেঞ্চির উপর; মা চেয়ে রইল রেল-সমুদ্রের উপর দিয়ে। তার দু'চোখ যেন পৌষের কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি ভেদ ক'রে দেখতে চায়—কোথায় কোন্ সুদূরে একটা আগুনের দৃষ্টি মেলে তুফান মেল চ'লে আসছে হুস্-হুস্ ক'রে তার কোঁকড়া-চুল ডাগর-চোখ ছেলেটিকে নিয়ে।

স্টেশনের আলো জ্বলল। লক্ষ্ণৌর গাড়ী এল বাঁশী ফুঁকতে ফুঁকতে। একজন যাত্রীর কাছে এগিয়ে গিয়ে মা শুধালে—"তুফান মেল ক'টায় বাবা?"

—"এগারোটায়। স'রে দাঁড়াও, পরের গাড়ী এল ব'লে।"

কাশ্মিরী বামুন বললে—"চল মা—এত ব্যস্ত হবার কি প্রয়োজন! এখনও তিন ঘণ্টা সময় আছে, অই বেঞ্চির উপর খানিক ঘুমিয়ে নেও।"

কিন্তু মার চোখ ছেলের পথ চেয়ে আছে—ঘুমের স্থান কোথায় তাতে!

অবশেষে তুফান মেল এল। পানিওয়ালার চীৎকার—যাত্রীদের কথাবার্ত্তা—ফেরিওয়ালার হাঁকডাক—'রুটি—মিঠাই—ডাব—চুরুট—খবরের কাগজ—গরম চা!'

মা তাদের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে—প্রত্যেকটি যাত্রীর মুখের পানে চায়—কোথায় সে?

আহা! হয়ত বা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে প'ড়ে আছে—ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে' গেছে!—এগাড়ীতে ত নেই; ও গাড়ীটা দেখি ত! অই যেন কার কোঁকড়া চুল দেখা যাচ্ছে—এই যে, কোথায় গেল? কোন্ দিকে নেমে পড়ল?

হঠাৎ একজন পাশ থেকে ডেকে শুধায় —"এ কি! লক্ষ্মী যে! গুজরনোয়ালার লক্ষ্মীই ত!"

লক্ষ্মী তাকায় তার মুখপানে। এ কে? মতিলাল নয় নিশ্চয়!

—"আমাকে মনে নেই লক্ষ্মী? শার্দ্দূল সিংকে?—সেই যে দু'জনাতে মিলে লড়াই লড়াই খেলতাম—তোমার বাবার ফল-বাগানে।"

—"ও শার্দ্দূল ভাই! তুমি কোত্থেকে?"

—"কেপ্‌টাউন থেকে। কি খুশীই না হলাম তোমাকে দেখে।—"

—"আমার ছেলে? সেও ত ওখান থেকেই আসচে। গাড়ী থেকে নামেনি এখনও? আমি যে সারাদিন তার জন্যে ব'সে আছি।"

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ চেপে গিয়ে শার্দ্দূল সিং বললে—"এস এস—কিছুটা খেয়ে নেই দু'জনাতে মিলে।"

—"তা খাব; কিন্তু বাবুজী আগে নেমে নিক। হয়ত সে মনে করেনি আমি আসব ব'লে। নইলে এতক্ষণে নেমে আসত। তুমি একটু এগিয়ে যাও ভাই; বল, তার মা তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।"

শার্দ্দূল সিং এদিক ওদিক চেয়ে ঢোক গিলে বললে—"তুমি তবে জান না বোন! বুয়র যুদ্ধের কালে কাফ্রিরা যখন বড় সাহেবের ডেরা ঘেরাও করেছিল, মতিলালও ছিল সেখানে। দলকে দল তখন কাটা পড়েছিল, বড় সাহেবকে বাঁচাতে গিয়ে।"

একটু কান্না ফুটল না মায়ের মুখে, একবিন্দু অশ্রু ঝরল না তার চোখে! হাতে সেই খাবারের ঝুড়ি, কাঁধে বনাতের টুক্‌রো—ত্বরিতপদে সে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল!

শার্দ্দুল সিং একবার ভাবলে, সাথে যাই। কিন্তু তার সাথে মালপত্র অনেক; তার ব্যবস্থা করবে কে?

লক্ষ্মী চলল মাথা নীচু ক'রে। স্টেশনের আলো, মানুষের কোলাহল রইল তার পেছনে প'ড়ে। মেঠো পথের কাঁটা পায়ে বিঁধতে লাগল, কিন্তু তার ব্যথা বোধ হ'ল না। আশে পাশে সামনে কত কিছু আছে, কিছুই তার চোখে পড়ল না। সে চলল—চলল—কোথায় তা সেও জানে না।

দূরে একটা গাড়ীটানা এঞ্জিন কোন্ অতীত যুগের দানবীয় ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে; তার নাক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ধুঁয়ার কুণ্ডলী পৌষের হিমঝরা আকাশের গায়ে। তার চোখ দুটা জ্বলচে দুটা আগুনের গোলার মত!

লক্ষ্মীর কিছু-না-দেখা চোখে হঠাৎ পড়ল সেই দুই গোলা—পাহাড়ী ঘোড়ার সম্মোহনী চোখের মত। তার আকর্ষণ লাগল পাগলিনীর বুকে! ছুটে চলল সে—নিশিতে পাওয়ার মত।

পরদিন ভোরে দেখা গেল রেল-লাইনের খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে এক ঝুড়ি খাবার—লুচি, সন্দেশ, আঙ্গুর, বেদানা, কমলা প'ড়ে আছে। চারদিকে কাকগুলো জড় হয়েছে। লোকজন কোথাও কেউ নেই।

পশুপাখীর জীবন-রহস্য

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম. এ.

পশুপাখীর জীবনের অনেক বিস্ময়কর রহস্যই তোমরা জান না। আজ তোমাদের এ বিষয়ে দু'-একটি কথা বল্‌ব। পাখীর মধ্যে অনেকেই যে খুব মিষ্টি গান করে তা তোমরা জান। কোকিল, বউ-কথা-কও, দোয়েল প্রভৃতি পাখীর গান তোমরা কান পেতে শোন। কিন্তু পাখীরা গান গায় কেন জান? তোমরা হয়ত বল্‌বে

তোমাদের তৃপ্তি দিতে ; কিন্তু সত্যিই সেজন্য নয়। তোমরা তৃপ্তি পাও সে ভাল কথা, কিন্তু পাখী গান গায় তার নিজের স্বার্থের জন্য। যে সকল বিজ্ঞানী প্রাণীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তাঁদের কেউ কেউ বল্‌তেন, পুরুষ-পাখীদেরই গান গাইবার ক্ষমতা থাকে, স্ত্রী-পাখীদের থাকে না। তাঁরা আরও বল্‌তেন যে, গান গেয়ে পুরুষ-পাখীরা স্ত্রী-পাখীদের মুগ্ধ করে। কোকিলের বেলায় একথাটা খুব খাটে ; কেননা পুরুষ-কোকিলই গান গাইতে পারে, স্ত্রী-কোকিল পারে না। সম্প্রতি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, অনেক পাখীর বেলা একথা মোটেই খাটে না। বিলাতে 'রবিন্' নামে এক রকম পাখী দেখা যায় ; সেই পাখীর স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই গান গাইতে পারে। বর্ত্তমানে অনেক পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পাখীর গান অনেকটা যুদ্ধের মত। পাখীরা গান গেয়ে জানিয়ে দেয় যে, যেখান থেকে তা'রা গান গাইছে সেটা তাদের অধিকৃত স্থান—সেখানে অন্য কেউ যেন না আসে ; যদি আসে তবে তা'রা যুদ্ধ না ক'রে সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়বে না।

পশুপাখীরা বিভিন্ন রঙের প্রভেদ বুঝতে পারে কিনা এ নিয়ে আজকাল নানা রকম গবেষণা চল্‌ছে। একবার বিলাতের একটি ছোট ষ্টেশনে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে মাল ভরা হচ্ছে, এমন সময় ঘোড়াটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে দিল ছুট্। সহিস বেচারী ছুট্‌তে ছুট্‌তে সঙ্গে চল্‌ল, কিন্তু কিছুতেই ঘোড়াকে বাগ মানাতে পার্‌ল না। রাস্তার লোক থেকে আরম্ভ ক'রে পুলিশম্যান অবধি হার মেনে গেল ; কিন্তু শেষে হঠাৎ হ'ল কি জান ? রাস্তার মাঝখানে লাল নীল বাতি জ্বালিয়ে পুলিশ যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা কর্‌ছিল, ঘোড়াটা হঠাৎ লাল বাতি দেখে একেবারে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ ব্যাপার নিয়ে বিলাতের পণ্ডিতদের ভেতর হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। কেউ কেউ বল্‌লেন, 'ঘোড়া নিশ্চয়ই লাল আর নীল আলোর প্রভেদ বুঝতে পারে।' আবার কেউ কেউ বল্‌লেন, 'ঘোড়া আলোর রঙের তফাৎ কখনই বুঝতে পারে না, শুধু অভ্যাস-বশে সে ঐখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।' এই শেষোক্ত মতটিকেই অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঠিক বল্‌ছেন।

বেশীর ভাগ জন্তুই কিন্তু রঙের তফাৎ বুঝতে পারে না। অবশ্য বানরজাতীয় জীবের সম্বন্ধে একথা খাটে না। রঙে রঙে প্রভেদ চিন্‌তে ওরা মানুষের মতই পটু। একটি বানরকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য তার সামনে চার রঙের চারটি কৌটা রাখা

হয়েছিল। তাদের মধ্যে যেটি লাল রঙের সেটির ভেতর খাবার রাখা হয়েছিল, বাকী তিনটিই ছিল খালি। বানরের মালিক লাল রঙের কৌটাটি খুলে বানরকে খাবার দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল বানরটি মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে লাল রঙের কৌটাটিতে হাত দিয়েছে। নিশ্চয়ই সে রঙ্ দেখে চিনে রেখেছিল, কোন্‌টিতে তার খাবার আছে। তোমরা হয়ত অনেকেই শুনেছ যে, ষাঁড় লাল রঙের কাপড় দেখ্‌লে ক্ষেপে যায়। বিজ্ঞানীরা আজকাল বল্‌ছেন যে, একথা ঠিক নয়। ষাঁড় লাল এবং কাল রঙের তফাৎই বুঝতে পারে না। কাপড় বাতাসে নড়লে যে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাই নাকি ষাঁড়ের এই উত্তেজনার কারণ—লাল রঙ্ নয়।

মাছ সম্বন্ধেও দু-একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার সম্প্রতি হয়েছে। একবার মাছের সাঁত্‌রাবার শক্তি পরীক্ষা করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, অনেক মাছেরই সাঁত্‌রাবার শক্তি অসাধারণ। 'কড্' নামে একপ্রকার মাছ ইউরোপের উত্তরে এবং আমেরিকায় প্রচুর পাওয়া যায়। তোমাদের মধ্যে অনেকেই এ মাছ থেকে তৈরী তেলের অর্থাৎ 'কড্‌লিভার অয়েলের' নাম শুনে থাক্‌বে। একবার করা হ'ল কি, অনেক কড্ মাছকে সমুদ্র থেকে তুলে তাদের গায়ে নানা রকম চিহ্ন এঁকে দিয়ে আবার তাদের সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন পরে ওদের দলের একটি মাছকে আইস্‌ল্যাণ্ড থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৫০০ মাইল সাঁত্‌রে যেতে দেখা যায়। চিংড়ি মাছেরাও বেশ্ সাঁত্‌রাতে পারে। আমেরিকায় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, তা'রা অনায়াসে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার কেটে চল্‌তে পারে।

মাছেরা কি শুন্‌তে পায়? তোমাদের কি মনে হয়? এসম্বন্ধে সম্প্রতি একটি ভারি মজার পরীক্ষা হয়ে গেছে। একটা পুকুরের কতকগুলো মাছকে খাবার দেবার আগে হুইস্‌ল্ বাজান হ'ত। দু-এক দিন পরে দেখা গেল, বাঁশীর শব্দ হ'লেই মাছেরা জলের ওপর উঠে এদিকে ওদিকে উঁকি মার্‌তে থাকে। তোমরা হয়ত বল্‌বে, যে লোকটা বাঁশী বাজাত তাকে দেখেই মাছেরা আস্‌ত। কিন্তু বাঁশী যে বাজাত সে সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিত। সুতরাং এ থেকে একমাত্র এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, মাছ শুন্‌তে পায়। অবশ্য সব মাছের সম্বন্ধে একথা খাটে না। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, মাছ শোনে কি রকমে? তার কান কই? সম্ভবতঃ মাছের কান পাখীর কানের মত মাথার ভেতর কোন জায়গায় লুকান থাকে।

শুঁয়াপোকারা শুনতে পায় কিনা বলতে পার? পায়। একটু শব্দ হ'লেই তা'রা মাথা উঁচু ক'রে শোনে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, যদি একটু জল কি একটু ধুলো তাদের শুঁয়াগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়, তা হ'লে তখনকার মত তাদের শ্রবণ-শক্তি লোপ পায়। তা'রা শোনে ওই শুঁয়াগুলো দিয়ে। বাতাসের ঢেউয়ে যে বায়ুর চাপ তৈরী হয়, তা ঐ শুঁয়াগুলোর ওপর চাপ দেয়। এই চাপে শুঁয়াগুলো শুঁয়াপোকার কাছে শব্দের বার্ত্তা বহন ক'রে থাকে। জল কিংবা ধুলো ছিটালে শুঁয়াগুলো জট্ পাকিয়ে অকেজো হয়ে যায়; এই জন্যই শুঁয়াপোকারা সে সময় শুনতে পায় না। পোকামাকড় জাতীয় অনেক প্রাণীর কিন্তু শোন্‌বার ক্ষমতা অতি প্রখর—যেমন শিংওয়ালা গঙ্গাফড়িংএর; তাদের কান তাদের সামনের পা দুটির ওপর থাকে।

খুকুর ঘুম

কুমারী সুষমা রায়, ভারতী (রাণী)

ঘুমিয়ে আছে ছোট্ট খুকু
　　　　মায়ের কোলটি ঘেসে,
সোহাগ-ভরে করছে আদর
　　　　রূপালী চাঁদ এসে।

বাতায়নের মধ্য দিয়ে
　　　　চাঁদের যাওয়া-আসা—
খুকুর সাথে মিতালি তার
　　　　কতই ভালোবাসা।

বাতাস সে যে বইছে ধীরে
　　　　ছুঁয়ে কেশের রাশি,
খুকুর কানে বলছে যেন—
　　　　"তোমায় ভালবাসি।"

মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যলাভ

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বি. এ.

[গৌতম বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন, তখন শৈশুনাগ বংশের রাজারা মগধে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের রাজাদের মধ্যে মহারাজ বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু খুব বিখ্যাত ছিলেন। এই বংশের উদয়ী নামে এক রাজা রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনায়) রাজধানী সরাইয়া আনেন। শৈশুনাগ বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করিলে পর মহাপদ্ম নন্দ নামে শূদ্রবংশের এক রাজা মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাপদ্ম নন্দ শৈশুনাগ বংশীয় রাজা মহানন্দীর শূদ্রজাতীয়া মহিষীর গর্ভজাত পুত্র। মহাপদ্ম নন্দ খুব বীর রাজা ছিলেন। তিনি মগধ রাজ্যকে এমন শক্তিশালী করিয়া তোলেন যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা পর্য্যন্ত নন্দ সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে ভরসা পায় নাই। মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যলাভ সম্বন্ধে একটি গল্প এখানে দেওয়া হইল।]

মগধের নূতন রাজধানী পাটলিপুত্র। গঙ্গা ও শোণনদ যেখানে মিশিয়াছে ঠিক সেখানেই বিশাল রাজপুরী—যেন দেবশিল্পীর নিজের হাতে গড়া, এমনই অপরূপ সুন্দর। রাজধানীতে নিত্য নূতন উৎসব-আনন্দের কোলাহল।

আজ কিন্তু নগরে কোন কোলাহল নাই। রাজপুরীর সম্মুখে রাজপথে অসম্ভব জনতা, অথচ কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই। গভীর আতঙ্কে ও শোকে সমস্ত নগর যেন আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ভারতের বুকে ইন্দ্রের অমরাবতীর মত এই পাটলিপুত্র নগর যিনি স্থাপন করিয়াছেন, সেই মহারাজ উদয়ী আজ তাঁহারই প্রিয় পরিচারকের হাতে রাজপুরীর মধ্যে নির্ম্মমভাবে নিহত হইয়াছেন। রাজ্য, সিংহাসন সব শূন্য পড়িয়া আছে। রাজবংশে এমন কেহ নাই যাহাকে সিংহাসনে বসান যাইতে পারে। তাই আজ সমস্ত রাজধানী একদিকে গভীর শোকে মগ্ন, অপর দিকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মহারাজ উদয়ীর পিতা যখন মগধের রাজা, তখন মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহে। পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন মহারাজ উদয়ী সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। আজন্ম পিতার আদরে লালিত মাতৃহীন উদয়ী পিতার মৃত্যুতে শোকে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইত, মৃত পিতার আত্মা যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে; তিনি রাজপুরীর সর্ব্বত্র পিতাকে দেখিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার কথা শুনিতেন। রাজার এইরূপ নিশিতে-পাওয়া ভাব দেখিয়া মন্ত্রীরা বড় চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা রাজধানী পরিবর্ত্তন করিবার মন্ত্রণা দিলেন।

রাজার আদেশে রাজধানীর উপযুক্ত স্থান দেখা হইল। গঙ্গা ও শোণনদ যেখানে মিশিয়াছে, সেখানে ছিল পাটলি নামে একখানা গ্রাম; সেখানে মহারাজ অজাতশত্রুর নির্ম্মিত একটা দুর্গ ছিল। সেই পাটলি গ্রামই রাজধানীর উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে সেখানে বহু যোজন ব্যাপিয়া এক বিরাট নগর স্থাপিত হইল। উদয়ী এই নগরের নাম রাখিলেন পাটলিপুত্র।

ইহার পর উদয়ী চারিদিকের রাজ্য জয় করিয়া মগধ রাজ্যকে ভারতের মধ্যে আয়তনে ধনে ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিলেন।

উদয়ী যে সকল রাজ্য জয় করেন, তাহাদের মধ্যে একটির নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। পিতৃহারা ও রাজ্যহারা তরুণ রাজকুমার আর্য্যক দুর্ব্বলের উপর প্রবলের এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। পিতার মৃত্যু আর স্বদেশের অধীনতা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল।

আর্য্যক দরিদ্রের বেশে পাটলিপুত্রে গিয়া উদয়ীর পরিচারক নিযুক্ত হইল। রাজা এই সুন্দর-কান্তি সেবকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মহারাজ উদয়ী বৌদ্ধ ছিলেন। আর্য্যকও মহারাজকে খুশী করিবার জন্য বৌদ্ধ হইল এবং কঠোর পরিশ্রম করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি শিখিয়া ফেলিল। দিনের পর দিন আর্য্যকের মুখে বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা শুনিয়া উদয়ী ক্রমে ভুলিয়াই গেলেন যে, আর্য্যক তাঁহার সাধারণ পরিচারক মাত্র।

এইরূপে উদয়ীর মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া আর্য্যক এক সুযোগে রাজাকে হত্যা করিয়া পিতৃহত্যা ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণের প্রতিহিংসা লইল। কিন্তু সে শীঘ্রই ধরা পড়িয়া গেল এবং নিজের প্রাণ দিয়া রাজহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিল।

মহারাজ উদয়ীর কোন পুত্রসন্তান বা উত্তরাধিকারী ছিল না। তাই রাজার এই অপমৃত্যুতে রাজমন্ত্রীরা বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। অনেক পরামর্শের পর তাঁহারা স্থির করিলেন, রাজার পাটহাতী যাহাকে অভিষেক করিবে, সে-ই মগধের সিংহাসন পাইবে।

পরামর্শমত মগধের মহাসেনাপতি রাজার প্রধান শ্বেত অশ্বে চড়িয়া রাজা খুঁজিতে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চলিল—নানা ভূষণে সজ্জিত শ্বেত রাজহস্তী, বিচিত্র হাওদার উপরে রাজচ্ছত্রে শোভিত রত্নমণ্ডিত স্বর্ণ-সিংহাসন; সিংহাসনের দুই পার্শ্বে শ্বেত চামর হাতে রাজার দুই প্রধানা পরিচারিকা, মাহুতের নিকট স্বর্ণকলশে অভিষেকের জন্য পবিত্র গঙ্গাজল।

এই ক্ষুদ্র মিছিলের সম্মুখে, পশ্চাতে, দুই পাশে ছুটিয়াছে কৌতূহলী জনতা। প্রত্যেকের মনের কোণেই একটু ক্ষীণ আশা উঁকি-ঝুঁকি দেয়—কি জানি, রাজহস্তী ত তাহাকেও রাজপদে বরণ করিতে পারে! রাজহস্তী কিন্তু কোন দিকেই চায় না—নিজের গৌরবে চলিয়া যায় রাজপথ বাহিয়া।

এমন সময়ে রাজপথে যাইতেছিল মহাপদ্ম। সে নন্দ নামক এক শূদ্রের ছেলে। তাহার আকৃতি-প্রকৃতি ছিল রাজারই মত, কিন্তু অবস্থা ছিল বিপরীত। শূদ্র বলিয়া সমাজে তাহার সম্মান ছিল সামান্য, অথচ তাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল প্রচুর। যেখানে নিজের অমর্য্যাদা বা অসম্মানের আভাসমাত্র পাইত, সেখানটা এড়াইয়া চলাই ছিল তাহার অভ্যাস। সকলে তাহাকে ছোট ভাবিলেও নিজেকে সে ছোট ভাবিতে পারিত না।

অত বড় জনতা আসিতেছে দেখিয়া মহাপদ্ম রাস্তার এক দূরের কোণে সরিয়া গেল। হঠাৎ রাজহস্তী সেই বিশাল জনতা ঠেলিয়া যেখানে মহাপদ্ম দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আসিল; তারপর সকলকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ করিয়া দিয়া, ভীত-ত্রস্ত মহাপদ্মকে সিংহাসনে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-অশ্বও উচ্চ হ্রেষাধ্বনি করিয়া অভিনন্দন জানাইল। মহাসেনাপতি স্বর্ণকলশের পবিত্র জল তাহার মাথায় দিলেন, পরিচারিকারা চামর ঢুলাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল জনতা 'জয়, মহারাজ মহাপদ্মের জয়!' রবে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল।

মহা সমারোহে দরিদ্র নন্দের ছেলে মহাপদ্ম মগধের সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার বংশের নাম হইল নন্দবংশ।

বনস্পতির বৈঠক

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

জ্যৈষ্ঠের পর]

বংশতরুর বক্তৃতার পর কম্পিতহৃদয়ে বেতসলতা মাথা উঁচু করিলেন। পিছন হইতে পিটুলী, ভেরেণ্ডা, শেওড়া প্রভৃতি আগাছা বলাবলি করিতে লাগিল—'ওমা! বেতসলতা নাম শুনে আমরা ভেবেছিলাম কী জানি তার রূপ!—এ যে দেখছি আমাদেরই বেত!'

কামিনীগাছ উপহাস করিয়া বলিল—'দাঁড়াবার ছিরি ছাখ-না।'

শিমুলগাছ রক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল—'চুপ্—চুপ্, সাইলেন্স!'

নবপল্লবিত বাবলাগাছ ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল—'ন্যাড়াটা বলে কি? তবু যদি গায়ে ঢ্যাবা-ঢ্যাবা কাঁটা না থাকত! ওই সাইরেণ মাইরেণ শুনলেই গা চমকে ওঠে বাবা!'

বেতসলতা বলিতে সুরু করিলেন :

'ভদ্রমহোদয়গণ! পণ্ডিত জহরলাল কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁর কারামুক্তির পর যে বক্তৃতা দেন, তা' স্মরণ করতে আপনাদের অনুরোধ করি। এই দুর্দ্দিনে দেশের শিল্পকে যদি আমরা বাঁচিয়ে না রাখতে পারি, তা' হ'লে আমাদের দুর্গতির আর অবধি থাকবে না। অবশ্য কয়লার অভাবে কাষ্ঠের জন্য আমাকে কেউ ব্যবহার কচ্ছেন না একথা সত্যি। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, কতকগুলো সহরের লোক পল্লীগ্রামে এসে কেবল আমার হত্যা সাধন ক'রেই ক্ষান্ত হননি—আগুন দিয়ে আমাকে ভস্মীভূত ক'রে ছেড়েছেন! কিন্তু আমার কি প্রয়োজন নেই?

এতদিন দেশবাসী আমার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেননি—কিন্তু এইবার কিছু বুঝতে হবে। এতদিন এই দেশে প্রয়োজন হ'লেই ভালো বেত এনেছে সিঙ্গাপুর থেকে—নিজেদের দেশে ভালো বেত তৈরীর কথা কিছুমাত্র ভাবেননি এঁরা—'

সুপারীগাছ নিজের অবস্থার অনুকূল প্রস্তাব শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—হিয়ার! হিয়ার!!'

আশশ্যাওড়া গাছ চুপি চুপি বলিল—'ছেলেবেলায় যাঁরা দিনরাত বেতের কথা ভেবেছে—বড় হয়েও তাঁরা বেতের কথা ভাববে? বাঙ্গালী সারাজীবন বেত ছাড়া আর কিছু কি ভাবতেই পারবে না? কি সর্ব্বনাশ!'

'চুপ্, চুপ্'—ছত্রপতি ছাতেন মাথা নাড়িয়া ধমক দিয়া উঠিল।

'কিন্তু এখন সে কথা ভাবতে হবে'—বেতসলতা বলিয়া যাইতে লাগিলেন : 'সহরের লোক এখন বুঝবেন ইজিচেয়ারে বসা তত সহজ নয়। কবি সত্যই বলেছেন—"পশ্চাতে ঠেলিছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" এতদিন ডোম ও বেতুয়াদের হাতে যে শিল্প ছেড়ে দিয়ে দেশবাসী নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন, আজ দুঃসময়ে তার পরিণাম বুঝতে পারবেন—কত পিছনে প'ড়ে আছেন তাঁরা!

কথায় বলে, "বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠতি কবিতা বনিতা লতা",—আমি যে বাঁশঝাড়, আম বা কাঁটাল গাছকে আশ্রয় ক'রে আছি, মানুষ সেই আশ্রয়কে অসময়ে কুঠারাঘাত ক'রে আমায় নিরাশ্রয় করছে—এর পরিণাম মানুষেরই ভোগ করতে হবে।

বাঙ্গালীর ঘর-সংসার আমাকে ছেড়ে কখনও সম্ভব? বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে তার গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি। আগে বাঁশের সঙ্গে বেতের নানারূপ লতা-পাতা-ফুলের

কারুকার্য্য দিয়ে বাংলার ঘর তৈরী হ'ত—এখন বাঙ্গালী তা ভুলে গেছে! ঘর বাঁধতে আমি, ধামা-কাঠা-পাল্লা তৈরীতে আমি। কথায় বলে, "স্পেয়ার দি কেইন এণ্ড স্পয়েল দি চাইল্ড", ছেলে ঠেঙ্গিয়ে মানুষ করতে আমি, আবার আমিই বৃদ্ধের আশ্রয় যষ্টি! শিশুকে দোলনায় শুইয়ে ঘুম পাড়াই আমি। কুমিল্লায় আমাকে দিয়ে ব্যাগ, সুটকেশ, ঝুড়ি, কত কি তৈরী হয়। কুমিল্লা জেলে তৈরী বেতের জিনিষ জাপানী জিনিষের তুলনায় কিছুমাত্র হীন নয়।

আমার পাতা দিয়ে সভাগৃহ সাজানো হয়। আমার কাঁটা আছে ব'লে আমি উপেক্ষিতা হ'তে পারি না। কাঁটা না আছে কার? পদ্মে কাঁটা আছে। সংস্কৃত কাব্যে আমি "বেতসকুঞ্জ" নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছি।

বৃক্ষ ব'লে বাঁশকে না হয় না-ই ধরা হ'ল; কারণ, যাঁরা উদ্ভিদ নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরা বাঁশকে নাকি ঘাস-শ্রেণীর মধ্যেই ফেলেছেন! কিন্তু লতা? লতা বলতে বেতসকে কারও মনে পড়বে কি? এতদিন আমরা দেশের অগণিত বৃক্ষলতা নীচে থেকে একটা ঘোর ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে এসেছি—দেশবাসীর তাই আজ অধঃপতন!'

বলিতে বলিতে চৈতী-সন্ধ্যার উদাস হাওয়ায় বেতসলতার কম্পন দেখা দিল। তিনি আবার আবেগময়ী ভাষায় বলিলেন,—আমার এই আবেদন সবিনয়ে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করছি। তাঁরা কি এই দুর্গতদের কথা একটুও বিবেচনা করবেন না? দেশের যা-কিছু নিজস্ব, যা-কিছু বৈশিষ্ট্য তার দিকে তাঁদের কৃপাদৃষ্টি কি একটুও পড়বে না?'

জেলী-ফিস

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

যারা পুরীতে বা অন্য কোথাও সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছ, তা'রা নিশ্চয়ই সমুদ্রের জল নেমে গেলে বালি-শয্যার উপর শায়িত অথবা জলের উপরিভাগে সন্তরণরত জেলী-ফিস (Jelly-fish) দেখেছ। এই দু'অবস্থায় এদের আকৃতিতে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। এক অবস্থায় সমুদ্রের বেলাভূমিতে এক খাবলা নরম পদার্থরূপে প'ড়ে থাকে—যাদের স্পর্শ

করা নিষেধ; স্পর্শ করলেই হাতে কাঁটা ফুটে যাবে। কিন্তু আর এক অবস্থায় ভারী সুন্দর, প্রায় স্বচ্ছ—চক্‌চকে।

অনেকে এদের 'মেডুসা' (medusa) ব'লে থাকেন। পুরীতে এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'রাবণছত্র'। বাস্তবিক জেলী-ফিস নামের মধ্যে কোন যৌক্তিকতা দেখতে পাওয়া যায় না। এরা জেলীর মত থল্‌থলে বটে, কিন্তু মাছ নয় কোন ক্রমেই। শুধু জলে বাস করা ছাড়া মাছের সঙ্গে এদের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সূত্রও আবিষ্কৃত হয়নি আজ পর্য্যন্ত।

জেলী-ফিস সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত বর্ণনার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এদের প্রধান উপাদানই হচ্ছে জল; কাজেই তটভূমির উপর যখন প'ড়ে থাকে, তখন রৌদ্রের তাপে এরা ক্রমশঃ গলতে থাকে এবং এমন একটা সময় আসে যখন এদের সব কিছুই প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এমন কি, হাতের উত্তাপেই মুহূর্ত্তের মধ্যে জেলী-ফিস গ'লে যাবে। পূর্ণাবয়ব এবং সবচেয়ে বড় জেলী-ফিসের মধ্যে মাত্র পাঁচ কি ছয় রতি পরিমাণ কঠিন পদার্থ আছে।

বার পাউণ্ড ওজনের একটা জেলী-ফিস—বড্ড বেশী বড় ব'লে মনে হ'তে পারে; কিন্তু এদের দু'একটা সত্যই বিপুলকায়। এরা সমুদ্রের বাসিন্দা এবং সকল সমুদ্রেই দৃষ্টিগোচর হয়। মেরু অঞ্চলে এরা তিমির প্রধান খাদ্য। আবার এক জাতের জেলী-ফিসকে জাপানীরা তাদের উপাদেয় আহার্য্যবস্তুর তালিকায় স্থান দিয়েছে।

জেলী-ফিসকে জলে সাধারণতঃ ভাসমান কাচের 'ব্যাঙের ছাতা' ব'লে মনে হয়। এরা নিরীহ প্রকৃতির প্রাণী—প্রায় কারুরই কোন ক্ষতি করে না—করতে পারেও না। কিন্তু এরা ছোট ছোট সামুদ্রিক শুক্তি, শামুক প্রভৃতির শত্রু। এরা তাদের ঠিক রাক্ষসের মত শেষ ক'রে দেয়। মানুষেরাও এদের খুব সুনজরে দেখে না—এদের হুলফুটানর ক্ষমতার জন্য। এদের গায়ে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়ো আছে—যার সাহায্যে এরা প্রাণিদেহে বিষ ঢেলে দেয়।

হাতে ছুঁচ ফুটলে যে রকম যন্ত্রণা হয়, এদের শুঁয়োতে আহত হ'লে তেমনি সুতীব্র যন্ত্রণা বোধ হয়; এজন্য কোমল-চর্ম্ম-বিশিষ্ট নরনারী এদের প্রীতির চোখে দেখে না। জেলী-ফিসের সঙ্গে দেহের কোন স্থানের সংস্পর্শ ঘটলে সেই স্থান ফুলে' যায় এবং দশ-বার ঘণ্টা বেশ যন্ত্রণা থাকে—এমন কি, এর পরেও আহত স্থানে একটু বেদনার ভাব থেকে যায়। দু'এক ক্ষেত্রে মাসাধিককাল পর্য্যন্ত যন্ত্রণা থাকে। বাস্তবিকই যে প্রাণী স্ফীত সাবানের ফেনার মত দেখতে, সে যে এরকম্ ভাবে মানুষকে যন্ত্রণা দিতে পারে—একথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় বই কি!

এদের বিষ ঢেলে দেবার যন্ত্রটি বেশ জটিল। এদের দেহে কতকগুলো সেল (cell) আছে যার মধ্যে বিষ থাকে এবং প্রত্যেক সেলের মধ্যে তন্তু গুটান অবস্থায় থাকে। প্রাণীটি কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠলে ঐ তন্তু খুলে যায়। ঐ তন্তুর শেষপ্রান্ত ছুঁচাল এবং

কাঁপা। ঐ ছুঁচাল অংশ সহজেই চর্ম্ম ভেদ করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষ নির্গত হওয়ায় আহত স্থান ফুলে' ওঠে। সময় সময় ঐ বিষতন্তু পলায়নপর জেলী-ফিসেরা পেছনে রেখে যায় এবং তাদের তখন হুলফুটানর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এদের বিষকোষগুলো এক স্থানে নয় —দেহের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ মুখের চারপাশে সজ্জিত থাকে।

জেলী-ফিসেরা মানুষের কাছে সামান্য বিরক্তিকর হ'লেও সামুদ্রিক চিংড়ি, কাঁকড়া, শামুক প্রভৃতির কাছে মূর্ত্তিমান মৃত্যু। এদের মুখটি থাকে নীচের দিকে ছাতির তলায় শুঁয়োর মধ্যে এবং মুখের সঙ্গে পাকস্থলীর সোজাসুজিভাবে সংযোগ আছে। দেখতে এরা খুব কোমল ও সুন্দর হ'লে কি হবে—এরা কিন্তু এক একটি ক্ষুদে রাক্ষস। হতভাগ্য শিকার যদি পলায়নের জন্য বেশী ছটফট করে, এরা শুধু মুখটা বন্ধ ক'রে চুপচাপ প'ড়ে থাকে যতক্ষণ না সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে; তখন এরা তাকে গিলে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হজম করতে লেগে যায়।

জলের মধ্যে এদের গমনাগমন একটা দেখবার মত ব্যাপার—ভারী অদ্ভুত! ছাতার মত উপরিভাগের যে অংশ জলের উপর ভাসমান থাকে, তাকেই একবার সঙ্কুচিত আর একবার প্রসারিত করে অর্থাৎ জলকে একবার শোষণ করে পরমুহূর্ত্তে বের ক'রে দিয়ে এরা পথ চলে। এইভাবে এরা জলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে গমন করতে সমর্থ হয়—জলের উপরে ভেসে থাকতেও পারে, যদিও এরা জলের চেয়ে ভারী। এর থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে এদের সুদৃঢ় পেশীবহুল গঠন আছে।

কিন্তু সবার চাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এদের বংশবিস্তার। জেলী-ফিসদের দেহে জলের উপরিস্থিত অংশে অর্দ্ধবৃত্তাকার অনেকগুলো চিহ্ন আছে। ঐখানেই ওদের ডিম্ব তৈরী হয়। ডিমগুলো তখন পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে মুখে চ'লে আসে। মুখে অনেকগুলো ছোট ছোট গর্ত্ত আছে—সেখানে তা'রা থাকে যতদিন না ছোট ছোট তন্তু জন্মায়। এবার এরা জলে ভেসে চ'লে যাবে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদের একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণী ব'লে কল্পনা করা হ'ত।

এই সময় এদের মুখ থাকে না; কিন্তু শীঘ্রই দেহে পরিবর্ত্তন হ'তে থাকে এবং এরা দেখতে হয় ঠিক এক একটি পেয়ারার মত। এবার মাথার দিকে মুখও দেখা দেয়। কিছুকাল পরে এরা কোন পাহাড়ের গায়ে দেহটাকে আটকে বাড়তে থাকে—তখনও চেহারাটা পেয়ারার মত। মুখ বড় হ'তে থাকে ক্রমশঃ এবং শেষে ভিতরের গহ্বরের সঙ্গে মিশে যায়। এবার মুখের চার জায়গা সামান্য ফুলে' উঠবে এবং এই ফুলাই শুঁয়োর সূচনা! ক্রমশঃ এগুলো আকারে ও সংখ্যায় বাড়তে থাকে যতক্ষণ না মুখের চারধারে গোলাকার সূতার ঝালর হয়ে যায়। এদের চেহারাটাও এবার বদলে অনেকটা পেয়ালার মত হয়।

তারপর দেহটা ক্রমে লম্বা হ'তে থাকে এবং কতকগুলো বৃত্তাকার খাঁজ দেখা দেয়। ফলে চেহারাটা দাঁড়ায় একটার পর আর একটা বসান একদল সানকির মত। প্রথম অবস্থার শুঁয়োগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার স্থানে নূতন দলের আবির্ভাব হয়।

এখন দেখা যাবে এক বাণ্ডিল সানকি—যার ধারগুলো খাঁজকাটা। এখন আরও বিস্ময়ের বিষয় যে, প্রথমটি হঠাৎ বাণ্ডিল থেকে পৃথক্ হয়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যায়—তারপর একটি—আর একটি—এইভাবে সবগুলো চ'লে যায় এবং প্রত্যেকেই তলাটি নীচের দিকে ক'রে ভাসতে থাকে সমুদ্রে।

সানকিগুলো দ্রুত বাড়তে থাকে যতক্ষণ না দেখতে হয় ঠিক ছাতির মত—শুঁয়োর ঝালর-সমেত সম্পূর্ণ। এরা এখন ভেসে বেড়াবে, খাবে, হুল ফুটাবে অর্থাৎ জেলী-ফিসদের জীবন যাপন করবে। ক্রমে এরাও বংশ বিস্তার করবে—পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

প্রত্যেক সানকি থেকেই একটি জেলী-ফিস হবে; এক একটা বাণ্ডিলে বারটা বা তার চেয়ে বেশী সানকি থাকে এবং সবাই একটি মাত্র ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয়।

কিন্তু আসল মজার কথা এখনও বলা হয়নি। গোড়ার পেয়ারার মত প্রাণীটি এক কি দেড় ইঞ্চি বড়; কিন্তু সানকিরা বড় হয়ে জেলী-ফিসে পরিণত হ'লে তখন তাদের ব্যাসই হয় প্রায় ছ'-সাত ফুট।

সংক্ষেপে এই হ'ল জেলী-ফিসের জীবন-কাহিনী—তিমির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য প্রাণী; কিন্তু তাই ব'লে এদের জন্মবৃত্তান্ত তিমির চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়।

গম্বুজ সিং

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

রায়দের দারোয়ান গম্বুজ সিং—
মুখভরা দাড়িগোঁফ রোগা টিং টিং;
ঝোপের মতই ঘন জোড়া ভুরু-তলে
জোনাকির মত আঁখি মিটি-মিটি জ্বলে;
সরু সরু ঠ্যাং দুটো নড়বড় করে—
নাগ্‌রার ভার যেন বহিতে না পারে;
টিকিওলা নাগরাই আগে আগে চলে,
মাথাভরা পাগড়িটি তালে তালে দোলে;
খায় শুধু দিনরাত ভাঙ্গ আর গাঁজা,
কথায় কথায় মারে উজির ও রাজা।

জাঁক ক'রে বলে সদা, "এহি বাত ঠিক্
ডাকু পাকৃড়ানা মেরা খেল্‌কা মাফিক্।"
পাতাটি নড়িলে বলে, "হুঁয়া কোন্ হ্যায়—
গম্বুজ সিং হাম আভি আতা হ্যায়।"
একদিন রায়বাড়ী পড়িল ডাকাত,
গোলমালে চীৎকারে গোটা পাড়া মাত্।
লুটে নিয়ে তস্কর দিল পিঠটান্,
গম্বুজ তরমুজ সম গড়াগড়ি যান্।
কহিনু—"গম্বুজ সিং, হ'ল কি তোমার?"
মাথা নাড়ি বলে, "হুয়া বহুত বোখার।"

গহন গিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালিপদ চট্টোপাধ্যায়

—দুই—

ভয় ভাঙ্‌ল

সেদিন ভোররাত্রে শোনা গেল, চারদিকে একটা 'সাজ-সাজ' রব প'ড়ে গেছে। পথের পাশের ঘরে শুয়েছে রঞ্জিত। রাস্তায় লোকগুলো মহা উৎসাহে ছুটোছুটি কর্‌ছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একজনকে ডেকে সে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"ব্যাপার কি?"

জানা গেল, সেখানকার কতকগুলো লোক যাচ্ছে শিকার করতে সেই শর্‌দাই পাহাড়ে। খবরটা শুনে মন তার আহ্লাদে নেচে উঠ্‌ল; ভাব্‌ল এতগুলো লোক যখন যাবে, বিপদের আর ভয় কি? সেও যাবে না-কি ওদের সঙ্গে? যাবে সে। কিন্তু কাউকে জানান হবে না—মানে বাসার কাউকে।

জামাইবাবুর আফিসের কাজ তো সকাল থেকেই। তিনি তো চ'লে গেছেন আফিসে। দিদির চোখে ধূলো দিতে আর বিশেষ কার্‌সাজির দরকার কি?

রঞ্জিত মালকোচা মেরে জামাটি প'রে চুপি-চুপি বেরিয়ে পড়্‌ল; সটান গিয়ে ভিড়ে গেল শিকারীর দলে। দলের সবাই কুলি-কামিন। তা'রা যখন শুন্‌ল যে, বড়বাবুর শালা অর্থাৎ রঞ্জিতবাবু যাবে তাদের সঙ্গে, আনন্দের আর সীমা রইল না যেন তাদের।

রঞ্জিতকে সঙ্গে নিয়ে শিকারীর দল বেরিয়ে পড়্‌ল সূর্য্য ওঠার আগেই। দলের সবার হাতে লাঠি সড়্‌কি—কুড়ুল, বল্লম, ধনু আর বড় বড় ছোরা।

উঁচু-নীচু মেঠো পথ ধ'রে বহুক্ষণ চলার পরে শর্‌দাই পাহাড়ের তলায় গিয়ে যখন তা'রা হাজির হ'ল, বেলা তখন দশটার কম নয়। গাছের ছায়ায় সবাই বিশ্রাম কর্‌ল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে তা'রা বনের ভিতর ঢুকতে লাগ্‌ল—পাহাড় বেয়ে উপর দিকে।

বেশি উঁচুতে তা'রা উঠ্‌ল না। খানিকটা উঠেই পাওয়া গেল গাঢ় বন। সেখানে গিয়ে ওরা হৈ-চৈ সুরু ক'রে দিল। সে কি চীৎকার! সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল লাঠির ঘায়ের পরে ঘা জঙ্গলের গায়ে। এমনি ক'রে তা'রা এগিয়ে চল্‌ল—উপরদিকে নয়, ধারে ধারে।

অনেকক্ষণ এমনি করার পর সোঁ ক'রে একটা শুওর সাম্‌নে দিয়ে দিল ছুট্। আর যাবে কোথায়! চীৎকারে বন কাঁপিয়ে লোকগুলো শুওরটার পিছনে পিছনে কর্‌ল তাড়া।

রঞ্জিতের তো আর এসব অভ্যাস নেই। জঙ্গলের ভিতর ছুট্‌তে গিয়ে পদে পদে সে ঠোক্‌কর খেতে লাগ্‌ল। কাঁটাগাছে কাপড় জড়িয়ে ছিঁড়ে গেল কতবার। কী দুর্গতি বেচারার!

শুওরটা আর পার্‌বে কাঁহাতক্! লোকগুলোকে একেবারে কাছে দেখে সে দাঁড়াল রুখে'। আগে আগে ছিল লখি। সোঁত্ ক'রে সে তার বল্লমটা ছুঁড়ে মার্‌ল। বল্লম বিঁধে গেল শুওরের গায়ে। দুর্দান্ত শুওর তখন গর্জ্জে উঠে লাফিয়ে পড়্‌ল লখির উপর। সঙ্গে সঙ্গে সবাই গিয়ে লাঠির ঘায়ে—বল্লমের খোঁচায় মেরে ফেল্‌ল শুওরটাকে। ভ্যাগিস্ তক্ষুনি গিয়েছিল সবাই এগিয়ে, তা নইলে লখির লখিত্ব সেখানেই ঘুচে গিয়েছিল আর কি।

ঘণ্টা-দুই সময়ের মধ্যে আরও তিনটে শুওর মারা পড়্‌ল। চারটাকে চারজনে কাঁধে ফেলে চল্‌ল আবার হর্‌রা কর্‌তে কর্‌তে। কী ফূর্ত্তি তখন তাদের!

হঠাৎ কোন্ আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা হরিণ সামনের দিকে ছুট্ লাগাল —শিঙ্ দুটো তার উঁচু ক'রে। দ্বিগুণ জোরে কোলাহল ক'রে ছুটে চল্‌ল সবাই হরিণের পিছনে। বেশি দূর বেচারা যেতে পার্‌ল না, একটা ঝোপের ভিতর প'ড়ে সে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল। হরিণটা না ছুটে ঝোপের মাঝে প'ড়ে কেন ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, রঞ্জিত তা মোটেই বুঝতে না পেরে হাঁ ক'রে রইল।

রঘু সোঁ ক'রে ছুঁড়্‌ল এক তীর। হরিণের গায়ে সেটা বিঁধে গেল। একটা লাফ মেরেই হরিণটা প'ড়ে গেল—মাটিতে প'ড়ে পা ছড়াতে লাগ্‌ল।

বড় দুঃখ হ'ল রঞ্জিতের। কিন্তু হরিণটা অমন থেমে গেল কেন? দলের দু'চারজন লোককে সে জিজ্ঞেস কর্‌ল। কিন্তু আনন্দে তখন তা'রা মশ্‌গুল ; কে বা কার কথা শোনে, কেই বা তার জবাব দেয়? শেষে জানা গেল, হরিণটার শিং না-কি জড়িয়ে গিয়েছিল লতায়। তাই আর চল্‌তে না পেরে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল অমন ক'রে।

ইঃ! কী নিষ্ঠুর এরা!—রঞ্জিত ভাব্‌ল,—হরিণটা আট্‌কা-ই যখন পড়েছিল, তখন মার্‌বার কি দরকার ছিল ওকে? বেঁধে নিয়ে গেলেই তো হ'ত।

তার মতটা রঘুকে না জানিয়ে পার্‌ল না রঞ্জিত। শুনে রঘু বল্‌ল—"হরিণটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া কিসের জন্য? বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাবার জন্যই তো শিকার করা। ওটাকে এখনও মারা হয়েছে, তখন হ'লেও মারা-ই হ'ত। এখন সবার রক্ত গরম, মার্‌তে বিশেষ লাগ্‌ল না প্রাণে ; কিন্তু পরে ঠাণ্ডা রক্তে অমন সুন্দর জীবটাকে মার্‌তে কষ্ট হ'ত না মনে?"

সত্যি কথা।—রঞ্জিত স্বীকার কর্‌ল।

এর পরে অনেক চেষ্টাতেও কোনও শিকার আর পাওয়া গেল না। তাই সবাই বন থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্রাম কর্‌ল কতকক্ষণ। আকাশের সূর্য্য তখন পশ্চিমদিকে বেশ খানিকটা নেমে এসেছে। চারটে মরা শুওর চারজনে নিল কাঁধে ক'রে ; হরিণটা নিল দু'জনে বাঁশে ঝুলিয়ে। চল্‌ল ওরা ঘরে ফিরে।

আস্তানায় ফিরে এসে ওরা আগেই কাট্‌ল হরিণটাকে। তার বেশ খানিকটা মাংস দিল রঞ্জিতকে।

মাংস হাতে ক'রে সে যখন দিদির বাড়ীতে এসে পৌঁছল, রাত তখন কম হয়নি। তাকে দেখ্‌তে পেয়েই চোখ কপালে তুলে দিদি এলেন ছুটে ; কিছু বল্‌তে পারার আগেই তিনি উঠ্‌লেন কেঁদে। সে কি যা'-তা' কান্না! তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হ'ল, সারাদিন তাঁর আজ কেঁদে কেঁদেই কেটেছে।

রঞ্জিত কোথায় গিয়েছিল, তা বলা মাত্রই জামাইবাবু ভীষণ মাত্রায় গম্ভীর হয়ে ব'সে রইলেন। আজকের দিনের এমন বৈচিত্র্যের কাহিনীটা ফলাও ক'রে বলার আর সময়ই পেল না বেচারা রঞ্জিত। দিদি চোখের জল শাড়ির আঁচলে মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লেন—"না ভাই, তুই বাড়ী চ'লে যা। না হয়, শেষে এ বিদেশে বিভুঁয়ে—"

কথাটা শেষ না হ'তেই তিনি আবার কেঁদে ফেল্‌লেন এবং চোখের জল মুছ্‌তে

মুছ্‌তে বল্‌লেন—"ভালো-মন্দ একটা কিছু হ'ত যদি আজ, মনকে আমি বোঝাতাম কেমন ক'রে বল্ তো ? আর বাবা-মাকে মুখ দেখাতামই-বা কেমন ক'রে ?"

এক্‌কেবারে হতভম্ব হয়ে রঞ্জিত দাঁড়িয়ে রইল।

খেতে ব'সে জামাইবাবুর গাম্ভীর্য্য ভাঙ্‌ল। মাংসটা রান্না হয়েছিল খুব ভালো। তা মুখে দিতেই যে হাসিখানা তাঁর মুখে ফুটে উঠ্‌ল, তার তোলার দাম লাখ টাকা।

—তিন—

সুযোগ

সেদিন দিদি আর জামাইবাবু যে কাণ্ডখানা কর্‌লেন, তাতে পাহাড়ের নাম আর রঞ্জিতের মুখে বেরোলই না। ক'দিন তাকে থাক্‌তে হ'ল নজরবন্দী হয়ে। তাকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে সেদিনকার শিকারীর দলটিকে যা বকুনিটা খেতে হয়েছিল জামাইবাবু অর্থাৎ বড়বাবুর কাছে, তা কহতব্য নয়। তাদের চোখ রাঙ্গিয়ে তিনি বারণ ক'রে দিলেন, এমন কাজ যদি আর কখনও করে তা'রা, তা' হ'লে—

তা' হ'লে যে কি শাস্তি দেবেন, রাগের চোটে তা আর মাথায়ই এল না তাঁর।

দিদির চোখের জলের ভয়ে বাড়ীর বা'র হবার নামটিও রঞ্জিত কর্‌ল না ক'দিন। বাড়ীর ভিতরই বা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল ছেলেটা কাঁহাতক্ ব'সে থাক্‌তে পারে !. তাই একটু খোলা হাওয়ার পরশ পাবার জন্য রঞ্জিত সেদিন সাঁঝে উঠ্‌ল গিয়ে ছাদের উপর।

দূরে শর্‌দাই পাহাড়কে কী চমৎকারই না দেখাচ্ছিল। আবছা কুয়াসায় ঢাকা পাহাড়টাকে দেখাচ্ছিল দিগন্তজোড়া কালো মেঘের মত। তার মাথায় সাঁঝের রবির আভার দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা সোনালি রেখা।

আপন মনেই রঞ্জিত ব'লে উঠ্‌ল—"চমৎকার ! কী সুন্দর !"

পাহাড়ে যাবার বিপুল ইচ্ছা আবার তার মনকে মাতিয়ে তুল্‌ল। কিন্তু উপায় যে নেই।

ক'দিন শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাকার ফলে বাড়ীর বাইরে বেড়াবার অনুমতি সে পেল।

তার জামাইবাবু যে আফিসে কাজ কর্‌তেন, সে কোম্পানির বড় সাহেব এসেছিলেন কল্‌কাতা থেকে আফিস দেখা-শোনা কর্‌তে। থাক্‌বেন তিনি দিন কতক। সাহেবের বাঙ্‌লোটা রঞ্জিতের দিদির বাড়ী থেকে কয়েকশ' পা দূরেই।

সেদিন সেই সাহেবের বাঙ্‌লোর সাম্‌নের রাস্তায় রঞ্জিত পাইচারি কর্‌ছিল। সাহেবের সুসজ্জিত বাঙ্‌লোর দিকে বারবার সে মুগ্ধদৃষ্টিতে না তাকিয়ে পার্‌ছিল না। সে-সময় সাহেব ভিতর থেকে এলেন বারান্দায়। রঞ্জিতকে বারবার তাঁর বাসার দিকে চাইতে দেখে কী তাঁর মনে হ'ল, কে জানে। হাত তুলে তিনি তাকে ডাক্‌লেন—
—"ই-ঈ খোকা! ইডিকে আইসো।"

অন্য কেউ 'খোকা' ব'লে ডাক্‌লে রঞ্জিত রেগেই উঠ্‌ত ভীষণ রকম। বয়সটা তো তার কম হয়নি। নির্ঘাত পনের পেরিয়েছে। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'ল সে। তবু সাহেব ডাক্‌ছেন! সে এগিয়ে গেল সেদিকে।

সাহেবের বারান্দায় গিয়ে সে উঠ্‌ল।

হাসি-হাসি মুখে সাহেব জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কী ডিখিটিসিলে?"

রঞ্জিত বিনয়ে উত্তর কর্‌ল—"দেখ্‌ছিলাম—এই—এমনি—সব—"

সাহেব জান্‌তে চাইলেন—"টুমি কোন্‌ বাড়ীটে ঠাক?"

জামাইবাবুর নাম ক'রে রঞ্জিত বল্‌ল—"আমি তাঁর সম্বন্ধী।"

বিস্ময়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন সাহেব—"হোআট্‌? সোমাডি কী আছে?"

রঞ্জিত হেসে বল্‌ল—"শালা আর কি—ব্রাদার-ইন-ল।"

—"শালা—ও ইয়েস্‌, শালা—শালা!" সাহেব হেসে বল্‌লেন,—"ওয়েল্‌, বইঠো।"

রঞ্জিত দাঁড়িয়েই রইল। বড় সাহেবের ভয়ে যে তার জামাইবাবু কম্পমান। কে-ই বা নয়? আর রঞ্জিত সেই সাহেবেরই কাছে পাচ্ছে এমন আদর!

সাহেব নিজে একখানা কেদারায় ব'সে আর একখানা দেখিয়ে রঞ্জিতকে বল্‌লেন—"বইসো।"

রঞ্জিত বস্‌ল। সাহেবি বাঙ্‌লা আর বাঙালী বাঙ্‌লায় অনেক কথাই তু'জনের মধ্যে হ'ল। কথায় কথায় উঠে পড়্‌ল শর্‌দাই পাহাড়ের কথা। সাহেব বল্‌লেন—"হামি কাল ওই 'হিল্'টায় শিকার কর্‌টে যাবে। টুমি যাবে?"

রঞ্জিত তো তাই চায়। আহ্লাদে সে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল; কিন্তু তারপরেই দ'মে গিয়ে এক্‌কেবারে পড়্‌ল ব'সে। সাহেব তার মুখের ভাবটা লক্ষ্য কর্‌লেন না, তার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বল্‌লেন—"গুড্‌ গুড্‌! টুমি যাবে টা হোলে?"

বড় তুঃখিতভাবে রঞ্জিত বল্‌ল—"নাঃ, আমার যাওয়া হবে না।"

—"কেনো হোবে না?"—সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

—"হবে না,"—রঞ্জিত বল্‌ল ঃ "আমায় বাড়ী থেকে দেয় না যেতে।"

—"কে ডেয় না যেটে?"

—"জামাইবাবু।"

—"ঝামাইবাবু!—ওঃ, সো হামি ঠিক ক'রে ডেবে।"

রঞ্জিত বিশ্বাস কর্‌ল, এ ক্ষমতা সাহেবের আছে। মনটা তার নেচে উঠ্‌ল

সাহেব অভয় দিয়ে বল্‌লেন—"হামি হাটি কোরে যাবে। টোমার কুছ্ 'ডেনজার' হোবে না।"

বাঃ, হাতীতে চ'ড়ে যাবে, তাতে 'ডেনজার' মানে বিপদ আবার কী? রঞ্জিতের তো ভারি আনন্দ।

সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বাড়ী এল, সন্ধ্যা তখন উত্‌রে' গেছে। তাকে দেখেই দিদি আবার তেমনি চোখ কপালে তোলার উপক্রম করলেন, বল্‌লেন—"আবার কোথায় গিয়েছিলি আজ?"

রঞ্জিত হো-হো ক'রে হেসে বল্‌ল—"কি মুশ্‌কিল! সাহেবের বাঙ্‌লোয় গিয়েছিলাম, ও ডেকেছিল।"

দিদি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। তাঁর চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল আর কি!

(ক্রমশঃ)

অগ্নি-পরীক্ষা

শ্রী—

মুঙ্গের জেলার সীতাকুণ্ডের জল অত্যন্ত গরম। এক মিনিটও তার মধ্যে হাত রাখা সম্ভব নয়। অথচ পাশেই রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড প্রভৃতি আছে, সেগুলির জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। পাণ্ডারা বলেন—এখানে সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছিল। অগ্নি পুণ্যবতী সীতার দেহ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু অগ্নির উত্তাপে সহিষ্ণু সীতার দেহ থেকে যে ঘর্ম্ম নির্গত হয়েছিল, তারই সাক্ষ্য র'য়ে গেছে এই সীতাকুণ্ড।

কেউ কেউ একথা মানতে চান না। ফিলিপ সাহেব কোনও সময়ে মুঙ্গের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি সীতাকুণ্ডের অনতিদূরে রাস্তার অপরপার্শ্বে আর একটি কুণ্ড খুঁড়ে প্রমাণ ক'রে দেন, এইরূপ উষ্ণ প্রস্রবণ আরও তৈরী করা যেতে পারে। ঐ কুণ্ড এখনও বর্ত্তমান এবং লোকে ওটাকে 'ফিলিপ কুণ্ড' ব'লে থাকে। অবশ্য পাণ্ডারা ঐ কুণ্ডের বিশুদ্ধতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট মনগড়া গল্প ব'লে থাকেন। কিন্তু এইখানেই রামায়ণকথার পরিসমাপ্তি হয়। মুঙ্গের জেলার কোনও স্থানে হয়ত গুপ্ত আগ্নেয়গিরি থাকতে পারে—সীতাকুণ্ড বা ফিলিপ কুণ্ডের জলস্রোত হয়ত সেইরূপ কোনও পাহাড়ের দ্বারাই উত্তপ্ত হ'য়ে আসছে; তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, রামায়ণে বর্ণিত জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা একটা মিথ্যা বা অসম্ভব গল্প।

প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে মানুষ এখনও হেঁটে আসছে অথচ তার পায়ে বা গায়ে ফোস্কা পড়ছে না। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে আলোচনাও করছেন খুব, কিন্তু সঠিক কারণটা এখনও হদিস করতে পারেননি তাঁরা।

ভারতবর্ষ এবং পলিনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকদিন থেকে এক শ্রেণীর লোক এইভাবে অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে থাকে। বহুবার আমেরিকা ও ইউরোপবাসীরা এই ব্যাপার দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন। এইসব দেখে তাঁরা তাঁদের দেশের কাগজে এ নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছেন।

সাধারণতঃ দুই রকমে এই অগ্নি-পরীক্ষা হয়ে থাকে। খুব উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে অথবা গণগণে কাঠকয়লার উপর দিয়ে। পলিনেশিয়ায় ফিজি, কুকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে হাঁটা দেখান হয়। এক হাঁটু উঁচু ক'রে গণগণে কাঠের আগুন জেলে দেওয়া হয় একটা তিন-চার হাত চওড়া পাথরের চারদিকে। পাথরটা যখন লাল টক্‌টকে হয়ে যায়, তখন পুরোহিত (অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরীক্ষা দেখাবে) নানাবিধ মন্ত্র-পাঠের পর খালি পায়ে সেই পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে যায়, অথচ তার পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

কাঠের আগুনের ভিতর দিয়ে নির্ব্বিবাদে যাওয়ার কসরৎ ভারতবর্ষ, জাপান প্রভৃতি দেশে দেখান হয়। আট-দশ হাত দীর্ঘ, চার-পাঁচ হাত প্রশস্ত এবং এক হাঁটু পরিমাণ গভীর এমন গর্ত্তের মধ্যে পূর্ব্ব থেকে অনেক কাঠ পুড়িয়ে গণগণে আগুন ক'রে রাখা হয়। তারপর যে ব্যক্তি এই অগ্নি-পরীক্ষা দেখাবে, সে খালি পায়ে ঐ অগ্নিকুণ্ডের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে।

প্রফেসর ল্যাংলি সোসাইটি দ্বীপে একুশ ফুট লম্বা এবং নয় ফুট চওড়া এমন একটা কুণ্ডের মধ্যে পুরোহিত চারবার ক'রে প্রদক্ষিণ করেছিল এমন ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। পার্সিভেল লাওয়েল জাপানে ছয়-সাত হাত লম্বা একটা কুণ্ডে জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপর দিয়ে একটা লোককে হাঁটতে দেখেছেন।

তাঁদের এই সব বিবরণ প'ড়ে—ঐ দেশীয় একজন পাঠক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এগুলি কি সত্য ঘটনা, না লেখক ঐ ব্যাপার দেখবার সময় নিজেই যাদু হয়ে গিয়েছিলেন।

একথা শুনে যাঁরা এই অগ্নি-পরীক্ষা দেখেছেন তাঁদের অনেকে এর প্রতিবাদ করেছিলেন।

ভারতবর্ষীয় একজন লিখেছিলেন,—আমি স্বচক্ষে দুইবার এই ঘটনা দেখেছি। পরীক্ষার আগে পুরা ছয় ঘণ্টা ধ'রে কাঠের আগুন জ্বালান হয়েছিল গর্ত্তের মধ্যে। যে এই খেলা দেখিয়েছিল, তার পরণে ছিল নেংটি। অগ্নিকুণ্ডে নামবার ঠিক পূর্ব্বে সে স্নান ক'রে উঠেছিল এবং অগ্নির ভিতর দিয়ে হাঁটবার সময় সে কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম, কোনও গাছের পাতার রস গায়ে মেখে নেয় ঐ ব্যক্তি ; কিন্তু দ্বিতীয়বারে দেখা গেল, একই দলের কয়েকজন একসঙ্গে এই পরীক্ষায় নেমে কেউ বা হ'ল অকৃতকার্য্য, কারও বা গায়ে পড়ল ফোস্কা !

লণ্ডনেও এই বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটি অব লণ্ডন কাউন্সিল এই জিনিসটা পরীক্ষা করবার জন্য যারা এই বিদ্যা দেখাতে পারে তাদের আহ্বান করেছিল। আহ্বানে আর কেউ সাড়া দেয়নি—ভারতবর্ষ থেকে খোদা বক্‌স্ নামক এক ব্যক্তি এই ক্রীড়া দেখাতে গিয়েছিলেন। পরীক্ষকেরা প্রথমেই দেখে নিলেন, খোদা বক্‌স্ পূর্ব্ব থেকে পায়ে কোনও ঔষধ, ফিটকিরি, সাবান প্রভৃতি কোনকিছু মেখে নেয় কিনা এবং বাইরের অনুষ্ঠানে এমন কিছু আছে কিনা যার জন্য আগুনেও গায়ে ফোস্কা পড়ে না। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বললেন, এটা তার বড় রকমের একটা সহ্য করবার শক্তি। কিন্তু আগুনকে কি অস্ত্রাঘাতকে আমি চুপ ক'রে সহ্য করতে পারি ব'লেই—আগুনে আমাকে পোড়াবে না বা আমার গায়ে অস্ত্রের ধার বসবে না এটা ত অসম্ভব কথা। খোদা বক্‌স্ বলেছিলেন, তিনি বিশ্বাসের বলে এটা করতে পারেন।

পরীক্ষকেরা পরিশেষে যে মত দিয়েছেন সেটা এই—এটা চালাকি নয়, কোন রকম ঔষধ প্রয়োগ না ক'রে খালি পায়েই এটা করা হয়। পা ভিজা থাকলে সুবিধার পরিবর্ত্তে অসুবিধাই

বেশী হওয়ার কথা। তারপর তাঁরা বলেছেন, কাঠের আগুনের উত্তাপ অন্য আগুনের চেয়ে কম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খালি পায়ে যাদের হাঁটা অভ্যাস, তা'রা অভ্যাস করলে এইরূপ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়ে হয়ত হাঁটতে পারবেন।

একমাত্র অভ্যাসের কথাই যদি ধরা যায় তা হ'লে বলা যেতে পারে অভাগিনী সীতা এতই দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন যে, অগ্নির উত্তাপ তার কাছে বেশী কিছু নয়। কিন্তু এতেও সেই সহ্য করবার কথাই এসে পড়ে। মনের জোর বা অভ্যাসগুণ দ্বারা আগুনের দাহিকা শক্তিকে নষ্ট করা যায় না। খোদা বক্‌স্ বিশ্বাসের কথা বলেছেন। সীতাদেবীরও নিশ্চয়ই এমন বিশ্বাস ছিল যে, আগুন তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না।

খোকার অনুযোগ

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি.

আচ্ছা, মাগো! অমন ক'রে সারা দুপুর বেলা
কেমন ক'রে করিস্ মাগো আমার সাথে খেলা?
করতে খেলা ছোট'র সনে লজ্জা কি তোর হয় না মনে?
কোলে ফেলে কেমনে তুই দিস্ যে চুমার মেলা?

খুকী তোমার ছোট্ট ব'লে খেলি না তার সাথে।
ছোট'র সনে খেলবে বড়!—অপমান যে তাতে!
ছোট্ট আমি তোমার কাছে, তবুও কি মা খেলতে আছে?
খেলতে যদি চাও মা তবে খেলব আমি রাতে।

রাত্তিরেতে যখন খুশী আমায় বুকে নিয়ো,
যত গণ্ডা চুমো দিতে ইচ্ছে হয় তা দিয়ো;
মুখটি বুঁজে চুপ্‌টি ক'রে রইব প'ড়ে বুকের 'পরে,
বলব না কো রাগের ভরে, "হচ্ছে তোমার কী-ও?"

সবাই কাছে থাকলে মাগো নিস্‌নে আমায় কোলে,
হাজার চুমো দিস্‌নে মোরে "খোকন সোনা" ব'লে।
মণ্টুরা সব দেখলে পরে বলবে তখন হল্লা ক'রে—
"মার আদুরে গোপাল যে রে! থাক্‌না শুয়ে কোলে!"

রাগের ভরে আমায় ফেলে যাস্‌নে মাগো চলি;
সত্যি বড় লজ্জা করে, তাই তো আমি বলি।
পর হয়েছি হয়ে বড়? তাই চোখে জল হচ্ছে জড়?
চুপ্‌ কর্‌ মা, কাঁদিস্‌নে গো, তুই কি পাগল হ'লি?

আমি যে মা বড্ড ছোট—বড়ই আমি বোকা,
আমার 'পরে রাগ করে কি?—আমি যে তোর খোকা!
তাই হবে গো, তাই হবে মা, সাম্নে সবার দিস্‌গো চুমা,—
চুমা দিয়ে চট্‌কে আমায় করিস্‌ মাগো ধোঁকা!

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বিস্ময়কর পণ্য

সুরেশ কোমরে রিভলবার ও হাতে রাইফেল লইয়া বনমালীর সহিত ধীরে ধীরে সুন্দর সিংএর বাংলোর দিকে চলিল। গ্রাম হইতে লোকগুলি তীক্ষ্ণভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও কোনও উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গেল না। অবশ্য তাহারাও প্রস্তুত হইয়াছিল যদি আক্রমণ করিবার কেহ সাহস করে, তবে রাইফেল ও রিভলবার চালাইয়া আক্রমণকারীদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবে। কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া তাহারা বুঝিল, অপর জাহাজের লোকগুলির সাবধান করার অর্থ এই যে, তাহারা যেন তীরে না আসে; বাহিরের কোনও লোক তাহাদের ব্যবসায়ের পণ্য দেখিতে পায়, তাহাদের এরূপ ইচ্ছা নাই।

এসব ব্যাপারে সুরেশের কোন লাভ-লোকসান নাই, লক্ষ্য করিবার প্রয়োজনও নাই। তাহার জানাই ছিল যে, যত বাটপাড়, গাঁটকাটা, খুনী, ডাকাত আর বোম্বেটের সঙ্গেই সুন্দর সিংএর কারবার। সে শুধু কতকগুলি মাল খালাস করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছিল, সত্বর যাইতে পারিলে রক্ষা পায়।

সুরেশ অনুচ্চস্বরে বলিল—"কোপ্‌রা!"

বনমালী চাহিয়া দেখিল সুন্দর সিংএর লোকজন গুদামে কতকগুলি মাল বোঝাই করিতেছে। মালগুলির বস্তা দেখিলেই বুঝা যায় যে তাহার মধ্যে কোপ্‌রা আছে।

আকারায় কোপ্‌রা বিশেষ পাওয়া যায় না, আর যদি বা পাওয়া যায়, তবে তাহাও অতি সামান্য পরিমাণে। এত অধিক পরিমাণে ও এরকম বস্তা বোঝাই করা কোপ্‌রা চালান করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিবার স্থান যে এটা নয়, তাহা সুরেশ ও বনমালী বেশ জানিত। অধিকন্তু সকলেই জানে যে, সুন্দর সিং যে সকল জিনিস ক্রয় করিয়া থাকে তাহার জন্য সে কখনও উপযুক্ত মূল্য দেয় না। এ জাহাজের লোকেরা সিঙ্গাপুর, পিনাং প্রভৃতি স্থানে গেলে অনেক বেশী দামে এ মাল বিক্রয় করিতে পারিত।

তাহারা সেদিকে আর অধিককাল দৃষ্টিপাত না করিয়া সুন্দর সিংএর বাংলোর দিকে চলিতে লাগিল। বাংলোর পাশে যাইতে সেই মোটা লোকটি বাহির হইয়া আসিল এবং সুরেশের দিকে তাকাইয়া,—"রাম রাম বাবুসাব," বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সুরেশও "রাম রাম" বলিয়া প্রতিনমস্কার করিল। লোকটার চেহারা দেখিয়া মনে হইল—সে শুধু মোটা নয়, বেশ শক্তিশালীও।

বাড়ীর সিঁড়ির নীচে দেখা হইল সুন্দর সিংএর সহিত। সুন্দর সিং তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"আরে ইয়ে তো সুরেছ বাবু! হামার দোস্ত্। আসুন নম্মছ্‌কার। হামি আউর তিন-চার রোজ পর বেণীমাধব আছ্‌বে ঠিক কোরেছিলো। আপনি বহুৎ জলদি জলদি আয়া হ্যায়।"

সুরেশ প্রতিনমস্কার করিলে, সুন্দর সিং বলিল—"আপন্ পিয়ারেলাল চৌধুরী, উ জাহাজকে কাপ্তান সাথ জানপছন নেই?"

—"না আমার চেনা নেই।"

—"ভারি আচ্ছা লোক, বহুৎ খোশমেজাজ আদমী। ওর সাথ হামার বহুৎ কারবার হোয়—উ লোক মুক্তাকে কারবার কোরে।"

"মুক্তার কারবার!" সুরেশ বিস্মিতভাবে বলিল। সুন্দর সিং মনে করিয়াছিল একটা বাজে কথা বলিয়া সুরেশকে ফাঁকি দিবে; কিন্তু সুরেশ আরও বিস্মিত হইল যে, কোন্ মূর্খ মুক্তা বিক্রয় করিতে সুন্দর সিংএর নিকটে আসিবে।

—"হাঁ হাঁ, মুক্তা ঝিনুকভি বেচে।"

—"কোপ্‌রা নয়?"

—"হোঃ হোঃ হোঃ, কোপ্‌রা দোসরা লোক বেচে; এই দেশকা লোক। ভারী মজেদার কারবার এই কোপ্‌রাকে।"

সুন্দর সিং সুরেশ ও বনমালীকে বারান্দায় দুইখানি চেয়ার দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। চেয়ার দুইখানি গুদামঘরের দিকে পিছন ফিরানো ছিল, উহাতে বসিয়া যেন তাহারা ওদিককার কাজকর্ম্ম দেখিতে না পায়।

সুন্দর সিং বারান্দায় বসিয়া অনর্গল কথা বলিয়া হোঃ-হোঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। অন্য লোকে তাহার ভাব দেখিয়া হয়তো তাহাকে অতি অমায়িক লোক মনে করিতে পারিত, কিন্তু সুরেশ বুঝিতে পারিল যে, ইহা সুন্দর সিংএর অমায়িকতার অভিনয় মাত্র—তাহার আসল ইচ্ছা এই যে, তাহারা যেন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার, জানিবার বা বুঝিবার সুযোগ না পায়। আরও বুঝিল, বেণীমাধবের এত দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত আগমনে সুন্দর সিং বিব্রত ও বিরক্ত হইয়াছে।

একটু পরে সুন্দর সিং জিজ্ঞাসা করিল—"কোই খবর আছে সুরেছবাবু? রাঙ্গুনকা হালচাল?"

—"ও জানা নেই বুঝি! সাত-আট দিন আগে বোম্বেটেরা একটা জাহাজ লুঠ করেছে।"

—"লুঠ! তাজ্জব কোথা বাবুসাব! কোই ঝুটা বোল্‌ছে।"

—"ঝুটা নয়, সত্যি! একদল লোক নৌকো ক'রে এসে একটা জাহাজ লুঠ করেছে! হয়তো দূরে তাদের জাহাজও ছিল।"

—"সাচ্, হোয়তো ধোরা পর্ যাবে। দরিয়ামে রাহাজানি করকে বহুৎ লোক গিরেপ্তার হো কর ফাটক্‌মে চলা গিয়াসে।"

এই বোম্বেটের লুঠের কথা আরও আলোচনা হইবার পর, সুরেশ বেশ বুঝিল এ কাণ্ডের কথা সুন্দর সিং বেশ ভাল জানে, যদিও সুরেশকে ছেলেমানুষ মনে করিয়া

অনেক কিছু অতিরিক্ত বিস্ময় ও অতিরিক্ত না-জানার ভাব দেখাইল। পরে আবার বলিল যে, ওরকম লুঠপাট চিরদিনই হইতেছে, ওটা একশ্রেণীর লোকের ব্যবসা।

সুরেশ বহু চেষ্টা করিবার পর এ আলোচনা বন্ধ হইল। তখন মাল খালাস করিয়া দিয়া রসিদ সহি করাইয়া সুরেশ জাহাজে যাইয়া উঠিল। সুন্দর সিংএর বাংলো হইতে বাহির হইবার পরই সুরেশ লক্ষ্য করিল, অপর জাহাজটি আর সেখানে নাই। ইহাতে সে বুঝিতে পারিল যে, পিয়ারীলাল চৌধুরী দ্রুত পলায়ন করিয়াছে। তখন তাহার সন্দেহ আরও গাঢ় হইল।

সুরেশ সুন্দর সিংএর জন্য যে মাল আনিয়াছিল তাহা তখনই খোলা হইল। দেখা গেল তাহার মধ্যে নানারকম ছুরী, কাঁচি, টীনের খেলনা, টীনের ঘড়ি, নানা রঙ্গের তৈরী কুর্ত্তা, রংকরা নকল সিল্কের থান ও সুতির কাপড়। সুন্দর সিংএর নির্দ্দেশমত ভৃত্যেরা তাহা যথাযোগ্য স্থানে সাজাইয়া রাখিল।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িল, বেণীমাধব আকারা হইতে যাত্রা করিল।

তাহারা আবার সমুদ্র বাহিয়া দক্ষিণ দিকে চলিল। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল; ধীরে ধীরে সাগরবক্ষে অন্ধকার নামিয়া আসিল। সুরেশ ও বনমালী জাহাজের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া সুন্দর সিংএর কথা আলোচনা করিতেছিল। সুরেশ বলিল—"যদিও আমাদের হঠাৎ গিয়ে পড়ায় ওরা খুব বিব্রত হয়েছিল তবুও আমরা ঠিক নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, ও মাল সেই জাহাজ থেকেই লুঠ ক'রে নেওয়া হয়েছে। সুন্দর সিংএর যা ব্যবসা তাতে ওরকম মাল অনেকভাবেই আসতে পারে।"

—"কিন্তু ওদের ভাব দেখে সন্দেহ খুবই হয়।"

—"হাঁ সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু কি ক'রে বলা যায় যে এসব সেই মাল? আর একথা বলা চলে না যে ঐ জাহাজটির লোকেরাই সে জাহাজখানা লুঠ করেছে।"

বেণীমাধব আরও দুই-চারিটি ছোট ছোট জায়গায় থামিল এবং মাল খালাস করিয়া দিয়া ফিরিয়া চলিল; কিন্তু আকারার কথা তাহারা ভুলিতে পারিল না, অবসর পাইলেই আলোচনা করিত। (ক্রমশঃ)

লেখা ও লেখনী

বররুচি

গণেশকে ডাকিয়াছিলেন বেদব্যাস তাঁর মহাভারত লিখিয়া দিবার জন্য। গণপতি তাঁকে বলিলেন—'আমি লিখিব, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, আপনি বলিয়া যাইবার সময় থামিতে পারিবেন না। একবার যদি আপনি থামেন এবং তার ফলে আমাকে লেখনী থামাইতে হয়, তবে ঐখানেই আমি ইতি দিব, আর লিখিব না।'

ব্যাসদেব বলিলেন—'তথাস্তু, কিন্তু আমারও একটা সর্ত্ত আপনাকে বলি। আপনি আমার শ্লোকগুলি যেমন লিখিয়া যাইবেন, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থটাও বুঝিয়া লিখিতে হইবে; শ্লোকের অর্থ নির্ণয় না করিয়া লিখিবেন না।' গণেশ ঐ সর্ত্ত মানিয়া লইলেন।

তারপর ব্যাসদেব শ্লোকের পর শ্লোক বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর গণপতিও লিখিতে লাগিলেন এমনি দ্রুতবেগে যে, ব্যাসদেবকে একটু দুর্ভাবনায়ই পড়িতে হইল। তখন চালাকি করিয়া ব্যাসদেব মাঝে মাঝে এক একটা খুব শক্ত শ্লোক বলিতে লাগিলেন, যার অর্থ বুঝিতে গণপতিকে বেশ একটু সময় নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়—তা' তিনি দেবতা হইলে কি হইবে? ইতিমধ্যে ব্যাসদেব গোটাকয়েক শ্লোক আগাম তৈরী করিয়া রাখেন। এইভাবে নাকি হইয়াছিল মহাভারতের রচনা ও লিখন।

এখন মহাভারতের শ্লোক পড়িতে পড়িতে সময় সময় মনে একটা কৌতূহল জাগে যে, সিদ্ধিদাতা গণনাথ ঐসব লিখিবার সময় না জানি কি রকম কলম ব্যবহার করিয়াছিলেন। যদিও তাঁর কলমের গতিবেগের কথা ভাবিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, সেটি যেমন ছিল মজবুদ্ তেমনি চলিষ্ণু, তথাপি সে যে তোমাদের নিত্যকার বন্ধু শেফার্ড, ওয়াটারম্যান, ব্ল্যাকবার্ড, পেলিকান্ বা রাজা গোষ্ঠীর কোনও লেখনী নয়, তা' বুঝিয়া নেওয়ার জন্য ইতিহাসের পাতা না খুলিলেও চলে।

লেখা, লেখনী এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য বস্তুর উৎপত্তি, ব্যবহার ও ক্রম-পরিণতি ইতিহাসের একটা ছোট অথচ কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় বটে।

ইতিহাসে দেখিতে পাই, খুব প্রাচীনকালের—যেমন ধর, খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচ হাজার বছর আগেকার—মিশরের লোকদের যে লেখা, তাহাকে লেখা না বলিয়া ছবি বলিলেই ঠিক হয়। ও-গুলির দেখা পাওয়া গিয়াছে পিরামিডের গর্ভঘরে কবরের দেওয়ালে, বালি-চাপা মন্দিরের গায়ে বা আমাদের লুচি-বেলা বেলনের মত গোল করিয়া পাকানো 'পেপিরাসের'

প্রাচীন পুঁথির পাতায়। লেখাটা কিন্তু দেখিতে বেশ্। তবে স্পষ্টই বুঝা যায় 'ড্রইং' ভাল না জানিলে ঐ ধরণের লেখা সহজে কাহারও হাতে আসিতেই পারে না; কারণ উহার এক একটি অক্ষর বা ভাব এক একটি চিত্র—পাখী, পাতা, পদ্ম, হাত, কোন পশু, কোনও বস্তু ইত্যাদি দিয়া প্রকাশ করা হইত। কালক্রমে অবশ্য উহাদের ছবিত্ব একটু একটু করিয়া কমিয়া শেষে আসিয়া দাঁড়াইল কয়েক রকম সোজা ও বাঁকা রেখার সমষ্টিতে, যা' থেকে পরে উৎপত্তি হইল কতকটা আধুনিক ধরণের অক্ষরের। মানুষ কাঁহাতক আর পরম ধৈর্য্যে নিখুঁত ছবি আঁকিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, বল? কারণ হাতের চেয়ে মন যে চলে অনেক দ্রুত।

উপরে 'পেপিরাস্' (papyrus) শব্দটা বলিয়াছি। ওটা কিন্তু তোমাদের খুব অচেনা শব্দ নয়; কারণ তোমরা যে সর্ব্বদা বল 'পেপার' (কাগজ)—তা' আসিয়াছে ঐ পেপিরাস্ শব্দ থেকে।

আসলে পেপিরাস্ ছিল এক জাতীয় জলজ তরু, কতকটা আমাদের দেশের নল-খাগ্ড়ার মত। প্রাচীনযুগের মিশরীয় লোকেরা ঐ গাছের রীতিমত চাষ-আবাদ করিত, যেহেতু পেপিরাসের কতকগুলি গুণের জন্য উহার ব্যবহার ছিল সেকালে খুবই সাধারণ। তার মধ্যে প্রধান ব্যবহারটা অবশ্য পুঁথি লেখার কাগজ তৈরীতে। কাগজ বলিলাম বটে, কিন্তু সে এক অপূর্ব্ব ধরণের কাগজ। তা' তৈয়ার করা হইত এইভাবে:—

লম্বা নলের মত একটা পেপিরাস্ গাছ নিয়া তাকে দরকারমত ছোট বা বড় টুক্রায় কাটা হইত। ঐরকম একটা টুক্রা লইয়া লম্বালম্বিভাবে তা' থেকে উহার বাকলটা পাত্লা করিয়া ছাড়াইয়া লইত, যেমন তোমরা কলাগাছের ডোঙ্গা বা ডিঙ্গা বানাইবার জন্য পাত্ পাত্ করিয়া উহার খোল বা বাকলটা চাঁচিয়া তোল, ঠিক্ তেমনি ভাবে। তারপর ঐ পাত্লা বাকলের কয়েকখানি গায়ে গায়ে ঠেকাইয়া পাশাপাশি সাজাইলে বেশ চওড়া এক তা' কাগজের আকার ধরিত; তার উপর আবার আড়াআড়ি ভাবে পাশাপাশি কয়েক ফালি পেপিরাস্ আঁঠা দিয়া সাটিয়া দিতেই সবটা জুড়িয়া গিয়া চমৎকার একখানি কাগজের পাতার মত হইয়া যাইত। এই হইল প্রাচীন মিশরের কাগজ।

আমরা যেমন করিয়া বই বাঁধাই, বা সাবেক কালে আমাদের দেশে কাঠের দু-পাটার মধ্যে তালপাতা বা তুলট্ কাগজের টুক্রা পরতে পরতে সাজাইয়া যেমন পুঁথি বাঁধা হইত, মিশরীয়েরা কিন্তু পেপিরাসের পাতা সেইভাবে সাজাইয়া পুঁথি করিত না। তা'রা এক পাতার নীচে আর এক পাতা জুড়িয়া একটানা দীর্ঘ একখানি পাতা করিয়া পুঁথি লিখিত ও উহা "গাজির পটের" মত গুটাইয়া রাখিত। ওরই এক একটা বেলন ছিল তাদের এক একখানা বই।

বই বাঁধার এই নিয়মটা তার পরও, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত, লোহিত ও ভূমধ্য-সাগরের চারিপাশের দেশে লিখক ও পাঠকদের মধ্যে চলিত ছিল। পেপিরাসের পর ওসব দেশে

তখন কাগজের স্থান নিয়াছিল পশুচর্ম্ম। বিশেষ যত্নে চাম্‌ড়াকে লিখিবার উপযুক্ত করিয়া তৈয়ার করা হইত, যার নাম ছিল পার্চমেণ্ট (parchment)। ঐ সব প্রাচীন পুঁথির ছবি-লেখা বা লেখা নিশ্চয়ই কোন রকম কলম দিয়া হইত, তা' না হইলে ওরকমের সূক্ষ্ম দাগ আর কিছু দিয়া কাটা সম্ভব নয়।

আরব-পারস্যের মানচিত্রে যেখানে দেখিবে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী দুইটি অনেক শাখা-প্রশাখা মেলিয়া বহিয়া যাইতেছে, ঐ দেশটার প্রাচীন নাম ছিল এশিরিয়া। খৃষ্ট জন্মের ছয়-সাত শত বৎসর আগে ওখানে রাজা ছিলেন—অসুরবানিপাল। তাঁর রাজধানী নিনেভে সহরের ধ্বংসাবশেষে অনেক আশ্চর্য্য বস্তুর সঙ্গে রাজার একটা গোটা লাইব্রেরীই বাহির হইয়া পড়িল! তোমরা হয়তো ভাবিতেছ—সে একটা মস্ত ঘর, তাতে সারি সারি আল্‌মারীতে চক্‌চকে বাঁধানো সব বই। তা' কিন্তু নয়। শুনিলে হয়ত বিশ্বাস যাইবে না—বই যে ক'খানি পাওয়া গেল তা' সবই একদম্ কাদামাটির। চৌকো পাত্‌লা ইটের মত এক একখানা মাটির ফলক, তারই গায়ে লেখা। সে লেখা যেন কতকগুলি বিভিন্ন ভঙ্গীতে সাজানো তীরের ফলার মত ছাপের সমষ্টি—ছত্রে ছত্রে সাজানো। দেখিতে মন্দ লাগে না। কাঁচামাটির নরম ফলকে একটা চৌফলা, সূক্ষ্মাগ্র কোন ধাতব শলাকা দিয়া উহা লেখা হইত। কালির হাঙ্গামা নাই। ওরকম কলম দিয়া আমাদের মত টানিয়া লেখা হইত বলিয়া বোধ হয় না। কলমটাকে কায়দামত ধরিয়া ফলকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া লিখিয়া চলিলেই তীরের ফলার ছাপের মত বেশ পরিষ্কার অক্ষর সহজেই ফুটিয়া উঠিত। পরে ফলকখানি শুকাইয়া, পোড়াইয়া নিলেই দিব্য বই হইয়া যাইত। হয়তো ঐরকম শত শত মাটির ফলক লাইব্রেরী-ঘরের দেওয়ালে কাটা কুলুঙ্গির মধ্যে সাজানো থাকিত। ওদের লেখাটা পড়িতে হইত আমাদের আজকালকার লেখারই মত বাঁ-দিক থেকে ডাইনে। অনেক আগে নাকি উহা উপর থেকে নীচের দিকেও লেখা হইত।

আগে যে মিশরীয়দের আদিম চিত্রাক্ষর লেখার কথা বলিয়াছি তা' কিন্তু অনেক সময়ই লেখা হইত ডাইনে থেকে বাঁয়ে; যেমন লেখা হয় আজও আর্‌বি, ফার্সী, উর্দ্দূ;—এসব একই গোষ্ঠীর লেখা কিনা!

মিশরীয় লেখা থেকে লিখিতে শিখে ফিনিসীয়ার লোকেরা; তাদের থেকে ইহুদীরা ও প্রাচীন গ্রীকেরা। প্রথমতঃ গ্রীকেরাও ডাইনে থেকে বাঁয়ে লিখিত। তারপর তা'রা এই পদ্ধতিটা বদ্‌লাইয়া লিখিতে থাকে একছত্র ডাইনে থেকে বাঁয়ে, পরের ছত্রটি বাঁ থেকে ডাইনে,—আবার তার পরেরটি ডাইনে থেকে বাঁয়ে—যেমন বলদে মাঠে লাঙ্গল দিয়া যায় সেই ভঙ্গীতে। সব শেষে গ্রীকেরা লিখিতে সুরু করে বাঁদিক থেকে ডাইনে, যেমন আজকাল লিখ তোমরা বাংলা, ইংরাজী ইত্যাদি।

চীনদেশের লোকেরা লিখিতে শিখিয়াছে কোন্ 'আদ্দিকালে' তার ঠিক্-ঠিকানা নাই।

ওদের ভাষায় অক্ষরের সংখ্যাই নাকি সাতচল্লিশ হাজার! তার অর্থ কি জান? ওদের ভাষায় যত শব্দ তত অক্ষর। আমাদের অক্ষরে প্রকাশ করে ধ্বনি, ওদের করে বস্তু বা ভাব। এতগুলি অক্ষর সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, ওদের পণ্ডিতেরাও চেনে না; দু'চার হাজার অক্ষর মনে রাখিলেই কাজ চলে। দেখিতে ওদের এক একটি অক্ষর যেন কতটি মোটা রেখার জালি। ঐ রেখা কোন্ অক্ষরে কতটি তাই গণিয়া নাকি অক্ষর চিনিয়া লইতে হয়।

আমাদের দেশে গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা এখনও কলা বা তালপাতার উপর, কঞ্চি বা খাগের কলম দিয়া লিখে। কালি হয় ভুসা, নয় সিয়াই। প্রাচীন গ্রীস-রোমের ছেলেরা কিন্তু লিখিতে শিখিত মোম-মাখানো কাঠের পাটায় ছুঁচালো লোহার শলা দিয়া। এ লেখায় কালির প্রয়োজন নাই, লেখা মুছিয়া ফেলিতেও খুব সহজ; মোমটা একটু ঘষিয়া দিলেই হইল। ওদের ঐ কলমকে বলিত ষ্টাইলাস্ (Stylus) যা থেকে তোমাদের Stylo কলমের নাম। ক্বচিৎ এদেশেও লম্বা তক্তায় ছোটদের বর্ণমালা খড়ি দিয়া লিখিয়া শিখিতে দেখা যায়।

এদেশে স্বর্ণকারদের মধ্যে যারা পরে নক্সার কাজ করিবে তা'রাও প্রথমটা নক্সা দাগিতে শেখে—কাঠের পাটায় ঠিক ঐ stylusএর মত লোহার শলা দিয়া। কিন্তু পাটায় মোম না দিয়া এরা তাতে ভুসা কালি ঘষিয়া ঘষিয়া একেবারে মসৃণ করিয়া লয়। তার উপর ঐ শলা দিয়া দাগ দিতেই উহা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। নক্সা দাগিলে উহা বেশ পরিষ্কার রেখায় চিক্‌মিক্ করিতে থাকে। দাগ মিটাইতে হইলে কালিতে ঈষৎ ভিজানো এক টুক্‌রা ন্যাক্‌ড়া দিয়া মুছিয়া ফেলে।

এই stylus ব্যবহারের রীতিটা শুনিয়াছি উড়িয়া পুঁথি-লিখকেরাও চালাইত; এখনও চালায় কিনা জানি না। তা'রা তালপাতার উপর আগে লোহার শলা দিয়া চাপিয়া লিখিয়া যাইত। পরে ঐ লেখার উপর উপর সিয়াই কালি-মাখা ন্যাকড়া ঘষিয়া দিত। তারপর তালপাতাটি জলে ধুইয়া দেখিলে কালি শলার রেখায় আট্‌কাইয়া থাকায় সুন্দর কালো লেখা বাহির হইত; ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তালপাতা, ভোজপাতা বা তুলট্ কাগজের উপরে কিন্তু রীতিমত কালি কলম দিয়াই লেখার প্রচলন ছিল। সিয়াই কালি দিয়া খাগ বা কঞ্চির কলমের সে সব লেখা; কিন্তু কি সুদৃশ্য! যাকে বাস্তবিক বলা যায় 'মুক্তোর গাথুনি'।

আজকাল বাজারে কত রকমারি কালি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের সাবেকি বাংলা কালি বা সিয়াই—তাদের চেয়ে খারাপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পাকা, ঘোর কালো সে কালির লেখা শত বছরের পুরানা হইলেও জ্বলিয়া যায় নাই, এমনও দেখা যায়।

গ্রামের পড়ুয়া ও দোকানীরা এখনও সিয়াই ছাড়ে নাই। কঞ্চি ও খাগের কলমটা শুধু পাঠশালায় চলে। দোকানীরা আগে পাখের কলমে লিখিত, এখন নিব ধরিয়াছে। পাখের কলম, যাকে ইংরাজীতে বলে Quill pen,—এর চলন আগে ছিল জগতের সর্ব্বত্র। কি এদেশে, কি বিলাতে ও-ই ছিল উচ্চশ্রেণীর লেখনী। মাত্র শ-খানেক বছর হইল লৌহযুগের যন্ত্র-দানব

বেচারাকে ঐ সম্মানের সিংহাসন থেকে সরাইয়া দিয়াছে। পাখের কলম কি জান? হাঁসের বা ময়ূরের শক্ত ডাঁটওয়ালা পাখার সুডৌল গোড়ার দিকটা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ঐ কলম তৈরী করিতে হয়। খুঁজিলে এখনও এর সাক্ষাৎ মেলা একেবারে অসম্ভব নয়।

Stylus, কঞ্চি, খাগ ও পাখের কলমের সুবিধা এই যে ওতে নিব ও হ্যাণ্ডল জোড়া দেওয়ার হাঙ্গামা নাই। সবই একঠাঁই বর্ত্তমান। তোমাদের ঝরণা-কলমের আবার তৃতীয় সুবিধা—কালিটাও থাকে সঙ্গে। কিন্তু ঝরণা-কলমের খরচ অনেক।

আগের দিনে গুরুজনদের প্রণাম করিলে একটা আশীর্ব্বাদ মিলিত, "তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক্," হালে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ যেন দেশ থেকে উঠি উঠি করিতেছে। তা' যাক্ গে, —সোনার দোয়াত কলম কিন্তু মিলিয়াছে তোমাদের। ঝরণা-কলম—সোনার পাতে মোড়া, সোনার নিব। সেই স্বপ্নের সোনার গাছে রূপোর ডাল, হীরের পাতা, মুক্তোর ফল আর কি! তবে হাতের লেখার ছাঁদে তোমরা যেন প্রাচীনদের কাছে হারিয়া যাওয়ার পথে চলিয়াছ বলিয়া ভয় হয়। শুনিয়াছি চীনারা আজও সুন্দর ছাঁদে লেখা একটা শিল্প হিসাবে যত্ন করিয়া শেখে। আমাদের সে রকম করিলে ক্ষতি কি?

এইবার লেখার কালি শুকাইবার পুরাণা রীতির কথা বলিয়া ইতি দেই।

এখনকার ঝরণা-কলমের কালি এমন করিয়া তৈরী যে, লিখিতে লিখিতেই লেখা শুকাইয়া উঠে। কালি-কলমে যারা লেখে তা'রা ব্লটিং পেপার চাপিয়া কালি শুকায়। ব্লটিং পেপার একটা আধুনিক জিনিস বলিতে পার। সাবেক কালে এর কাজ করিত ভাজা বালিতে। বালি কাঠ্‌খোলায় ভাজিয়া লওয়া হইত। লেখার অন্যান্য সরঞ্জামের সঙ্গে মাটির খোরায় খানিকটা ভাজা বালিও লেখকের হাতের কাছে উপস্থিত থাকিত। লেখক দরকারমত ঐথেকে এক চিম্‌টি বালি লেখার উপর ছড়াইয়া দিয়া লেখা কাগজ বা তালপাতা ঝাড়িয়া ফেলিত। ভাজা বালি কালি শুষিয়া নিয়া যাইত। এই প্রথাটাও প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

যুদ্ধের দরুণ সব রকমের কাগজের যা দাম! এখন তোমাদের লিখিবার ডেস্‌কের উপর ব্লটিং-এর বদলে এক বাটি ভাজা বালি রাখিলে কেমন হয়?

কলিকাতায় প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলা চলছে খুব জোরে। যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কলিকাতার লোকসংখ্যা অনেক কমে' গেছে বটে; কিন্তু মাঠে গেলে উৎসাহ ও উত্তেজনা অন্যবারের চেয়ে বিশেষ কম মনে হয় না।

প্রথম বিভাগে এবার খেলছে ১৩টি টিম। এর মধ্যে মহামেডান্ স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলই সব চেয়ে ভাল খেলছে। ইষ্টবেঙ্গল প্রথম ছয়টি খেলায় একটানা জয়লাভ ক'রে প্রথম পরাজয়ের গ্লানি বরণ করেছে মহামেডান্ স্পোর্টিংএর কাছে ২—১ গোলে, শুধু গোলকিপারের দোষে। ইষ্টবেঙ্গল দলের ভাল তিনজন খেলোয়াড় অন্য দলে চ'লে যাওয়ায়, বিশেষতঃ বিখ্যাত গোলকিপার ডি. সেন যাওয়ায় একটু ক্ষতি হয়েছে। তা' হ'লেও ঐ দলের খেলা খুব ভালই হচ্ছে। মহামেডান্ স্পোর্টিং-এর টিমের কোন অদল-বদল হয়নি। মোহনবাগানে কয়েকজন খুব ভাল খেলোয়াড় যোগ দিয়েছেন; কিন্তু বি. এণ্ড এ. রেলওয়ের কাছে ৩—০ গোলে হেরে যাওয়াটা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। অবশ্যই মোহনবাগান এবার মহামেডান্ স্পোর্টিংকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। খেলা হবে মোট ২৪টি। খেলায় শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে তা' বলা শক্ত, তবে ইষ্টবেঙ্গল এবার প্রথমার্দ্ধের খেলায় মহামেডান্ স্পোর্টিং থেকে ৩ পয়েণ্ট বেশী আছে।

কয়েকজন ভাল ভাল খেলোয়াড় চ'লে যাওয়ায় কালীঘাট টিমটি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, সুতরাং এবারে মোটেই সুবিধে করতে পাচ্ছে না। এরিয়ান্স্ এখনও বেশ ভালই খেলে চলেছে, শেষ রক্ষা হ'লেই ভাল। ভবানীপুর এবং বি. এণ্ড এ. রেলওয়ে মাঝামাঝি রকমের টিম। খুব নামজাদা খেলোয়াড় বেশী আছেন এই রেল দলটিতে। ফুটবলের যাদুকর সামাদ এবারেও খেলছেন। একটি ম্যাচে তিনি ঠিক আগেকার মতই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তাঁর বয়স এখন প্রায় ৫০; প্রায় ৩০ বছর ধ'রে একটানা

প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলায় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করার যোগ্যতা আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের হয়েছে ব'লে আজ অবধিও শুনিনি।

এবার সব চেয়ে বেশী দুর্দ্দশা হয়েছে দুর্দ্ধর্ষ কাষ্টমস্ দলের। এই দলটিকে সমীহ ক'রে খেলত না এমন টিম কলিকাতায় ছিল না। শিল্ড খেলায়ও কত বড় বড় টিমকে এই দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই দলই আজ প্রথম বিভাগের খেলায় ক্রমাগত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ডালহৌসীর অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। ক্যালকাটা গত দুই বছরের চেয়ে এবার অনেকটা ভাল খেলছে। পুলিশদল খুব কৃতিত্ব দেখাতে পাচ্ছে না, তার কারণ যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য প্রায়ই ভাল খেলোয়াড়রা খেলায় যোগ দিতে পাচ্ছেন না। এই কারণেই রেঞ্জার্স দলেরও ঢের অবনতি হয়েছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন্ মোহনবাগানের সঙ্গে যে 'ড্র' রেখেছে, এইটাই তার বড় কৃতিত্ব। খেলার এখনও ঢের বাকী, সুতরাং শেষে ভাল খেলবে এ আশা করা যায়।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের তালিকা

(২৩শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত)

টিমের নাম	খেলার সংখ্যা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে গোল	বিপক্ষে গোল	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১২	১১	০	১	৩০	৫	২২
মহামেডান্ স্পোর্টিং	১১	৭	৩	১	৪০	৮	১৭
মোহনবাগান	১২	৭	৩	২	২৭	১০	১৭
এরিয়ান্স	১০	৫	৩	২	১৬	৯	১৩
কালীঘাট	১১	৫	২	৪	১৬	১১	১২
ভবানীপুর	৯	৩	৫	১	৯	৫	১১
বি. এণ্ড এ. আর	১০	৪	৩	৩	১৭	১৫	১১
ক্যালকাটা	১২	৪	৩	৫	৮	৩০	১১
পুলিশ	১০	৪	২	৪	১৪	১০	১০
স্পোর্টিং ইউনিয়ন্	১১	২	৪	৫	১২	১৮	৮
রেঞ্জার্স	১১	২	১	৮	১২	১৮	৫
ডালহৌসী	১১	১	১	৯	৯	৩১	৩
কাষ্টমস্	১২	১	০	১১	৪	৪৪	২

ধাঁধা

১। আকাশের শিশু আমি পৃথিবীতে যুবা,
শক্তির উৎস লয়ে ফিরি রাত্রি-দিবা;
দেশে দেশে বার্ত্তা বহি, মেঘেতে প্রকাশ,
তাইত আদর করি ঘরে দেয় বাস।

২। মকরেতে জন্ম, কুম্ভে চোখ মেলি চায়,
মীন তাকে দেখিলেই খুশী হয়ে খায়;
মেষ আর বৃষে তারে খেয়ে তৃপ্ত হয়,
বলত সকলে মোরে কি নামেতে কয়?

৩। দুই আখরে নাম মোর থাকি সব ঠাঁই,
নিজেরে না দেখি আমি—পরেরে দেখাই।

শ্রীঅমলেন্দুবিকাশ রায়

দ্রষ্টব্য—ধাঁধার উত্তর ১২ই আষাঢ়ের মধ্যে **শিশুসাথী কার্য্যালয়, ৩।৮নং জনসন রোড, ঢাকা** এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। তিনটি ধাঁধার উত্তর ঠিক না হইলে নাম ছাপা হইবে না।

কল্যাণীবালা স্মৃতি-পদক

কল্যাণীবালা ছিল শিশুসাথীর একজন গ্রাহিকা। মাত্র পনের বৎসর বয়সে সে পরলোক গমন করিয়াছে। তাহার অকাল-মৃত্যুতে তাহার মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় আমরাও বিশেষ দুঃখিত। ১৩৪৮ সনের ভাদ্র মাসের শিশুসাথীতে কল্যাণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

কল্যাণীর স্মৃতিরক্ষার্থ তাহার অভিভাবকগণ গত বৎসর হইতে একটি গল্প বা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবৎসর শিশুসাথার সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। আমাদের বিচারে যাহার গল্প বা প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাহাকে একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইবে।

এবছরের প্রতিযোগিতার বিষয় হইল—**'শিশুর খেয়াল'**। এসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বা গল্প লিখিতে হইবে। রচনা বেশি দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়—ফুলস্কেপ কাগজের তিন পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হইলেই ভাল। পেন্‌সিলের লেখা বা কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা চলিবে না।

আগামী **১৫ই শ্রাবণ** তারিখের মধ্যে রচনাটি শিশুসাথী কার্য্যালয়ে (**৩।৮নং জনসন রোড, ঢাকা**) পৌঁছান বাঞ্ছনীয়। রচনার সঙ্গে লেখক বা লেখিকার নাম, ঠিকানা ও **গ্রাহক নং** উল্লেখ করিতে হইবে। —শিঃ সাঃ সঃ

কৈফিয়ৎ—শ্রীযুক্তা লীনা দত্তগুপ্তার লেখা 'গম্বুজ সিং' কবিতাটি আমাদের নিকট ছিল। এমাসের পত্রিকা ছাপা শেষ হইলে লেখিকা আমাদের জানাইয়াছেন, তাঁহার ঐ কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র ছাপা হইয়াছে। আমরা এজন্য যথেষ্ট লজ্জিত ও দুঃখিত। —শিঃ সাঃ সঃ

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Sankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

একবিংশ বর্ষ ‖ শ্রাবণ, ১৩৪৯ ‖ ৪র্থ সংখ্যা

গাঁয়ের বর্ষা

শ্রীবিজয় চক্রবর্ত্তী

রাতদিন ঝুপ্ ঝাপ্ অবিরাম বৃষ্টি,
শাওনের ধারা নেমে' ভেসে' গেল সৃষ্টি।
কোথা আর হ'বে বা'র—কাদাজল ভিন্ন ?
মেঘে ঢাকা 'রবিমামা'—নাই তা'র চিহ্ন।
কাজলা কালো মেঘে চারিদিক্ আঁধিয়ার,
থই-থই শুধু জল নদী নালা একাকার,
ওপারের তরু-শির হ'য়ে আসে ঝাপ্ সা,
খেয়াতরী বাঁধা-ঘাটে'—ঢেউয়ে দোলে 'রূপ্ সা'
গাঙের কূলে বাঁধা জেলেদের ডিঙ্গি,
'ঘুণি পেতে' ধরে মাছ—কই আর সিঙি।

দেয়া ডাকে গুরুগুরু, ধারা নামে অবিরাম,
কুঁড়েঘরে জলে ভিজে—শীতে কাঁপে দুখীরাম।
কদমের সাথে সাড়া দেয় আজ কেয়াফুল,
ভেক সব দল বেঁধে আমোদেতে মশ্‌গুল।
ধরণীর বুকে নেমে' যূঁই করে মিতালি,
ঝোপে ঝোপে জোনাকির আজ বুঝি দীপালী।
নিশুঁতি নিঝুম রাতে ঝড় উঠে উছলি',
আঁধারের বুক চিরে কেঁপে যায় বিজলী।
মাঠে মাঠে দোলা লাগে পেয়ে' কার স্পর্শ,
কিষাণের মুখে ফোটে পুলকের হর্ষ।
ক্ষণেকে রোদের আভা—হয়ে আসে ফর্সা—
চকিতে মেঘের সাথে নেমে আসে বর্ষা।

সৈনিক

আ. কা. মো. শা.

তুর্কীরা গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌ছিলো প্রাণপণে।

কেন? স্বাধীনতা চাই। বিদেশীকে আমাদের দেশে প্রভুত্ব কর্‌তে দেবোনা—আমরা কারো অধীন হয়ে থাকবো না।

যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে অগ্নিবৃষ্টি—অবিরাম গোলাগুলি চল্‌ছে—সর্ব্বত্র অগ্নি ও আগ্নেয় অস্ত্রের এক বিরাট তাণ্ডব।

ধোঁয়া—অন্ধকার—!

তুর্কী সৈন্যদল স্মার্ণা থেকে গ্রীকদের তাড়িয়ে দিচ্ছিল। স্মার্ণায় পৌছবার কিছু আগে তারা সেদিনকার মত একটা যায়গায় থাম্‌লে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে—যুদ্ধক্ষেত্র এখন স্তব্ধ। রাশি রাশি মৃতদেহের মাঝে তখনও কয়েকটা আহতের কাৎরানি ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছিল।

জেনারেল কামালউদ্‌দীন সামি ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে ঘুরে ফিরে দেখ্‌ছিলেন। অনেকগুলি সৈনিকের শব ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে—গ্রীকরা ফেলে পালিয়েছে—ছিন্নভিন্ন বীভৎস সব দেহ।

হঠাৎ একটা মৃতদেহ যেন একটু নড়ে উঠ্‌লো। একজন গ্রীক সৈন্যের দেহ। মারা যায়নি, বেঁচে আছে তখনো।

কামালউদ্‌দীনকে দেখে সে চীৎকার করে উঠ্‌লো—"জল! জল!"

আনাতোলিয়ায় জল বড়ো সহজে মেলে না। কামালউদ্‌দীন গত মহাযুদ্ধে দু'-দু'বার আহত হয়েছিলেন—বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে আহত অবস্থায় যখন যন্ত্রণায় প্রাণ মুমূর্ষু—এক ফোঁটা জলের জন্য তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়—তখন জল যে কত তৃপ্তি ও শান্তি এনে দেয়, তা তিনি জান্‌তেন। তিনি অনুভব কর্‌লেন গ্রীক সৈন্যটির যন্ত্রণা প্রাণ দিয়ে।

তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তার ফ্লাস্কে যে শেষ জলটুকু ছিলো, তা' সৈন্যটিকে কোলের ওপর শুইয়ে, তার মুখে ঢেলে দিলেন।

উপবাসী পশুর মত সে একচুমুকে জলটা খেয়ে ফেল্‌লে।

সৈন্যটি গুরুতর আহত। বোধহয় কামানের গোলার আঘাতেই তার একটা পা একেবারে কোমরের কাছ থেকেই ছিঁড়ে গেছে। কামালউদ্‌দীন বড়ো বিচলিত হয়ে পড়্‌লেন। আহত সৈন্যটির প্রতি করুণায় তার দুই চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠ্‌লো।

কিন্তু, না—তিনি তুর্কী সৈন্য। গ্রীকরা তাদের শত্রু। জোর করে সমস্ত দুর্ব্বলতা তিনি ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া একজন সেনানীর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।

তাড়াতাড়ি ঘোড়াটার দিকে ফিরে চল্‌লেন। পিছন ফিরে একবার তাকালেনও না। গ্রীক সৈন্যটি তখন কিছুটা সুস্থ।

শ্যেন দৃষ্টিতে সে তার প্রাণদাতার দিকে একবার তাকিয়ে বাঁ পা দিয়ে ঠেলে রাইফেলটাকে হাতের কাছে আন্‌লে।

ক্রম্! ক্রম্!

কামালের দেহটা লুটিয়ে পড়লো। আর একটিতে তাঁর দেহ নিস্তব্ধ অসাড় হ'য়ে গেল।

গ্রীক সৈন্যটার জলভেজা ঠোঁটে ফুটে উঠ্‌লো—পৈশাচিক প্রতিহিংসার হাসি। হাঃ-হাঃ করে অট্টহাসি হেসে সে সান্ধ্য আকাশে এক ভয়ঙ্কর তরঙ্গ তুল্‌ল। কেঁপে কেঁপে সে হাসি বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হলো অনেকক্ষণ ধরে।

গর্দ্দভ! এই ছিলো আমার—সৈন্যের কর্ত্তব্য! সে হাস্‌লে তৃপ্তির হাসি। পরক্ষণেই একটা কাতর শব্দ করে সে তাঁর মাথাটা এলিয়ে দিলে—পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে।

কাকে দোষ দেই? কামাল কি ভুল করেছিলেন? গ্রীকসৈন্যটি কি তার কর্ত্তব্য করেনি?

দয়া, করুণা অর্থাৎ মানবতা আর কঠোর কর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব এইখানে—এই যুদ্ধক্ষেত্রে।

গ্রীক সৈন্যটিকে গ্রীকরা বল্‌বে, বীর! আর কামালকে সকলে বল্‌বে, মহানুভব—না,—বোকা—নির্ব্বোধ।

দয়ামায়ার স্থান যুদ্ধে নেই—আছে শুধুই হত্যা।

যুদ্ধ ও জাহাজ

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

বাংলার রাজা বিজয়সিংহ সাত শত সঙ্গী নিয়ে নৌকায় ক'রে সমুদ্র পার হ'য়ে লঙ্কাদ্বীপে গিয়েছিলেন, এ কথা কে না জানে? কিন্তু যে নৌকায় সাত শো লোক যেতে পারে সেটাকে কি বলব? সেটা কি জাহাজ নয়? অত বড় সমুদ্রগামী নৌকা বা জাহাজ সে যুগে পৃথিবীর আর কোন দেশে তৈরি হয় নি, তৈরি হয়েছিল আমাদেরই এই বাংলা দেশে। প্রশান্ত মহাসাগরের পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তুচ্ছ ক'রে এই রকম জাহাজে চ'ড়ে ভারতবর্ষের লোক যখন দেশ-দেশান্তরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন অন্য দেশ জাহাজ তৈরি করতে শেখেনি; ভারতবাসী এই শিল্পে শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য লাভ করেছিল।

তখন জাহাজ তৈরির কারখানায় সবই করতে হ'ত হাতে, কলের আবিষ্কার হয়নি, কাজেই পরিশ্রম ও সময় লাগত অত্যন্ত বেশী। নানা কারণে ভারতের এই শিল্পটির অগ্রগতি গেল রুদ্ধ হ'য়ে। চাকা গেল ঘুরে; পশ্চিমের নৌ-শিল্প গ'ড়ে উঠল, কলের আবিষ্কার হ'ল এবং এই নৌ-শিল্প ও নৌ-শক্তি হ'ল বর্ত্তমান জগতের সভ্যতার একটি সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। বাণিজ্য, দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন, সমুদ্রের ওপরে আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদি কাজ ছাড়াও জাহাজ এখন যুদ্ধেরও একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ।

বর্ত্তমান যুদ্ধের মোটামুটি তিনটি অঙ্গ ধ'রে নেওয়া যেতে পারে; জাহাজ, ট্যাঙ্ক আর বিমান। এর একটা অঙ্গ দুর্ব্বল হ'লেও যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য্য। এই জন্যই আমেরিকা ও ইংলণ্ড জাহাজ তৈরির যে ব্যবস্থা করেছে, তা শুনলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়; ট্যাঙ্ক ও বিমান তৈরির সংখ্যা শুনলেও স্তম্ভিত হ'তে হয়।
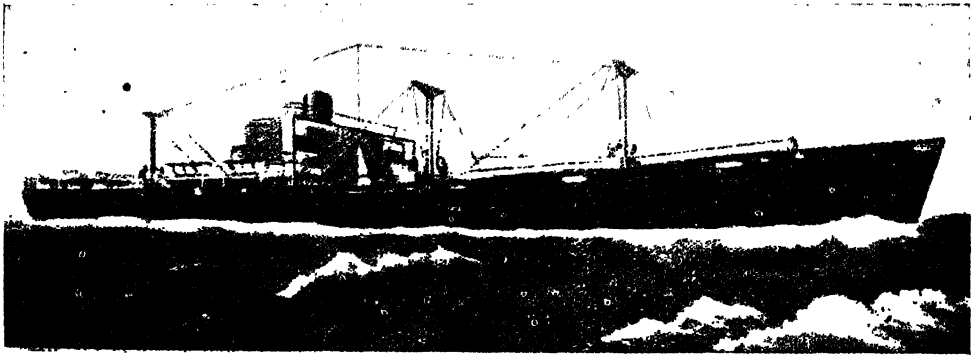
লিবার্টি সিপ

জাহাজ হচ্ছে মানুষের তৈরি একটা অতি বিশালকায় জীবন্ত জন্তুর মত। বুক দিয়ে মহাসাগরের ঢেউ কেটে সে চলে, মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডটার মত ইঞ্জিনটা তার দেহের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ধুক্‌ধুক্ করে। মানুষের যেমন মেরুদণ্ড, জাহাজেরও তেমনি একটা প্রকাণ্ড অত্যন্ত শক্ত মেরুদণ্ড আছে; এই মেরুদণ্ডের দু'পাশ থেকে পাঁজরার হাড়ের মত লোহার কড়ির হাড় উঠেছে। জাহাজের সামনেকার শেষ প্রান্ত থেকে পেছনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত লম্বা এই মেরুদণ্ডটি প্রথমে তৈরি হয়; এইটিকে বলা হয় কীল্ (Keel)। এই কীলের ওপরেই পাঁজরা, বুক, হৃদ্‌পিণ্ড বসানো হয়। এইগুলো সবই অতি উৎকৃষ্ট লোহার। জাহাজের যে অঙ্গে যে প্লেট, কড়ি, পাইপ, থাম, ট্যাঙ্ক ও বয়লার ইত্যাদি লাগে, তা'র

নিখুঁত মাপ অনুসারেই সেইগুলি তৈরি হয় কারখানায়। তৈরির পর প্রত্যেকটি জিনিষে চিহ্ন দেওয়া হয়, সেই চিহ্ন দেখে কারিকরেরা বুঝতে পারে কোন্ টুকরো কোন্ জায়গায় বসাতে হ'বে। এই জন্যই তাদের পক্ষে এইগুলি খুব তাড়াতাড়ি ফিট করা সম্ভব হয়। কীল্ থেকে আগাগোড়া যে লোহার পাঁজরা উঠে, তাতে খুব পুরু লোহার পাত বসানো হয়। একটা পাত আর একটা পাতের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে এমন ভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যে, আর কখনো খুলতে পারা যায় না। স্ক্রু দিয়ে এই রকম জোড়ানোকে বলা হয় রিভেট করা। জাহাজের পাঁজরা আগাগোড়া ঢাকা হ'য়ে গেলে তার বাইরেকার যে রূপটি দেখা যায়, তাকে বলে হাল (Hull)। এই হালের ভেতরে খুব পুরু লোহার প্লেট জুড়ে জুড়ে বসিয়ে অনেকগুলি বড় বড় কুঠরী তৈরি হয়, কোনটা ট্যাঙ্ক করা হয়, কোনটা বা ইঞ্জিনের ঘর, কয়লার ঘর ইত্যাদি।

একটা বড় জাহাজে কত লোহা লাগে তা তোমরা সহজেই বার করতে পারবে যদি তোমাদের এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, ১১০০০ টনের একটি জাহাজ তৈরি করতে ২৬০০ টন লোহা লাগে। খুব বড় একটা জাহাজে ১০,০০,০০০ বোল্ট্ লাগে। কাজেই জাহাজের কারখানা একটা অতি অদ্ভুত বিশাল ব্যাপার। লোহা-লক্কর ওঠানো-নামানোর জন্য বহু ক্রেন্ বসানো তো আছেই, তা ছাড়া লোহা গালাবার, বাঁকাবার এবং প্রয়োজন মত নিখুঁত আকৃতি করবার জন্য বহু রকমের কলকব্জা থাকা সত্বেও এখানে হাজার হাজার লোকের দরকার হয়।

জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার পর আমেরিকায় জাহাজ তৈরির একটা এমন বন্দোবস্ত হয়েছে, নতুন নতুন কারখানা এত স্থাপিত হয়েছে যে, খুব নিকট ভবিষ্যতে প্রতিদিন গড়ে দু'খানা ক'রে নতুন জাহাজ সাগরের বুকে ভেসে বেড়াবে ; অথচ এর পূর্ব্বে খুব বড় একটা জাহাজ তৈরি হ'তেই সময় লাগত ছ' মাস।

যদি জাহাজ তৈরির হার এই ভাবেই চলে, তা হলে ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে আমেরিকার নৌ-শক্তি ৪৫,০০০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনীর শক্তির সমকক্ষ হবে। এই যে নতুন জাহাজগুলি তৈরি হচ্ছে শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য, এর নাম দেওয়া হয়েছে লিবার্টি সিপ্ (Liberty Ship)। একটি জাহাজের ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল, এই রকম শত শত বিশালকায় লিবার্টি সিপ্ আমেরিকার ডকে এখন তৈরি হচ্ছে।

খোকা ও মা

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি.

খোকা কয়, "পালিয়ে যাব" ; মা বলেন, "পারবি না তো" ;
খোকা বলে, "দেখবে নাকি ?" মা হেসে কন, "দেখি, যা'তো !"
খোকা বলে, "গেলুম চলে" ; মা বলেন, "রুখ্‌ছে কেবা ?"
ঠোঁট ফুলিয়ে বলে খোকা, "জানি তোমার আছে রেবা !
ভালবাসা যা কিছু সব খুকীটাকেই দেছ' ধরে',
জানি তুমি কাঁদবে না ক' দুষ্টু খোকা গেলে মরে' ।"
মা বলেন শিউরে উঠে—হাসি তাঁর মিলায় মুখে—
"ষাট্ ! ষাট্ ! কী যে বলিস্ !"—টেনে তারে আনেন বুকে ।
খোকা কয় মধুর হেসে, "এই তো তোমার হল হার,
বলেছিলে আমায় তুমি নেবে না যে কোলেতে আর !
খুকীটার চুলের মুঠি ধরেছিনু একটু সবে,
বলেছিলে আমায় বকে' নেবে না আর কোলে তবে ।
হেরেছ তো ? কেমন হল ? মোরে আর বকবে নাকি ?"
শুনে মা'র খোকার কথা ছলছলিয়ে উঠে আঁখি ।
মা বলেন, "ওরে পাজি ! শিখেছিস্ এরই মাঝে—
জেনেছিস্ মনের কথা—ব্যথা মোর কোথায় বাজে !"
দরদরিয়ে অশ্রুধারা নামে মার অভিমানে,
খোকা কয় মলিন মুখে, "দোব' না আর ব্যথা প্রাণে ।
না বুঝে মা দোষ করেছি, হবে না ক' এমনতর ;
খুকীকেই ভালবেসো, খোকা তোমার দুষ্টু বড় ।"
অভিমান কোথায় গেল—মা হেসে কন দিয়ে চুমো,
"লক্ষ্মী সোনা ! দুপুরেতে পাশে শুয়ে একটু ঘুমো ।"

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালিপদ চট্টোপাধ্যায়

—চার—

যাত্রা

পরদিন সকালবেলা সাহেব এসে ডাক্‌লেন রঞ্জিতকে।

রঞ্জিত একেবারে সেজেগুজেই বেরিয়ে এল। আসবার পথে প'ড়ে গেল দিদির চোখে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—"যাচ্ছিস্ কোথায় আবার। ব'লে ক'য়েও যেতে নেই?"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"ভয় নেই, সাহেবের সঙ্গে আফিসে যাচ্ছি।"

দিদি হেসে বল্‌লেন,—"সাহেবটাকে পেয়ে ব'সেছিস তো! এখন থেকে হাত ক'রে রাখ্, হ্যাঁ।"

—"বড় হ'লে একটা চাকরির জন্যে তো? চাকরি কোর্‌বো না-কি আমি!—ব'লে রঞ্জিত হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে এল।"

জামাইবাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে সাহেব তো চেয়ে বস্‌লেন অনুমতি—রঞ্জিতকে সঙ্গে ক'রে শর্‌দাই পাহাড়ে নিয়ে যাবার। যেম্‌নি সাহেবের প্রস্তাবটি কানে যাওয়া, জামাইবাবুর হাতের কলম মাটিতে প'ড়ে গেল ঠক্ ক'রে। চোখ একেবারে তাঁর স্থির রইল সাহেবের চোখে। চোখের সে আয়তন কী! চার পয়সা দামের রসগোল্লা যেন।

সাহেব হেসে উঠ্‌লেন। আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন,—"ঘাব্‌ড়াও মট্ বাবু। হামার সোঙ্গে কোরে নিয়ে যাবে, হাটি কোরে নিয়ে যাবে। টোমার কুছু ভয় হোবে না।"

ভয় হ'লেই বা উপায় কী? সাহেবের মতে মত না দিলে শেষে এতকালের এমন সুখের চাকরি নিয়েই যে টানাটানি প'ড়ে যাবে। অগত্যা কতকটা সাহেবের উপর নির্ভর ক'রে আর তাঁর রেগে যাবার ভয়ে জামাইবাবু নেহাৎই "হেঁ—হেঁ" ক'রে সম্মতি দিলেন।

রঞ্জিতের মনে খুশি আর ধরে না। সে বুক ফুলিয়ে প্রায় লেফ্‌ট্-রাইট্ কর্‌তে কর্‌তেই সাহেবের সাথে চল্‌ল। রাঙ্গা চোখ দেখার ভয়ে জামাইবাবুর মুখের পানেই সে তাকাল না।

দু'জনে হাতির উপর চেপে ব'স্‌ল। হাতি চল্‌ল হেলে দু'লে। সঙ্গে আরো লোকজন চল্‌ল হেঁটে।

শরদাই পাহাড়ের তলায় গিয়ে তা'রা হাজির হ'ল। সাহেব হাতির মাহুতকে আদেশ কর্‌লেন,—"হাটি উপোড়্‌মে উঠা লেও।"

মাহুত বল্‌ল,—"হাতি বেশি উপরে যাবে না সা-ব।"

—"কেনো উঠ্‌বে না?"—সাহেব হুকুম কর্‌লেন,—"আল্‌বাট্‌ যাবে। তুমি চালাও।"

হাতি উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল বটে—না চলার মতো। যতই উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, রঞ্জিতের মনে হোল, হাওদা-ফাওদা সুদ্ধ একেবারে গড়িয়ে প'ড়ে যাবে বুঝি তা'রা। হাতির চলা ক্রমেই গজেন্দ্র-গমন থেকে গজেশ্বর-গমনে দাঁড়াতে চ'ল্‌ল। শেষে সে একেবারে দাঁড়িয়েই পড়্‌ল, সামনে পিছনে দোল লাগাল।

মাহুত বল্‌ল,—"আর যাবে না, সা-ব।"

সাহেব রেগে উঠ্‌লেন,—"কেন যাবে না?"

—"উঠ্‌তে পার্‌বে না।—"মাহুত বল্‌ল।"

—"কেনো?"—সাহেব বল্‌লেন,—"বুনো হাটি টো উঠে।"

—"এ তো আর বুনো হাতি নয় সা-ব",—মাহুত বল্‌ল,—"পোষা হাতি অত জোর পাবে কোত্থেকে?"

অগত্যা সাহেবকে নামতে হোল। রঞ্জিতও নাম্‌ল। একটু সমান একটা জায়গা দেখে হাতিটাকে বেঁধে রাখা হোল—পায়ে শিকল দিয়ে গাছের গুঁড়িতে।

সাহেব বল্‌লেন রঞ্জিতকে,—"আমার পিঠু পিঠু আইসো।"

রঞ্জিত চল্‌ল সাহেবের পিছু পিছু। সঙ্গে চল্‌ল চারজন লোক। বাকি সব লোক সাহেবের আদেশে রইল হাতির কাছে।

সাহেব চল্‌ল আগে আগে—ভরা পিস্তল হাতে ক'রে। তাঁর পিছনে রইল রঞ্জিত—সাহেবের দেওয়া বন্দুক ঘাড়ে ক'রে। তার পিছনে বল্লম হাতে ক'রে চল্‌ল সঙ্গের চার জন লোক—একের পিছে আরেক জন।

চল্‌ল তো তা'রা শুধু চল্‌লই। কতদূর তারা চল্‌ল ঘুরে-ঘুরে বন-বাদাড় ভেঙ্গে; কতদূর তাঁরা উঠ্‌ল খাড়াই-উত্‌রাই ভেঙ্গে; রইল না হুঁস-হিসাব। বেলা তিনটা

পর্য্যন্তও এমনি চ'লে চ'লে কোন শিকার জুট্‌ল না। রঞ্জিতের বিরক্তি ধ'রে গেল। এ কী রকম? আর কতো এমনি চল্‌বে। এমন না ক'রে সবাই মিলে হৈ-চৈ জু'ড়ে দিলে তো বেশ হয়, তা'তে যদি একটা শুওর-টুওর বেরিয়ে আসে! সাহেবের গেছে রোখ চেপে। রঞ্জিত কি আর কর্‌বে! না চ'লেই-বা উপায় কি?

হঠাৎ বনের ভিতর দেখা গেল, কতো কালের পুরাণ, কে জানে, এক ভাঙ্গা মন্দির। পাথরের তৈরি। গায়ে শেওলা-পড়া। চারদিকে তার দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সাহেবের চোখ হর্ষে জ্ব'লে উঠ্‌ল—কি জানি কেন? কোমর থেকে মস্ত ভোজালি টেনে নিয়ে জঙ্গল কেটে কেটে পথ ক'রে তিনি এগিয়ে চল্‌লেন। আস্তে আস্তে চল্‌ছিল সবাই। তৈরি রাস্তা তো নেই যে পা চালিয়ে যাবে। যেতে হচ্ছিল পদে-পদে বাধা পেয়ে, হোঁচট্‌ খেতে-খেতে।

অনেকক্ষণ এরকম চ'লে যখন তা'রা মন্দিরের বিরাট, ভাঙ্গা, হাঁ-করা দরজাটার প্রায় কাছাকাছি গিয়েছে, সাহেব নিচু গলায় বল্‌লেন,—"এই খেনে চুপ কোরে খাড়া হও।"

চুপ ক'রে পাঁচ জনে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হয় সাহেব আগেও আর একবার এসেছিলেন এখানে। এখানে কিছু একটার আশা পেয়ে গেছেন। না হয় বরাবর এদিকেই উঠে এলেন কেন? আর এখানে এসে এত সতর্কতাই বা কেন তাঁর!

পিস্তলটা শক্ত ক'রে ধ'রে সাহেব মন্দিরের দিকে এগিয়ে চল্‌লেন। ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতরকার ভীষণ জঙ্গলের অন্ধকারে অদৃশ্য হ'লেন।

কতক্ষণ সব চুপ-চাপ। হঠাৎ শব্দ হোল,—হু-হু-হু-হুম্‌। হুম্‌!

মেঘের ডাক যেন—কালবৈশাখীর।

সঙ্গের একজন লোক বড় বড় চোখ ক'রে চুপি চুপি বল্‌ল,—বাঘ!

—"অ্যাঁ! বাঘ!"—রঞ্জিত আঁত্‌কে উঠ্‌ল।

একটু পরে শব্দ হোল,—গুড়ুম!—গ্রুম্‌।

ভয়ঙ্কর একটা গর্জ্জন! ঝুপ্‌ ক'রে একটা আওয়াজ! ভীষণ হুটোপাটির শব্দ! মন্দিরের ভিতর যেন প্রলয়-কাণ্ড চল্‌ছে।

আবার পিস্তলের হুঙ্কার—গুড়ুম্‌!—গ্রুম্‌!

তারপর কতক্ষণ সব নিস্তব্ধ। কে মর্‌ল? সাহেব না বাঘ? কি সাহস সাহেবের! একা গেল বাঘের সাম্‌নে! কাউকে ডাক্‌লও না!

ভয়ে এরা পাঁচটি প্রাণী উৎকর্ণ হয়ে এখানে থরথর কাঁপ্‌ছে।

সাহেবের গলা শোনা গেল,—"ভিটোরে আইসো!"

বন-বাদার ভেঙ্গে ছুট্‌ল ওরা সেদিকে। ভিতরে যেতে সাহেব 'টর্চ্‌ লাইট্‌' জ্বেলে ধর্‌ল। সবাই দেখ্‌ল, বিরাট বাঘ ঠ্যাং ছড়িয়ে ম'রে প'ড়ে আছে। সাহেবের মুখে বিজয়ের হাসি। আহ্লাদে সাহেব নাচ্‌তে বাকি রাখ্‌লেন শুধু।

চারজনে ধরাধরি ক'রে বাঘটাকে বাইরে নিয়ে এল।

রঞ্জিতের গায়ের কাঁপন তখনো থামেনি। ওরে বাপ! এতবড় বাঘ! কোনো রকমে যদি ফস্‌কাতো! ঈঃ! সাহেবের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। (ক্রমশঃ)

তুহিনের দেশের নাগরিক

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

দক্ষিণের মেরু অঞ্চল বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ভূভাগ। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বরফ ও তুষারে ঢাকা থাকে। একমাত্র শৈবাল ছাড়া কোন উদ্ভিদ এখানে জন্মায় না। এই শৈবালের মধ্যে পতঙ্গ নামধেয় দু'একটা প্রাণীর বাস। বস্তুতঃ কীট পতঙ্গ নেই বললেই চলে, স্থলচারী পাখীও নেই; ঘাস বা পুষ্পক উদ্ভিদ নেই বলে তৃণভোজী প্রাণীও নেই, কাজেই মাংসাশী প্রাণীও বিরল। এইরূপে পড়ে রয়েছে—সম্মিলিত ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার সমান—সাড়ে পঞ্চান্ন লক্ষ স্কোয়ার মাইল একটি শ্বেত তুষার-মণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ স্থলভাগ।

মাঝে মাঝে আবার হাড়-কাঁপুনি-ধরা তীক্ষ্ণ বাতাস বয়ে যায় হু হু করে সেই মেরু প্রান্তরের উপর দিয়ে—সূর্য্য কুয়াসার মেঘ ভেদ করে কদাচিৎ সেখানে প্রবেশ-পথ পায়—কাজেই সেখানকার

ভূমি অনুর্ব্বর, বন্ধ্যা। সারা বছরের মধ্যে একবারও আর মেরু-প্রান্তরের বরফের ঢাকনি উত্তোলিত হয় না।

নিরক্ষ রেখার দক্ষিণে ঋতুচক্র বদলে যায় সম্পূর্ণ—তার গতি হয়ে আসে ঢিমে-তেতালা, মন্থর। উত্তরে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব—তীব্র ঠাণ্ডায় উগ্র জীবন-স্রোতে যখন ভাঁটা পড়ে আসতে থাকে, তখন সুদূর দক্ষিণ পাড়ে আবহাওয়ার উত্তাপ সবচেয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ গ্রীষ্মের গরম হাওয়া একবার দোল দিয়ে যায় সেখানে এবং সেই স্বল্পকালস্থায়ী গ্রীষ্মের মধ্যে একদল পক্ষি-শাবক ও পশু সর্ব্বপ্রথম অপরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় লাভ করে—যাদের কয়েকটি জাতির কাহিনী প্রাণি-বিজ্ঞানেও স্থান লাভ করেছে।

সে এক অদ্ভুত কর্ম্মচাঞ্চল্যপূর্ণ বিপদ ও বিস্ময়, সংগ্রাম ও আনন্দ মুখরিত মাস—যখন সেই বিরাট কলোনীতে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর পেনগুইন (Penguin) শিশুরা ডিম থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর প্রথম আলোক দেখে।

দক্ষিণের মেরু অঞ্চলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাখীই হচ্ছে পেনগুইন। বস্তুতঃ সারা বিশ্বে এদের সমতুল্য পাখী আছে কি না সন্দেহ। এদের ছোট ডানা, কালো তেল কুচকুচে পিঠ শাদা পালক, খাড়া হয়ে বসা—এ সবই অদ্ভুত।

সকলেরই একটা ধারণা যে, পেনগুইনরা দক্ষিণের তুষার রাজ্য এণ্টার্কটিকা মহাদেশের বাসিন্দে, কিন্তু এ ধারণা সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক। এদের বাসস্থানের গণ্ডী সুদূর-প্রসারী—উত্তরে আফ্রিকা থেকে সুরু করে দক্ষিণে মেরু প্রদেশের ৮০° ডিগ্রী দূর পর্য্যন্ত। কেবল মাত্র আফ্রিকা নয়—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ মহাসাগরের প্রায় সমস্ত দ্বীপে এদের কোন না কোন জাতভাই বাস করে।

পেনগুইনরা আদৌ উড়ে না—অর্থাৎ উড়তেই জানে না। এদের ডানা খাট,—কেবলমাত্র ঘাড়ের কাছে সংযোগ-স্থলে নড়ান চড়ান সম্ভবপর এবং সমস্ত ডানাটাই ছোট ছোট শল্কের মত পালকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত। পাখী হয়েও জলে অনবরত সাঁতার কাটার দরুণ ডানা এরূপ হয়েছে। সন্তরণকালে এদের ডানা দু'টো চক্রাকারে ঘুরতে থাকে—কতকটা দাঁড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্থলে এদের বড় বেমানান দেখায়, কারণ এদের পা প্রায় সম্পূর্ণ চামরায় ঢাকা—পায়ের পাতাও কেমন অদ্ভুত। দেহটা উপরের দিকটায় ভারী—অনেকটা ঠিক কোঁৎকা ছেলের মত টলতে টলতে পথ চলে—মিনিটে ত্রিশটি পদক্ষেপ—ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এক একটি পদক্ষেপ—কাজেই এক মাইলের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করতেই লেগে যায় পাক্কা একটি ঘণ্টা। প্রতি মুহূর্ত্তে বুককে সামনের দিকে বাড়িয়ে ঠিক যেন গড়াতে গড়াতে পথ চলে। এদের পলায়নের দৃশ্যটাই সবচেয়ে উপভোগ্য। অসম্ভব রকম একটা ব্যস্ততা লক্ষিত হ'বে সকল অঙ্গে—গলাটা বাড়িয়ে দেবে সামনে

দিকে—হাওয়া চালিত কলের চাকার মত ডানা দুটো বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে—ভারী দেহটা ছোট পায়ের উপর দুলতে থাকে এক পাশ হ'তে আর এক পাশে, ঠিক ঘড়ীর দোলকের মত—হোঁচট খায় বার বার—তবুও উঠে ছুটতে থাকে মরিয়া হয়ে—সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা অসম্ভব রকম দুশ্চিন্তার ছাপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একটি গোলগাল নাদুস্‌-নুদুস্‌ চেহারার লোক ভারী পুঁটলি হাতে প্রাণভয়ে ছুটতে থাকলে যে অবস্থা হয় অনেকটা সেই রকম। ফলে, এই সময় এমন একটা অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হয় যে, অনুসরণকারীর পক্ষে সকল সময় হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই পলায়ন করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু জলে এদের আচরণ সম্পূর্ণ জড়তাহীন। একমাত্র ডানার সাহায্যে এরা সাঁতার কাটে, পদদ্বয়কে শুধু জলের উপরিভাগে ব্যবহার করে—তাও হাল হিসেবে। ফুস্‌ফুস্‌ বাতাসে পূর্ণ করে এরা ডুব মারে—চলে যায় একেবারে দশফিট জলের নীচে—কোন মাছকে হয়ত আক্রমণ করে বন্দী করে এবং জলের মধ্যেই কোঁৎ করে গিলে ফেলে। তারপর আবার ভেসে ওঠে জলের উপরে—একপাশে হেলে নিছক ক্রীড়াচ্ছলে অত্যন্ত আনন্দের উত্তেজনায় উপরের ডানার সাহায্যে জলে আঘাত করতে থাকে—খল খল করে ওঠে—আবার বিপরীত পার্শ্বে হেলে দ্বিতীয় ডানার সাহায্যে পূর্ব্ববৎ জল সিঞ্চন করে।

পেনগুইনদের মধ্যে রাজা পেনগুইনরাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। এদের এক একটির ওজন প্রায় ৮০ পাউণ্ডের কাছাকাছি। ছোটদের তুলনায় এদের সংখ্যা খুব কম এবং এরা বহু বিস্তৃত নয়। এণ্টার্কটিক অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাসই হচ্ছে এদের জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ—কারণ এই সময় শিশুরা কুলায় পরিত্যাগ করে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে। কিন্তু রাজা পেনগুইনদের সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না। এরা বাসাহীন বাসা বাঁধে। শীতের মধ্যভাগে এরা উন্মুক্ত বরফ-প্রান্তরে ডিম্ব প্রসব করে। পায়ের উপরিতলা ও পেটের শেষে একখণ্ড লোমহীন শিথিল চর্ম্মের উষ্ণতার মধ্যে ডিমগুলোকে রেখে তা' দেয়। গ্রীষ্মকালে নয়, দারুণ শীতের অন্ধকারময় দুর্য্যোগপূর্ণ সময়ে যখন মুহূর্ত্তের জন্যও সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, তখনই আসে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।

জ্যাক এ্যাস (Jack ass) পেনগুইনরা গর্ত্ত করে তার মধ্যে ডিম পেড়ে রাখে। এরা ঠিক গাধার মত একপ্রকার শব্দ করে বলেই পূর্ব্বোক্ত নামকরণ করা হয়েছে। গর্ত্তগুলোর গভীরতা খুব বেশী নয়—বড় জোর পাখীটার সম্পূর্ণ স্থান সঙ্কুলান হ'তে পারে। কিন্তু গর্ত্ত করবার জন্য এরা অতি দুর্গম স্থান নির্ব্বাচন করে। কি ভাবে এরা গর্ত্ত করে সঠিকভাবে এখনও তা পর্য্যবেক্ষিত হয়নি। খুব সম্ভবতঃ পদদ্বয় ও ঠোঁট উভয়েরই সাহায্য নেয়। ডিম ফুটে বাচ্চারা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকতে সুরু করে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এদের আর্ত্তনাদের আর বিরাম থাকে না। এইভাবে চলে যতদিন না শীতের আশ্রয় বা আস্তানার জন্য স্থানান্তরে গমন করে।

টেরা নোভা অভিযানের (Terra Nova Expedition) সুবিখ্যাত ডাঃ ম্যুরী লেভিক্ (Dr. Murry Levick) কোন এক শ্রেণীর পেন্‌গুইনসম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এটা অবশ্য কৃষ্ণকণ্ঠ এ্যাডিলী পেনগুইনের (Adilie Penguin) ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য। এই পেনগুইনরা আকারে ছোট—এদেরই প্রকৃতপক্ষে তুষার অঞ্চলের পেনগুইন বলা উচিত।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি এরা তুষার অঞ্চলে এসে সমবেত হয়—প্রথমে দু'টি তিনটি করে—পরে দলে দলে। মাসের শেষে দেখা যায় প্রায় ৭৫ হাজার পেনগুইন এসে সমবেত হয়েছে। নিরাপদে উপস্থিত হ'বার পর মেয়েরা পুরাতন বাসায় আশ্রয় নেয়, অথবা মাটি খুঁড়ে নূতন নীড় রচনা করে' প্রতীক্ষা করতে থাকে। পুরুষেরা সমুদ্রযাত্রা-জনিত পরিশ্রমের জন্য ক্লান্ত, কিন্তু ক্রমশঃ তারা সঙ্গিনীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং নির্ব্বাচিতা সঙ্গিনীর সম্মুখে এসে তার পদপ্রান্তে একটি কাল্পনিক প্রস্তর খণ্ড রাখে। মেয়েরা সম্ভবতঃ তখনও শ্রান্ত—এই উপহার দেখেও দেখে না, যতক্ষণ না আর একজন এসে উপস্থিত হয়। এবার একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। বুকে বুক লাগিয়ে ডানার ঝাপটা মেরে বেশ একটা লড়াই বাধিয়ে তোলে, আর মেয়েরা দূরে থেকে স্মিত হাস্যে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপভোগ করে। এদের লড়াইএ খুব মারাত্মক রকমের কিছু ঘটে না—কখনও রক্তপাত হলেও কেহ প্রাণে মারা গেছে বলে' শোনা যায়নি। 'বীরপূজা'র ব্যাপারটা এদের মধ্যেও বেশ উল্লেখযোগ্য। বিজয়ীকে কয়েকদিন খুব সতর্ক থাকতে হয়—অন্য কোন শত্রু এসে বাসাটাকে না আবার দখল করে বসে। কিন্তু মাসের শেষে দেখা যায়, প্রত্যেকের ভাগ্যেই সঙ্গিনী জুটেছে এবং প্রত্যেকেই নিরুদ্বেগে পারিবারিক জীবন যাপনে ব্যস্ত। যতদিন না এরা ডিম পাড়ে, ততদিন এরা উভয়েই না খেয়ে বাসাতে অবস্থান করে—তারপর ডিম্ব প্রসবের পর একজন সমুদ্রে চলে যায় এবং দিন কয়েকের জন্য অনুপস্থিত থাকে। সে ফিরে এলে দ্বিতীয় জন আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলেও পূর্ব্বোক্তভাবে খাদ্য সংগ্রহ চলে।

এ্যাডেলী পেনগুইনের বাসা প্রায়ই ৫০০ থেকে ৭০০ ফিট উঁচুতে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত—কাজেই এদের পক্ষে গমনাগমন কার্য্যটি যে খুব সহজসাধ্য নয়, সে কথা বলা বাহুল্য। অবতরণ করা সহজ, কিন্তু বড় অসুবিধা অধিরোহণের বেলা। শাবকদের লালনপালনকালে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে বার কয়েক এইভাবে সমুদ্র থেকে খাবার নিয়ে আসতে হয়। এদের ছোট পা ও বিপুল দেহের পক্ষে সে যে কী ভীষণ কষ্ট ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার, তা কল্পনা করা যায় না—পাক্কা দু'ঘণ্টা লাগে অতি কষ্টে উপরে উঠতে। যখন বোঝার ওজন ভারি হয়ে ওঠে, তখনই ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়—হয়ত মাঝে মাঝে থেমে যেতে হয় এবং পরিশ্রমের ফল মাঝপথেই বিনষ্ট হয়ে যায়। খাবার নিয়ে এরা গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়ে মুখ বিস্তার করে দাঁড়ায় এবং শাবকেরা মা'র মুখের ভিতরে মাথা পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে সেই খাবারের সদ্ব্যবহার করে।

মা পেনগুইনরা খুব ধৈর্য্যসহকারে স্থিরভাবে বাসায় বসে থাকে; কিন্তু পুরুষেরা হামেশাই একটুতে ঝগড়া বাধিয়ে বসে এবং এইভাবে এদের বসতির প্রায়ই যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে। মেয়েরা এই সময় চতুর্দ্দিক থেকে চীৎকার করে' এরকম অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

শিশুরা যতই বড় হয়ে ওঠে, মা-বাপেরা ততই বেশীক্ষণ সমুদ্রে খেলা করে। এদের খেলা হচ্ছে—হেলে দুলে যাওয়া-আসা করা, ডুব দেওয়া, সাঁতার কাটা, লাফিয়ে জল থেকে ভাসমান বরফের স্তূপের উপর উঠে বসা—এইভাবে বহুদূর চলে যাওয়া ও ফিরে আসা। এই সময় শিশুরা দলবদ্ধভাবে অথবা আনাচে কানাচে কোন নির্ভরযোগ্য পাখীর তত্ত্বাবধানে থাকে—তা'রা যূথভ্রষ্ট বদমায়েস শিশুকে সামলে রাখে। বাপমা'রা মাঝে মাঝে ফিরে আসে—প্রত্যেকেই সঙ্গে করে খাবার আনতে ভোলে না।

এদের জীবনের একটা অদ্ভুত উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে—সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে এরা উপবাস করে—যখন এরা নীড় রচনায় রত থাকে তখনও মাসাধিক কাল না খেয়ে কাটিয়ে দেয়; বাসা বাঁধার শেষে ও শিশুরা সমুদ্রে চলে গেলে একটা সময় আসে যখন এদের পালক ঝরতে সুরু হয় এবং এই সময়কার ভীষণ বিপদপূর্ণ অবস্থাতেও এরা উপবাস করে।

স্থানত্যাগের সময় হলে দেখা যায়—প্রায়ই হাজার হাজার পাখী বরফের জাহাজে চড়ে চলছে—ড্রিল করতে করতে—সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই রকম সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এরা অঙ্গচালনা করে। অজানা শীতের আস্তানার খোঁজে বহির্গত হবার এইটাই সূচনা। শীঘ্রই দেখা যাবে, মেরু অঞ্চলের জীবনচাঞ্চল্য নিস্তব্ধ হয়ে গেছে—দুর্ভেদ্য কুয়াসার পর্দ্দা ধীরে ধীরে নেমে আসছে—আবার বসন্তের প্রারম্ভে দেখা দেবে পেনগুইন পাখীরা—আবার সুরু হবে জীবনের ছন্দ।

পেনগুইনের জীবনে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে—এদের ডানাহীনতা, ক্রীড়াচঞ্চল স্বভাব, দলবদ্ধভাবে বাস, অপত্য স্নেহ, সাঁতার কাটা, হেলে দুলে অগ্রসর হওয়া, মেরুপ্রদেশে সমবেত হওয়া, আবার শীতের প্রারম্ভে উন্মুক্ত সমুদ্রে শীতের আশ্রয় খোঁজা—সব কিছু মিলে এদের জীবনকে রহস্য-মধুর করে তুলেছে। শীত ও গ্রীষ্মের আস্তানা খোঁজাটাই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার; কিন্তু সে সমস্যাকেও এরা সহজেই সমাধান করে নেয়। এদের ওড়বার ক্ষমতা নেই—পাখীদের পক্ষে এটা মারাত্মক ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও এরা অদ্ভুতভাবেই টিকে আছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাণীদের জীবন যত বিপদসঙ্কুল, তারা ততই সাফল্যের সঙ্গে বেঁচে থাকে পৃথিবীতে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের এইটাই চিরন্তন আকর্ষণ।

বিচিত্র জগৎ

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম্. এ., এইচ্. ডিপ্. এড্ (ডাবলিন্)
সার্টিফিঃ সাইকঃ (এডিনবার্গ)

সেকালের বাদ্যযন্ত্র

দেশী বিলিতী অনেক বাদ্যযন্ত্র তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ এবং গান-বাজনাও হয়ত তোমরা অনেকে জান; কাজেই আজকে কতকগুলো সেকালের বাদ্যযন্ত্রের কথা ব'ললে, খুব সম্ভব তোমাদের ভালই লাগবে। আজকে যে বাদ্যযন্ত্রগুলোর কথা ব'লব, সে-গুলো সবই প্রাচ্য দেশের। এই বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত ধরণের। এই শ্রেণীর কতকগুলো বাদ্যযন্ত্র এখনও পর্য্যন্ত এই সব দেশে প্রচলিত আছে। প্রথমে আরম্ভ করা যাক্ ব্রহ্মদেশের বাদ্যযন্ত্রের কথা।

১। ঢোলক হারমোনিয়ম্

এই বাদ্যযন্ত্রটি আকারে মস্ত বড়। এই বাদ্যযন্ত্রটা দেখ্‌তে একটা প্রকাণ্ড গোল কাঠের টবের মত। এই যন্ত্রের ব্যাস হ'ল সাড়ে চার ফুট এবং খাড়াই হ'ল আড়াই ফুট। টুকরা টুকরা কারুকার্য্য করা কাঠের তক্তা কব্জা দিয়ে জুড়ে জুড়ে এই বৃত্তটি তৈরি হয় এবং এই বৃত্তের ভেতর আঠার থেকে কুড়িটা ছোট বড় ঢোলক ঝোলান থাকে। এই ঢোলকগুলো বড় থেকে ছোট, তারপর আরও ছোট, তারপর আরও ছোট, এইভাবে সাজান হ'য়ে থাকে এবং আকারেও এরা দশ ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি পর্য্যন্ত ছোট হয়। ঢোলকগুলো শুধু আকারে নয়, সুরের তারতম্য অনুসারেও সাজান হ'য়ে থাকে। প্রথমে থাকে খুব চড়া সুরের ঢোলক, তারপর থাকে তার চেয়ে কম চড়া সুরের ঢোলক, তারপর আরও কম, এইভাবে শেষ ঢোলকটা হয় অতি কম সুরের। ঢোলকগুলোর সুর মিষ্টি করবার জন্যে ভিজে ময়দা কিংবা কাদা খানিকক্ষণ ধরে' ঢোলকের চামড়ার উপর মাখিয়ে রেখে দেওয়া হয়। সুর ঠিক তৈরি হ'লে, একজন লোক বৃত্তের ভেতর গিয়ে, উঁচু হ'য়ে ব'সে আঙুল ও হাতের তালু দিয়ে ঢোলকগুলো পিটিয়ে সুর বার করে।
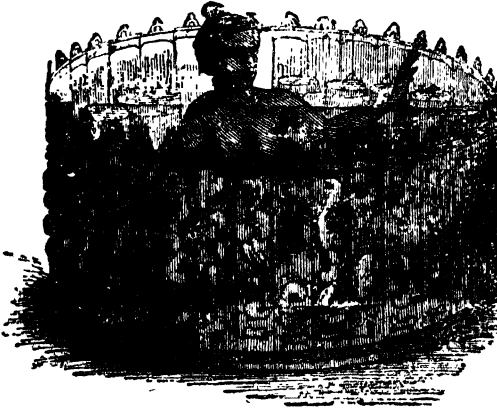
২। ষ্ট্যাকাটো (Staccato)

বিলিতী বেলো-ওয়ালা হারমোনিয়ম তোমরা সকলেই দেখেছ; এই ষ্ট্যাকাটো যন্ত্রটা অনেকটা সেইভাবে বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় এবং এই ভাবের বাঁশের হারমোনিয়ম মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রেজিলেও চলন আছে। একটি বাটির মতন খালি পাত্রের মুখের ওপর দু'ধারে দু'গাছা দড়ি ঝোলান থাকে। এই দড়ি দু'গাছার ওপর প্রায় দেড় ইঞ্চি চওড়া ছোট বড় আঠার থেকে চব্বিশটা বাঁশের পাতলা পাত বসান থাকে। এই বাঁশের পাতগুলোর মাঝটা চেঁচেছুলে বেশ পাতলা করা হয়; কিন্তু দু'ধারটা থাকে মোটা—বাঁশের শক্ত ছালের দিকটা থাকে ওপরে। একটা ছোট কাঠের হাতুড়ি দিয়ে এই পাতগুলোর ওপর আঘাত করলে, বেশ মিষ্টি সুর বার হয়। বাঁশের পাতগুলো যেমন যেমন পাতলা হয়, তার থেকে সেই অনুসারে নরম বা চড়া সুরও বার হয়। বর্ম্মীদের কাছে এই বাদ্যযন্ত্রটা অতি প্রিয়; কাজেই তারা সহজে এটি হাতছাড়া করতে চায় না।
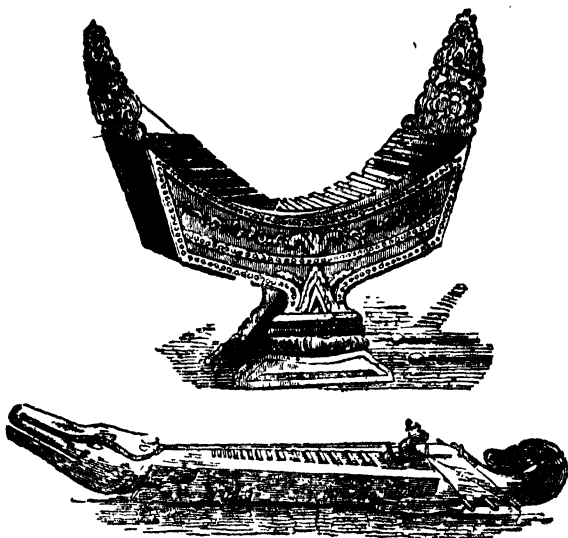
শুনা যায়, একবার ব্রহ্মদেশের রাজা খারাবড্ডি নিজের হাতে এই রকম একটা লোহার বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেছিলেন; কিন্তু যন্ত্রটি দেখ্‌তে সুন্দর হ'লেও, তার সুর বাঁশের হারমোনিয়মের মত অত মিষ্টি হয়নি; কাজেই দেশের লোকের কাছে তার আদর হয় নি।

৩। সেতার

ওপরের ছবিখানার নীচেই যে সেতারটি দেখ্‌ছো, সেই সেতারের নাম কুমীর সেতার; তার কারণ এর মুখ ও লেজ কুমীরের মত। এই সেতারে তিনটি তার থাকে। মাটিতে শুইয়ে রেখে, আঙ্গুল দিয়ে তারে আঘাত ক'রে ঝঙ্কার তুলতে হয়।

৪। সাগাত

ছবির মধ্যে ১নং বাদ্যযন্ত্রটিকে মিশর দেশীয় ভাষায় সাগাত (Sa'ga't) বলা হয়। সাধারণতঃ নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা এগুলি নিয়ে গানবাজনা করে' থাকে। এগুলো দেখ্‌তে অনেকটা আমাদের দেশের মন্দিরার মত—পিতল বা কাঁসায় তৈরি হয়। এগুলোর মাঝে একটা করে' ছিদ্র থাকে, ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে একগাছা দড়ি পরান থাকে, এবং ঐ দড়ি অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে জড়িয়ে নিয়ে বাজাতে হয়। দুই হাতে দু'জোড়া নিয়ে পরস্পর ঠুকে বাজাতে হয়।

৫। খঞ্জনি

২নং বাদ্যযন্ত্রকে মিশর দেশের ভাষায় Ta'r বলা হয়। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা এই খঞ্জনি বাজিয়ে পুরুষদের চিত্তবিনোদন করে। এই খঞ্জনিগুলোর ব্যাস প্রায় এগার ইঞ্চি এবং ভিতর ও বাহিরের ধারগুলো কচ্ছপের খোলা, হাতীর দাঁত বা ঝিনুকে মোড়া থাকে। বৃত্তটির ভিতর দশ জোড়া পিতলের ছোট ছোট করতাল থাকে এবং এই করতালগুলো আবার একটি তার দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বাম হাতে খঞ্জনিটি ধরে' ডান হাতের আঙ্গুল ও তালু দিয়ে বাজাতে হয়। এই ভাবের খঞ্জনি আমাদের দেশেও পশ্চিমারা ব্যবহার ক'রে থাকে।
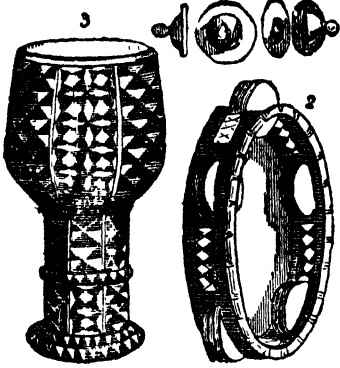
৬। দারাবুকে (Dar'a-boo'k-keh)

৩নং বাদ্যযন্ত্রটি একজাতীয় ঢোলক। মিশর দেশে এগুলো নিয়ে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা গান বাজনা করে' থাকে। খোলটা হয় কাঠের—ধারগুলো সাধারণতঃ ঝিনুক বা কচ্ছপের খোলায় মোড়া থাকে। লম্বায় সাধারণতঃ পনের ইঞ্চি হ'য়ে থাকে। এই ঢোলকের সরু দিকটা খোলা থাকে, আর চওড়া দিকটা থাকে মাছের চামড়ায় ঢাকা। ঢোলকটা দড়ি দিয়ে বাঁ কাঁধে ঝোলান থাকে, বা কখন কখন বাঁ বগলে টিপে ধ'রে দু'হাত দিয়ে বাজান হয়।

যে কটা বাদ্যযন্ত্রের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হ'ল, সেগুলো প্রায়ই কোন না কোন আকারে প্রাচ্যের বহু দেশেই প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও অনেকটা এই ভাবের দুই একটা বাদ্যযন্ত্র তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এই সব ছোটখাট জিনিষের ভিতর দিয়ে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ, ভারতবর্ষের সঙ্গে সমস্ত প্রাচ্যদেশের অতি প্রাচীনকাল থেকেই যোগাযোগ ছিল।

আজব মানুষ

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

আজব মানুষ দেখবে যদি মোদের গাঁয়ে যেও—
ভয় যদি পাও তাইতে তোমার সঙ্গেতে লোক নিও।
জালার মত বিরাট দেহ, তালের মত মাথা,—
শিশুরা সব আঁৎকে উঠে শুনলে তাহার কথা।
সর্ব্বাঙ্গ তা'র চুলে ভরা, মাথা নেড়া বেল—
দেখলেই পায় বেদম হাসি—অদ্ভুত—বিটকেল।
সবাই ডাকে নন্দ খুড়ো,—লোক মন্দ নয়—
টাকার গদি শোয় বিছিয়ে গাঁয়ের লোকে কয়।
জন্মাবধি খুড়ো নাকি চড়েননি রেলগাড়ী—
একবারটি চড়ে' দেখতে সখ হ'ল তাঁর ভারি।
কলকাতাতে যাবেন বলে ট্রেন চড়তে গিয়ে—
কি যে নাকাল হলেন খুড়ো, শোন মন দিয়ে।
পোঁটলা পুঁট্‌লী নিয়ে যবে ঢুকতে গেলেন গাড়ী—
দরজা দিয়ে ঢুক্‌ল নাকো খুড়োর বিষম ভুঁড়ি।
ঠেলে ঠুলে ঢুকিয়েছিল খানিক দেহ তাঁর—
ভৃত্যে বলেন, ঠেলিস্‌ নে রে পারিনে তো আর।
চাইনে আমি চড়তে ট্রেনে, নামিয়ে নে চল্‌ মোরে—
ট্রেনের চেয়ে ঢের যে আরাম আমার গাঁয়ের ঘরে।
নন্দ খুড়োর ভৃত্য তাঁরে কর্‌ল টেনে বার—
ভুঁড়ির খানিক চামড়া তাঁহার ফিরল নাকো আর।
সেদিন থেকেই হলেন খ্যাত নন্দকিশোর রায়—
দেখবে যদি খোকাখুকু এসো মোদের গাঁয়।

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আক্রমণ

হেমন্তকাল, শীত আসে নাই, গ্রীষ্ম চলিয়া গিয়াছে। অন্ধকার আকাশে অগণ্য তারকা জ্বলিতেছে, আবার তাহারই প্রতিবিম্ব বঙ্গোপসাগরে প্রতিফলিত হইয়া মায়াজাল সৃষ্টি করিতেছে। মৃদু বাতাসে বেণীমাধব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

রাজেন বরুয়া হালের চাকাটি পা' দিয়া ধরিয়া, একটি চেয়ারে বসিয়া বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে।

বাঁশীর সুর বড় মিষ্ট লাগিতেছে। মাল্লারা সামনের ডেকে বিছানা পাতিয়া আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে, বনমালী নীচে তাহার ঘরে। সুরেশ রেলিংয়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ প্রকৃতির অপরূপ শোভা উপভোগ করিতেছে।

এই নিস্তব্ধ রাত্রে অতি দূর হইতে সাগরের গর্জ্জন মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যেখান হইতে এই গর্জ্জনের কলরব আসিতেছে কাল প্রভাতে জাহাজ সেই জায়গায় পৌছিবে, সেখানে কিছু মাল খালাস করিবার আছে। সে জায়গার নাম ওমুঙ্গা। সুরেশ সেই ওমুঙ্গাতে প্রভাতের পূর্ব্বেই পৌছিতে চায়, তাহা হইলে কাজের অনেক সুবিধা হইবে।

সুরেশের মনে অনেক কিছু চিন্তা আসিতেছিল, অধিকাংশই তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে। এবারকার সফরে ওমুঙ্গাই শেষ, এখানে মাল খালাস করিয়া আবার ফিরিয়া যাইবে। এবার তাহার জাহাজে আছে চা, ফিরিবার সময় অন্য কোনও মাল লইয়া যাইবে।

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সেই লুঠ-করা জাহাজের কথা, আকারায় সুন্দর সিংএর গুদাম। সে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেকার কথা। তাহার মনে ওরকম বিপদে পড়ার ভয় হয় নাই, তবু হতভাগ্যদের কথা মনে হইতেছিল। ওদিকে অস্পষ্ট তারকার আলোতে দেখা গেল—ঢেউয়ের জল ছিটিয়া উঠিল। দূরে দেখা যায় তীরের অস্পষ্ট রেখা। তাহার একদিকে অনন্ত সাগর, আর একদিকে প্রায় অদৃশ্য সমুদ্রতীর।

তীরের দিকে একটা অস্পষ্ট ছায়া নড়িতেছিল, সুরেশ চিন্তায় বিভোর, তাহা লক্ষ্য করে নাই। দাঁড়ে জলকাটার মৃদু শব্দ, কিন্তু সাগরের গর্জ্জনে সে শব্দ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পেছনদিকে যেন কেমন একটা শব্দ হইল, এবং তাহার পরেই জাহাজের সঙ্গে কি একটা ঘেঁসা খাইল। সুরেশ চমকিয়া ঘুড়িয়া দাঁড়াইল।

সে সবিস্ময়ে দেখিল, কে একজন দড়ি ধরিয়া জাহাজে উঠিতেছে। মনে হইল, লোকটি যেন সমুদ্র হইতেই উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল আরও পাঁচ ছয়জন লোক একটি নৌকা হইতে সেইভাবেই জাহাজে উঠিতেছে।

সুরেশ কোমর হইতে রিভলবার হাতে লইয়া সেদিকে ছুটিয়া গেল। প্রথমে তাহার মনে হইল, জাহাজ ওনুঙ্গার নিকটে আসিয়া পড়ায় তীর হইতে নৌকা আসিয়াছে, পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। ওনুঙ্গার লোক খুব ভাল, তাহারা কখনও কাহারও কোন ক্ষতি করে না এবং জাহাজে উঠিবার সময় তাহারা সাধারণতঃ কথাবার্তা বলার দরকার বোধ করে না।

ব্যাপারটা ঠিক জানিবার জন্য সুরেশ প্রশ্ন করিল,—"খবরদার! তোমরা কে? কেন নৌকায় এসেছ?"

জবাবে সুরেশের কান ঘেঁসিয়া একটি গুলী চলিয়া গেল।

সুরেশ থমকিয়া এক পা পিছাইল। তবে এরাই বোম্বেটে! আবার সঙ্গে বন্দুকও আছে! তাহোলে ওনুঙ্গার লোক নয়! তবে কি সেই দল, যারা কোপরা লুঠ করিয়াছে? সুরেশ গুলী ছুঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করিয়া একটা লোক জলে পড়িয়া গেল।

আর গুলী ছোঁড়া হইল না। কে এক ঝাঁকি মারিয়া তাহার হাতের রিভলবার ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গেই চার পাঁচটি লোক তাহাকে ধরিতে আসিল। ওদিক হইতে কে যেন বেশ গম্ভীর স্বরে বলিল,—"পাকড়ো, উল্লুককো!"

রাজেন বরুয়া গুলীর আওয়াজ শুনিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই কে একগাছি মোটা দড়ি দিয়া তাহাকে হালের সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিল। মাল্লারা উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহাদিগের গা ঘেঁসিয়া গুলী চলিতে লাগিল, বাধ্য হইয়া তাহারা আবার শুইয়া পড়িল।

সুরেশ তখনও অসুরের মত লড়িতেছিল। বিশাল-দেহ একটা লোক তাহাকে কায়দা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। লোকটা ভারী জোয়ান, কিন্তু সুরেশ বালক হইলেও কৌশলে তাহাকে হঠাইয়া রাখিতেছিল। লোকটা বলিল,—"রোখো, রোখো! নেইতো দরিয়ামে ডার দেগা।"

সুরেশ জবাবে তাহার নাকে একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারিল। লোকটা ঘুসি খাইয়া এবার মরিয়া হইয়া উঠিল, সুরেশের বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

বনমালী গোলমাল শুনিয়া নীচে হইতে বন্দুক হাতে ছুটিয়া আসিয়া এক গুলিতে একজন বোম্বেটেকে ফেলিয়া দিল; তারপর সুরেশের দিকে ছুটিল। হঠাৎ তাহার মাথায় এক লাঠির ঘা পড়িল, সে জ্ঞান হারাইল।

দুই তিনটি লোক নীচে ছুটিয়া গেল, একজন রিভলবার লইয়া মাল্লাদিগকে পাহারা দিতে লাগিল। বনমালী অজ্ঞান, রাজেন হাত-পা বাঁধা। একমাত্র সুরেশ প্রবলভাবে লড়িতেছে। তাহারা দুইজনে জড়াপাল্টা করিতেছে, পাশে তিন চারিজন দস্যু দাঁড়াইয়া আছে, সুযোগের অন্বেষণে। একজন একটু অগ্রসর হইয়া সুরেশকে ধরিতে চেষ্টা করিতেই এক লাথি খাইয়া ছিট্‌কাইয়া রেলিংএ গিয়া পড়িল।

জোয়ান লোকটি একটু সুবিধা করিয়া এক হাতে সুরেশের কোটের কলার ধরিয়া অপর হাতে তাহার কোমর হইতে ভোজালী বাহির করিল। ভোজালী উঠাইয়া বলিল,—"আভি ক্যা রে উল্লুক?"

সুরেশ কৌশলে বাঁ হাতে তাহার কব্জী ধরিয়া ঠেলিয়া দিয়া তড়াক্ করিয়া বসিয়া পড়িতেই ভোজালী আক্রমণকারীর স্কন্ধে বিদ্ধ হইল। সে চিৎকার করিয়া সুরেশকে ছাড়িয়া দিল। সুরেশ ডানহাতে তাহার মুখে আর এক ঘুসি মারিল। তখনই পশ্চাৎ হইতে দুই তিনজন তাহার দুই হাত শক্ত করিয়া ধরিল। আহত লোকটা বলিল,—"বিগ দেও দরিয়ামে।"

অমনি উহারা সুরেশের হাত-পা ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য শূন্যে তুলিল। সুরেশ ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেই কে একজন চিৎকার করিয়া বলিল,—"রোখো, একদম খুন মৎ করো। জান মারনেকো হুকুম নেহি হ্যায়!"

আবার কে বলিল,—"চো-ওপ্‌রাও! ফেকো পানিমে।"

ঝপাৎ! তাহাকে ছুঁড়িয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে বনমালী চক্ষু মেলিল, জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসে নাই। কয়েক মিনিট পর সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। মাথায় দারুণ ব্যথা। হতবুদ্ধির মত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মনে পড়িল মাথায় আঘাত লাগিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, মাথাটা আবার টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

ওদিকে কতগুলি লোক, হয়তো বারো চৌদ্দজন হইবে, জাহাজের চায়ের বাক্সগুলি আনিয়া ডেকে জমা করিতেছে। আবার কেহ কেহ সেই বাক্স নৌকায় তুলিতেছে। যে মাস্তলে তাহাকে বাঁধা হইয়াছিল তাহারই একটু দূর দিয়া দস্যুরা যাতায়াত করিতেছে। কয়েকজনের চালচলতি দেখিয়া অন্যান্যের চেয়ে একটু পদস্থ বলিয়া মনে হইল, কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদ সেই একই প্রকার, মাত্র কটিবাস।

তখনও বেণীমাধব পাল তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে খুঁজিতে লাগিল, সুরেশ কোথায়। মাথায় বেদনা, কিন্তু সুরেশের জন্য তাহার প্রাণ আকুল। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"এই ব্যাটারা! এই চোরগুলো! এই ব্যাটারা জবাব দিচ্ছিস্ না যে, সুরেশবাবুকে কোথায় রেখেছিস্? বল্ শিগগীর।"

রাজেন ওদিক হইতে অসহায়ভাবে চিৎকার করিয়া বলিল,—"ওরা মালিককে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ছেলেমানুষ, আর কি পারবে, হয়তো ডুবে মরে যাবে।"

"বলো কি হে?" বনমালী রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল। বাঁধন খুলিবার জন্য লাফালাফি দাপাদাপি করিতে লাগিল, কিন্তু এত কষিয়া বাঁধিয়াছিল যে, বাঁধন একটুও আলগা করিতে পারিল না। বরং জামা ছিঁড়িয়া গায়ের চামড়া কাটিতে লাগিল। রাজেন বলিল,— "আর কি মালিক বেঁচে আছে। ছেলেমানুষ, বদমায়েসরা তাঁকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছে।"

বনমালী তখন ছোট শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। জাহাজ বেগে ছুটিয়াছে, যদি সত্য সত্যই সুরেশকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তবে সে তো এখন চলমান জাহাজ হইতে বহুদূর।

"ওরে কুকুররা, যদি আমার হাত বাঁধা না থাকতো, যদি আমার হাতে বন্দুক থাকতো, তবে এতক্ষণ তোদের সব ছারপোকার মত মারতাম।" বলিয়া বনমালী উন্মত্তের মত চেষ্টা করিতে লাগিল বন্ধন খুলিবার জন্য, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আগন্তুকেরা তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ডেকের উপরিস্থ স্তূপীকৃত চায়ের বাক্সগুলি নামাইতে লাগিল। বাকী দস্যুরা নীচে যাইয়া সর্ব্বত্র লুঠের উপযুক্ত মালের সন্ধান করিতে লাগিল।

বনমালী নিরুপায়, তাহার চক্ষের সম্মুখে জাহাজ লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে,—ইহাও তাহাকে চুপচাপ দেখিতে হইতেছে, অথচ এই বনমালীর দাপটে সকল বন্দরের চোর, গুণ্ডা, বদমায়েস তটস্থ থাকে।

তাহার, চক্ষের সম্মুখে এরকম ব্যাপার যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। মনে হইতেছে, লোকগুলি যেন কালো কালো ছায়া, ঘটনাটি যেন স্বপ্ন।

"আয় গিয়া !"

কর্কশ স্বরে একজনে এই কথা বলিল, বনমালী চাহিয়া দেখিল জাহাজের সামান্য দূরে জল হইতে একটি পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে। দেখা গেল, দ্বীপে যেন গাছপালা নাই। জাহাজের পালের দড়ি খুলিয়া দিয়া জাহাজ থামানো হইল, জাহাজের ডিঙ্গিটা জলে নামানো হইল। দস্যুদের নৌকা ও ডিঙ্গি করিয়া চায়ের বাক্স তীরে নামানো হইল। আবার আসিয়া নৌকা দুইটিতে তাহারা বারবার চা বোঝাই করিয়া তীরে লইয়া যাইতে লাগিল। বনমালী বুঝিতে পারিল যে, এই পাহাড় হইতেই পরে অপর কোন জাহাজে এই সকল মাল উঠাইয়া লওয়া হইবে।

সমস্ত মাল খালাস হইবার পর একটি মাত্র নৌকা পাঁচ ছয়জন লোক সহ ফিরিয়া আসিল। তাহারা আবার জাহাজে পাল তুলিয়া দিল, বেণীমাধব আবার ছুটিয়া চলিল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই দ্বীপটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাল চুরি গিয়াছে সেজন্য বনমালীর মনে দুঃখ হয় নাই; সে ভাবিতেছিল জাহাজের লোকদের কথা। এই জাহাজ, জাহাজের সব মাল, টাকাকড়ি, প্রয়োজন হইলে আরও অনেক কিছুর মায়া সে ত্যাগ করিতে পারিত যদি সুরেশকে পাওয়া যাইত !

এইবার জাহাজের পাল নামানো হইল। তস্করগণ কুঠার ও কাটারী লইয়া মাস্তুল কাটিল, দড়ি কাটিল, পালগুলি টুকরা টুকরা করিতে লাগিল। বনমালী জানিত যে, তাহারা যাইবার পূর্ব্বে এইভাবে সব লণ্ডভণ্ড করিবে, যেন জাহাজ আর কার্য্যক্ষম না থাকে। তাহা হইলে জাহাজ কোনও ঘাঁটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিবে।

ইহার পর বর্ব্বরগুলি হাসিতে হাসিতে নৌকায় উঠিল। একজন লোক অবশিষ্ট রহিল; তাহার চালচলন দেখিয়া মনে হইল যে, সে দলের অন্যান্য লোকের অপেক্ষা অন্য স্তরের। সে জাহাজের সম্মুখে পিস্তল লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, যেন মাল্লারা কেহ কোনও অসুবিধা ঘটাইতে না পারে। এখন ধীরে ধীরে সে রিভলবার বাগাইয়া ধরিয়া নৌকার নিকট আসিল। তাহার পর তিনটি গুলী ছাড়িয়া নৌকায় লাফাইয়া পড়িল। নৌকা তখন দাঁড় ফেলিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তখন ভীত মন্থরগতিতে জাহাজের সম্মুখভাগ হইতে মাল্লারা আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বনমালী চিৎকার করিয়া বলিল,—"শিগ্‌গীর এদিকে এসো ! শুনছো ?"

একজন ছুটিয়া আসিল, বলিল,—"শুনেছি, এই এসেছি !"

তাহারা বনমালী ও রাজেন বরুয়ার বাঁধন কাটিয়া দিল। বনমালী ছুটাছুটি করিয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল, যদি নৌকাটা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নৌকা দেখিতে পাওয়া গেল না।

তখন সেই তরঙ্গবিক্ষিপ্ত জাহাজটি কি করিয়া সচল করা যায়, বনমালী ও রাজেন সেই পরামর্শ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। (ক্রমশঃ)

বাঁচবার উপায়

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

জ্যৈষ্ঠের পর]

তোমাদের হয়ত মনে আছে, গতবারের প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম, আমরা সচরাচর যে সব খাদ্যদ্রব্য আহার করি, তার মধ্যে আমিষ বা 'প্রোটিন', চর্ব্বি বা 'ফ্যাট্', শর্করা বা 'কার্ব্বোহাইড্রেট্' এবং খাদ্যপ্রাণ বা 'ভাইটামিন' ও মশলা বা 'স্পিসিস্' জাতীয় খাদ্য আছে, এবং এ-ও গতবারের প্রবন্ধে বলেছিলাম, কোন্ ধরণের খাদ্যদ্রব্য আমাদের কি ভাবে কোন্ কোন্ কাজে লাগে।

কিন্তু আরও একটা কথা হচ্ছে এই যে, শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কেনই বা খাদ্যের প্রয়োজন? এমন কি হ'তে পারত না যে, কিছু না খেয়েই শরীর বেশ্ সুস্থ ও সবল হ'য়ে রইল?

সত্যসত্যই যদি তা হ'তো, তবে যে ব্যাপারটা খুব মজারই হ'তো তা'তে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই। বেচাকেনা, বাজার-হাট, রান্না, টাকাকড়ি রোজগার, ওসবের কোন হাঙ্গামাই পোহাতে হ'তো না। হেসেখেলে দিন কেটে যেত। কিন্তু মাত্র একটা দিন না খেয়ে থাকলেই, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করে, শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। কথায় বলে রাত উপোসী হাতীও কাহিল হ'য়ে পড়ে, তা এতো মানুষ। না খেলে চলে না কেন, জান? মানুষের দেহ এক একটা প্রকাণ্ড সচল 'মেসিন' বা কল। তোমরা প্রত্যেকেই হয়ত দেখেছো কল চালাতে হ'লে, হয় বাষ্প—যার জন্য জল, কয়লা ইত্যাদি প্রয়োজন, না হয় পেট্রোল, না হয় বিদ্যুৎ, মোটমাট একটা যা হোক কিছু শক্তির দরকার। মানুষের দেহগুলোও এক একটা সচল সদা-চলিষ্ণু মেসিন। তবে সেই দেহরূপী মেসিনের কলকব্জা ও অংশগুলো লোহা বা ইস্পাত দিয়ে তৈরী নয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব জীবন্ত 'সেল' বা কোষ দিয়ে তৈরী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষ একত্রিত হ'য়ে দেহের এক একটি অংশ তৈরী হয়েছে, যেমন—পাকস্থলী, অন্ত্র, মস্তিষ্ক, চোখ, মাংসপেশী, হাড়, নখ, চুল, চামড়া, এইসব কিছু। ঐ সব অংশ যে সব কোষ দিয়ে গঠিত হয়েছে, সেই সব কোষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে বা কর্ম্মক্ষম থাকে মানুষের দেহও ততক্ষণই সচল, সুস্থ ও সবল থাকবে। ঐ সব সেলগুলোকে বাঁচাতে হ'লেই চাই আহার বা খাদ্য, এবং সেই খাদ্য হওয়া চাই পুষ্টিকর ও বলকারক।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে একটা শক্তির খুবই দরকার। এখন দেখা যাক, এই শক্তিটা কি ভাবে দেহের মধ্যে খাদ্যের সাহায্যে তৈরী হচ্ছে। তোমরা হয়ত জান, আগুন জ্বালাতে হ'লে দু'টো বস্তুর দরকার—একটা দাহ্যবস্তু অন্যটা অক্সিজেন। এঞ্জিন চলে শক্তির জোরে এবং সেই শক্তি তৈরী হ'চ্ছে কয়লা বা পেট্রোল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বা বিদ্যুতের সাহায্যে। দেহের মধ্যেও এঞ্জিনের মতই আগুন জ্বালিয়ে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে দিবারাত্র। সেই শক্তির সাহায্যে মানুষ হাঁটে, চলে, দৌড়ায়, কথাবার্ত্তা বলে, হাসে, কাঁদে। দেহের মধ্যে কয়লা বা পেট্রোলের কাজ করে আহার্য্য বস্তু এবং মানুষ শ্বাস নেওয়ার সময় নাক ও মুখ দিয়ে বাইরের বায়ুমণ্ডলস্থ অফুরন্ত ভাণ্ডার হ'তে অক্সিজেন সংগ্রহ করে নেয়। ভাত, ডাল, তরিতরকারি, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি আহার্য্য দ্রব্যগুলো প্রথমতঃ পাকস্থলীতে গিয়ে জমা হয়। তারপর সেখান থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হ'য়ে সেগুলো দেহের মধ্যকার রক্তস্রোতে গিয়ে ঢোকে। পরে রক্তস্রোতের মধ্যে অবস্থিত রক্তকণিকার ঘাড়ে চেপে দেহের মধ্যস্থিত কোষগুলোতে গিয়ে সঞ্চিত হয়। বায়ু হ'তে সংগৃহীত অক্সিজেনও রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে, রক্তকণিকার সাহায্যে ঐ সেলে গিয়ে একই সময়ে উপস্থিত হয়। তখন সেলগুলোর মধ্যে খাদ্যকণিকা ও অক্সিজেনে মেশামিশি হ'য়ে আগুন জ্বলতে থাকে। আমরা জানি, কোন কিছু পোড়ালে দু'টো জিনিষ হয়—এক হচ্ছে সেই পোড়ানর জন্য তাপ, দ্বিতীয় ছাই। দেহের অসংখ্য কোষগুলোর মধ্যে খাদ্যকণিকা পোড়ার জন্য যে তাপের সৃষ্টি হয়ে থাকে তা থেকেই তৈরী হয় দেহের শক্তি। এই শক্তিই দেহকে হাঁটায়, চলায়, এক কথায় কর্ম্মক্ষম করে' বাঁচিয়ে রাখে। আর খাদ্য পু'ড়ে শক্তি জুগিয়ে যে ছাই পড়ে থাকে তাই মল মূত্র, ঘাম, ইত্যাদি হ'য়ে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। শরীরের মধ্যে যে, এই আশ্চর্য্য রকমের ব্যাপারটা দিবারাত্র ঘটছে, এ মহাসত্যটি কে আবিষ্কার করেন জান? চিরস্মরণীয় বিজ্ঞানী লাভোসিয়র!

শরীরের মধ্যে যে তাপের সৃষ্টি হচ্ছে এটার পরিমাণ বা ডিগ্রী মেপে দেখবার একটা উপায় বা যন্ত্র আছে: সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে "ক্যালোরিমিটার"। 'ক্যালোরি' কথাটার মানে কি? ধর, এক সের জলের টেম্পারেচার বা তাপের পরিমাণ ১৫° ডিগ্রী; এখন যদি ঐ জলের তাপের পরিমাণ আরো ১° ডিগ্রী অর্থাৎ ১৬° ডিগ্রী করতে চাই, তা হলে জলটাকে আরো ফুটাতে হবে বা তাপ দিতে হ'বে নিশ্চয়ই। ঐ এক ডিগ্রী

বেশী তাপ করবার জন্য যে তাপের প্রয়োজন, তাকে বলা হয় এক 'ক্যালোরি' অর্থাৎ জলটাকে ১৬° ডিগ্রী তাপে তুলতে এক ক্যালোরি তাপ খরচ হয়েছে। এমনি করেই উত্তাপের একটা নির্দ্দিষ্ট মাপ ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। মানুষ যে সব খাদ্য আহার করে, সেগুলো শরীরের মধ্যে গিয়ে নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা প্রধানতঃ দু'টো কাজ করে—

এক নম্বরঃ ক্যালোরি উত্তাপের জোগান দিয়ে শক্তির সৃষ্টি করে।

দুই নম্বরঃ দেহের মধ্যে যে নিত্য ভাঙ্গাচোরা হচ্ছে সেগুলোকে আবার নতুন করে তৈরী করে। মানুষ যে সব খাদ্য খায়, যেমন, মাছ, মাংস, ভাত, ডাল, ফলমূল ইত্যাদি—এগুলোর প্রত্যেকের মধ্যেই, আমিষ, চর্ব্বি, শর্করা, খাদ্যপ্রাণ ও লবণ জাতীয় পদার্থ কমবেশী পরিমাণে আছে ; ঐ সব কয়টি খাদ্যাংশই প্রত্যেক মানুষের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়। আবার ঐগুলোর মধ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্য—যেমন, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি হচ্ছে দেহের পরিপুষ্টিসাধক, অর্থাৎ ঐ ধরণের খাদ্যগুলো শরীরের ক্ষয় ও ভাঙ্গাচোরা মেরামত করে নতুন নতুন কোষের গঠন করবে এবং চারিদিকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবন-ধারণের সমস্ত কাজগুলো চালিয়ে দেবে। মাছ মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি খাদ্যগুলোকে জান্তব আমিষ বলা হয় অর্থাৎ এগুলি জন্তু হ'তে আহৃত হয় ; এ ছাড়াও কতকগুলো আমিষ জাতীয় খাদ্য আছে, যেমন, ডাল, কলাইশুঁটি, বরবটি, পেস্তা, বাদাম প্রভৃতি। শেষোক্তগুলোর মধ্যে আমিষের অংশ কম। প্রত্যেক মানুষেরই প্রত্যহ মোটামুটি প্রায় এক শত গ্র্যাম আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন।

এরপর হচ্ছে চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য। চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যগুলো শরীরে ক্যালোরি তাপ তৈরী করে শক্তির জোগান দেয়। ঐ শক্তি হ'তেই মানুষের দেহ কর্ম্মক্ষমতা লাভ করে অর্থাৎ হাঁটা, চলা, বসা, কথা বলা, খাওয়া, দৌড়ান ইত্যাদি কাজগুলো সম্পন্ন করে। মানুষ যত প্রকার ঘি, তেল কিংবা চর্ব্বি খায়, সবই চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য। শর্করা জাতীয় খাদ্যও শরীরে তাপেরই জোগান দেয়। চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য বেশী খেলে শরীরে চর্ব্বি জমে যায়। শর্করা ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য দু'টোই শরীরে তাপের জোগান দিয়ে শক্তি তৈরী করে। তবে দু'টোর মধ্যে পার্থক্যও আছে—যেমন, চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যের ক্যালোরির মূল্য শর্করার ঠিক দ্বিগুণ। অতএব শর্করা জাতীয় খাদ্য যে পরিমাণ খেলে যে তাপের সৃষ্টি হয়, চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য তার অর্দ্ধেকটা খেলেই সে তাপ পাওয়া যায়। সেইজন্যই

দেখা গেছে, যারা শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রত্যহ খুব বেশী খান, যেমন, সাধারণ বাঙ্গালীরা —তাদের কিন্তু চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য খুব বেশী আর না খেলেও চলে। কেননা চর্ব্বি বা শর্করার কাজ একই। সেই জন্যই একটা বেশী খেলে অন্যটা তত বেশী না খেলেও চলে। তা ছাড়া এদেশটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে বেশী চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য খেলে শরীরে বেশী তাপের সৃষ্টি হ'বে। চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যের বেশী দরকার শীতপ্রধান দেশে,—যেখানে বাইরের ঠাণ্ডা হ'তে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য শরীরের মধ্যে বেশী করে তাপের সৃষ্টি হওয়া দরকার। এর পরই আসে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণযুক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি। খাদ্যের মধ্যে যদি ঐ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বর্ত্তমান না থাকে, তবে সে খাদ্য গ্রহণ নিরর্থক হয়ে যায়। ঐ খাদ্যপ্রাণ অতি সূক্ষ্ম ভাবে খাদ্যের মধ্যে থাকে এবং সামান্যতম অংশ খেলেই কাজ হয়। পেট ভরে নানা জাতীয় খাদ্য খেলেও যদি সেই খাদ্যগুলোর মধ্যে খাদ্যপ্রাণের অভাব হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হ'বে না। আর নানা প্রকার অসুখ দেহে দেখা দেবে। বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার খাদ্য পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন, খাদ্যের মধ্যে সাধারণতঃ ছয় প্রকার বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ আছে, এবং তাদের নাম দেওয়া হয়েছে, 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ', 'চ' খাদ্যপ্রাণ!

খাদ্যের মধ্যে আরো একটা পদার্থ থাকে, সেটা হচ্ছে 'লবণ'। 'লবণ' আবার খনিজ আর ধাতব দুই প্রকার। শাকসব্জী, দুধ, ডিম ইত্যাদি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে 'লবণ' থাকে। শরীরের পুষ্টির জন্য 'লবণ'ও একান্ত প্রয়োজনীয়। একজন পূর্ণবয়স্ক কর্ম্মক্ষম ও পরিশ্রমী লোককে পরিশ্রম করে সুস্থ ও সবল হ'য়ে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রত্যহ অন্ততঃ পক্ষে ৬৫ গ্র্যাম আমিষ, ৬০ গ্র্যাম চর্ব্বি, ৩৫০ বা ততোধিক গ্র্যাম শর্করা, ০'৬৮ গ্র্যাম চূণ, ১ গ্র্যাম ফস্‌ফরাস, ২০ মিলিগ্র্যাম আইওডিন ও ২৫ মিলিগ্র্যাম খাদ্যপ্রাণ দিতে পারে এই রকম পাঁচমিশেলী খাদ্য আবশ্যক। মেয়েদের পক্ষে কিছু কম হ'লেও চলে। কিন্তু শিশু ও বালকবালিকাদের জন্য আরো বেশী পরিমাণে খাদ্যের দরকার। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। এর পরের প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরণের খাদ্যবস্তু ও তাদের গুণাগুণ। এই প্রবন্ধের মধ্যে যদি কোথাও তোমাদের কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা বোধ হয়, তবে 'শিশুসাথী' কার্য্যালয়ে আমার নামে চিঠি দিলেই আমি সাধ্যমত তোমাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

খোকার কথা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজ্‌কে বুঝি কৈলাসেতে ভোলানাথের বিয়ে!
মেঘ-বধূরা যাচ্ছে সেথা বরণ-ডালা নিয়ে।
'পাগলটারে পরিয়ে মালা গিরিরাজের মেয়ে—
কেমন ক'রে রাখ্‌বে প্রাণ নিজের পানে চে'য়ে!
রাজকন্যা ভূত-নাচানো স্বামীর সাথে সদা—
ঘরকন্না কর্‌বে মাগো—বড্‌ডো ভয়ের কথা!
মাথায় নাকি মস্ত সাপ; গলায় কটু বিষ;
বাজিয়ে শিঙ্গা ষাঁড়ের পিঠে বেড়ায় অহর্নিশ।

এমন জামাই কর্‌লো কেন ক্যাবলা গিরিরাজ
সত্যি কথা বল্‌তে কি মা রাণীর বুকে বাজ—
বাদল দিনে পড়্‌বে আর মর্‌বে গিরিরাণী,
দেব্‌তারা যে স্বর্গ হ'তে কর্‌ছে কাণাকাণি।
খুকুমণির অমন বর হয় না যেন, মাগো!
কও মা কথা, কুলুঙ্গিতে বইটা তুলে রাখো।

আজ কিছুতে মন বসে না—আকাশ ডাকে গুরু,
বিষ্টি পড়ে, আমায় নিয়ে গল্প করো সুরু।
ঠ্যাং তুলে ঐ ব্যাংগুলো সব লাফিয়ে আসে ঘরে,
তোমার খুকু ভয় পেয়েছে, কান্না বুঝি ধরে!
বনের পথে কদম কেয়া গাইছে কত গান,
ভেঁপু বাজায় রাখাল ছেলে আকুল করে প্রাণ।
গিরিরাণীর নয়নধারা বাদলরূপে আসে,
ভোলানাথের বিয়ের ফুল আঁধার নভে ভাসে!

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

চারদিকেই শুধু বরফ—যতদূর দৃষ্টি চলে ধূ ধূ করছে। সামনে—পেছনে—ডাইনে—বাঁয়ে সব দিকেই। দূরে—বহু দূরে—আরও দূরে—আবার বরফের উঁচু স্তূপ—মিশে গেছে আকাশের গায়ে একটা ধূসর রেখার সঙ্গে। মনে হয়, পৃথিবী যেন সেখানেই শেষ হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা যায় দু'একটা গাছ—দাঁড়িয়ে আছে নীরবে—তা-ও বরফের পোষাক পরে। কোথাও কোন পথ নেই—কোথাও কোন জন-প্রাণীর সাড়া নেই। কখনও কোন প্রাণী সে রাজ্যে যে বাস করেছে, এমন কোন চিহ্ন পর্য্যন্তও নেই।

এরই উপর দিয়ে পথ ক'রে চলেছেন অতি কষ্টে এক সাহেব—মালপত্র বয়ে নেবার জন্য সঙ্গে তিনজন পাহাড়ী মজুর। উদ্দেশ্য—নূতন ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য হিমালয়ের ২১,২৬৪ ফিট উঁচু কাশ্মীর-গাঢ়োয়াল প্রদেশস্থ এক গিরি-শৃঙ্গের শীর্ষে আরোহণ করা। তিনি যাত্রা করেছিলেন গাঢ়োয়াল জেলার ভুন্দার উপত্যকা থেকে। সেখানেই তিনি তাঁর প্রথম তাঁবু ফেলেছিলেন।

১৪,৫০০ ফিট উঁচুতে উঠে সাহেব তাঁর দ্বিতীয় তাঁবু ফেল্‌লেন একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। রাত্রিটা সেখানে যাপন ক'রে পরদিন প্রভাতে আব্‌হাওয়া ভাল থাকলে পুনরায় তিনি যাত্রা সুরু করবেন—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু দৈবের এমনই লিখন যে, তাঁর সমস্ত পরিশ্রম—সমস্ত অর্থব্যয় একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেলো। কেন?—তাই বল্‌ছি।

পরদিন প্রভাতে সূর্য্য উঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে সাহেব তাঁবুর বাইরে এসে বরফের উপর কতকগুলো বিরাট আকারের পদ-চিহ্ন দেখে বিস্মিত হয়ে পড়লেন। চিহ্নগুলো মানুষের পদ-চিহ্নেরই মত। বহুদূর পর্য্যন্ত সেই চিহ্ন চলে গিয়েছে, দেখা যায়। মনে হয়, কিছু পূর্ব্বেই ঐ পদ-চিহ্ন যার সে সেই পথে উপরের দিকে কোথাও চলে গিয়েছে। সাহেব খুব মনোযোগের সঙ্গে সেই চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। এমনি সময় তাঁর সঙ্গী ঐ পাহাড়ী মজুর তিনজনও সেখানে এসে জুটলো। তাদের দৃষ্টি ঐ পদচিহ্নগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মাত্রই ভয়ে তারা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। সাহেব তাদের বল্‌লেন—"আবহাওয়া বেশ্ ভালোই দেখা যাচ্ছে—এখনই তাঁবুটাবু গুটিয়ে ফেলে যাত্রার বন্দোবস্ত কর। আর দেরী করা ঠিক হ'বে না।"

সাহেবের আদেশ শুনে মজুরেরা ভয়ে ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর করলে—"আমরা আর এগোতে পারবো না—এখান থেকেই ফিরে যাবো।"

সাহেব তাদের এই অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন—"কেন? কি হলো তোমাদের?"

তারা বল্‌লে—"ঐ ত আপনি পায়ের দাগ-গুলো দেখ্‌ছেন। এগুলো শিসের পায়ের দাগ, হুজুর কি জানেন না?"

সাহেব বল্‌লেন—"কোন পাহাড়ী প্রাণীর পায়ের চিহ্ন এগুলো হ'বে হয়ত।"

মজুরদের আশ্বাস দেওয়ার জন্য তিনি একথা বল্‌লেন বটে। কিন্তু তাঁর মনেও কেমন একটা খট্‌কা লেগেছিল এ দাগগুলো সম্বন্ধে। কারণ এর পূর্ব্বেই তিনি তাঁর পকেট থেকে স্কেল্ বার করে ঐ চিহ্নগুলোর মাপ নিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি চিহ্ন লম্বায় প্রায় আঠারো ইঞ্চি, আর প্রস্থে আট ইঞ্চি। মানুষ ত দূরের কথা পৃথিবীর কোন প্রাণীর পদ-চিহ্নই যে, এত প্রকাণ্ড হ'তে পারে না, সাহেব তা জান্‌তেন। তিনি ভাব্‌লেন—এই নির্জ্জন বরফের রাজ্যে—যেখানে জন-প্রাণীর কোন চিহ্নই নেই সেখানে কি করে এই পদ-চিহ্ন আস্‌তে পারে? তিনি একথা ভেবে শিউরে উঠ্‌লেন—যে প্রাণীর পদ-চিহ্ন এরূপ বিরাট তার দেহটি না জানি কেমন? তিনি শুনেছিলেন—অবশ্য পাহাড়ীদেরই মুখে যে, হিমালয়ের অতি উঁচু প্রদেশে—সেই চির-তুষারের দেশে বাস করে—অতি হিংস্র 'তুষার-মানব'। সারা অঙ্গ লোমে ঢাকা—দেখ্‌তে অনেকটা মানুষের মত হ'লেও—যেমন বিরাট তার দেহ—তেমনই রুক্ষ তার প্রকৃতি। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে আজও কেউ কোথাও তাদের দর্শনলাভ করে নি। তবে মাঝে মাঝে বরফের উপরে অঙ্কিত পদ-চিহ্ন অনেকেই অনেকবার দেখ্‌তে পেয়েছে। পাহাড়ীরা এই জীবের নামকরণ করেছে "হিমালয়ের ভয়ঙ্কর"। এরাই নাকি মানবের আদি পুরুষ—তারা বলে। সাহেব ভাব্‌লেন, তবে কি এই পদ-চিহ্ন সেই তুষার-মানবের?

সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসু-নেত্রে মজুরদের মুখের দিকে তাকালেন। মজুরেরা বল্‌লে—"হুজুর এ চিহ্ন যে-প্রাণীর পায়ের সে হচ্ছে অতি ভীষণ প্রাণী? আমাদের ভাষায় একে বলা হয়—'মিরকা'। দানব—হুজুর—ওরা দানব। হিমালয়ের এই যক্ষপুরীতেই এরা বাস করে। যেমনি বিরাট এদের চেহারা—তেমনি বিরাট হাত-পা—মুখটা যেন একটা পর্ব্বতের গুহা। কোন প্রাণী দেখ্‌তে পেলে অমনি ওরা মুখে পূরে দেয়।"

এই ভীষণ সঙ্কটেও মজুরদের কথা শুনে সাহেব না হেসে পারলেন না।

সাহেবকে হাস্‌তে দেখে মজুরেরা একটু ক্রুদ্ধ-স্বরেই তাঁকে বল্‌লে—"হুজুর, হাস্‌ছেন বটে, কিন্তু এক্ষুনি যদি এ জায়গা ছেড়ে না যান তবে বুঝ্‌তে পারবেন ব্যাপারখানা কত ভীষণ। চলুন, শীগ্‌গীর পালিয়ে যাই।"

এই সুদীর্ঘ কঠোর পথশ্রম সহ্য করে চারভাগের তিনভাগ পথ এসে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা মোটেই সাহেবের ছিল না। সুতরাং মজুরদের আশ্বস্ত করবার জন্য তিনি বল্‌লেন—এসব তোমাদের কুসংস্কার। দৈত্য-দানব বলে পৃথিবীতে কিছু নাই। তোমরা এগিয়ে চল—যদি তোমাদের কোন বিপদ হয়, তবে সেজন্য আমি দায়ী থাক্‌বো। ধর, যদি আমরা এই ভয়েই আজ এখান থেকে ফিরি তবে আর লোকের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না—কাপুরুষ বলে ঢি ঢি পড়ে যাবে। আর যদি ঐ পাহাড়ের চূড়োয় উঠ্‌তে আমরা পারি, তা হ'লে পৃথিবীতে আমাদের সবারই একটা কীর্ত্তি থেকে যাবে।"

এসব কোন কথায়ই কাজ হলো না। তা'রা পরিষ্কার ভাষায় বল্‌লে—"আমরা আপনার সঙ্গে গিয়ে প্রাণ দিতে পারবো না। আমাদের মাপ করবেন।"

এদের সাহায্য ছাড়া এই অজানা রাজ্যে পথ-চলা অসম্ভব। তাই সাহেব অতি অনিচ্ছায় তাঁর সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তখন তিনি "অর্দ্ধং ত্যজতি" নীতি অবলম্বন ক'রে, ঐ পদ-চিহ্নগুলোর রহস্য ভেদ করবার জন্য চিহ্ন অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'তে চাইলেন। কিন্তু কুলীরা নিশ্চল—নিথর। তা'রা আর "পাদমেকং" পর্য্যন্ত যেতে রাজী হ'লো না।

এরপর অনেক অনুনয় বিনয় ক'রে বলাতে তারা বল্‌লে যে, তারা ঐখানে সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে পারে—সাহেব ইচ্ছা হ'লে এগিয়ে দেখে আস্‌তে পারেন। তবে তারা

এক ঘণ্টার অধিক থাকতে পারবে না। সাহেব আর কি করেন; তিনি একাই চল্‌লেন এগিয়ে ঐ পদ-চিহ্ন অনুসরণ ক'রে। প্রায় দু'শ গজ দূরে এক জায়গায় গিয়ে তিনি দেখ্‌তে পেলেন বরফের উপরে কতকগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিহ্ন। সাহেব অনুমান করলেন যে, জানোয়ারটা বোধ হয় পাশের ছোট বরফের ঢিবিটার উপর থেকে লাফিয়ে নেমেছে এবং উঠেছে। ওরই ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে প্রায় এক হাজার ফিট উঁচু একটা বরফের পাহাড়। সুতরাং সেখানে আবার কোন্ নূতন রহস্য আছে তা' পরীক্ষা করা সম্ভব নয় ভেবে সাহেব সে চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। অতএব সেখান হ'তেই ফিরতে মনস্থ ক'রে, সাহেব তার পকেট থেকে ক্যামেরা বার ক'রে ঐ পদ-চিহ্নগুলোর কয়েকটি ফটো নিলেন। কিন্তু ব্যাপারটির সত্যিকার মীমাংসা তিনি করতে পারলেন না।

দেশে ফিরে এসে সাহেব সংবাদ-পত্রে তাঁর এই আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশ করে দিলেন। হুলুস্থূল পড়ে গেল—বিশেষ করে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের মহলে। তাদের কৌতূহলের আর সীমা রইলো না। তা'রা ঐ অভিযানকারী সাহেবের তুলে আনা ফটোগ্রাফগুলি পরীক্ষা ক'রে এর রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করলেন। কেউ বল্‌লেন, হস্তি-শাবকের পদ-চিহ্ন; কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই বল্‌লেন যে, এ এক শ্রেণীর ভল্লুকের পদ-চিহ্ন। এই শ্রেণীর ভল্লুক সাধারণতঃ দেখা যায় হিমালয়ের পশ্চিম এবং মধ্য প্রদেশে। কিন্তু প্রশ্ন উঠ্‌লো যে, ভল্লুকের পদ-চিহ্ন ত এত বড় হ'তে পারে না। পণ্ডিতেরা এর কারণও বল্‌লেন বটে। যুক্তির দিক থেকে মেনে নেওয়া গেলেও প্রকৃত পক্ষে সে কারণ সত্যি কিনা তা বলা শক্ত। তোমাদের পূর্ব্বেই বলেছি যে, আজ পর্য্যন্ত এত উঁচুতে ঐ বরফের রাজ্যে ভল্লুক ত দূরের কথা কোন প্রাণীরই সাক্ষাৎ কেউ পায়নি। পণ্ডিতেরা ভল্লুকের পদ-চিহ্ন বড় হবার কারণ সম্বন্ধে বল্‌লেন—যখন ভল্লুকটা ঐ পথে চলে গিয়েছিল তখন ছিল রাত্রি—আর বরফ ছিল জমাট—প্রভাতে সূর্য্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য-কিরণের উত্তাপে বরফ উত্তপ্ত হওয়ার ফলে, প্রসারিত হয়ে স্বাভাবিক পদ-চিহ্নগুলোই এইরূপ বিরাট আকার ধারণ করেছে।

এ যুক্তি কিন্তু সবাই মেনে নিতে পার্‌লে না। ভল্লুক বন-জঙ্গলের মত প্রিয় আবাস-স্থল পরিত্যাগ করে—পর্ব্বতের অতি উচ্চ-প্রদেশে বরফের রাজ্যে বাস করতে যাবে কেন? ঐ বরফের দেশে ওরা বাঁচবেই বা কি খেয়ে? তদুপরি সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—আজ পর্য্যন্ত কেউ কোন প্রাণীর সাক্ষাৎ সেখানে পায় নি—যদিও এইরূপ পদ-চিহ্ন এর পূর্ব্বেও বহুবার ঐ বরফের রাজ্যে অনেকেই দেখেছে। ব্যাপারটার সত্যিকার মীমাংসা তা হ'লে হলো কৈ?

তবে কি ওরা সত্যি সত্যিই পাহাড়ীদের বর্ণিত দানব না তুষার-মানব?—আর তাদেরই পদ-চিহ্ন এগুলো! *

---

* সুবিখ্যাত পর্ব্বত-অভিযান-কারী মিষ্টার এফ. এস্. স্মাইথ সাহেবের প্রদত্ত বিবরণ অনুসরণে।

মা-পো

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রাত্রির অন্ধকারে কামান গর্জ্জে উঠ্‌ল—বুম্—বুম্—বুম্ম!

চীৎকার উঠ্‌ল—শত্রু, শত্রু, শত্রু!

তন্দ্রাচ্ছন্ন নাগরিকেরা এক নিমেষে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল, হাতের কাছে যার যা হাতিয়ার ছিল নিয়ে দরজা খুলে পথে বার হ'য়ে পড়লো। কেউ কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস কর্‌ল না, যারা কিছু জিজ্ঞেস কর্‌ল তারা জবাব পেল না। সারা সহরের যুবকদল ভেঙ্গে পড়ল পথের জনতার মাঝে, সারা পথ জুড়ে ভিড় এগিয়ে চল্‌ল সামনের পানে। কালো কালো অসংখ্য মাথা দেখে মনে হয় যেন একটি চলমান কালো পাথরের টুক্‌রো, গুঞ্জন শুনে মনে হয় যেন একটা ঘূর্ণি ঝড়ের সাড়া।

শাঁ শাঁ ক'রে মাথার উপর দিয়ে গোলা ছুটে গেল, দূরে আগুনের ঝিলিক দিয়ে বুম্ বুম্ ক'রে ফাট্‌ল। পিছনের একটি পাইন গাছে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। জনতা উত্তেজিত হ'য়ে জয়োল্লাস তুললো—'তা তুই তাই! মহাচীনের জয়! কুওমিংটাংয়ের জয়!'

হাসপাতালের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়—শত্রু এগিয়ে আসছে। আহতেরা চমকে ওঠে, ডাক্তারেরা চমকে ওঠে। সকলেরই চোখ-মুখে আতঙ্কের ছায়া।

ডাক্তারের মুখের পানে তাকিয়ে একজন নার্স জিগ্‌গেস করে—"কি হবে, ডাক্তার?"

ডাক্তার মৃদু হেসে বলে—"হবে আবার কি?"

—"এতগুলো লোক শত্রুর হাতে মরবে? এদের যে অনেকেই বাঁচতো, ডাক্তার?"

—"সবাই যে মরবে, এ কথা তোমায় কে বল্‌লে?"

—"নান্‌কিন ফ্রণ্টে, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি, ডাক্তার, হাসপাতালটায় ওরা আগুন জ্বালিয়ে দিলে।"

—"কিন্তু এখন আমরা কি করতে পারি বল? একখানি তো মাত্র এম্বুলেন্স, তিনশো আহতকে নিয়ে যাই কোথা? ওদের তো ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি?"

অদৃষ্ট! অদৃষ্ট বলে আবার কিছু আছে নাকি? নার্সটি বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মন তার চঞ্চল হয়ে ওঠে। নানকিন্ ফ্রণ্টে তার ভাই ও প্রতিবেশী ছেলেরা সকলে লড়ছে। তাদের মধ্যে এতক্ষণ কেউ হয়তো বেঁচে নাই! আর কতক্ষণ পরে শত্রুরা এসে পড়লে এখানেও

কেউ আর বেঁচে থাকবে না। এই তাদের অদৃষ্ট! যারা দুর্ব্বল ও গরীব যত কিছু বিপত্তি সব তাদের অদৃষ্টেই ফলবে, আর সবলের অদৃষ্টেই যত কিছু আনন্দ! ওঃ! আজ যদি তার ক্ষমতা থাকতো……

ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে চীনা নার্স্‌টি বারান্দার রেলিংয়ের গায়ে সজোরে একটা ঘুঁসি মারলো। সমস্ত হাতখানি ব্যথায় টনটন্ ক'রে উঠ্‌লো।

ডাক্তার কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, মৃদু হেসে বল্‌লেন,—"অত চঞ্চল হ'য়ো না, সিস্‌টার।"

—"চঞ্চল হ'ব না? তুমি বল কি, ডাক্তার! আমার সোনার দেশকে ওরা শ্মশান ক'রে দিলে, বোমা ফেলে কত গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে, কামান দেগে কত লোক খুন কর্‌লে, আর আমি চঞ্চল হ'ব না!"

—"সবই তো জানি সিস্‌টার, কিন্তু তুমি একা। কি কর্‌তে পার বল? হাজার হাজার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েও কিছু কর্‌তে পার্‌ছে না, তোমার আমার মত দু'একজন কি করবে, বল?"

ডাক্তারের কথাগুলি মা-পো মনে-প্রাণে স্বীকার কর্‌তে পারলো না—কোন জবাব দিল না। অস্থিরভাবে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে চলে গেল, প্রতিটি শয্যাশায়ী আহত সৈনিকের মুখের পানে তাকায়, আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্ক তাদের চোখে। এদের আর বাঁচানো গেল না। জাপানীদের হাতে এদের মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু উপায় নেই।………সত্যই কি উপায় নেই?………মা-পো'র কপালে চিন্তার রেখা পড়ে।

ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যায়, মা-পো আবার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, পূর্ব্বদিকের আকাশের গায়ে কয়েকখানি প্লেন দেখা যায়, ফড়িংয়ের মত উড়ে আস্‌ছে। ডাক্তারের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠ্‌লো, বল্‌লে—জাপানী বোম্বার!

মা-পো বোমারু প্লেনগুলির পানে তাকিয়ে থাকে স্তব্ধ হ'য়ে।

ঘর্‌-ঘর্‌ ঘর্‌-ঘর্‌ ক'রে প্লেনগুলি মাথার উপর এসে পড়লো, গতি হ'য়ে এল মন্থর—এক সময় সেগুলো আকাশের গায়ে থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর মাথার উপর গোল হয়ে ঘুরতে সুরু করলে। ঘুরতে ঘুরতে সহসা চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গিতে নীচের দিকে নেমে এসেই একটা বোমা ফেলে উপর দিকে উঠে গেল—বোমাটি মাটিতে পড়েই প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল। মাটি কেঁপে উঠ্‌লো, অদূরে পাহাড়ের গায়ে খানিকটা ধুলো ও ধোঁয়া উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

তারপর বুম্‌ বুম্‌ বুম্‌ ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিক কয়েক মিনিটের মধ্যে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একেবারে কালো হ'য়ে গেলো।

হাসপাতালের মধ্যে আর্ত্তনাদ উঠ্‌লো।

মা-পো আর ঠিক থাকতে পারলে না ; দু'হাতে কয়েক সেকেণ্ড মাথাটা চেপে ধরে রইলো —মাথার মধ্যে কিসের একটা যাতনা তাকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লো। হঠাৎ অত্যন্ত কাছে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সে চমকে উঠ্‌লো, তর্‌ তর্‌ ক'রে ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বল্‌লে,— "আমি চল্লাম ডাক্তার !"

—"কোথায় ?"—ডাক্তারের বিস্মিত কণ্ঠস্বর !

সে প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য মা-পো আর দাঁড়ালো না, সে ততক্ষণে পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কতক্ষণ পরে প্লেনগুলির পিছনে ঘন পাহাড়ের আড়ালে শত্রুবাহিনী আত্মপ্রকাশ কর্‌ল, তাদের ব্যাণ্ডের বাজনা বাতাসকে মুখর ক'রে তুল্‌লো—তক্‌ তক্‌ তর্‌র্‌ তক্‌—ততর্‌ ততর্‌ তক্‌ !

সারি সারি ট্যাঙ্ক আর মেশিন গান নিয়ে যারা এগিয়ে এল তাদের সকলেই জাপানী সৈন্য।

পথের উপরেই হাসপাতাল। সৈন্যদল দরজার কাছে আসতেই ডাক্তার করজোড়ে তাদের অনুরোধ কর্‌লে, আহত সৈন্যদের উপর যেন কোনও অত্যাচার না করা হয়।
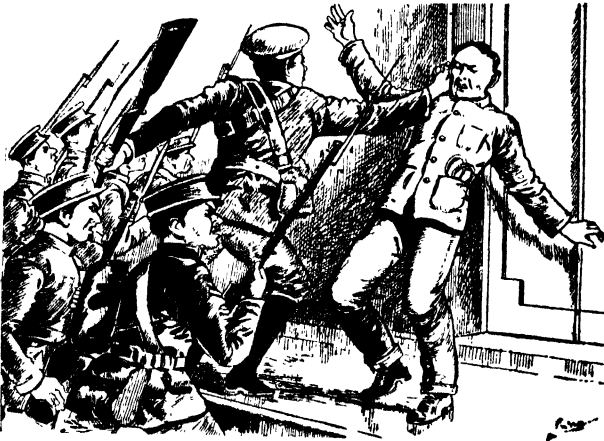
সে কথা তারা বুঝতে পার্‌লো কিনা কে জানে, ডাক্তারকে ধাক্কা দিয়ে সেনারা হুড়মুড় ক'রে গিয়ে ঢুকলো হাসপাতালের ভিতর।

এক লহমায় শান্তিপূর্ণ হাসপাতালটির মধ্যে সব যেন ওলট-পালট হ'য়ে গেল। একটা হুড়মুড় শব্দ, আহতদের অতি করুণ আর্ত্তনাদ, উল্লাসের উচ্ছ্বাস—সব মিলে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করলে।

মা-পো'র কানে এসে বাজলো আহতদের করুণ আর্ত্তনাদের রেশ। মা-পো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। ভগবান ব'লে কি কিছুই নেই ? এত নিরীহ দুর্ব্বল লোককে খুন কর্‌লেও কি পাপ হয় না ? তবে·· ······

মা-পো দ্রুত পা চালালো—কোথায় চলেছে, কেন যাচ্ছে, সে কিছুই জানে না। কিসের যেন নেশায়, কিসের যেন এক উত্তেজনায় সে এগিয়ে চল্‌ল। [আস্‌ছে মাসে শেষ হ'বে]

অনুসন্ধানী

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ.

হটবেড

'হটবেড' কথাটার একটা অর্থ হ'চ্ছে—কোনও স্থান বা অবস্থা যেটা কোনও খারাপ কিছু জন্মাবার পক্ষে অনুকূল। যেমন, কোনও বিশেষ যায়গা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে,— The place is a hotbed of malaria. আর একটা অর্থ হ'চ্ছে—কৃত্রিম উপায়ে বা জোর ক'রে কোনও কিছু তাড়াতাড়ি উৎপাদন করা।

আমি এই দ্বিতীয় প্রকার 'হটবেডের' কথাই বল্‌ছি।

যুদ্ধ-সমস্যা এবং অন্ন-সমস্যা তু'টোতেই বিজ্ঞানীদের মাথা বেশ তাড়াতাড়ি খোলে, দেখা গেছে। এইরূপ সমস্যার দিনে বিজ্ঞানীরা চিন্তা কর্চ্ছিলেন, কি ক'রে খুব অল্প স্থানে এবং খুব অল্প সময়ে খুব বেশী শস্য উৎপাদন করা যায়।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বিদ্যুৎ-শক্তিদ্বারা উষ্ণ কোনও ক্ষেত্রে চারাগাছ লাগালে তার বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি। নরওয়ে দেশেই এই প্রথার উৎপত্তি। তারপর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এর যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছে।

বড় কাঠের পাত্রে বা তুই তিন থাক সেল্‌ফে, শস্যের শিকড় অনুযায়ী মাটি রেখে 'হটবেড' তৈরি হয়। হটবেডের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একরকম বৈদ্যুতিক তার আছে। এই তার (cable) প্রায় এক ইঞ্চি জমির নীচে দিয়ে চালানো হয়। একটা উত্তাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা 'Thermostat' থাকে, যাতে করে ঐ জমির উত্তাপটা ৩০ থেকে ১০০ ডিগ্রীর মধ্যে রাখা হয়।
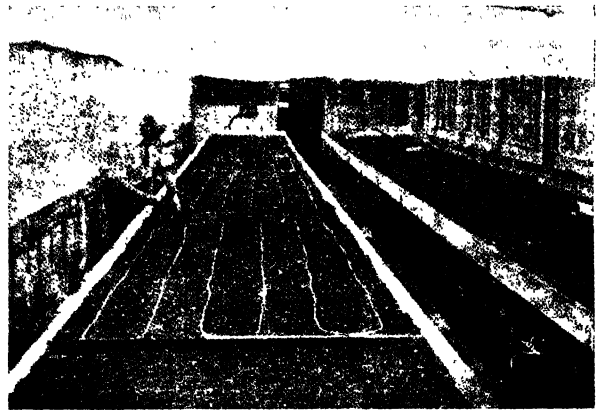
হটবেডের সব চাইতে সুবিধা এই যে, এর জমিতে সার দেওয়ার কোন দরকার হয় না। প্রত্যেক তিন চার বছর অন্তর উপরের মাটিটা পালটে নিলেই হ'ল।

এইভাবে 'হটবেডে' তৈরি চারাগুলির সাধারণ চারা অপেক্ষা অৰ্দ্ধেক সময়ে শিকড় গজায়। দেখা গেছে, সাধারণ চারাগুলি ৩০ দিনে যত বড় না হয়, হটবেডের চারাগুলি মাত্র ১০ দিনে তত বড় হ'য়ে থাকে।

বিদ্যুতের সাহায্যেই এগুলি সম্ভব হয়।

সাধারণ অবস্থায় বাতাবীলেবু গাছের চারায় পাঁচ-সাত বছরে ফুল হয়; কিন্তু 'হটবেডে' দেখা গেছে, এক মাসের গাছেই ফুল ধরেছে।

ছবিতে দেখা যাবে, গাছটি দুই ইঞ্চির বেশী বড় নয়। এই রকম গাছের ফুল আকারে ছোট হয়, কিন্তু এত শীঘ্র ফুল উৎপাদনের কৌশল একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার!

সাধারণ হটবেডেই যে এটা হ'য়েছে তা নয়। বীজে একস্-রে ব্যবহার করার ফলেই গাছটির দ্রুত-বৃদ্ধি সম্ভব হ'য়েছে। সাধারণ হটবেডের পাঁচ সপ্তাহের এবং একস্-রে করা বীজের পাঁচ সপ্তাহের গাছের পার্থক্য ছবিতেই পরিষ্কার বুঝা যাবে।

একস্-রের নতুন কাজ

সাধারণ লোকের ধারণা একস্-রে জিনিষটা কেবল রোগ-চিকিৎসার একটা যন্ত্র মাত্র; কিন্তু একস্-রে দিয়ে আজকাল গাছ-পালারও বৃদ্ধি সাধন করা হয়। একস্-রে দিয়ে সম্প্রতি জাল-জোচ্চুরীও ধরা হ'চ্ছে। বাক্সবন্দী হ'য়ে ফল কি আরও কত সব জিনিষ এল। বাক্সের মধ্যে কি আছে না আছে তাতো আমরা আর জানিনে। বাক্স খুললে হয়ত দেখা গেল, তার মধ্যে অৰ্দ্ধেকের বেশী পাথরের নুড়ি!

এই জোচ্চুরী ধরবার জন্য 'একস্-রে' ব্যবহৃত হ'চ্ছে। সাধারণ চোখে যে জিনিষের দোষ ধরা পড়ে না, একস্-রে করলে বেড়িয়ে পড়বে তার ভিতরকার কৃত্রিমতা

একস্-রে দিয়ে আবার মোটরের টায়ার পরীক্ষাও হ'চ্ছে। টায়ারের মধ্যে অনেক সময় পাথর, ভাঙ্গা কাঁচ, কাঁকর প্রভৃতি ঢুকে টায়ারটাকে খারাপ ক'রে রাখে। একস্-রে পরীক্ষায় এইগুলি ধরা পড়ে।

নবযুগের সার্চ্চলাইট

বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড, উপর থেকে শত্রুর বোমা-নিক্ষেপ যে সব যন্ত্রপাতি দিয়ে বন্ধ কর্চ্ছে, তার মধ্যে আধুনিক সার্চ্চলাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লাইটের ব্যাস (diameter) ৬০ ইঞ্চি এবং তার তীব্রতা-শক্তি হ'চ্ছে ৮০০,০০০,০০০ ক্যানডেল পাওয়ার। এটা উপরে কম পক্ষে সাড়ে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত আলো ফেলে শত্রুর বিমান-পোত পর্য্যবেক্ষণ করতে পারে। কেবল উপরে নয়, আলোটি উপরে, নীচে, বাঁদিকে অথবা ডানদিকে ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান যায়।

এই রকম শক্তিশালী আলো আবার দূরবীণের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। যারা সব সময়ে দূর আকাশ-পথের শত্রুবিমান লক্ষ্য করে, তাদের পক্ষে রাত্রিবেলায় এই আলো বিশেষ প্রয়োজন।

সংবাদিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ, পি-এইচ্. ডি. মহোদয় গত পাঁচ বৎসর যাবৎ অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া, গত ১লা জুলাই হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। বঙ্গভাষা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, শারীর-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে; কৃষিবিদ্যা শিক্ষার এবং কৃষি-বিষয়ে ডিগ্রি (B. Ag.) দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

ডাঃ মজুমদারের স্থলে ভাইস্-চ্যান্সেলার হইলেন খান্ বাহাদুর ডাঃ এম্. হাসান, এম্-এ, ডি-ফিল্. ইনি এই ভার গ্রহণের পূর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। আশা করা যায়, তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্ববিষয়েই উন্নতি লাভ করিবে।

পরলোকে যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কাগজ-বিক্রেতা মেসার্স জন্ ডিকিন্সন্ কোম্পানির বড়বাবু যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় অকালে মাত্র ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সামান্য বেতনে উক্ত কোম্পানিতে প্রবেশ করিয়া, নিজের পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে এক হাজার টাকা বেতনে বড়বাবুর পদ পাইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং তিনি সকলকেই অকুণ্ঠভাবে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। প্রধানতঃ তাঁহারই উৎসাহে ও সহানুভূতিতে শিশুসাথী ও বার্ষিক শিশুসাথী প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং আজীবন তিনি শিশুসাথীকে অকপটে ভালবাসিতেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে সুধীরচন্দ্র সেন

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কার্য্যবিবরণীর সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সেন মহাশয় গত ২রা আষাঢ় বুধবার পরলোক গমন করিয়াছেন। বাহ্যতঃ তাঁহার কোন অসুখ ছিল না, কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে তাঁহার বাসায় মৃতাবস্থায় দেখা যায়। তিনি প্রথম বয়সে ঢাকা হইতে প্রকাশিত শিশুদের মাসিক পত্রিকা 'তোষিণী'তে সামান্য প্রুফ রীডারের কাজ করিতেন এবং স্বীয় অতুল অধ্যবসায়ের গুণে বর্ত্তমান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'তিনি একখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের গ্রন্থকাররূপে প্রথমে আমাদের সহিত পরিচিত হ'ন। শিশুসাথীর প্রতি তাঁহার চিরদিন অসীম স্নেহ ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

উল্টা বুঝিলি রাম

শ্রীনীলরতন দাশ, বি. এ.

রামের ভক্ত সন্ন্যাসী এক তীর্থ ভ্রমণ করি'
চরণযুগল শরীর অচল, কহে দেবতারে স্মরি'—
"হাঁটি অনুখন ক্লান্ত চরণ, দুর্ব্বহ দেহভার ;
রাম দয়াময় ! অশ্ব মিলাও, চলিতে পারি না আর।"
রাজার সিপাহী গর্ভিণী এক ঘোটকীর পিঠে চড়ি'
জরুরী কাজের ভার ল'য়ে দ্রুত চলে সেই পথ ধরি'।
রুগ্ন শাবক প্রসব করিল ঘোটকী পথের মাঝ ;
দুর্ব্বল শিশু চলিতে পারে না—হয়ে এল ক্রমে সাঁঝ।
মুস্কিলে পড়ি' সিপাহী ভাবিল—"অনেক পথ যে বাকী ;
বাচ্চারে ফেলি কেমনে বা চলি ?" কহিল সাধুরে হাঁকি'-
"সদ্যপ্রসূত অশ্বিনীসুত কাঁধে করে' নিয়ে চল্,
রাজার কার্য্যে হ'লে অবহেলা হ'বে বিষময় ফল।"
সাধু বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে বাচ্চারে কাঁধে তুলি'
সিপাহীর সাথে চলে রাজপথে সকল ক্লান্তি ভুলি'।
সন্ন্যাসী চলে মনে মনে বলে—"হায় বিধি মোর বাম।
চড়িবার লাগি ঘোড়া মাগিলাম, উল্টা বুঝিলি রাম!"

কলিকাতায় প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

শ্রীম—

গেল মাসে তোমাদের বলা হয়েছে যে, প্রথমার্দ্ধের খেলায় ইষ্টবেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিং থেকে তিন পয়েণ্ট বেশী পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হ'বে বলা যায় না। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে যে, এর পূর্ব্বে অনেকবারই দেখা গেছে, এদের লীগ-বিজয় অতি অল্পের জন্য শেষের দিকে ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে। নিজেদের উপরে আত্মবিশ্বাস রাখা খুবই দরকার, কিন্তু তা বলে অন্য দলের শক্তি সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করাও উচিত নয়। এই ব্যাপারটাই অন্যান্য বারে ইষ্টবেঙ্গলের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। এবার ইষ্টবেঙ্গল কিন্তু সুরু থেকেই তাদের গতি অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যলক্ষ্মী হয়ত এদের প্রতিই সুপ্রসন্না হ'বেন। এদলের সোমানা, সুনীল ঘোষ, আপ্পারাও, কৃষ্ণরাও, আমিন, পি. দাশগুপ্ত বেশ্ চমৎকার ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন।

মহামেডান এবারে লীগ-তালিকায় এখন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। শুধু ক্রীড়াজগতেই নয়, সংসারের সমস্ত ব্যাপারেই জয়-পরাজয় সকল সময় নৈপুণ্যের মান নির্দ্দেশক নয়। কারণ দুর্দ্ধর্ষ মহামেডান দল খুব চমৎকার খেলেও অনেকগুলি খেলা অমীমাংসিতরূপে শেষ করেছে। এদের দলের সাবু, রসিদ, সিরাজউদ্দিন, নূরমহম্মদ (বড়), তাজমহম্মদ, তাহের অতি উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রথমার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল মহামেডানের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান অমীমাংসিতরূপে শেষ হয়েছে। এ খেলাটি চ্যারিটি খেলা হয়েছে। প্রথমার্দ্ধে মোহনবাগান মহামেডানকে ২-১ গোলে পরাজিত করে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে মোহনবাগান এদের কাছে পরাজিত হয়েছে ২-০ গোলে। মোহনবাগানও ভালই খেলছে। এদের দলের গর্গরী, বেণীপ্রসাদ, এ. ভট্টাচার্য্য, অনিল দে, নিমু বোস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এরিয়ানস্ মহামেডানের মত দুর্দ্ধর্ষ টিমের সঙ্গে ১-১এ ড্র করেছে। এর চেয়ে কৃতিত্বের পরিচায়ক আর কি হতে পারে?

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ভবানীপুরের খেলাও ১-১এ অমীমাংসিতরূপে শেষ হয়েছে। কালীঘাট দল অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হ'লেও এরিয়ান্‌সকে ২-১এ পরাজিত করেছে। বি. অ্যাণ্ড এ. রেলওয়ে দল মোহনবাগানের কাছে ২-০এ হেরে গেছে। রেল দলের বিমল করের খেলা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

ভবানীপুর পুলিশকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। পুলিশ টিম এবার খুবই দুর্ব্বল, কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে তারা প্রথমে ড্র রাখে, তারপর মহামেডান স্পোর্টিং যখন তাদের হারাতে পারলে না, তখন সকলেই বিস্মিত হলো। তারপর ইষ্টবেঙ্গল টিম যখন ড্র করলে তখন সকলেই অবাক।

সবচেয়ে শোচনীয় পরিণতি হয়েছে চারটি দলের—ক্যালকাটা, রেঞ্জার্স, ডালহৌসী এবং কাস্টমস্। বারো চৌদ্দ বৎসর আগেও যারা খেলার মাঠে গিয়েছেন তারা এদের অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যান্নি। বেশ কিছু দিন থেকেই এইসব দলের খেলার অধোগতি আরম্ভ হ'য়ে ক্রমে বর্ত্তমানে এই পরিণতি লাভ করেছে। সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল), বিমল কর (বি. অ্যাণ্ড এ. আর), সুনীল ঘোষ (ইষ্টবেঙ্গল), সাবু (মহামেডান)—এঁরা এবারের লীগ প্রতিযোগিতায় এখন পর্য্যন্ত বেশী গোল দিয়েছেন।

কলকাতার মাঠে ফুটবল খেলায় এর পরবর্ত্তী আকর্ষণ হচ্ছে আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতা —২০শে জুলাই থেকে সুরু হ'বে। বোম্বাইতে রোভার্স কাপের খেলা আগস্ট মাস থেকে আরম্ভ হ'বে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর বাইরে থেকে যে সমস্ত দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে যেতেন, তাদের আর্থিক সাহায্য করা হ'তো। এবারের পরিস্থিতির জন্য তা করা হ'বে না। সুতরাং বাইরে থেকে কোন ভাল দল যোগদান করবেন কিনা সন্দেহ। তা যদি না করে তবে এ খেলা আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। আর একটী বড় আকর্ষণ হচ্ছে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলা— সন্তোষ মেমোরিয়াল ট্রফি। এ খেলা ভারতবর্ষের নানা জায়গায় হ'বে। প্রথম খেলা মহীশূর বনাম হায়দরাবাদ ১৯শে আগস্ট বাঙ্গালোরে আরম্ভ হ'বে।

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের তালিকা

(২২শে আষাঢ় পর্য্যন্ত)

দলের নাম	খেলার সংখ্যা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বপক্ষে গোল	বিপক্ষে গোল	পয়েন্ট
ইষ্টবেঙ্গল	২২	১৮	৩	১	৬০	৭	৩৯
মহামেডান স্পোর্টিং	২০	১৩	৬	১	৫৮	১০	৩২
মোহনবাগান	২০	১৩	৪	৩	৪৫	১৬	৩০
ভবানীপুর	২০	৯	৭	৪	২৫	১১	২৫
বি. অ্যাণ্ড এ. রেল	১৯	৯	৫	৫	৪০	২৮	২৩
এরিয়ান্স্	১৯	৬	৭	৬	২৫	২৮	১৯
কালীঘাট	২১	৭	৫	৯	২৬	২৩	১৯
পুলিশ	২০	৬	৫	৯	২১	২৩	১৭
স্পোর্টিং ইউনিয়ন	১৯	৫	৫	৯	২৫	৩৩	১৫
ক্যালকাটা	১৯	৫	৫	৯	১২	৪৮	১৫
রেঞ্জার্স	২০	৬	২	১২	২০	২৯	১৪
ড্যালহৌসি	২০	৪	৩	১৩	১৯	৪৮	১১
কাস্টমস্	২৩	১	১	২১	৯	৭৯	৩

ধাঁধা

১। ভোরের আলোর সাথে ভালবাসা মোর,
তাই মোর চোখে নিদ্রা নাই,
রাতের আঁধার সাথে নাই কোন মিল,
অকাতরে সুখে নিদ্রা যাই।

২। বলত শিশুরা সবে কিবা নাম তার,
সৃষ্টিকর্ত্তা পায়ে পড়ি' করে নমস্কার।

৩। বল দেখি কিবা নামে ডাকিবে আমারে,
পুণ্যময় স্পর্শ মোর, আসিয়াছি অভিশাপ বরে।

শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দ্রষ্টব্য—তিনটি ধাঁধার উত্তর ঠিক না হইলে নাম প্রকাশিত হইবে না। আগামী ১২ই শ্রাবণের মধ্যে যে সকল উত্তর পাওয়া যাইবে, শুধু সেগুলিই বিবেচিত হইবে।

—সম্পাদক

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। বিদ্যুৎ ২। আম ৩। আর্শী বা চক্ষু

উত্তরদাতাদিগের নাম

শরদিন্দু, সুনীতি, মিনতি, আরতি, ইলা, অঞ্জলি, ডলি, অমল, নির্ম্মল, নীলিমা, সুধীর, সুকুমার, বিষ্ণুপুর; শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ, কুসুমদীঘি; শ্রীরবীন্দ্রকিশোর দাশগুপ্ত, ল্যান্সডাউন রোড্, কলিকাতা; গোবিন্দদাস, ভগবানশরণ, ঢাকা; মধুসূদন ব্যানার্জ্জি, আড়ানি; প্রমীলা কুণ্ডু (লিলি), সৈয়দপুর; রামনারায়ণ, হরিনারায়ণ, ললিতা, গোপাল ও দুর্গা ভদ্র, কালিয়াগঞ্জ; সুনীতি, হিমাংশু, মিনতি, বেলা, খড়দহ; পান্না ও অণিমা সেন, একদুয়ারিয়া; জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্যবৃন্দ, টি. সি. এম. ই. স্কুল, গালিমপুর; কণিকা, অমিতাভ, অরুণাভ, তরুণাভ ও ইরা ঘোষ, কোড়ামারা; মথুরেশ সিংহ, আখিলাগোরী; সুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী (বৈদ্যনাথ), মোহনলাল আগরওয়ালা, সুজানগর; শান্তি চক্রবর্ত্তী, গ্রাহক নং ২০৩০৫; নিশি, নৃপেন, সত্যেন, মণি, পরেশ, ব্রজ, অনিল, হাই, ময়েম, সুজাতা এম. ই. স্কুল; ছবি, রুনু, নিভা, ভুলু, খুকু, কৃষ্ণা, জলি, পিও, অমূল্য, সাধন, নিরু, বেনু, পুলক, অলক ও আরতি, নবগ্রাম; সুবাস, অমিয়, সুকুমার, সুশান্ত, শুভেন, অজিত, রণজিৎ, ধীরেন, নিমাই, সাধা, বীথি, খড়দহ; চিন্তাহরণ মালো, ভাঙ্গা; সৌরীন্দ্র, দুলু, বাবলু, টেবলু, বুলু, নিতা, শিউলী, নানু, শিখা, মাণিক, হাবরু, বুড়ন, মনু, বাদল, ঈশ্বরগঞ্জ, অনিন্দ্যসুন্দর রায়, পলি, পিকা ও মল্ল, ঢাকা; শিশির, দিলীপ, বিজয়, বিমল, কানু, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Sankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

রবীন্দ্রনাথ
(১৯ বৎসর বয়সে)

রবীন্দ্রনাথ
(২৬ বৎসর বয়সে)

রবীন্দ্রনাথ
(৩০ বৎসর বয়সে)

মৃণালিনী দেবী
(কবিগুরুর পত্নী)

একবিংশ বর্ষ	ভাদ্র, ১৩৪৯	৫ম সংখ্যা

ভাদ্রের পল্লী

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

ভরা ভাদরের ঘোর বরষায় হৃদয়ের দ্বার খুলি'
পল্লীর রূপ হেরিতেছি আজ গ্রীষ্মের জ্বালা ভুলি'।
বরষা-বীণার তারে তারে শুনি মেঘমল্লার তান,
কাকলি জাগিল বন-জঙ্গলে চঞ্চল করি' প্রাণ।
আঁধার গগনে মেঘের নাচন গুরুগুরু গরজন,—
চমকে চপলা, দমকা বাতাসে ঝরঝর বরিষণ!
কপোত-কপোতী কুলায়ে কাঁপিছে হিমেলা বৃষ্টিপাতে;
তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিছে রাখাল লইয়া গো-পাল সাথে।
খেয়া পারাপার বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার পরে মাঝি
গভীর আঁধারে ভগ্ন কুটীরে ঘুমা'য়ে পড়েছে আজি।

শ্যাম সমারোহে ভরেছে ধরণী নিভেছে বুকের জ্বালা ;
কামিনীর হিয়া আঁখি জল দিয়া ভিজাইল মেঘমালা।
কেতকীর বুকে বেণুবনে মৃদু জাগিতেছে শিহরণ,
ক্লান্ত দাদুরী, মত্ত ময়ূরী, চঞ্চল সমীরণ !
বনে বনে হেরি শ্যামলের শোভা, মাঠে মাঠে কচি ধান,—
ডালে ডালে শুনি বুল্‌বুলি গায় কা'র আগমনী গান।
জীর্ণ কুটীরে শীর্ণ কৃষক গড়ে স্বপ্নের তাজ,—
বুকে জাগে তা'র ক্ষণিক ভরসা, চক্ষে পুলক নাচ !
চাষীর জীবনে নাহি ফোটে ফুল, আসে নাক' মধুমাস ;—
বরষার মেঘ আবরে নিত্য চাষীর ভাগ্যাকাশ।
বৃষ্টিধারায় পল্লীমায়ের ঝরে বুঝি আঁখিজল ;
কে ঘুচাবি তা'র বেদনার ভার বল্‌রে কিশোর-দল !

গল্প নয়

কুমারী আশা চৌধুরী

শরতের মধ্যাহ্ন। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ নেচে বেড়াচ্ছে—যেন নীল আকাশের গায়ে কে একরাশ পেঁজা তূলা ঢেলে দিয়েছে। স্নিগ্ধ, মন্থর বাতাস দূর সমুদ্রের গম্ভীর শব্দ সামান্য ব'য়ে নিয়ে আসছে।

বম্বে নগরীর এক পাশে একটি দোতলা বাড়ী। তারই একটি ঘরে একটি মেয়ে খোলা জানালার কাছে ব'সে—দিগন্তে দৃষ্টি মেলে দিয়ে, কত অতীত ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল। বোধ হয় সে ভাবতে একটু বেশী ভালবাসে।

কিছুক্ষণ হ'ল তার স্বামী বেরিয়ে গেছেন। নিস্তব্ধ দুপুর। সে শুধু ব'সে ব'সে ভাবছে—হয়তো তার ছেলেবেলাকার কত আব্‌ছা ভুলে-যাওয়া কথা।

দরজায় কে ঘা দিল। শুভা একটু চমকে উঠল—যেন কোন অজানা রাজ্য হ'তে ফিরে এল ঘা খেয়ে। শুভা ভাবল বোধ হয় ডাকওয়ালা; খুলে দেখে একটি কিশোর ছেলে—নতমুখে দাঁড়িয়ে। ছেলেটিকে দেখে শুভা একটু থতমত খেয়ে গেল। ছেলেটি মুখ তুলে চাইল। শুভা দেখল, দুটি করুণ আঁখি, একখানি ম্লান মুখ।

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ ক'রে, তাকে নমস্কার ক'রে বলল—"মিঃ সেন কোথায় থাকেন, অনুগ্রহ ক'রে বলবেন কি?"

শুভা বলল—"ও, তিনি তো অ্যাপলো বন্দরে উঠে গেছেন। বাইশ নম্বরে থাকেন।"

ছেলেটি কুণ্ঠিত হ'য়ে বলল—"আমি তো চিনি না; আচ্ছা এখানটায় কে থাকেন— মিঃ -— ?"

—"ও, উনি তো সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কে কাজ করেন। এখানে থাকেন '—' বন্দ্যোপাধ্যায়।" শুভা কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি বুঝি নূতন এসেছেন?"

—"হ্যাঁ, আজ সকালেই বম্বে মেলে নেমেছি। মিঃ সেন খুব ভাল ও সহৃদয় লোক ব'লে শুনেছি।"

শুভা তাকে বসতে বলল। সে একটু কুণ্ঠার সঙ্গে মাটিতেই বসতে যাচ্ছিল। শুভা বলাতে চেয়ারেই বসল। সে বলল যে সে কলকাতা থেকে এসেছে। আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছে রিপণ কলেজে। বাবা খরচ দিতে না পারায় আর পড়তে পারেনি। মা নেই, একটি বিধবা দিদি ও বাবা আছেন। কাউকে না ব'লে, বাড়ী থেকে পালিয়েছে,—এতদূরে এসেছে চাকরীর চেষ্টায়। একটু থেমে পার্থ চাইল শুভার দিকে ছলছল চোখে, একটু ম্লান হেসে বলল—"যদি উপার্জ্জন ক'রে বাড়ীর কষ্ট ঘোচাতে পারি, তবে বাড়ী ফিরব—না হ'লে, বম্বের সমুদ্রের তলায় স্থান নেব।"

শুভার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠল ; বলল—"ছি, ছি, আত্মহত্যা করবেন না। ও মা! আপনার কিছুই খাওয়া হয়নি—কখন বেরিয়েছেন ?"

পার্থ ওর পায়ের উপর লুটিয়ে প'ড়ে বলল—"আমার মা নেই,—এই বিদেশে আপনি আমায় মায়েরও বেশী স্নেহ করলেন। আপনি মিঃ ব্যানার্জিকে ব'লে আমায় একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দিন্। আমি বড্ড···।" ওর কথা জড়িয়ে গেল আবেগে।

শুভা বলল—"নিশ্চয় বলব।"

চাকরটা ছিল না, শুভা নিজেই ভাত ও তরকারী রান্না করল। অভুক্ত ছেলেটিকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে স্নান ক'রে আসতে বলল ; তারপর তাকে তৃপ্ত ক'রে খাওয়াল। পার্থের চোখ দুটি কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে টলটল ক'রে উঠল।

বেলা চারটের সময় শুভার স্বামী এলেন। সব শুনে বললেন—"ও সব গরীব-টরীব রেখে দাও—কে না কে, চোর কি ডাকাত—তার ঠিক্ নেই। ··· ওহে তুমি বাইরে গিয়ে ব'সো।"

শুভার চোখে জল এল—মুখখানা হ'ল লাল—তার আতিথ্যের অপমানে।

পার্থ করুণ-স্বরে বলল—"আমায় একটা চাকরী দেবেন, আমি বড় গরীব—এই বিদেশে অসহায়···"

—"যাও—যাও,—চাকরী পথে ঘাটে গড়াচ্ছে কিনা ?" মিঃ ব্যানার্জির ক্রুদ্ধস্বর শোনা গেল—"জোচ্চোরি ডেঁপোমি—যত সব···।"

শুভা মিঃ ব্যানার্জিকে ঘরে ডেকে ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বলল—"ও কি, চেঁচিও না—একটু চেষ্টা ক'রে দেখ না, যদি কিছু পায়,—আহা, বেচারা বড় দুঃখী !" মিঃ ব্যানার্জি বড় রাশভারী গম্ভীর মানুষ। শুভার সাহসই নেই বেশী বলার।

মিঃ ব্যানার্জি চাকরকে ডেকে বললেন—"চা দেও।"

চা খাওয়া হ'ল। পার্থ ব'সে আছে মাথায় হাত দিয়ে। তাকেও এক কাপ 'অফার' করলেন ; তারপর সিগারেটটি টেনে বললেন—"আচ্ছা, দেখ, এখানে থাকার জায়গা হবে না। তুমি প্যারেলে যাও। এ চিঠি দেখালে তা'রা জায়গা দেবে।" বলতে বলতে মিঃ ব্যানার্জি ব্যস্তভাবে হাতের রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন—"ওঃ ! আচ্ছা তুমি যেতে পার। কাল সকালে এস। ··· শুভা, চল ছ'টায় একটা ভাল 'শো' আছে—দেখে আসা যাক।"

শুভার মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে আছে। ও বলল—"আমি যাব না। মাথাটা ধ'রে আছে, তা ছাড়া রান্নার ব্যবস্থাও হয়নি।"

মিঃ ব্যানার্জি একাই চ'লে গেলেন। শুভা ওপরের বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে দেখল—পার্থ আস্তে আস্তে চ'লে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে পার্থ এল; এসে বলল—তাকে আর বেঙ্গল ক্লাবে থাকতে দেবে না। মিঃ ব্যানার্জি আফিসে যাবার পোষাক পরছিলেন; বললেন বিরক্তভাবে—"এখানে কিছু হবে না। ভাল কথায় তুমি এখান থেকে যাও—তা' না হ'লে···। যত সব··· !"

পার্থ ক্ষীণস্বরে একবার বলল—"আপনাদের সাথে মিঃ সেনের পরিচয় আছে। একটু যদি বলেন···।"

"গেট আউট (Get out)—অতিথশালা পেয়েছ? ··· শুভা, দরজা বন্ধ ক'রে রাখো—ও ছেলেটা যেন ঘরে না ঢোকে"—ব'লে মিঃ ব্যানার্জি বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে শুভা খোঁজ ক'রে জানল চাকরের কাছে—অনেকক্ষণ হ'ল চ'লে গেছে সে। শুভার মনে হ'ল—যদি ডুবে মরে? চাকরটাকে রাস্তায় পাঠাল—সে নেই। বিশাল বম্বে নগরীর কোথায় মিশে গেছে সে। সেখানে কে কাকে চেনে?······

কয়েকদিন পরে শুভার স্বামী বলছিলেন, "শুন্ছ, আমার অফিসে একটা পোষ্ট খালি হয়েছে,—ছোকরাকে পেলে দিতাম।" শুনে শুভা নিরুত্তরে উঠে চ'লে গেল, হঠাৎ যেন একটা বড় অভিমানপূর্ণ ব্যথার জায়গায় জোরে আঘাত লাগল। শুভার স্বামী কিছু অনুতপ্ত হয়ে অনেক খোঁজ করলেন, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তা'কে।

ক্রমে সব মিলিয়ে আসে। শুভার মনে এখনও সেই করুণ সুরের রেশটুকু ভেসে আসে···'সমুদ্রের তলায় স্থান নেব।' সত্যই কি তাই! যদি—। সে আর ভাবতে পারে না। হতভাগ্য!

—বাংলায় এমন কত তরুণ, বুকের প্রাণভরা আশা ব্যর্থ হওয়ায় বিসর্জ্জন দিচ্ছে তাদের প্রাণ। বড় হয়েছে যা'রা তা'রা তাদের অতীত ভুলে যায়। কত উপেক্ষা অবহেলা অভাবের পর আজ দাঁড়িয়েছে নিজের পায়ে—সব ভুলে যায়।

[সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।]

তুষারের দেশ

কুমারী অণিমা সেন, বি-এ

গল্প শুনবে? আচ্ছা বলি। এক মস্ত রাজ্য। রাজ্যে না আছে হাতী, না মেলে ঘোড়া। না আছে রেল, না আছে ষ্টীমার। ভাবছ বুঝি বাঙ্গলাদেশের কোন অজ পাড়াগাঁয়ের গল্প বলছি। উহুঁ—এ একেবারে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের কথা। নরওয়ের উত্তর প্রদেশ—যেটাকে তোমরা ল্যাপল্যাণ্ড বল—তারই গল্প।

ল্যাপল্যাণ্ডের আগাগোড়া বরফে ঢাকা। যেদিকে তাকাও শুধু বরফের মেলা। সবুজের চিহ্ন একটুও নেই। তবে যখন গ্রীষ্ম আসে, বরফ গ'লে যায়, তখন হঠাৎ একমুহূর্ত্তে ওদের পৃথিবী হেসে ওঠে। ঘাসগুলো একেবারে তো ম'রে যায় না—বরফের তলায় চাপা থাকে; বরফ স'রে গেলে পরে ঘাসগুলো আবার দেখা দেয়। ল্যাপল্যাণ্ডে শুধু দুটো ঋতুই আছে—গ্রীষ্ম আর শীত। শীতকালে পূর্ণ ছ'মাস সূর্য্যদেব দেখা দেন না, আর গ্রীষ্মকালে আবার অস্ত যাবার নামটিও করেন না।

হয়ত বলবে, এসব কথা তোমাদের জানা। তা হ'লে অন্য কথাই বলা যাক। সেদেশে যে লোকগুলো থাকে তা'রা নাকি ভুঁইফোঁড়। কোথা থেকে যে ওরা সেখানে গেল, তা কারুর জানা নেই। কেউ বলেন, তা'রা সেখানকার আদিম অধিবাসী; আবার কেউ বলেন, তা'রা হচ্ছে যাযাবর। এসিয়া থেকে যাত্রা ক'রে রাশিয়া দিয়ে গিয়ে পৌঁছেচে ল্যাপল্যাণ্ডে। সেই দেশে গিয়ে তাদের মনে হয়েছে এইবার তা'রা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছেচে। এ সবই কিন্তু অনুমান।—তাদের সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা যায় যে তা'রা মঙ্গোলিয়ান টাইপের লোক।

আগেই বলেছি সেখানে হাতী-ঘোড়া কিছু মেলে না। তবে একটা জিনিস যা মেলে—তা-ই ওদের ধনরত্ন, গাড়ী-ঘোড়া, পোষাক-পরিচ্ছদ সব। ল্যাপদের এই অমূল্য রত্নটি হচ্ছে রেইনডীয়ার নামক হরিণ। সেখানকার লোকগুলো সব বেটেসেঁটে। সর্ব্বাঙ্গে ওরা জড়িয়ে পরে রেইনডীয়ারের চামড়ায় তৈরী পোষাক। রেইনডীয়ার না হ'লে ওদের চলেই না। তাঁবু থেকে আরম্ভ ক'রে বিছানাপত্র বাসনকোশন সব ঐ হরিণের চামড়ায় তৈরী। হরিণের ওরা কিছু ফেলে দেয় না; পাকস্থলীটাও রেখে দেয়। পাকস্থলীটা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে ওরা দুধ রাখে—হরিণীর দুধ। হরিণী কিন্তু খুব কম দুধ দেয়; একটায় মোটে তিন-চার চামচ ক'রে দুধ দেবে। তা ছাড়া ওদের দোয়ানো বড় মুস্কিলের ব্যাপার। গরমের শেষে ওরা দুধ দুইয়ে রেখে দেয় শীতের জন্য। দুধটা ঘন হয়ে জ'মে থাকে। শুধু দুধ কেন, ঐ পাকস্থলীর মধ্যে ওরা হরিণের রক্তও জমা ক'রে রাখে কুকুরের জন্য। কুকুরকে ওরা দু'এক টুকরো হরিণের হাড় আর জমা রক্ত খেতে দেয়। বিছানায়

ওরা পাতে নরম হরিণের চামড়া। সবচেয়ে মজার কথা, ওরা যখন স্লেজে ক'রে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়, তখন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় একটা ক'রে হরিণের চামড়ার থলি। থলিটা পথে অপরিহার্য্য। মনে কর, পথে এল বিরাট ঝড়, শিলাবৃষ্টি কিংবা ঘন কুয়াসা—এরকম প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় তো শীতকালে প্রায়ই হয়ে থাকে—তখন পথচারীদের বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্লেজগাড়ীটা উল্টিয়ে তার তলায় থলির ভিতর ঢুকে আত্মরক্ষা করা। শুধু তাই বা বলি কেন? পথের ধারে দূরে দূরে যে বিশ্রাম-কুটিরগুলো—তাতেও বেশ আরাম ক'রে থলিতে ঢুকে ঘুমানো যায়।

ওঃ, এক কথা বলা হয়নি। স্লেজ কাকে বলে জান তো? চাকাহীন একরকম গাড়ী।—এই স্লেজ হরিণই টানে। ওদের দেশে যারা বড়লোক তাদের আছে হাজার হাজার হরিণ। একটা মজার গল্প বলি। একবার এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা গিয়েছেন ল্যাপল্যাণ্ডে পর্য্যটকের ঔৎসুক্য আর কৌতূহল নিয়ে। সেখানে তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে গেছেন একটি ল্যাপের তাঁবুতে বেড়াতে। সঙ্গের ভদ্রলোকটি ল্যাপটিকে ভদ্রমহিলার পরিচয় দিয়ে বললেন—"ইনি সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছেন।" ল্যাপটিও আগ্রহ প্রকাশ ক'রে ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। অবশেষে যখন জানল ভদ্রমহিলা বিধবা, তখন বলল—"দেখ, আমি খুব বড়লোক; আমার এক হাজার হরিণ আছে, আর আমাকে যদি বিয়ে করো, তবে এর অর্দ্ধেক তোমার হবে। কি বলো, রাজী?" ভদ্রমহিলা মুখটি কাঁচুমাচু ক'রে উত্তর দিলেন—"এ আমার বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু এত সুখ কি আমার সহ্য হবে!" ল্যাপটি আর কি করে, মনের দুঃখে মেয়েটির নাম নিয়ে দুলে দুলে গান করতে লাগল। আমাদের দেশে হ'লে হয়ত রবি ঠাকুরীয় সঙ্গীত আরম্ভ করত। ওদেশে কিন্তু তা করে না। ল্যাপরা প্রত্যেকেই স্বভাব-কবি। যখন আনন্দ হয় বা দুঃখ হয়, তখন নিজেরাই একটা গান তৈরী ক'রে একটানা সুরে গান করে। ওদের গানগুলো কিন্তু বেশীর ভাগই সাদাসিধে—হরিণ নিয়ে কিংবা ঐ জাতীয় কোন বিষয় নিয়ে; বড় বিষয় নিয়ে ওরা মোটেই মাথা ঘামায় না। শুন ওদের একটা গানের পদ—

"খটা-খট্-খট্ হরিণ ছোটে পাখীর মত বেগে।
সরু শক্ত ঠ্যাংগুলো তার চলে ঝড়ের বেগে।
ও ভাই চলার বেগে ধরা কাঁপে বরফ উড়ে রে
ঠিক যেন ঝরণা ছড়ায় জলের গুঁড়া দৃষ্টি হারাই রে।
ও ভাই খটা-খট্-খট্ ছোটে হরিণ—
হরিণ ছোটে রে।"

বিয়ের কথা যখন উঠলই তখন আর একটা কথা বলি। ল্যাপদের কিন্তু রোগা মেয়ে একটুও পছন্দ নয়। ল্যাপরা পছন্দ করে বেশ মোটা সোটা নাদুস্-নুদুস্ মেয়ে। তাই সম্বন্ধ

এলেই মেয়েরা যত জামা আছে তাই গায়ে প'রে নেয়। তারপরে ঐসব জামার উপরে জড়িয়ে নেয় উড়ানি (Scarf); উড়ানিও আবার একটা-দুটো নয়—ছয়-সাতটা ক'রে। আরও মজার ব্যাপার—বিয়ে যখন একেবারে পাকাপাকি হয়ে যায়, তখন বর-বৌ পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধ'রে নাকে নাকে ঘ'সে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাবে। এমনি সাধারণতঃ ওরা দেখা হ'লে পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বলে—"বোরিস্ বোরিস্ (Boris Boris)—শান্তি! শান্তি!"

ওদের সম্ভাষণ থেকেই ওদের শান্ত সুন্দর স্বভাবের আভাস পাওয়া যায়। ল্যাপরা কখনও উত্তেজিত হয়ে পরস্পরের গলায় ছুরি বসায় না। এমন কি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মদ্যপান করার পরেও ওরা অপ্রকৃতিস্থ হয় না বা উত্তেজিত হয়ে দুর্ব্যবহার করে না। ঝগড়া-ঝাঁটি আর চুরি ওদের মধ্যে বিরল; তবে একেবারে যে নেই একথা বলা যায় না। কিন্তু ঝগড়া হ'লেও সেটা তা'রা পুষে রাখে না। একবার এক ল্যাপের হরিণ তার প্রতিবেশীর ছেলে চুরি করল। যার হরিণ চুরি গেল সে নালিশ করল না—কাউকে সালিশ মানল না। শুধু দীর্ঘ দু বছর ধ'রে ছেলেটি আর তার বাবাকে হরিণটি ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করল। শেষে কোনও ফল না পেয়ে ছেলেটির নামে নালিশ করল। বিচারে ছেলেটি দোষী প্রতিপন্ন হ'ল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাঠগড়ার থেকে নেমে ছেলেটি যখন জরিমানার টাকাটা দিয়ে দিল, তখনই অভিযোগকারী ল্যাপটি তাকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে পান-ভোজনের সাদর আমন্ত্রণ করল; বাড়ী ফিরে একত্রে গালগল্প এবং হাসি-তামাসার মধ্যে তাদের কাফি আর হরিণের মাংস ভোজন চলতে লাগল! এরকমটি কিন্তু সভ্য সমাজে হবার জো নেই—এরকম ঘটনার পরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃণার ভাব কি আমাদের ঘোচে?

এবারে আমার গল্প শেষ করব ওদের কতকগুলো অন্ধবিশ্বাস আর ওদের দেবতাদের কথা ব'লে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগে পর্য্যন্ত ওরা ছিল মূর্ত্তি-উপাসক। ওদের ছিল তিনজন দেবতা। একজন হ'লেন থর (Thor)—জীবন ও মৃত্যুর দেবতা তিনি। দ্বিতীয় জন হ'লেন ষ্টরজাঙ্কার (Storjunkar)—পশু-জগতে তাঁর একাধিপত্য—তাঁর কৃপা না হ'লে মানুষের সাধ্য কি জন্তু-জানোয়ার পোষে। কথিত আছে, এই ষ্টরজাঙ্কার নাকি মাঝে মাঝে মানুষের বেশে আবির্ভূত হ'তেন। দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন অভিজাত বংশীয় পুরুষের বেশে বন্দুক হস্তে অকস্মাৎ সমুদ্রের উপকূলে যেখানে জেলেরা মাছ ধরছে, সেখানে ষ্টরজাঙ্কার নৌকো ক'রে আবির্ভূত হ'তেন। মানুষের সঙ্গে তাঁর আকৃতিগত কোন প্রভেদ থাকত না, শুধু পায়ের দিকটা হ'ত পাখীর মত। ষ্টরজাঙ্কারের পুণ্যপ্রভাবে জেলেদের জালে ধরা পড়ত প্রচুর মাছ—ভক্তিপ্লুত চিত্তে নতি জানিয়ে তা'রা বাড়ী ফিরে যেত। ভাগ্য যদি আরও সুপ্রসন্ন হ'ত, তা হ'লে দেবতা তাঁর বন্দুক দিয়ে পাখী মেরে জেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তৃতীয় দেবতা হ'লেন আলোর দেবতা—সূর্য্য।

এই তো গেল ওদের দেবতাদের কথা ; এবার ওদের কতকগুলো সংস্কারের কথা বলা যাক্। আচ্ছা, তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করি স্নো-হোয়াইট (Snow-white) গল্পের সাত বামনের মত লোক পৃথিবীতে আছে নাকি ?—তা হ'লে তোমরা বলবে তো—ওরকম বেঁটে বামুন গল্পেই থাকে। ল্যাপরা কিন্তু বলবে—উহুঁ। মাটির তলায় ছোট ছোট সুন্দর মানুষ আছে, আর আছে তাদের ছোট ছোট সাদা হরিণ। সেই হরিণের গলায় বাঁধা আছে ঘণ্টা।

পরীরা হরিণ চরিয়ে বেড়ায় আর তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টা থেকে শব্দ হয় টুং-টাং। তোমরা মনে করছ, ল্যাপল্যাণ্ডে গিয়ে পরী দেখে আসবে। কিন্তু সেটি হবার জো নেই। পরীদের দেখা যায় না, বড় জোর তুমি হরিণের পাল দেখত পার আর তাদের ঘণ্টার শব্দ শুনতে পার। কিন্তু তাতেও লাভ নেই—কারণ যে ঘণ্টার শব্দ শুনবে তার হবে মৃত্যু, আর যে হরিণ দেখবে—সে কেবল হরিণই দেখতে থাকবে, তার আর মুক্তি নেই। তবু এর মধ্যে হরিণ দেখাই ভাল—কারণ হরিণ দেখামাত্র তুমি যদি একটা ছুরি কিংবা লোহার জিনিস হরিণের দিকে ছুঁড়ে মার, তা হ'লে হরিণ হবে অদৃশ্য আর জায়গাটা হবে তোমার। এটা মন্দ কি ?

পরীরা যদিও দেখা দেয় না, তবুও অদৃশ্য থেকে নানা উপকার ক'রে দেয়। হয়ত জাপানী বোমার হাত থেকে তোমার প্রাণ রক্ষা করল, কিংবা ধর অঙ্কের পরীক্ষার দিন আগেই তুমি জানতে পারলে কি কি অঙ্ক আসবে। এসব দিক থেকে মজা হ'লে হবে কি ?—পরীদের কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ের উপর ভীষণ লোভ। সুবিধা পেলেই বুড়ো বাবা-মাকে রেখে দিয়ে সুন্দর খোকাখুকুদের নিয়ে চম্পট দেয়। তাই ওদেশের মায়েরা ছোটদের দোলনায় ঝুলিয়ে দেয় রূপোর চাকতি বা ছোট ঘণ্টা। ঘণ্টা বা চাকতি থাকলে আর পরীরা চুরি করতে পারে না—এই ওদের বিশ্বাস।

আচ্ছা, তোমরা সবাই তো শিশুসাথীতে পি. সি. সরকারের ম্যাজিকের কথা পড়েছ এবং তোমরা ম্যাজিককে হাতের কারসাজি ব'লেই জান—ল্যাপেরা কিন্তু এটাকে একটা অলৌকিক ক্ষমতা ব'লেই মনে করে। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত ল্যাপ যাদুকরেরা ভয় ও বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন। আজকাল কিন্তু যাদুবিদ্যা খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদের চেষ্টায় বিরল হয়ে এসেছে। আগে যাদুকরেরা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী এবং প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনের সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিত। কিন্তু তার জন্যে সঙ্গে সরঞ্জাম কম ছিল না। সর্ব্বপ্রথম দরকার হ'ত একটা ড্রামের (drum)। তার দু'পিঠের চামড়ায় আঁকা থাকত সূর্য্য, চন্দ্র, তারা আর নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবি। সূর্য্যের ছবি থাকত চামড়ার ঠিক মধ্যিখানে। তারপর লাগত একটা হরিণের শিংয়ের হাতুড়ী। সেই হাতুড়ী দিয়ে কিন্তু ড্রাম বাজান হ'ত না—কেবল কতকগুলো পিতলের আংটি সূর্য্যের উপর রেখে সেই হাতুড়ী দিয়ে ঘোরান হ'ত ; ঘুরতে ঘুরতে আংটিগুলো এক একটা ছবির উপর থামত, আর তাই দেখে প্রশ্নকারীরা উত্তর বুঝতে পারত। এই ড্রামগুলোকে ল্যাপরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে

দেখত। কোনও মেয়ে কিংবা বিবাহের উপযুক্ত ছেলে এটা ছুঁতে পারত না। শুধু তাই নয়, এটাকে গোপনে একটা পর্ব্বত-গুহায় একরকম সামুদ্রিক পাখীর লোম দিয়ে ঢেকে রাখা হ'ত।

এই ড্রাম-বাদক যাদুকরদের মধ্যে এক একজন শেষে ড্রাম ছাড়াই ভবিষ্যৎ বলতে পারত। মনে কর তুমি তোমার এক আমেরিকা-প্রবাসী বন্ধুর কথা জানতে চাও। তোমাকে কি করতে হবে শোন। একটুকরো রূপো কিংবা একখানা কাপড় নিয়ে সেই যাদুকরকে দিতে হবে। যাদুকর সেটা হাতে নিয়ে চুপ ক'রে চোখ বুজে মনঃস্থির ক'রে ব'সে তোমার বন্ধুর কথা চিন্তা করবে। চিন্তা করতে করতে যাদুকর অজ্ঞান হয়ে পড়বে—সেই অজ্ঞানাবস্থায় কেউ যদি তাকে ছুঁয়ে দেয় তবে যাদুকরকে বাঁচানো মুস্কিল হবে, কারণ তখন তার আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে গিয়েছে। কাজেই যতক্ষণ না যাদুকরের জ্ঞান হয়, ততক্ষণ তোমার চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে। যাদুকরের জ্ঞান হ'লে পরে সে তোমাকে তোমার বন্ধুর খবর দেবে।

আগেই বলেছি, খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা এই যাদুবিদ্যাকে অত্যন্ত হেয় ব'লে মনে করতেন এবং এটাকে শয়তানের কারখানা ব'লে ধর্ম্মপ্রাণ ল্যাপদের মনে ভয় জাগিয়ে দিতেন। এক বেচারা যাদুকর শয়তানের ভয়ে ড্রামটাকে ফিরিয়ে দিতে এল, কিন্তু ফিরিয়ে দেবার সময় সে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "ঠাকুর, এটা ফিরিয়ে দিলেই বা কি হবে, আমি যে দূরের জিনিস শুধু চোখেই দেখতে পাই।" একথার উত্তরে প্রচারক মহাশয় বললেন, "আচ্ছা বাপু, তুমি যদি সকলই দেখতে পাও, তা হ'লে বলো দেখি এদেশে আসার সময়ে পথে আমাকে কি কি দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়তে হয়েছে।" আশ্চর্য্যের বিষয় যাদুকরটি হুবহু যা ঘটেছিল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিল।

এইবার আমার শেষ কথা বলি। সাদা ভালুকের কথা তোমরা ভূগোলে কত পড়েছ। সেই সাদা ভালুক থাকে ল্যাপল্যাণ্ডে। ল্যাপদের বিশ্বাস, ভালুক বেশ বীর জানোয়ার আর তার জন্যেই ভালুক কখনও জেনেশুনে মেয়েদের আক্রমণ করে না। এমন কি যদি বা না চিনে আক্রমণ করতে আসে, তবে ওভারকোট (Pesk) তুলে মেয়েলি ফ্রক দেখিয়ে দিলেই ভালুক পথ ছেড়ে চ'লে যাবে।

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালিপদ চট্টোপাধ্যায়

—পাঁচ—

বিপদ

আধঘণ্টা বিশ্রাম করার পর সাহেব হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"ওঃ, ঠোঙে হোলো-হোলো, ফিট্‌টে হোবে।"

সন্ধ্যা তখন না হইলেও বিকালের মন্দ আলোয় বনভূমি হয়ে এসেছে অন্ধকার। শেষে কি গাছের উপর রাত কাটাতে হবে? সবাই উঠে পড়্‌ল। ফিরার জন্য পা বাড়াতে গিয়েই সঙ্গের একজন লোক আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। এক লহমা দেরী না ক'রে চারজন লোকই, যে যে-দিকে পার্‌ল, ছুটে পালাল।

সাহেব আর রঞ্জিত তো অবাক!

এদিক-ওদিক দু'জন দেখ্‌তে লাগ্‌ল, ব্যাপারখানা কী!

হঠাৎ একটু দূরে যে মূর্ত্তি তা'রা দেখ্‌তে পেল, তাতে বুকের ভিতর ধুক্‌-ধুক্‌ ক'রে উঠ্‌ল। দেখ্‌ল, একটা মানুষ—মানুষ কি—হঁ্যা, তা মানুষের মতোই—বোধ হয় মানুষই! গায়ের রঙ্‌ মিশ্‌কালো, উলঙ্গ, মাথায় ইয়া ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁক্‌ড়া রুক্ষ চুল, গোঁফ-দাঁড়িতে মুখ ভরা—বুক ঢাকা। হিংস্র দুটো চোখ যেন জ্বল্‌ছে! সেই চোখের দৃষ্টি সাহেবের চোখে রেখে লোকটা এগিয়ে আস্‌ছে।

একটুও দেরী না ক'রে সাহেব তার দিকে পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে ছুঁড়্‌লেন গুলি; তারপর আর একটা। লোকটা অদ্ভুত, বিকট এক চীৎকার ক'রে প'ড়ে গেল মাটিতে।

ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে গুম্‌রাতে লাগ্‌ল। কী সে শব্দ! সে শব্দ ক্রমে মৃদু হয়ে এল। আরও দু'একবার গড়াগড়ি দিয়ে লোকটা নীরব হয়ে রইল। ভবলীলা তার সাঙ্গ হ'ল।

সাহেব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়্‌লেন, বল্‌লেন—"চল।"

কিন্তু চলা আর হ'ল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে রকম পাঁচ-ছয়টা লোক এসে দাঁড়াল একেবারে পথ আগ্‌লে।

সাহেব আবার পিস্তল তুলে ঘোড়া টিপ্‌লেন। খট্‌ ক'রে একটা আওয়াজ তাঁকে ঠাট্টা কর্‌ল যেন। ছয়ঘরা পিস্তল; তার ছ'টা টোটাই যে ছোঁড়া হয়ে গেছে—চারটে বাঘ-মারায় আর দুটো জংলী-মারায়।

সাহেব তাড়াতাড়ি কোমরে হাত দিলেন টোটার জন্য। কিন্তু বাঘের মতো লাফিয়ে এসে একটা লোক তাঁর হাত চেপে ধরলেন। রঞ্জিত বন্দুক ছোঁড়ার চেষ্টাও কর্‌তে পার্‌ল না। লাফিয়ে আসা লোকটার ধাক্কা লেগে সে গেল প'ড়ে; তার বন্দুক ছিট্‌কে প'ড়ে গেল কোথায় জঙ্গলের ভিতর!

একটানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব মার্‌লেন লোকটাকে এক ঘুসি। উঃ! ঘুসিটা পড়্‌ল যেন লোহার উপর।

সব ক'টি লোক এগিয়ে এল। লাগ্‌ল তাদের সাথে এদের ধস্তাধস্তি। এরা পার্‌বে কেন। জংলীদের শরীর কী! পাহাড়ের বুকের পাথরের মানুষ তা'রা।

আষ্টেপৃষ্ঠে রঞ্জিত জংলীদের হাতে বাঁধা প'ড়ে গেল—জংলা লতার বাঁধনে। তার নড়বার ক্ষমতা রইল না।

যাঁর উপর নির্ভর ক'রে এসেছিল, সেই সাহেবের দিকে তাকিয়ে রঞ্জিত দেখ্‌ল, তাঁরও হাত-পা গায়ের সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধা।

রঞ্জিতের মনে পড়্‌ল দিদির কথা, মনে পড়্‌ল তাঁর জলভরা চোখের মানা, মনে পড়্‌ল জামাইবাবুর শত নিষেধ। ওঃ! দিদিকে ফাঁকি দিয়ে সে চ'লে এসেছে!

ভাব্‌তে পার্‌ল না আর। তার চোখের সাম্‌নে সব ঝাপ্‌সা হয়ে এল। কোনও শক্তি তার নেই—নড়্‌বারও না। দু'চোখ তার বুজে এল। (ক্রমশঃ)

মজার কথা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভূতের কথা শুন্‌তে পেতেম যত,
সাধ হতো যে দেখ্‌তে কেমন তাকে !
তোমার মত ছিলেম যখন ছোট,
ভয় করিনি বিশ্বভুবনটাকে।
জোনাক পোকা জ্বল্‌তো বনের ঝাড়ে,
রাতের পাখী কাঁদ্‌তো নদীর পাড়ে,
আমি তখন বাহির হতেম একা—
অন্ধকারে হুতোম পেঁচার ডাকে।

বনের ছায়ে ঢুল্‌তো গহীন রাত,
করুণ স্বর আস্‌তো কানেই কত !
হুক্কা-হুয়া ডাক্‌তো শিয়াল পথে,
জাগ্‌তো মনে ভূতের কথাই যত।
গাঁয়ের লোকে দুয়ার-দেওয়া ঘরে,
রইতো ঘুমে তক্তপোষের 'পরে,
গাঁয়ের সেরা ছিলেম দুষ্টু ছেলে,
আমিই শেষে হলেম ভূতের মত।

ঘন আঁধার কষ্টিপাথর সম
ছিল সেদিন কাজ্‌লা দীঘির কোলে।
দাঁড়িয়েছিনু—যষ্টি হাতেই দাদু
সেদিক দিয়ে যাচ্ছে যেমন চ'লে,—
দীঘির ধারে লাগিয়ে দিলেম তাল,
লাফিয়ে গাছে দুলিয়ে দিলেম ডাল,
নাকি সুরের মৃদু আওয়াজ শুনে,
চেঁচিয়ে ওঠে বাপ্‌রে পিশাচ ব'লে

ভয়ের চোটে দেবদেবীদের ডেকে—
ছুট্‌লো দাদু এদিক ওদিক চেয়ে,
আমি তখন হাস্‌তেছিলেম খুব
দাদুর বাতি নিব্‌লো বাতাস পেয়ে।
পরের দিনে বল্‌লো আমায় দাদু—
'ওইখানেতে রাতের বেলায়, রাধু !
কেউ যেয়ো না,—বেড়ায় ভীষণ ভূত ;
ঘাড় ভেঙ্গে সে ফেল্‌বে মানুষ খেয়ে !'

খণ্ডদন্ত

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ

[যে চাণক্য পণ্ডিতের লেখা চাণক্য-শ্লোক আজকালও ছেলেমেয়েরা পড়ে, সেই চাণক্য পণ্ডিত একজন মস্ত বড় লোক ছিলেন। শুনা যায়, ছেলেবেলায় তিনি মায়ের আদেশে, রাজার লক্ষণ-যুক্ত দুইটি দাঁত নিজ হাতে উপড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন ; এজন্য তাঁহার এক নাম হইয়াছিল 'খণ্ডদন্ত'। সেই গল্পই এখানে বলা হইয়াছে।]

সেকালে বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডির প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে তক্ষশিলা নামে এক অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। সেখানে চণক নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। চণক জীবনের অধিকাংশ সময়ই যাগ-যজ্ঞ ও তপস্যা করিয়া কাটাইতেন। সংসারে এক ব্রাহ্মণী ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না ; কাজেই খাওয়া-পরার ভাবনা তাঁহাকে বিশেষ ভাবিতে হইত না।

সেদিনে অনেক ব্রাহ্মণ, কৃষকেরা ধান কাটিয়া লইয়া গেলে ক্ষেতে যে ধান পড়িয়া থাকিত, তাহাই কুড়াইয়া মেটে কলসীতে ভরিয়া রাখিতেন ; এরূপ ধানে-ভরা মেটে কলসীকে বলা হইত 'কূট'। যে সকল ব্রাহ্মণ গৃহস্থ এই ভাবে এক বৎসরের মত ধান সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া, সারা বৎসর ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বলা হইত 'কূটল' ব্রাহ্মণ। চণক এবং চণকের পূর্ব্বপুরুষদের অনেকেই এই শ্রেণীর কূটল ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে চণকের এক পুত্র জন্মিল। ছেলেটির আকৃতি দেখিয়া চণক ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "এ ছেলে বড় হইয়া একটা মানুষের মত মানুষ হইবে।" বৃদ্ধ বয়সের ছেলের উপর বাপ-মায়ের টান থাকে একটু বেশী,—কাজেই ব্রাহ্মণী কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন।

চণক আদর করিয়া ছেলের নাম রাখিলেন বিষ্ণুগুপ্ত। কিন্তু বাপ-মা ছাড়া এ নামে কেহ বড় তাহাকে ডাকিত না; চণকের ছেলে বলিয়া সকলেই তাহাকে ডাকিত চাণক্য নামে; আবার কূটল ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া কেহ কেহ তাহাকে বলিত কৌটিল্য।

শিশু বড় হইতে লাগিল। চণক ছেলের ভিতর কি দেখিলেন কে জানে। তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "ছেলেকে খুব সাবধানে রাখিও; এ সাধারণ ছেলে নয়। দেখিবে এই বিষ্ণুগুপ্ত এক সময়ে একটা বিরাট সাম্রাজ্যের নায়ক হইবে।"

চাণক্যের বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর, তখন চণকের মৃত্যু হইল। শিশুকে লইয়া মা অকূলে ভাসিলেন। তিনি জীবিকার সন্ধানে মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ছেলে বড় হইয়া উঠিলে, তিনি এক পণ্ডিতের নিকট ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

খর্ব্বাকৃতি বালক। দেহে মনে তা'র অসীম তেজ। তা'র অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়া পণ্ডিত মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

চাণক্যের উপরের পাটির সাম্‌নের দুইটি দাঁত ভারি সুন্দর ছিল; আর তা'র উপরে ছিল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের চিহ্ন। কেবল মা ছাড়া ইহা কেহ জানিত না। মা গোপনে জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এরূপ চিহ্ন যা'র থাকে, সে হয় রাজা হইবে, নয়ত রাজার মত প্রতিপত্তিশালী হইবে। মা শুনিয়া হাসিতেন, কিন্তু কার যে এরূপ চিহ্ন আছে, সে কথা প্রকাশ করিতেন না।

তখন নন্দরাজারা মহাগৌরবে মগধে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহাদের ভয়ে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সৈন্যেরা পর্য্যন্ত মগধ রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে সাহস পায় নাই—এমনি তাঁহাদের প্রতাপ।

একদিন এক বিখ্যাত জ্যোতিষী রাজসভায় আসিলেন। রাজা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বলুন দেখি, এই যে প্রবল প্রতাপশালী নন্দবংশ—তাহা কয় হাজার বৎসর মগধে রাজত্ব করিবে?"

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া জ্যোতিষী অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিলেন; তারপর খড়ি পাতিয়া গণিতে বসিলেন; শেষে বলিলেন, "মহারাজ, জ্যোতিষ-শাস্ত্র অভ্রান্ত; চন্দ্রসূর্য্যই ইহার সাক্ষী; তবে ঠিকমত গণনা হওয়া চাই। আমি দেখিতেছি, হাজার বৎসর তো দূরের কথা, আর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই ভুবন-বিখ্যাত নন্দবংশ ধ্বংস হইবে, আর সেই ধ্বংসের কারণ হইবে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ—দাঁতে তাঁহার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আঁকা।"

শুনিয়া নন্দরাজার তো চক্ষুস্থির! তখনই হুকুম হইল—রাজ্যে যত ব্রাহ্মণ আছে, সকলের দাঁত পরীক্ষা কর; আর যা'র দাঁতে জ্যোতিষীর কথামত চিহ্ন আছে, তাহাকে হত্যা কর।

মগধে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দিন নাই, রাত্রি নাই, হাট নাই, বাজার নাই, রাস্তা নাই, ঘাট নাই—রাজার পাইকেরা ব্রাহ্মণ দেখিলেই ধরে, ঠোঁট টানিয়া দাঁত পরীক্ষা করে, আর দাঁতে যে কোন চিহ্ন দেখিলেই মশানে টানিয়া আনে আর মারে! দেশ জুড়িয়া এক বিরাট দন্ত-পরীক্ষা ও হত্যাকাণ্ডের হিড়িক পড়িয়া গেল।

চাণক্যের মা রাজার আদেশ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি গোপনে ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, রাজার আদেশ শুনিয়াছ; মায়ের কথা তুমি কখনও অবহেলা কর নাই। তুমি আমার কাছে তোমার উপর-মাড়ির সাম্‌নের দাঁত দুইটি উপ্‌ড়াইয়া ফেল।"

ছেলে বলিল, "মা, আমার দাঁতে তো কোন চিহ্ন নাই; আর যদি থাকেই তবে তাহা উপ্‌ড়াইয়া ফেলিলেই কি জ্যোতিষ-শাস্ত্র নিষ্ফল হইবে? তবে কেন এ কষ্ট করা, মা!"

মা বলিলেন, "তর্ক করিও না, বাছা! মা হইয়া আমি তোমার কষ্ট দেখিব, এ কি আর আমার সাধ করে? তবু তোমাকে বলিতেছি, দাঁত দুইটি তোমাকে ফেলিতেই হইবে; আমার কথা তোমাকে শুনিতেই হইবে।"

চাণক্য আর একটি কথাও বলিলেন না; তখনই এক লোহার হাতুড়ি দিয়া সাম্‌নের দাঁত দুইটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অজস্র ধারে রক্ত ছুটিল, কিন্তু চাণক্য অচল—অটল—মুখে তাঁর বেদনার লেশমাত্রও নাই। মা চোখের জলে বুক ভাসাইয়া তাঁহাকে সাপ্‌টিয়া কোলে লইলেন।

তখন হইতে চাণক্যের নাম হইল 'খণ্ডদন্ত'।

চাণক্য 'খণ্ডদন্ত' হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতেই কি বিধিলিপির খণ্ডন হইল?—

হোগ্‌লা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ

লতাগুল্মের কথা ভাবতে গেলে আমরা কখনও হোগ্‌লার কথা মনে করি না। হোগ্‌লাকে গাছ্‌ও বলা যায় না, আবার ঘাস বললেও অনেকে হয়ত হেসে উঠবেন। এজন্যই হোগ্‌লা আমাদের কাছে উপেক্ষিত হয়ে আছে; অথচ হোগ্‌লা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ। দীন-দরিদ্র থেকে কোটিপতি পর্য্যন্ত হোগ্‌লার ব্যবহার ক'রে থাকেন। গরীবেরা হোগ্‌লা দিয়ে ঘরের বেড়া দেয়। বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম্মে বড়লোকেরা বাড়ীর ছাদে হোগ্‌লার আচ্ছাদন ব্যবহার করেন। বেদেরা কখনও এক জায়গায় বাস করে না; কিন্তু মাথা গুঁজে থাকবার জন্য তাদের একটা আশ্রয় চাই। সেজন্য ত আর ঘরবাড়ী সঙ্গে বহন করা যায় না! বড়লোকদের মত তাঁবুও তা'রা যোগাড় করতে পারে না। এইজন্য তা'রা দড়ি দিয়ে বোনা এক রকম হোগ্‌লার তাঁবু ব্যবহার করে। হোগ্‌লার সুবিধা এই যে, এগুলি যেমন শক্ত তেমনি হাল্কা।

হোগ্‌লা একরকম খুব লম্বা পাতাবিশিষ্ট ঘাস—লম্বায় প্রায় বার-চৌদ্দ ফুট পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। এর পাতাগুলি দেড় ইঞ্চিরও বেশী চওড়া হয়। হোগ্‌লা-পাতার নীচের দিকটার মাঝখানে একটা উঁচু শির আছে। লাইন টানবার জন্য সাধারণভাবে ফুটরুল-রূপেও হোগ্‌লা ব্যবহার করা যায়। হোগ্‌লা দিয়ে এক রকম সস্তা দরমাও তৈরী হয়। ধান বা অন্যান্য শস্যাদি শুকাতে বা বৃষ্টি থেকে ঐ সব শস্য রক্ষা করতে হোগ্‌লার দরমা বিশেষ উপকারে লাগে।

বৃহৎ সভা-সমিতিতে 'প্যাণ্ডেল' করতে হ'লে হোগ্‌লার আচ্ছাদন অপরিহার্য্য। হোগ্‌লার গাছের ভিতর থেকে এক রকম সরু রোলারের মত ডাঁটা বেরুতে দেখা যায়। সেগুলি শুকিয়ে গেলে তা দিয়ে সাধারণভাবে বোধ হয় রুল টানার কাজ চলতে পারে। হোগ্‌লার পাতা বেশ পাতলা ক'রে নিয়ে সূঁচ দিয়ে সেলাই করলে হয়ত তার উপর সুন্দর ছাপার কাজ চলতে পারে। জাপানীদের খুব পাতলা কাঠের এমনি সব ফলকের উপর কত ফুল-ফল-আঁকা ছবি তৈরী করতে দেখা যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধে কাগজ দুর্ম্মূল্য হওয়ায় ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার প্রায় দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু হোগ্‌লার চওড়া পাতা

আরও পাতলা ক'রে পর পর বুনানী বা সেলাই ক'রে নিলে তার উপর ছবি ও ক্যালেণ্ডার ছাপানো যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

নদীর ধারে বা স্যাঁৎসেতে জায়গায় এবং উলুখড়ের ক্ষেতে হোগ্‌লা কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করে। একবার হোগ্‌লা জন্মাতে আরম্ভ করলে কিছুদিনের মধ্যেই সে উলুক্ষেত হোগ্‌লা ক্ষেতে পরিণত হয়। এক একটা ঝোপ নিয়ে হোগ্‌লা জন্মায়—এজন্য কোন চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না।

খুলনা জেলার ভৈরব নদীর তীরে কোথায়ও কোথায়ও হোগ্‌লার ঝোপ দেখা যায়; কিন্তু সব চাইতে বেশী হোগ্‌লা দেখতে পাওয়া যায় সুন্দরবন অঞ্চলে। সেখানেই হোগ্‌লার আদি নিবাস ও একাধিপত্য।

'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের' গায়ে যে কালো কালো দাগ, প্রাণিতত্ত্ববিদেরা বলেন, হোগ্‌লা বনই তার কারণ। সুন্দরবন অঞ্চলের নদী বা খালের ধারের হোগ্‌লা বনেই অধিকাংশ সময় রয়্যাল বেঙ্গল আশ্রয় নিয়ে থাকে। সূর্য্যালোকের ঢেউ উপর থেকে সোজাভাবে এই হোগ্‌লা বনে প্রবেশ করে। তার ফলে কালো কালো ছায়া পড়ে এই বনের মধ্যে—সূর্য্যালোকে একটা লাঠির ছায়া যেমন পড়ে মাটিতে। হোগ্‌লা পাতার বাঁকা বাঁকা কালো ছায়া রয়্যাল বেঙ্গলের কালো ডোরার সঙ্গে এমনভাবে মিলে থাকে যে, চোখের সম্মুখে থাকলেও হোগ্‌লা বনে রয়্যাল বেঙ্গলকে খুঁজে বের করা যাবে না। কেবল রয়্যাল বেঙ্গল নয়, সাপ, ফড়িং, কাকলাস এবং অনেক জলচর পাখীও এমন-ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে রাখে যে, তাদের খুঁজে বের করা শক্ত হয়।

অনেকে মনে করেন, এখন যেখানে 'হুগ্‌লী', পূর্ব্বে ওখানে অনেক হোগ্‌লা ক্ষেত ছিল এবং তার থেকেই হুগ্‌লীর ওই নাম হয়েছে। অবশ্য হোগ্‌লা থেকেই হুগ্‌লী হয়েছে কিনা বলা শক্ত। লেডি ক্যানিংএর নাম থেকেই 'লেডিকিনী' হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ নেই—যদিও অনেকেই তা মনে করেন; যেমন অনেকে মনে করেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম থেকেই 'কৃষ্ণনগর' নাম হয়েছে।—প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুরুষ পূর্ব্বেই কৃষ্ণনগর নাম হয়েছে তাঁর রাজধানীর। অনুমানের উপর অর্থ ধরতে হ'লে তোষককে (তোষয়তি ইতি) সংস্কৃত শব্দ বলা যায়,—এমন কি 'ইষ্টুপীডকেও' সংস্কৃত শব্দ ব'লে চালানো কিছু কঠিন নয়!

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

অকূল পাথারে

সুরেশ হাত দিয়া চক্ষু হইতে লবণাক্ত জল মুছিয়া ফেলিল। একবার চাহিয়া দেখিল, বিরাট সাগরবক্ষে সে একাকী, উপরে অগণিত-তারকা-খচিত আকাশের চন্দ্রাতপ। তাহার চারিদিকে সাগরতরঙ্গে তারকারাজি প্রতিফলিত হইয়া আবার সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ খণ্ডে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে।

ঘটনাগুলি যেন কেমন উদ্ভট স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল—যেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই সে বেণীমাধবের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাজেনের বাঁশীর সুর বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল। আর কিছুকাল পরেই বনমালী আসিয়া পাহারার ভার লইবে। সে অনেক কিছু ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময় কোথা হইতে আসিল সেই পিশাচের দল! বোম্বেটেরা জাহাজ আক্রমণ করিল। সে আর পারিল না, বোম্বেটেরা তাহাকে জলে ছুঁড়িয়া দিল।

পড়িবামাত্রই সে জলে ডুবিয়া গেল। হাত-পা দিয়া জল কাটিয়া যখন ভাসিয়া উঠিল, তখন প্রথমেই মনে হইল বেণীমাধবের কথা। চাহিয়া দেখিল জাহাজ কোথায়।

আর হয়তো কতকক্ষণ পরেই জাহাজ ওস্নুঙ্গার নিকটে পৌছিলে নোঙ্গর করিয়া থাকিত। ভোর হইবার পর ফাঁড়ি খুঁজিয়া বাহির করিয়া বন্দরে প্রবেশ করিত। আর তৎপরিবর্ত্তে সে এখন সমুদ্রে ভাসিতেছে, তাহার জাহাজ তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

দূরে আবছায়ার মত জাহাজ দেখিয়া সুরেশ সাঁতার কাটিতে লাগিল। জাহাজে তাহার প্রিয় সহচরবৃন্দ আছে, তাহারা হয়তো তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া আছে। বহুক্ষণ সাঁতার কাটিল, কিন্তু জাহাজ যেন ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেছে। আর তো দেখিতেই পাওয়া যায় না। তবে জাহাজ তাহাকে উঠাইয়া লইবার জন্য দাঁড়ায় নাই! বৃথা চেষ্টা করিয়া ফল কি?

পূর্ব্বদিকে কালো তটভূমির রেখা দেখিতে পাওয়া গেল। সুরেশের দেহ তখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তীরে পৌছিতে হইবে,—সে তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার কাটিতে লাগিল।

মনে হইল যেন তীরের দিকে সমুদ্রের একটি স্রোত বহিতেছে। সে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। হঠাৎ বুঝিতে পারিল স্রোতের গতি স্থলের পাশ দিয়া, এখন চেষ্টা না করিলে দূরে চলিয়া যাইবে, স্থলে পৌছিতে পারিবে না।

তখন সে প্রাণপণে সেইদিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল। এবার বেশ শক্তির প্রয়োজন হইল। ধীরে ধীরে সেই কৃষ্ণবর্ণ তটরেখা নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। এ এক অসাধারণ

প্রচেষ্টা! দেহ শ্রান্ত, অবসন্ন, স্রোতে তাহাকে সমান্তরাল ভাবে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, তথাপি ধীর মন্থরগতিতে সে স্রোতের বেগ প্রতিরোধ করিয়া লক্ষ্যস্থলের দিকে চলিয়াছে!

দেহে যেন আর শক্তি নাই! অথচ ঐ কৃষ্ণ তটরেখায় পৌছিতে না পারিলে জীবন রক্ষার আশা নাই। সুতরাং প্রাণপণে লড়াই করিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইভাবে কাটিল, এখনও বহু দূরে! আর যেন পারে না, শরীর ভাসিয়া থাকে না, পা নীচে নামিয়া যায়! হঠাৎ কি একটা কঠিন পদার্থ পায়ে ঠেকিল। তবে বুঝি ভগবান রক্ষা করিলেন!

সন্ধান করিয়া দেখিল, কি ঠেকিল। বেশ ভাল করিয়া হাত দিয়া দেখিল, একটি গাছের ডাল ভাসিয়া চলিয়াছে। হয়তো ডালটাকে ঝড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। যাহা হউক, বিশ্রাম করা চলিবে। ডালটার উপর ভর দিয়া সুরেশ বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একটু প্রকৃতিস্থ হইলে তট-ভূমির দিকে লক্ষ্য করিয়া সে দেখিল, সাগরের তরঙ্গ প্রচণ্ড শব্দে তীরে আঘাত করিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া শুভ্র ফেনরাশিতে পরিণত হইতেছে। সেই সাগরের অনন্ত অপরূপ খেলা, যুগ যুগান্ত হইতে এ খেলা চলিতেছে বিরামহীন অক্লান্তভাবে।

ঐ দেখা যায় শতাধিক হস্ত দূরে তটভূমি, ঐ দিকে যাইতে হইবে। গাছের ডাল তাহাকে সমান্তরালভাবে বহিয়া লইয়া চলিয়াছে কতদূর, জানা নাই। এ ডালের মায়া ত্যাগ করিয়া ঐ দিকেই চলিতে হইবে।

ডালটিকে ঠেলিয়া দিয়া সে তীরের দিকে সাঁতরাইয়া চলিল। এবার তাহার প্রতিপক্ষ দুইটি, সাগরের স্রোত ও উদ্দাম তরঙ্গ। স্রোতে তাহাকে একদিকে টানিতে চায়, তরঙ্গ ঠেলিয়া দেয় তীরের বিপরীত দিকে। আবার ঢেউগুলি ছুটিয়া আসে তাহাকে তরঙ্গগর্ভে নিমজ্জিত করিবার জন্য। প্রতিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ঢেউয়ের মাথায় ভাসিয়া থাকিতে হয়।

আর পারে না, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে জল, অনন্ত জলরাশি; কিন্তু ইহার একবিন্দুও তো পানীয় নহে। মুখের মধ্যে কতকটা লবণাক্ত বিস্বাদ জল প্রবিষ্ট হইল, থু থু করিয়া ফেলিল। এই সময়ে একটি সাগরের তরঙ্গ আসিয়া মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

তরঙ্গগর্ভে ডুবিয়া আবার নূতন করিয়া জীবনের মায়া আসিল, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা যেন নূতন তেজে তাহাকে সঞ্জীবিত করিল। চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টে আবার উপরে ভাসিয়া উঠিল।

অন্ধকার কাটিয়া আসিয়াছে। এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া অতি দূরে মসীরেখা দেখিতে পাইল। ঐ তবে সাগর-তীর। এত দূরে, তাই তরঙ্গভঙ্গের কলরব এত কমিয়া গিয়াছে। আর না, এতদূর পৌঁছিবার শক্তি আর নাই! আর উপায় নাই!

ওকি! হাতে কি ঠেকিল? একটি মোটা কাঠ—হয়তো জাহাজের মাস্তল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রাণে আশার সঞ্চার হইল, মাস্তলের উপর বুকের ভর দিয়া দম লইতে লাগিল। এখন বুঝিয়াছে, আর সব চেষ্টা নিষ্ফল। এই বিরাট সাগরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইতেছে প্রতি পদে। এর ফল মৃত্যু! কাঠের উপর ভর করিয়া আশা-নিরাশার কত কথা ভাবিতে লাগিল।

পূর্ব্বাকাশে প্রভাতসূর্য্য উঠিল, চারিদিকে আলোর রং মাখিয়া সাগরতরঙ্গ নৃত্য করিতে করিতে পিছলাইয়া পড়িতে লাগিল।

সুরেশ মাথা তুলিল, চক্ষের চারিদিকে সমুদ্রের জলনিঃসৃত সাদা লবণ জমিয়া গিয়াছে; কপালে, গালে, গলায় লবণ জমিয়া হয়তো শ্বেতচন্দনের মত দেখাইতেছে। মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইল, শূন্যে অনন্ত আকাশ আর যতদূর দৃষ্টি চলে সীমাহীন সাগর। এই দুই অসীমের মধ্যে সে একটি অতি নগণ্য ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র।

কাঠটি ভাসিয়া চলিয়াছে; সে তাহার উপর বসিয়া ভেলায় সাগর পার হইতেছে। তাও কি সম্ভব! কতদূর যে কাঠ তাহাকে বহিয়া আনিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল না। এখন আর সেই সমুদ্রতীর দেখিতে পাওয়া যায় না। রৌদ্রে কষ্ট হইতেছে, গায়ের জামা খুলিয়া পাগড়ীর মত মাথায় জড়াইল। গায়ের লবণের কণাগুলি গরম হইয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিতেছে! পিপাসায় গলা বন্ধ হইবার মত অবস্থা।

ঐ না,—নীল সাগরে যেন একটা সাদা পাখী উড়িয়া যাইতেছে। সে নাবিক, বুঝিল ওটা একটি পাল। একটি জাহাজ পাল উড়াইয়া চলিয়াছে। আবার সেই জীবনরক্ষার আশা, যাহা সে মনের কোণেও স্থান দিতে সাহস করে নাই। পাল আরও উপরে উঠিল, আরও,—নীল সাগরের বুকে পালসহ সমগ্র জাহাজখানি দৃষ্টিগোচর হইল।

বিশেষ দূরেও নয়, হয়তো আধক্রোশ দূরে। এত কাছে জাহাজ, কিন্তু নিকটে পৌঁছিবার কোন উপায়ই নাই। পৌঁছিতে না পারিলে আত্মরক্ষারও অন্য কোন উপায় নাই। তবে কি যে জাহাজ দেখিয়া এত আনন্দ, এত আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা চলিয়া যাইবে, সে তাহাতে উঠিতে পারিবে না! জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে।

সে পারিল না, কিন্তু জাহাজ তো তাহার নিকট আসিতে পারে। অবশ্য আসিবে, সুধু দেখিতে পাইলেই হয়। বসিয়া থাকিলে আর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইবে না। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলে কাঠ গড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। দাঁড়াইতেই হইবে, বহু চেষ্টার পর অতি সাবধানে কৌশলে কাঠের উপর দাঁড়াইল। মাথার কাপড় খুলিয়া হাতে লইয়া নাড়িতে লাগিল। যদি জাহাজের

নাবিকেরা দেখিতে পায়, তবে তুলিয়া নিবে। জাহাজের ডেকের রেলিং ধরিয়া লোকগুলি দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা হয়তো দেখিতে পাইল না। জাহাজ থামিল না, একটু ফিরিল না, মোড় ঘুরিল না। হয়তো সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

হঠাৎ মনে হইল এ জাহাজ কোথায় দেখিয়াছে। লক্ষ্য করিতে করিতে মনে হইল জাহাজটা আকারায় সুন্দর সিংএর নিকট কোপরা বিক্রয় করিয়াছে। এটা সেই ভাইজাগ বন্দরের সুন্দরম। এরাই সেই বোম্বেটে, এই সেই বোম্বেটেদের জাহাজ। ইহারা বেণীমাধব লুঠ করিয়াছে, এখন সেই মাল লইয়া পলায়ন করিতেছে। এই জাহাজেই নৌকার মাল উঠান হইয়াছে। না, কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে ইহারাই জলদস্যু! ইহাদিগকে সন্দেহ করিবার কোন প্রমাণ নাই। হয়তো উহারা দেখিতেই পায় নাই যে, সমুদ্রে একটি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই সাহায্য করিত।

নিরাশ হইয়াও বারবার কাপড়গুলি নাড়িতে লাগিল, যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। যদি উহারা বোম্বেটেই হইয়া থাকে, ক্ষতি কি, উহারা তো মানুষ। মানুষ মানুষকে বিপদে সাহায্য করিবে—এ তো মানবের সহজাত প্রবৃত্তি। কৈ, লক্ষ্য করিল বলিয়া তো মনে হয় না।

তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া জাহাজ আবার অনন্ত নীল সাগরে অদৃশ্য হইল।

সে আবার যেন অবসন্ন হইয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। এখন যেন রৌদ্র অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। পিপাসায় গলা যেন বন্ধ হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ক্ষুধার কথা তত মনে হইল না, কিন্তু পিপাসা অসহ্য মনে হইতে লাগিল।

এইভাবে দিন গেল, আবার রাত্রি আসিল। সেই কাষ্ঠখণ্ডের উপর শুইয়া থাকিতে থাকিতে সে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের মধ্যে সাগরের জল তাহার সর্ব্বাঙ্গে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিল। নিদ্রিত অবস্থাতেও সে কাঠটি শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল, ঢেউয়ের আন্দোলনে বিচ্ছিন্ন হইল না।

হঠাৎ কাঠটি যেন প্রচণ্ডভাবে নড়িয়া উঠিল। সে জাগিয়া দেখিল কোথাও কিছু নাই, তবে কি সমুদ্রের ঢেউ? হঠাৎ দেখিল সমুদ্রের মধ্যে একটা কালো ডানা এবং অতি নিকটে।

প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, ওটা একটা মস্তবড় হাঙ্গর, হয়তো বা তাহাকেই ধরিতে আসিয়া লক্ষ্য ঠিক করিতে পারে নাই। এবার দেখিল সাদা হাঙ্গরটি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। সুরেশ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি সব ভুলিয়া গেল। সে এক লম্ফে কতকদূর সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কাঠটির উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর লাফাইয়া গেল, আর দুই-এক ইঞ্চি এদিক দিয়া গেলে তাহাকে জলে ফেলিয়া দিত।

আবার কতকক্ষণ পরে কাঠটির মধ্যে প্রচণ্ড এক গুঁতা মারিয়া হাঙ্গরটি লাফাইয়া গেল। সুরেশ ঝুপ করিয়া জলে লাফাইয়া নামিয়া আত্মরক্ষা করিল। সে আর কাঠের উপর উঠিতে সাহস করিল না, একহাত কাঠের উপর রাখিয়া ভাসিতে লাগিল।

হাঙ্গরটি শিকার হারাইয়া চারিদিকে অত্যন্ত বেগে চক্কর দিতে লাগিল। সুরেশ বুঝিল, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ হিংস্র হাঙ্গরের হাত হইতে নিস্তার নাই। আর যদি ইহার পরও বাঁচিয়া থাকে, তবে এই সীমাহীন সাগরের মধ্য হইতে উদ্ধার পাওয়ার আশা নাই, তাহাকে অনাহারে মরিতেই হইবে।

হাঙ্গরটি সাঁতার দিতে দিতে ক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তারপর প্রবল বেগে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সুরেশ অমনি জলে ডুব দিয়া চট করিয়া অনেকটা নীচে চলিয়া গেল। কতকক্ষণ ডুবিয়া থাকিবার পর সে আবার যখন ভাসিয়া উঠিল, তখন দেখিতে পাইল হাঙ্গরটি মাত্র আট-দশ হাত দূরে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সে আবার কাঠটি ধরিল।

হাঙ্গর কিছুক্ষণ পরে আবার বোঁ-বোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সে আবার ডুব দিল, মাথার উপর দিয়া বিপুলবেগে হাঙ্গর চলিয়া গেল।

সুরেশ দম বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ জলের নীচে থাকিয়া আবার উঠিল। অতি সাবধানে সে সাঁতরাইয়া কাঠটির নিকট গেল ও তাহা ধরিয়া ভাসিতে লাগিল। হাঙ্গর আর দেখা দিল না। বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করা সত্ত্বেও হাঙ্গরটিকে না দেখিয়া সুরেশ আবার কাঠের উপর উঠিল। যদিও হাঙ্গর আর দেখিতে পাওয়া গেল না, তথাপি সে সেরাত্রে আর ঘুমাইতে সাহস করিতেছিল না; কিন্তু বহুক্ষণ আতঙ্কে কাটাইবার পর সেই কাঠের উপরে অজ্ঞাতভাবে আবার নিদ্রিত হইল।

যখন ত্রস্তভাবে আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল তখন দেখিল সূর্য্যোদয় হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের বিশাল বক্ষে আবার প্রভাত! চক্ষু মেলিয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—চারিদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, ভূমির চিহ্ন নাই, কোনও জলযানের চিহ্ন নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সাগরের গর্জ্জনে কান যেন ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। জাহাজ, নাবিক, বন্দর, বাড়ীঘর এসব জিনিস যেন স্বপ্নের কল্পনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল; মনে হইল যেন কোন্ সুদূর অতীতে—এসব কল্পনা বাস্তব বলিয়া ভাবিয়াছিল। সে তখন বড়ই শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত, কাষ্ঠখণ্ড হইতে উঠিবার বা পাশ ফিরিবার ক্ষমতাও তাহার নাই। (ক্রমশঃ)

ভূত-মহলে

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

বর্ষাকালের ঘুট্‌ঘুটে রাত !— ঝিপঝিপিয়ে ঝর্‌ছে জল ;
ঝোপেঝাড়ে বনবাদাড়ে মাত্‌ল সুখে ভূতের দল।
ঝিঁঝিঁর ডাকের ঝাপসা সুরে ঘনিয়ে ওঠে অন্ধকার ;
শুঁট্‌কো মড়া ভেপসে ওঠে, উথ্‌লে ওঠে গন্ধ তার।
অশথগাছের শিব্‌ডগালে খোসমেজাজে ঝুলিয়ে ঠ্যাং
বাদ্‌লা হাওয়ায় দুল্‌দুলিয়ে দেড়চোখো ভূত খাচ্ছে ব্যাং।
পেত্নীজলার ঈশেন কোণে বনঝাউ আর শ্যাওড়া-ঝাড়ে
তোব্‌ড়া মুখে মুচ্‌কে হেসে মরকুটে ভূত নেঙ্গুড় নাড়ে।
স্যাঁৎসেঁতে সেই জলার বুকে প্যাচ্‌প্যাচানি পাঁকের সাথে
আধেক রাতে আলেয়া-বৌ দপ্‌দপিয়ে খেলায় মাতে।
চাম্‌সা-বাদুড় ঝট্‌পটিয়ে ঝুল্‌ল এসে বাব্‌লা গাছে ;
খ্যাঁদা ভূত আর পেত্নীপিসি বাঁশডগালে বেদম নাচে।
ব্রহ্মদত্যি খড়ম পায়ে বেলের ডালে বেড়ায় হেঁটে ;
চোখ পাকিয়ে চারদিকে চায় নেড়া মাথায় মাম্‌দো বেঁটে।
শাঁখচুন্নি ঝিঁঝিঁট সুরে তান ধ'রে দেয় গিটকিরি ;
ফিচেল পেঁচো চুমকুড়ি দে' মারছে তা'তে টিট্‌কিরি।
উদ্‌ভুটে এক বিকট সুরে আঁৎকে ওঠে ভূতের ছাঁ—
নাক থেকে তার ন্যাজ বেরোনো— পিঠের দিকে মুখের হাঁ।
আজ্‌কে রাতে ফুর্ত্তি ভারি— ভূত-মহলে জাগ্‌ল সাড়া,
হুল্লোড়ে তার উঠ্‌ল কেঁপে শ্মশান-ঘাটার জংলীপাড়া।

বাঁচবার উপায়

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

শ্রাবণের পর]

গত সংখ্যার শিশুসাথীতে তোমাদের বলেছিলাম, ভাদ্রের সংখ্যায় আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য ও তাদের গুণাগুণ। স্যার রবার্ট ম্যাক ক্যারিসন কুণুরের গবেষণাগারে, আমাদের এই ভারতে যত জাতির লোক আছে, যেমন ধর—বাঙালী, শিখ, উড়িয়া, মাদ্রাজী, বেহারী ইত্যাদি এদের প্রত্যেক জাতি যে যে ধরণের খাদ্য খায়, সেগুলোর এক-একটা তালিকা তৈরী ক'রে তাদের প্রত্যেকটি খাদ্যের গুণাগুণ গবেষণা দ্বারা বিচার করেন। যেমন আমরা বাঙালীরা সাধারণতঃ ডাল, ভাত, মাছ ইত্যাদি খাই। শিখ বা পাঠানেরা সাধারণতঃ খায় রুটি, ঘি, মাংস ইত্যাদি। এক এক দেশের লোকের মধ্যে এক এক রকমের খাদ্যদ্রব্য প্রচলিত। তিনি প্রত্যেকের খাদ্যদ্রব্যগুলো পরীক্ষা ক'রে বলেছিলেন ভারতের নানা জাতির মধ্যে শিখেরাই নাকি সবার চাইতে বেশী পুষ্টিকর খাদ্য খায়। তারপরই পুষ্টিকর খাদ্য খায় পাঠান জাতি। শিখেরা যে সব চাইতে পুষ্টিকর খাদ্য খায়, সেটা তাদের সুগঠিত, বলিষ্ঠ চেহারার দিকে চাইলেই বোঝা যায়। সত্যি, কি চমৎকার চেহারা শিখদের! কলকাতায় যত শিখ দেখা যায়, তাদের বেশীর ভাগই লরী, বাস ও প্রাইভেট্ গাড়ীর ড্রাইভার। অথচ কি বলিষ্ঠ পেশল চেহারা তাদের! মন সর্ব্বদাই স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর! যেন দুনিয়ায় তা'রাই একমাত্র বিধাতার কাছে পেয়েছে বাঁচবার অধিকার! কিন্তু কি-ই বা রোজগার করে ওরা! পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হ'লে কেবল টাকারই প্রয়োজন হয় না; হয়—ভাল খেয়ে শরীরটাকে সুন্দর ক'রে তোলবার মনোগত একটা সত্যিকারের ইচ্ছা!

সুকুমার রায়-চৌধুরীর একটা চমৎকার কবিতা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জান:

"—উৎসাহে কি না হয়!
কি না হয় চেষ্টায়!—"

শরীরকে আগে সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোল, এ দুনিয়ায় বাঁচতে হ'লে আগে বেঁচে থাকবার শক্তি অর্জ্জন করো। বাঁচতে হ'লে চাই প্রচুর প্রাণ-প্রাচুর্য্য, পুষ্টিকর খাদ্য, আলো, বাতাস, স্বাস্থ্যকর ঘর, ব্যায়াম।

দুর্ব্বল পঙ্গু হ'য়ে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। অন্যের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করার মধ্যে ঔদার্য্য থাকতে পারে, আত্মসম্মান নেই এতটুকু। ভেবে দেখ রাস্তায় চলতে ট্রেনে, বাসে, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শক্তিমান না হ'লে ঠাঁই নেই।

জান ত—'বলং বলং বাহুবলং'...

কিন্তু যাক্, যা বলছিলাম। সব চাইতে পুষ্টিকর খাদ্য খায় শিখেরা, তারপর পাঠান, তারপর মহারাষ্ট্র, তারপর গুর্খা, তারপর কেনারিজ—তারপর হতভাগ্য আমরা বাঙালী ও আমাদের চাইতেও হতভাগ্য সর্ব্বপরে মাদ্রাজীরা!

এই শিখ, পাঠান, বাঙালী ইত্যাদি যা যা সাধারণতঃ খায় সেই সব খাদ্য স্যার রবার্ট আলাদা আলাদা এক একদল সাদা ইন্দুরকে ৮০ দিন ধ'রে খাওয়াতে সুরু করলেন এবং মাঝে মাঝে ইন্দুরগুলোর ওজন নিয়ে নিয়ে একটা খাতায় কত ওজন হ'ল টুকে টুকে রাখতে লাগলেন।

এই ভাবে এক একদল ইন্দুরকে এক জাতীয় বিশেষ খাদ্য খাইয়ে ওজন নিতে নিতে তিনি দেখলেন,—যে ইন্দুরগুলোকে শিখদের খাদ্য দেওয়া হ'ত, সেগুলোর ওজন ও দেহের চেহারা সবার চাইতে বেশী সুন্দর ও বলিষ্ঠ হয়েছে। আর মাদ্রাজী খাদ্য যে ইন্দুরগুলোকে দেওয়া হয়েছিল, তাদের চেহারা সকলের চাইতে খারাপ হয়ে গেল আর ওজনেও তা'রা সবার চাইতে বেশী কমে' গেল। এই ব্যাপার লক্ষ্য ক'রেই রবার্ট ম্যাক্ ক্যারিসন বললেন ঃ—এই ইন্দুরদের দিয়ে গবেষণা ক'রে বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের সমগ্র জাতির মধ্যে শিখদের খাদ্যই সবার চাইতে বেশী পুষ্টিকর, আর বাঙালী ও মাদ্রাজীদের খাদ্য সবার চাইতে কম পুষ্টিকর; এক কথায় ওদের খাদ্য-তালিকার মধ্যে এমন কোন খাদ্যদ্রব্য নেই যা পুষ্টিকর বলা চলতে পারে।

তখন তিনি ভাবতে লাগলেন,—এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সমগ্র বাঙালী জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে, এর প্রতিকার কি? এই ভাবে পুষ্টিকর খাদ্য না খেয়ে খেয়ে অবশেষে হয়ত তা'রা একদিন জগৎ হ'তে লুপ্তই হ'য়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ম্যাক্কে বাংলাদেশের জেলখানায় যেসব খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ দেওয়া হয়, সেগুলোর এবং সাধারণ একজন বাঙালী ছাত্রের খাদ্যদ্রব্যগুলোর গুণাগুণ বিবেচনা ক'রে মত দিয়েছিলেন,—'বাঙালীদের এই স্বাস্থ্যহানির হেতু আর কিছুই নয়; আমার মনে হয় বাঙালীরা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাৎ দেহের যতটুকু

উপযোগী ততটুকু 'আমিষ' জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ প্রোটিন খাদ্য খায় না। তাঁর মতানুসারে একজন সাধারণ মধ্যবয়স্ক বাঙালীর সুস্থ দেহ ধারণের পক্ষে অন্ততঃ দৈনিক ১০০ গ্র্যাম আমিষ জাতীয় খাদ্যের একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সেই সময় ম্যাক্‌কের কথার প্রতিবাদ তোলেন আর একজন বৈজ্ঞানিক, তাঁর নাম চিটেনডন। তিনি বললেন,—না, ১০০ গ্র্যাম প্রোটিন বা আমিষ না হ'লেও চলবে—৪০।৫০ গ্র্যাম আমিষ হ'লেই যথেষ্ট। অবশ্য অন্যান্য যে সব খাদ্য খাওয়া হবে তার মধ্যে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকবে। চিটেনডনের কথাই যদি সত্য ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়, তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীদের দেহের খর্ব্বতা ও দুর্ব্বলতা যে একমাত্র যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবেই হচ্ছে একথা বলা চলে না,—কি বল ?

'বাইশে শ্রাবণ'

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

"বাদল ধারা হলো যে সারা
বাজে বিদায় সুর।"

বাইশে শ্রাবণ—আজ বাঙ্গালীর একটি স্মরণীয় দিন—আজ আমাদের পরম আদরের—পরম শ্রদ্ধার কবি রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব-দিবস।

গত বৎসর এই বাইশে শ্রাবণ—বর্ষণ-ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে আকাশে বাতাসে যখন বাদল-বিদায়ের শেষ রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক তেমনি সময় কবি আমাদের ভিতর হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইবে—বছরের পর বছর যাইবে—বর্ষার পর বর্ষা আসিবে—আকাশে আকাশে মেঘের মেলা বসিবে, দেয়ার গুরু গুরু ডাকে আমাদের বুক 'দুরু দুরু' কাঁপিয়া উঠিবে—কেতকী, যুথী, চামেলী, চাঁপার গন্ধে চারিদিক ভরিয়া যাইবে—কিন্তু কবি কি আর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন ?—আর কি তাঁহার রচনায় আমাদের সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন ?—আর কি তাঁহার কণ্ঠ-সঙ্গীতে আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিবেন ?

কবি তাঁহার লেখনীদ্বারা আমাদের সাহিত্যকে আর নূতন করিয়া সমৃদ্ধ করিবেন না—কণ্ঠ-সঙ্গীতে এ মরজগতে আনন্দের বানও আর প্রবাহিত করিবেন না—লৌকিক ভাবে ফিরিয়াও আর আসিবেন না—এ সবই সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে কবির মৃত্যু নাই—কবি মরণ-বিজয়ী—

তিনি অমৃতের সন্তান। তিনি অমর হইয়া আছেন তাঁহার কাব্যে এবং থাকিবেনও। তাঁহার কাব্যের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে চিরদিন খুঁজিয়া পাইব। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু দেহত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কবি যে আমাদের কত গৌরবের বস্তু ছিলেন, তাঁহার জীবদ্দশায় উহা আমরা যেমন উপলব্ধি করিয়াছি—ততোধিক উপলব্ধি করিতেছি তাঁহার দেহত্যাগের পরে।

কবির দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী সমাজের একটা অতি গৌরবময় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। একটা যুগের পরিসমাপ্তি কেন বলিলাম, উহা একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। কবি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও চিন্তাধারাদ্বারা সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, রাষ্ট্রীয় চিন্তায় এবং শিক্ষায় একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগই শেষ হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে কোন কালে কেহ আপন চিন্তা ও ভাবধারাদ্বারা এইরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্পদশালী একটা যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, নাট্য-সাহিত্যে, প্রহসনে, সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে, বিজ্ঞান-সাহিত্যে, শিশু-সাহিত্যে, দর্শনে, চিত্র-শিল্পে, শিক্ষকরূপে, দেশ-প্রীতিতে, গঠনমূলক কার্য্যে এবং সমাজ-সংস্কারে তিনি অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া বিশ্ববাসীকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কৃষ্টির আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। যেদিকেই তাঁহার চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে—তাহাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়াছে এবং তাঁহার সুকল্যাণ হস্তের স্পর্শে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এই কারণে তাঁহার গুণমুগ্ধ বিশ্ববাসী তাঁহাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, অতি বড় সম্রাটের ভাগ্যেও তাহা অনেক সময় ঘটিয়া উঠে না।

মানবজাতির শিক্ষাগুরুরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে-সমস্ত মনীষী বিশ্ববাসীকে একটা বিশিষ্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া নব নব পথের সন্ধান দানে যত্নপর হইয়াছেন, কবি রবীন্দ্রনাথ, তাঁহাদের অন্যতম। তিনি আপন ভাবধারাদ্বারা বিশ্ববাসীকে যে-নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, উহার অনুসরণ করিলে সত্য সত্যই এক নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে—মানুষ হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া যাইবে—রক্তারক্তি, কাটাকাটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির ন্যায় ভয়ঙ্কর হিংসামূলক কার্য্যগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং বিশ্বে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে খুব বেশী হয় নাই—হয়ও না। কত শত বৎসরে এমন একজন মহান্ পুরুষ যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তাহা স্থিররূপে বলা দুষ্কর। এইরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভাবান পুরুষের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরাও ধন্য এবং ভাগ্যবান। তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত বাণী ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। আমাদের পরবর্ত্তী যুগে যাহারা আসিবে, সেই সব অনাগতদের নিকট ইহা কি একটা চির-ঈর্ষ্যার বিষয় হইয়া থাকিবে না?

শান্তিনিকেতনে কবির বাসগৃহ—উত্তরায়ণ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধন-পীঠ শিলাইদহ কুঠীবাড়ী

কবির প্রতিভা ছিল সহজাত। তাই যেদিন বিদ্যারম্ভের প্রথম দিকে বর্ণবিন্যাসের ঝড়-ঝাপট্টা কাটাইয়া উঠিয়া প্রথম পড়িলেন—"জল পড়ে পাতা নড়ে", সেই দিনই ছোট এই বাক্যটি শুধু উহার মিলের জন্যই তাঁহার মনটাকে দোলা দিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে তিনি বলিয়াছেন—"আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে, তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন? মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনও তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

মাত্র সাত আট বৎসর বয়সেই তিনি প্রথম কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; প্রথম অতি সন্তর্পণে। পরে যখন দেখিলেন কবিতা তাঁহার হাতে কবিতারই মত হইয়া উঠে, তখন সঙ্কোচ কাটিয়া গেল—ভয় আর রহিল না—লেখনী চলিতে আরম্ভ করিল অবিশ্রান্ত গতিতে। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্ব্বেও লেখনী তাঁহার একদিনের জন্যও আর বিশ্রাম লাভ করিতে পারে নাই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ তাঁহার অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। শিক্ষালাভের জন্য তিনি প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে, পরে নর্ম্ম্যাল স্কুলে, উহারও পরে বেঙ্গল একাডেমী নামক একটা ফিরিঙ্গি পরিচালিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাল না লাগায় একদিন তিনি পড়া ছাড়িয়া দিলেন এবং বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়িতে লাগিলেন। পরে বিলাতেও গিয়াছিলেন শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেখানেও ঐ একই ফল হইল; প্রথম একটা পাবলিক স্কুলে, পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেশে ফিরিলেন।

বিলাতে থাকিতেই তিনি একখানা কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহা সমাপ্ত করিয়া, প্রকাশ করেন। "ভগ্নহৃদয়" নামে উহা প্রকাশিত হয় এবং রসিক-সমাজে বিশেষ আদৃত হয়।

বিদ্যালয়ে পাঠ না করিলেও তিনি শুধু নিজ চেষ্টায় ও গৃহে অধ্যয়ন করিয়া যে-পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই উহা সম্ভব। বাংলার যে-অভিজাত ধনাঢ্য ঠাকুর পরিবারে তিনি জন্মিয়াছিলেন, সে পরিবার সে-যুগে বাংলাদেশে কৃষ্টি-চর্চ্চার কেন্দ্রস্থলস্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পারিবারিক প্রভাবের ফলও তাঁহার উপরে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়া, তাঁহাকে জীবনে সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। পারিবারিক প্রভাবের ফলে, শুধু সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি কৃষ্টির চর্চ্চায়ই নহে, স্বাদেশিকতার মন্ত্রে এবং ধর্ম্মজীবনেও তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যে 'গীতাঞ্জলি' নামক গ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, উহার প্রত্যেকটি

সঙ্গীতই ভগবদ্ভক্তিতে সমুজ্জ্বল। তাঁহার কাব্যে, রচনায় ও কার্য্যে স্বদেশ-ভক্তির পরিচয়ও বিশেষরূপেই পাওয়া যায়।

সঙ্গীতের প্রতি একটি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকার জন্যই তাঁহার প্রথম যুগের রচিত কাব্যের অধিকাংশই সঙ্গীত। তাঁহার প্রথম যুগের রচনার মধ্যে প্রধান "বাল্মীকি প্রতিভা", "প্রভাত সঙ্গীত", "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" এবং "ছবি ও গান"।

ইহার পরবর্ত্তী যুগেই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সূচনা হইল। তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন; বোটে পদ্মার বুকে কতককাল ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কত ঘাটে ঘাটে তাঁহার বোট ভিড়িল—কত অজানার সহিত তাঁহার জানা হইল। নদীয়া জেলার শিলাইদহ নামক স্থানে কবির জমিদারীর এক কাছারী-বাড়ী আছে। অনেক সময়ই তাঁহার বোট এই শিলাইদহের ঘাটে দেখা যাইত। এই সময়ের পূর্ব্বে তাঁহার গদ্য রচনা খুব বেশী প্রকাশিত হয় নাই। এখন তাহা হইতে লাগিল। "গল্পগুচ্ছ" নামক গল্পগুলিও এই সময়ে রচিত হইতে আরম্ভ হয়।

ছোট ছেলেমেয়েদের চিরকালই তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি যে শুধু ছেলেমেয়েদের স্নেহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি তাঁহার রচনাদ্বারা তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেও সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইতেন। তিনি ছিলেন ছোটদের একজন পরম বন্ধু। নানাভাবে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের চরিত্র বাল্যকাল হইতেই যাহাতে ভারতীয় আদর্শে গঠিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শিক্ষালাভও হয়, এইজন্যই বাংলা ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ বোলপুরে তিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। অতি সাধারণ ভাবেই তিনি ইহা আরম্ভ করেন। প্রথম মাত্র দুইটি ছেলে লইয়া ইহার সূচনা হয়—তাঁহার পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তদীয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষকুমার মজুমদার এই বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র। পরে ধীরে ধীরে অনেকেই তাঁহাদের ছেলেদের সেখানে শিক্ষার জন্য পাঠান। তখন বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন মাত্র তিনজন। কবিও স্বয়ং অতি যত্নে ছাত্রদিগকে নানা বিষয় পড়াইতেন। কবি-পত্নী বালকদিগকে এত যত্ন করিতেন যে, গৃহের অভাব তাহারা ভুলিয়া যাইত। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীরূপ মহামহীরুহে পরিণত হইয়া ভারতের কৃষ্টি সাধনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে।

বালক ও কিশোরদের জন্য রচিত 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'কথা ও কাহিনী' যখন রচিত হয় তখনও কবি প্রৌঢ়ত্বের সীমা লঙ্ঘন করেন নাই। কিন্তু বৃদ্ধবয়সে যখন তাঁহার মন ক্লান্ত ও দেহ অবসন্ন, তখনও কিন্তু তিনি তাঁহার চির-আদরের ছোটদের কথা ভুলিয়া যান নাই। যখন অনুরোধ আসিল ছোটদের জন্য কিছু রচনা করিতে, তিনি বলিলেন—

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে॥" —খাপছাড়া

'খাপছাড়া' নামক বইয়ের প্রথম পাতায় এই কয়টি পংক্তি লেখা আছে। 'খাপছাড়া' অতি চমৎকার ছড়ার বই—ছেলে-ভুলানো ছড়ার রীতিতে লেখা। ইহাতে চমৎকার সব ছবিও আছে—কবির নিজের হাতে আঁকা। যেমন ছড়া তেমনই সুন্দর ছবি! তোমরা অতি অবশ্য এইখানা পড়িও। ইহার ছবিগুলিও তোমাদিগকে সত্যিকার আনন্দ দান করিবে। এই শ্রেণীর বই তিনি আরও রচনা করিয়াছিলেন। 'ছড়া' এবং 'ছড়ার ছবি'—অতি চমৎকার। ছেলে-ভুলানো ছড়ার যেমন অর্থের কোন বালাই নাই—এগুলোরও তেমনি। ছড়ার ছবির ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—"ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থ-লোভী জাত নয়।"

কিশোরদের জন্য সহজ ভাষায় তাঁহার লেখা বিজ্ঞানের গ্রন্থ "বিশ্বপরিচয়"। "বিশ্বপরিচয়ে" আমরা বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃতিক রহস্যের অনেক পরিচয়ই পাই। যেমনি অনবদ্য ইহার বিষয়বস্তু, তেমনি চমৎকার ইহার ভাষা। এই গ্রন্থখানা রচিত হইবার পর কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "যাহাদিগের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত তাহাদের পক্ষে ইহা শক্ত।" কবি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "যদি সংগ্রাম করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা না করা যায় তবে সে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।"

আর একখানা বই 'ছেলেবেলা'—কবির নিজের লেখা তাঁহার ছেলেবেলার কথা। চমৎকার—এখানাও তোমরা পড়িও কিন্তু। কবির বাল্যকাল সম্বন্ধে অনেক কথা তোমরা জানিতে পারিবে—অনেক উপদেশ তোমরা পাইবে। সেই আদর্শে তোমরা তোমাদের জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিলে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

কবির বিচিত্র জীবনের কথা লিখিতে গেলে উহা এত বিরাট হইবে যে, কয়েক বৎসরের শিশুসাথীতেও স্থান দেওয়া যাইবে না। সুতরাং এইখানেই শেষ করিতে হইল।

আজ বাইশে শ্রাবণ—আজ আবার কবির কথা নূতন করিয়া আমাদের মনে পড়িতেছে—ব্যথায় বুক ভরিয়া যাইতেছে—

"ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরাণ-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়-কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।"

পথের ধূলা

যে বস্তু আমরা ঘরে-বাইরে সব জায়গায় দেখি, সেই বস্তুটি সম্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান খুব কম। অতি সামান্য ও সহজপ্রাপ্য বস্তু দিয়েই যে অসামান্য কিছু একটা করা যেতে পারে এই ধারণাই আমাদের নেই। এই জন্যই সামান্য বস্তু নিয়ে আমাদের দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীরাও মাথা ঘামান না। অন্য দেশের বিজ্ঞানীরা কিন্তু এ রকম নন। বর্ত্তমান যুগে খুব সামান্য জিনিস দিয়ে খুব কম খরচে কি ক'রে বড় বড় এক একটা স্থায়ী জিনিস তৈরি ক'রে দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করা যায়, এই চিন্তা তাঁরা সব সময়ে করেন, আর এই জন্যই তাঁরা সাফল্য-মণ্ডিত হন।

পথের ধূলার মত তুচ্ছ জিনিস আর কি হ'তে পারে বলতো? কলিকাতা ছেড়ে আমাদের দেশের যে কোন সহরে ধূলার জ্বালায় আমরা সর্ব্বদা অস্থির হ'য়ে থাকি, পল্লী-গ্রামের তো কথাই নেই। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতে ধূলার অসংখ্য অপকারিতাও আছে বটে, কিন্তু পৃথিবীকে তো আর ধূলাশূন্য করবার কোন উপায় নেই। পল্লী অঞ্চলে শত শত মাইল রাস্তা ডিষ্ট্রিক্‌ট্ বোর্ড তৈরি ক'রে রাখে লোকের চলাচলের জন্য, কিন্তু একটা মোটরগাড়ী চ'লে গেলে এমন একটা ধূলার মেঘ সৃষ্টি হয় যে, চোখ খোলা যায় না, নিঃশ্বাস ফেলা যায় না, পথও চলা যায় না,—ধূলায় স্নান ক'রে উঠতে হয়। একটু বৃষ্টি হ'লেই এই ধূলা পরিণত হয় কাদায়, হাঁটু অবধি ঢুকে যায়, পথচারীর দুর্গতির আর সীমা থাকে না। এই সব রাস্তা চওড়া ও উঁচু ক'রে বেঁধে নিতে কি কম খরচ হয়?

ধূলা আর মাটি নিয়ে কত দেশের কত বড় বড় পণ্ডিত বিজ্ঞানাগারে ব'সে পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকেন, কত নতুন নতুন গবেষণা ক'রে জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্র প্রসারিত করেন, তার খোঁজই বা ক'জন লোকে রাখে?

ধূলায় জল আছে। শুকনো ধূলা হ'লেও তাতে জল থাকে, যেমন হাওয়ায় জলীয় বাষ্প আছে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ জল ধূলায় আছে। প্রত্যেক সাড়ে আট সের ধূলায় প্রায় এক সের জল থাকে; কিন্তু যে পরিমাণ উত্তাপে সাধারণ জল ফুটে উঠে, তার চেয়ে ঢের বেশী উত্তাপে এই জল ততখানি উত্তপ্ত হয়, আর উত্তাপ যতটা হ্রাস পেলে জল জমে, তার চেয়ে ঢের বেশী হ্রাস না পেলে এ জল জমে না। মাটির এমন একটি শক্তি আছে যে, খুব শুকনো হ'লেও ভেতরে জল ধ'রে রাখতে পারে।

মাটির এই শক্তি আছে ব'লেই একে অত্যন্ত শক্ত ক'রে তোলবার নানা রকম পরীক্ষা করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ফরাসী বৈজ্ঞানিক বুসিনেস্ক (Boussinesq) মাটির চাপের পরিমাণ ও গতি নির্দ্ধারণ করেন। তাঁর মতবাদ এতদিন ধ'রে বিজ্ঞানীরা অনুসরণ ক'রে এসেছেন। সম্প্রতি আমেরিকার লস্ এঞ্জেলেসের আর. আর. প্রকৃটর্ নামে এক মনীষী ধুলা ও মাটির গবেষণায় অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাঁরই গবেষণার ফলে পথের ধুলা দিয়েই শত শত মাইল স্থায়ী শক্ত পথ তৈরি হ'তে পারছে।

আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণ হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, সেখানে যত খরচে পল্লী অঞ্চলে পাকা রাস্তা তৈরি হ'য়ে থাকে, তার তিন ভাগের এক ভাগ খরচে প্রকৃটরের উদ্ভাবিত প্রণালীতে অনায়াসে তার চেয়ে ভাল রাস্তা তৈরি হ'তে পারে। আমেরিকার ৩১টি ষ্টেটে এখন এই রাস্তাই তৈরি হচ্ছে।

আমাদের দেশে এটা সম্ভব কিনা তা নিয়ে যদি কেউ চিন্তা করেন ও পরীক্ষা ক'রে দেখেন, তা হ'লে অন্তত পল্লী অঞ্চলের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হ'তে পারে।

যাই হোক, প্রকৃটরের প্রণালীতে কি রকম ক'রে পাকা রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তা তোমাদের বুঝিয়ে বলছি।

ধুলা মাটিতে সিমেণ্ট খুব ভাল ক'রে মেশাবার জন্য বিরাট কলের লাঙ্গল চালানো হচ্ছে। মাটি ওলোট-পালোট হ'য়ে যাচ্ছে।

রাস্তার মাটি সাধারণ লাঙ্গল দিয়ে ১ হাত বা ২ হাত বা তার চেয়ে বেশী গভীর ক'রে চষে দিয়ে একেবারে গুঁড়ো ক'রে ফেলা হয়। মাটিতে তো জল আছেই, যাতে বেশী জল না থাকে এমনি ক'রে মাটিটাকে ওলোট-পালোট ক'রে শুকিয়ে নিতে হয়।

তারপর মাটিতে পরিমাণ মত সিমেণ্ট মেশাতে হয়। মাটির পরিমাণ যা তার চেয়ে সিমেণ্টের পরিমাণ ঢের কম লাগে। হাতে ক'রে বা শুধু কোদালি দিয়ে এত মাটিতে সিমেণ্ট মেশানো সম্ভবপর নয়, তাই কলে সিমেণ্ট ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে হিসাব মত জল দিতে হয়। এর পর কলের লাঙ্গল দিয়ে মাটিটা ওলোট-পালোট ক'রে দিলেই মাটির সঙ্গে সিমেণ্ট মিশে যায়। মেশানো পুরোপুরি হ'য়ে গেলেই তার উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয় রোলার। রোলার দিলেই রাস্তাটি বেশ পালিশ ও ঝকঝকে হ'য়ে উঠে। সপ্তাহ খানেক পরেই সেই রাস্তা দিয়ে বাস্, ট্যাক্সি প্রভৃতি যান-বাহন চলাচল সুরু করে। রাস্তা পাথরের মত শক্ত হ'য়ে যায়। পিচের রাস্তা গ্রীষ্ম-কালে কি রকম নরম হ'য়ে যায় তা তোমরা প্রায় সকলেই দেখেছ, কিন্তু এই রাস্তা সকল ঋতুতেই একরকম থাকে।

রোলার চালাবার পর পাথরের মত শক্ত হ'য়ে রাস্তাটি ঝকঝকে পালিশ হ'য়ে গেছে।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, এক দিনে আধ মাইল রাস্তা এমনি ক'রে তৈরি করা যায় রাস্তার ধূলা আর মাটি জমিয়ে। লোকের ধারণা পূর্ব্বে এই ছিল যে, বালি না মেশালে সিমেণ্ট ভাল জমে না, অথবা খুব পোক্ত হয় না, কিন্তু প্রকৃটর শুধু পথের ধূলাকেও পাথরে পরিণত ক'রে দেখিয়েছেন যে এ ধারণা ভুল।

নদীর জল উপচে উঠে যাতে শস্যক্ষেত্র না ডুবিয়ে দেয় এই জন্য আমাদের দেশেও যেমন বহু জায়গায় মাটির বাঁধ তৈরি করা হয়েছে, আমেরিকাতেও তেমনি খুব বড় বড় বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। কাঁচা বাঁধ প্রত্যেক বছরই খানিক খানিক নষ্ট হয়, মাঝে মাঝে ভেঙে গিয়ে প্রবল বেগে জল ঢুকে শত শত বর্গমাইল জমি ডুবিয়ে সব ফসল নষ্ট ক'রে

দেয়। প্রত্যেক বছরই রাশি রাশি টাকা ব্যয় ক'রে এই সব বাঁধ বাঁধতে হয় বটে, কিন্তু এর নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। প্রক্টর এই বাঁধ তৈরি করতে গিয়ে প্রথমে তাঁর নিজের উদ্ভাবিত প্রণালী প্রয়োগ ক'রে জয়যুক্ত হন। মাটির নরম বাঁধ পাথর হ'য়ে নদীর জলোচ্ছ্বাসের প্রচণ্ড ধাক্কা বুক দিয়ে প্রতিহত করছে।

তোমরা যখন বড় হবে তখন হয়তো আমাদের দেশেও এই প্রণালীতে বাঁধ তৈরি হবে,—জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে রাস্তা তৈরি হবে, সহরের সঙ্গে পল্লীগ্রামের যোগাযোগ এখনকার চেয়েও ঢের বেশী হবে।

বাদল-শিশু নাচে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

কাজল আকাশ জুড়ে' জুড়ে' মেঘ মাদলের সাথে,
বাদল-শিশু তালে তালে নাচের নেশায় মাতে।

নাচ্‌ছে তা'রা জলের চাদর জড়িয়ে গায়ে গায়ে,
'টাপুর টুপুর' নূপুর যেন বাজ্‌ছে পায়ে পায়ে।
কেউ বা সুখে ডিগ্‌বাজি খায়, কর্‌ছে ছুটোছুটি,
কেউ বা জলের ধারার সাথে হেসেই লুটোপুটি।

মেঘের দেশের ঝাপ্‌সা পুরী ভেদ করেছে তা'রা,
খিল্‌খিলিয়ে উঠ্‌ছে হেসে সকল বাঁধন-হারা।
সঙ্গী হোলো উতল বাতাস হঠাৎ এলো উড়ি'—
তাহার সনে বাদল-শিশু খেলছে লুকোচুরি।
এই ধরণীর শ্যামল বুকে ঝাঁপিয়ে তা'রা পড়ে'—
'ঝরঝরানির' গান গেয়ে যায় সারা দিবস ধরে'।
সৃষ্টি-ছাড়া শিশুর দলে বৃষ্টিধারার সনে,
আকুল হয়ে আকাশ বেয়ে ঝর্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।
গুরুগুরু বাজ্‌না যতই বাজ্‌ছে মেঘে মেঘে,
বাদল-শিশুর অথই পুলক উঠ্‌ছে ততই জেগে।

মৃত্যু—নিয়তি

শ্রীমালতী দাশগুপ্তা

একবার—

এক গভীর বনের পথে তিনজন দস্যু যাচ্ছিল ডাকাতি করতে।

তা'রা দেখতে পেল, এক সন্ন্যাসী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের দিকে আসছেন।

তাঁকে ওভাবে ছুটতে দেখে দস্যু তিনজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী তাদের সামনে এলে, তা'রা তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি এমন ধারা ছুটছেন কেন? কে আপনাকে তাড়া করছে?"

সন্ন্যাসী সন্ত্রস্তভাবে বললেন—"মৃত্যু!"

দস্যুরা তো প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর একজন জিজ্ঞেস করলে, "মৃত্যু আপনাকে তাড়া করেছে? সে কি?······কোথায় মৃত্যু আমাদের একবার দেখান তো।"

সন্ন্যাসী তাদের সঙ্গে ক'রে খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে একটা জঙ্গলা জায়গা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"ঐ যে!"—তারপরেই, "আমি চললাম" ব'লে আবার তেমনি বনপথে হন্‌হন্ ক'রে ছুটতে সুরু করলেন।

দস্যু তিনজন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় লক্ষ্য ক'রে দেখলে—একটা গর্ত্তের মধ্যে মুখখোলা এক ঘড়া মোহর ঝক্‌ঝক করছে! তার জৌলুসে চারদিক আলোময় হয়ে গেছে। "তাই তো ···," দস্যুরা সহসা অবাক হ'য়ে যায়; তারপর,—"এই মোহর তোমার মৃত্যু!" ব'লে তিনজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে—তাচ্ছিল্যের হাসি!

তাদের আচম্‌কা ভাব কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। ঘড়াটা তুলে নিয়ে সুবিধা মত জায়গায় ব'সে তিনজনে তার বিলি-ব্যবস্থায় মনোযোগ দেয়। কিন্তু তিনজনেরই মনের মধ্যে একই প্রশ্ন তোলপাড় করতে থাকে—কি ক'রে অপর দুইজনকে ফাঁকি দিয়ে সে একাই ঘড়াসুদ্ধ মোহরগুলি আত্মসাৎ করতে পারে।

তাদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করে, "দেখ, আজ আমাদের ভারি সুদিন বলতে হবে। ভাগাভাগি করার আগে আজ একটু প্রাণ ভ'রে ফুর্ত্তি করা যাক্।"

"যা বলেছো—" আর দুজন তার কথায় সায় দেয়। তখন তা'রা ঠিক করলে দু'জন ঘড়ার পাহারায় থাকবে, আর বাকী একজন একটা মোহর নিয়ে সহরে যাবে, সেটা ভাঙ্গিয়ে সকলের জন্য নানা জিনিষপত্তর আর ভালো ভালো সব খাবার নিয়ে আসবে। সেই ব্যবস্থা মত একজন একটা মোহর নিয়ে চললো সহরের পানে।······ যে সহরে চললো, তার মনে পাপবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠলো। সে ভাবলে, নিজে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে বাকী খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আনতে হবে, যাতে তা খাওয়া মাত্র ওরা দুজনেই মারা পড়ে।

এদিকে, পাহারাদার দু'জনেও বনের মধ্যে ব'সে ব'সে পরামর্শ করলো যে, ঐ লোকটা সহর থেকে খাবার নিয়ে ফিরে আসা মাত্রই তাকে খুন ক'রে ফেলতে হবে। তারপর, তা'রা দুজনে সমস্ত ধনরত্ন ধীরেসুস্থে দুভাগ ক'রে নেবে।

খানিক পরে লোকটা খাবার নিয়ে এলো। আসামাত্রই ওরা দুজন তা'কে ধরে' খুন ক'রে ফেললো। দু'জনেই খুশী—যাক্, আপদ চুকলো। এবার নিশ্চিন্ত মনে খাবারগুলি সাবাড় ক'রে মোহর ভাগ করা যাবে।······কিন্তু সেই বিষ-মাখানো খাবার মুখে দিতে না দিতেই তাদের সারা গায়ে বিষের ক্রিয়া সুরু হলো। দেখতে দেখতে মৃত্যু এসে তাদের অধিকার করলো। একটু পরেই তাদের অসাড় দেহ ঘড়ার পাশে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

নিয়তিকে কেউ আট্‌কাতে পারে না। অর্থের মধ্যে সন্ন্যাসী যে অনর্থের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, তা-ই নিয়তির বশে তিন দস্যুর অপমৃত্যু ডেকে আনলো।

[মূল গল্পটি ইতালীয়।]

লঙ্কাপারা পাহাড়ে

লীনা রায়

গেল বার পূজোর ছুটিতে সবাই আমরা ভুটানের সীমান্তে এক অখ্যাত জায়গায় গিয়েছিলাম।

যদিও সেখানে পূজোয় কোনই আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর সে পূজো বড় সুন্দর লেগেছিল। প্রথমটায় ভেবেছিলাম যে, লোক এখানে কি ক'রে থাকে,—চারধারে পাহাড়, আর চা-এর বাগান, আর ঘন জঙ্গল! কিন্তু কিছুদিন বাদে এই গাছপালা, পাহাড়ের মাঝে কি যে খুঁজে পেলাম, ঠিক বলতে পারি না। যখনই মনে হতো যে এ জায়গা ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে, তখনই আমার খুব কষ্ট হতো। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য কি এক অজানা আকর্ষণে আমাকে টেনেছিল।

একদিনের কথা বলি। সেদিন ছিল ৫ই নভেম্বর। তা'র দু'তিন দিন আগে গেছে পূর্ণিমা। সকাল হতেই সেদিন মেঘ মেঘ করেছিল। দুপুরে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেল। বিকেলে আবার মেঘ করল। আমরা সবাই ভাবলাম, আজ রাত্রে এমন একটা কিছু করলে মন্দ হয় না, যা আমাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকে। কি করা যায় এই নিয়ে মহা আলোচনা সুরু হলো। আমি বললাম, আজ রাতে আমরা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের খোঁজে বেরুব। চল যাই সবাই মিলে আজ রাতে লঙ্কাপারা পাহাড়ে। কথাটা সবারই মনে ধরল। ঠিক হলো যে রাতে খাওয়ার পর আমরা সবাই মোটর করে পাহাড়ে যাবো। সবাইর খুব স্ফূর্ত্তি—রাতে পাহাড়ে উঠবে। দিনে ত সবাই দেখি-ই, কিন্তু রাতে দেখা সচরাচর কারো ভাগ্যে ঘটে উঠে না।

সন্ধ্যার পরে অল্প অল্প চাঁদ উঠেছিল, মেঘও করেছিল, বাইরে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছিল। আমরা রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় খেয়েদেয়ে রওনা হলাম। পথের দু'ধারের দৃশ্য খুব সুন্দর লাগছিল। অল্প জ্যোৎস্নায় আমরা দেখতে পেলাম, রাস্তার দুধারে খাদ আর চা-এর কারখানা। রাস্তা একবারে নিঝুম। দু'একটা খরগোস মাঝে মাঝে রাস্তা পার হচ্ছিল। আমাদের ওখান হতে লঙ্কাপারা ৯ মাইল দূর। রাত্রি সোয়া দশটার সময় আমরা লঙ্কাপারার হাটে এসে পৌছলাম,—সেখান থেকে ডাকবাংলোয়। কাঠের

দোতলা, চারধারে খোলা মাঠ আর ফুলের বাগান। বাংলোর পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠার আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে।

আমাদের পাহাড়ে উঠবার ইচ্ছা শুনে বাংলোর চৌকিদার আমাদের যেতে বারণ করল। সে বল্‌ল, চার পাঁচদিন আগে এক পাহাড়ি সামনের কমলা বাগানে একটা বাঘ মেরেছে। আর কিছুক্ষণ বাদে নেকড়ে বাঘ বাংলোর সাম্‌নেই আসবে।

আমাদের সাথে অনেক লোক ছিল, তাই ভয় বিশেষ ছিল না। একজন গাইড্‌ নিয়ে আমরা পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। কিছুটা উঠার পর সবই আবছা হয়ে এল। জামা কাপড় সব ভিজে গেল। অস্পষ্ট আলোকে রাস্তা বেশ দেখা যাচ্ছিল। এই দুর্গম পথে চলতে চলতে আনন্দে আমরা সবাই মেতে উঠলাম। নীচে তাকিয়ে দেখি কোথায় বা ডাকবাংলো আর কোথায় বা নেমে যাবার পথ,—সব মেঘে একাকার হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা একটা নদীর ধারে পৌঁছলাম। নদীতে জল নেই, জ্যোৎস্নার ম্লান আলোতে বালু চিক্‌চিক্‌ করছিল। নদী পার হবার সময় দেখি মরামানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের কঙ্কাল বালুর উপর পড়ে আছে, চাঁদের আলোতে কঙ্কালগুলোও চিক্‌চিক্‌ করছিল।

জলের জায়গায় কঙ্কাল দেখে আমাদের ত চক্ষুস্থির। গাইড্‌ তখন বল্‌ল যে, ভুটানীরা যখন দল বেঁধে পাহাড়ে গাছ কাটতে আসে, তখন বাঙ্গালী, কি সাহেব, কি অন্য কোন লোক দেখলে পর ওদের খুন করে জলে ভাসিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে কোন কঙ্কালের উপর পা লেগে আমাদের জুতো ঠক্‌ করে উঠছিল, আর আমাদের শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। আতঙ্কে ও ভয়ে শরীর শিরশির ক'রে উঠছিল। মনে হচ্ছিল ভুটানীরা বুঝি দল বেঁধে আমাদের পেছনেই আসছে,—হয়ত বা আড়ালে দাঁড়িয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হাস্‌ছে। ভয়ে ও ক্লান্তিতে পা যেন আর উঠছিল না। রাত গভীর হওয়ায় চারদিক থেকে বন্য জন্তুর আওয়াজ ও নানা রকম শব্দ কানে আসতে লাগ্‌ল। তখন মনে হচ্ছিল নামতে পারলেই যেন বাঁচি। হঠাৎ গাইড্‌ বলে উঠ্‌ল,—এই যে কমলা বাগান। তাকিয়ে দেখি সেটাকে কমলা বাগান না বলে কমলা বন বললেই ঠিক হতো। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল কমলা গাছ। ছোট ছোট কমলা হয়েছে, তখনও কাঁচা। এত নিবিড় বন যে মনে হচ্ছিল দলে দলে নেকড়ে বা ভুটানীরা বুঝি বন থেকে আমাদের দিকেই তেড়ে আস্‌ছে। ক্রমেই জন্তু-জানোয়ারের ডাক নিকটতর ও

স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই আমরা প্রায় দৌড়িয়ে—নীচে নেমে—মোটরে উঠে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বাজে।

ফিরবার পথে রাস্তায় একদল ভুটানীর সাথে দেখা হলো। ওদের সবাইর হাতে ভোঁজালী। মোটর দেখে থম্‌কে দাঁড়াল।

এখনও লঙ্কাপারার কথা যখন ভাবি, শরীর ভয়ে শিউরে উঠে। সেই কঙ্কালের দৃশ্য এখনও ছবির মত চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে।

ভাদর করেছে নতুন কথিকা সুরু

শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ভাদর প্রভাতে বাদলের ধারা ঝর ঝর নাহি ঝরে,
সোনালী রবির উজল কিরণে আকাশ আঁচল ভরে।
মেদুর মেঘের মধুর চাউনী হারায়ে গিয়াছে হায় ;
কোথা তার ছায়া ? মায়া পড়ে আছে শান্ত তমাল ছায়।
বনস্পতির তাণ্ডব, ভাঙ্গা বজরের গুরু গুরু
থেমে গেছে আজ, ভাদর করেছে নতুন কথিকা সুরু।
আকাশের নীলে সাদা বলাকারা মধুর মালিকা গাঁথে ;
তারই ছায়া কাঁপে বিলের হৃদয়ে শান্ত ভাদর প্রাতে।
ফুলে ফুলে আজ কুঞ্জ ভ'রেছে, জেগেছে সুরভি বায়—
পথিক ভ্রমর চপল চরণে ফুলবনে ভেসে যায়।
চাঁদ জাগে রাত, মুগ্ধ হৃদয় ফোটা কেতকীর গানে ;
পথভোলা ঐ চপল বাতাস সুর তার বয়ে আনে।
দিকে দিকে ঐ নব জাগরণ, ভাদর ছড়াল প্রীতি,
ওরে শিশুদল, তোদের ডাকিছে গ্রামের শ্যামল বীথি।
চল্ চল্ গ্রামে ফিরে চল্ তোরা, ফিরে চল্ আজি সবে ;
যোগ দিবি চল্ পল্লীর ঐ ভাদরের উৎসবে।

মেথরের ছেলে বট্রোলালের কৃতিত্ব

মানুষ অধ্যবসায় এবং চেষ্টা দ্বারা যে অসাধ্য সাধন করতে পারে, সে কথা তোমরা অনেকেই শুধু যে শুনেছো তা নয়, তার অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনীও তোমাদের পড়ার বইয়ে প'ড়ে থাকবে। এখানে তোমাদের ঐ রকম আর একটী সত্যি কাহিনীই বলবো।

এ বছরে ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বট্রোলাল ডোমার ব'লে একটী ছেলে ঢাকার ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। বট্রোলাল মেথরের ছেলে এবং সে নিজেও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীতে অতি অল্প মাইনেতে নর্দ্দমা পরিষ্কার এবং রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার কাজ ক'রে থাকে। পড়ার সময়েও সে একাজে নিযুক্ত ছিল এবং এখনও আছে। সকাল বেলায় সে ঢাকা শহরের রাস্তা-ঘাট ও ড্রেন পরিষ্কার করে এবং দুপুরে স্কুলে ও রাত্রে বাড়ীতে পড়াশোনা করে। গরীব ব'লে কাজ না করলে তা'র সংসার চলে না। অথচ বিদ্যা অর্জ্জনের প্রতি তা'র অতিরিক্ত উৎসাহের জন্য পড়াশোনাও ছাড়তে পারে না। সুতরাং অত্যধিক পরিশ্রম ক'রেও সে এই দু'টো কাজই ক'রে গেছে এবং তা'র এই উদ্যম সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছে।
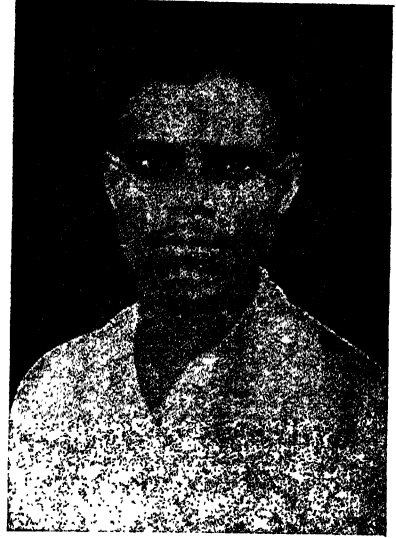
বট্রোলালের বর্ত্তমান বয়স কুড়ি বছর। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশের পক্ষে এ বয়সটা একটু বেশী ব'লে তোমরা মনে করতে পারো, কিন্তু বরাবর দারিদ্র্য ও বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বট্রোলাল লেখাপড়া শিখেছে। আর তা ছাড়া বট্রোলাল লেখাপড়া শিখতে আরম্ভই করেছে একটু বেশী বয়সে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটী ধাঙ্গড় ও মেথরদের ছেলেদের জন্য যে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে সেইখানেই হয় বট্রোলালের বর্ণপরিচয়।

ফটো : মডার্ণ ইলেক্ট্রো ষ্টুডিও : পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

মহাত্মা গান্ধী বট্রোলালের সাফল্যের সংবাদ পেয়ে তা'কে আশীর্ব্বাদ করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি আশা করেন, এই যুবক পূর্ব্বের মতই লেখাপড়া ও স্বজাতি-ব্যবসায়ের প্রতি সম-পরিমাণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করবে।

বট্রোলাল সম্প্রতি ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের আই. এ. শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছে। তা'র এই নূতন উদ্যমও ভগবান নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

খেলাধূলা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ

লীগ-শীর্ষে ইষ্ট বেঙ্গল দল

এবারকার মত কলিকাতার ফুটবল লীগ খেলা শেষ হয়ে গেছে, এ খবর তোমরা তো জানই। প্রথম বিভাগের লীগে ছিল ১৩টি টিম, খেলা হয়েছে ২৪টি। প্রথম শ্রেণীর ২৪টি খেলায় অপরাজিত থাকা অত্যন্ত দুরূহ, অসম্ভব বললেও চলে। তবু মাত্র ১টি খেলায় এবার ইষ্ট বেঙ্গল টিম হেরেছে, তাও মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে, আর ৩টি খেলায় ড্র করেছে, বাকী ২০টি খেলাতেই ইষ্ট বেঙ্গলের হয়েছে জয়। কাজেই ইষ্ট বেঙ্গলের লীগ চ্যাম্পিয়ন্ হওয়ার গৌরব লাভ সুসঙ্গত হয়েছে। বহুবার নিতান্তই বরাতের দোষে শুধু একটি পয়েণ্টের জন্য এই অসাধারণ গৌরব থেকে তা'রা বঞ্চিত হয়েছিল, এই জন্যই এবার খেলার সুরু থেকেই অপূর্ব্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখালেও শেষ অবধি যে তা'রা লীগে শীর্ষস্থান অধিকার করবে, এ সম্বন্ধে যে সন্দেহ একটুও ছিল না, তা নয়। শুধু গোলকিপারের অমার্জ্জনীয় ত্রুটিতেই মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে ইষ্ট বেঙ্গল একটা খেলায় হেরেছে, নইলে তা'রা এবার লীগে অপরাজিতই থাকত।

ইষ্ট বেঙ্গলের ক্যাপটেন সোমানার ক্রীড়া-নৈপুণ্যের তুলনা হয় না, তাঁরই সমকক্ষ খেলোয়াড় সুনীল ঘোষের সহযোগিতায় তিনি পর পর খেলায় তাঁর দলটিকে বিজয়-মণ্ডিত করতে পেরেছেন। গেল বছরে তিনি যেমন সকলের চেয়ে বেশী গোল দিয়েছিলেন, এবারেও তেমনি একলাই ২৯টি গোল দিয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। কলিকাতার কোন টিমে তাঁর মত সুদক্ষ সেণ্টার ফরোয়ার্ড নেই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

তোমাদের বোধ হয় এ কথাটা জানা আছে যে, ভারতীয় ফুটবল টিমগুলির মধ্যে কলিকাতার প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে সর্ব্বপ্রথম মহামেডান

স্পোর্টিং, তারপর মোহনবাগান এবং এবার ইষ্ট বেঙ্গল। আর কোনও ভারতীয় টিম এ সম্মানের অধিকারী হ'তে পারেনি। মহামেডান স্পোর্টিং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, তাদের হয়েছে ৪০ পয়েণ্ট, তা'রা হেরেছে মাত্র ১টি খেলায় মোহনবাগানের কাছে, কিন্তু ড্র বেশী করায় ইষ্ট বেঙ্গলের চেয়ে ৩ পয়েণ্ট কম হয়েছে। মোহনবাগান অধিকার করেছে তৃতীয় স্থান। তা'রা হেরেছে ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে দুটো খেলায়, আর মহামেডান স্পোর্টিংএর কাছে একটি খেলায়।

লীগ-বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল দল

বাম দিক হইতে প্রথম সারি—সুহাস চ্যাটার্জ্জি, টি. বোস, সুশীল চ্যাটার্জ্জি, এন. রায় ও এস. দত্ত।
দ্বিতীয় সারি—পি. চক্রবর্ত্তী, এফ্. সিংহ, খগেন সেন, এ. বোস্, আর. দে ও আমিন।
উপবিষ্ট—আর. মজুমদার, পি. দাশগুপ্ত, সোমানা (ক্যাপটেন), সুনীল ঘোষ ও গিয়াসুদ্দীন।
মাটিতে উপবিষ্ট—এন. মিত্র, আপ্পারাও এবং অমিতাভ মুখার্জ্জি।

তাদের পয়েণ্ট হয়েছে ৩৬। আর কোন টিম যে এদের কাছে ঘেঁসতে পারেনি তা তোমরা গেল মাসের লীগ-তালিকা থেকেই জানতে পেরেছ। এবার এই অপূর্ব্ব গৌরব লাভ করবার জন্য ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকেই নানা প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবকে যেমন অভিনন্দন জানাচ্ছেন, আমরাও তেমনি তাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আই. এফ্. এ. শিল্ড খেলা

সারা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই. এফ্. এ. শিল্ড খেলা—কলিকাতায় সুরু হয়েছে। মোট ৩৫টি টিম এবার এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে। এতগুলি টিমের মধ্যে ইষ্ট বেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও বাঙ্গালোর দলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে সকলের ধারণা। মনে হয়, শেষ অবধি এই চারটি দলের যে কোন একটি শিল্ড-বিজয়ী হওয়ার অপূর্ব্ব গৌরব লাভ করবে। খেলার কথা অবশ্য জোর ক'রে কিছু বলা যায় না, খুব শক্তিশালী দলও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দুর্ব্বল দলের কাছে পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। ইষ্ট বেঙ্গল যদি শিল্ড-বিজয়ী হ'তে পারে, তা হ'লে কৃতিত্বের দিক দিয়ে তা'রা মহামেডান স্পোর্টিংএর সমকক্ষ ব'লেই পরিগণিত হবে, কারণ লীগ ও শিল্ড একই বছরে জয় করা এক মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর কোনও ভারতীয় দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইউরোপীয় দলের মধ্যে ক্যালকাটা ও ড্যালহৌসি দলের জন্য সত্যই দুঃখ হয়। কয়েক বছর ধ'রেই এই দুটি দলের বিশেষ অবনতি ঘটেছে বটে; কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বল টিম নিয়েও আই. এফ্. এ. শিল্ড খেলায় ক্যালকাটা বরাবরই অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছে খুব শক্তিশালী টিমের বিরুদ্ধেও। লীগে তা'রা যাই খেলুক না কেন, শিল্ড খেলায় তা'রা সহজে পরাজয় মানেনি কোন দিন, এই জন্য তাদের বলা হয় "শিল্ড ফাইটারস্"। এবার কিন্তু প্রথম খেলাতেই তাদের বিদায় নিতে হয়েছে প্রতিযোগিতা থেকে। ড্যালহৌসিও কাত হয়েছে। বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে যে-সব সম্মিলিত দল যোগ দিয়েছে তাদের অনেকেই প্রথম খেলায়ই কাত হয়েছে, যেমন ২৪ পরগণা, বরিশাল, হাওড়া প্রভৃতি। খুব বড় খেলা একটাও এখনও হয়নি, সুতরাং সে-সব খেলার আলোচনা তোমরা পরের মাসে পড়তে পাবে।

জানবার মত কথা

শ্রীঅরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্ভুত অস্ত্রচিকিৎসা

নিউইয়র্ক হইতে এক অসম্ভব রকমের অস্ত্রচিকিৎসার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সতের বৎসর বয়স্ক এক যুবক যুদ্ধের কার্য্য করিত। সে একদিন ভীষণভাবে ছুরিকাহত হয় এবং ছুরির ফলা তাহার হৃদ্পিণ্ড ভেদ করে। অস্ত্রচিকিৎসকেরা তাহার বুকের তিনটি পাঁজরা কাটিয়া হৃদ্পিণ্ডটিতে সাতটি সেলাই করেন। হৃদ্পিণ্ড হইতে যে রক্ত ফিন্কি দিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহা পরে রোগীর বাহুর শিরায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। এই কঠিন অস্ত্রোপচারের ফলে যুবকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে।

গোঁফ

অনেকেই গোঁফকে অনাবশ্যক যন্ত্রণা মনে করিয়া থাকেন। ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া সযত্নে দাড়ি-গোঁফ নির্ম্মূল করা আজকাল ভদ্র-সম্প্রদায়ের প্রাতঃকৃত্যের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোঁফ আমাদের অনেক উপকারে লাগে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার খনিতে যাহারা কাজ করে, দেখা গিয়াছে যে, কয়লার অতিসূক্ষ্ম কণা তাহাদের নাকের ভিতর দিয়া গিয়া সিলিকোসিস্ (Silicosis) নামে এক ভীষণ ব্যাধির সৃষ্টি করে। এ পর্য্যন্ত এই রোগের কোন চিকিৎসাই বাহির হয় নাই। বহু মজুর এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে মারা যায়। চিকিৎসকগণ অনেক গবেষণা করিয়া মজুরদের বড় বড় ঝাঁকড়া গোঁফ রাখিতে পরামর্শ দিয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ গোঁফ রাখার ফলে কোনরূপ সূক্ষ্ম কণা নাকের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, গোঁফ রাখার ফলে সেখানে সিলিকোসিস্ রোগ বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

সম্পাদকের নিবেদন

গত মাসে শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামক একজন লেখকের "মা-পো" নামে একটি গল্পের অর্দ্ধেকটা শিশুসাথীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাকীটুকু এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু জানিতে পারিলাম, "মা-পো" গল্পটি ১৩৪৫ সনের চৈত্র সংখ্যার 'রামধনু'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর মহাশয়ের "লা-শিলারিও" গল্পের নকল; সুধু স্পেনযুদ্ধের স্থানে চীনযুদ্ধ করিয়া সামান্য কাটছাঁট করা হইয়াছে। এজন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। আশা করি, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রবাবু, আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ, এবং 'রামধনু'র সম্পাদক মহাশয় আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জ্জনা করিবেন। "মা-পো" গল্পের অবশিষ্টাংশ আর প্রকাশিত হইবে না।

গল্প-প্রতিযোগিতার ফল

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯]

গ্রাহিকাদের মধ্যে—

প্রথম—কুমারী তপতী দাম (গ্রাঃ নং ১৬৯৫৩)

দ্বিতীয়—কুমারী গৌরী ব্যানার্জ্জি (গ্রাঃ নং ২০২৬৬)

গ্রাহকদের মধ্যে—

প্রথম—শ্রীঅজয়কুমার মণ্ডল (গ্রাঃ নং ২২ Com.)

দ্বিতীয়—শ্রীমিলনকৃষ্ণ দত্ত (গ্রাঃ নং ২০২১৯)

চিঠির ধাঁধা

এই হেঁয়ালী-ভরা চিঠিখানা তোমরা পড়। বড় অক্ষরে ছাপান শব্দগুলির যায়গায় এমন শব্দ বসাও যাহা সকলেই বুঝিতে পারে। ১২ই ভাদ্রের মধ্যে তোমার উত্তর আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিও।

প্রিয় **যুক্তপ্রদেশের তীর্থস্থান,—**

এবৎসর শিশুসাথীর **ইতিহাসে খ্যাত সাহেব** দেওয়া হয়নি। তাই শিশুসাথী **একটি শহর**। আমার বাবার নাম **একটি তীর্থস্থানকে দু'ভাগ ক'রে মাঝে কাস্তে বসিয়ে দিলে যা হয় তাই**। তিনি **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পপূর্ণ নগরে** বদলী হয়েছেন। বেশ্ ভাল জায়গা নয় কি? কাল **রাশিয়ার হ্রদে** খবর পেলাম। আমরা এখন **যে শহর খ্যাতি হরণ করে সেখানেই** থাকবো। পূর্ব্বে ত জানই, আমরা **যে শহরের ইংরেজী নামের অর্থ 'আমার মানুষেরা গান করে' সেখানে** থাকতাম। কাকা এখন আছেন **রাণীর দেশে,** আর দাদা থাকেন **যেখানকার সাগরে হাঁস থাকে**। শুনেছি তাঁরা **কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রে** যাবেন। অথবা **যে নগর মুক্ত সেখানেও** যেতে পারেন। ভাল কথা, আমাদের দেশের বাড়ীর একটি—**যে বাংলা শব্দের প্রথম অক্ষর কেটে নিলে, যা বাকী থাকে সেটি বাংলায় লেখা ইংরেজী শব্দ— ঐ ইংরেজী শব্দের মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ বাংলা শব্দটি**—পড়ে গেছে। দেশের বাড়ীতে গেল বছরের শিশুসাথীগুলো এক বাণ্ডিল পুরাণো কাগজের নীচে **একটি শহর** আছে। ইতি—

তোমারই—**ভারতের স্বাধীন রাজ্য**

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। **পদ্মফুল**। ২। **প্রতিমা**। ৩। **গঙ্গা**

উত্তরদাতাদিগের নাম

অঞ্জু, মঞ্জু, দীপু ও শিবু, ছাতক; কুমারী রাধারাণী বসু, বারিপদা; রবি, নামু, বিমু, ডলু, মাঞ্জু, বাবলু, পরিমল, নন্দিতা ও বলদেব, লাহোর; ভগবানশরণ ও গোবিন্দদাস ধর, নবরায় লেন, ঢাকা; আবদুস সত্তর, কৃষ্ণমোহন আচার্য্য ও মনোহর আলী, গালিমপুর; হীরেন্দ্রনাথ রায়, গৌরচন্দ্র বিশ্বাস, দীনেশ, শুকদেব, নিতাই, কানাই, বলাই, উপেন ও মতি, উলপুর; সত্যেন্দ্রনাথ বাগচী, হীরেন, নরেন, ভূষণ, রমেন, শাস্তি, নকুল, গৌর, কমলিনী, কুসুম, কল্যাণী, চপলা, বিমলা, জোতকুড়া; চিনু, পদ্মা, মুকুল, টুলটুল, ময়না, মন্টু, চাঁপা, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Sankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

একবিংশ বর্ষ আশ্বিন, ১৩৪৯ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরৎ বুঝি এল

শ্রীলীনা দত্ত-গুপ্তা

বর্ষা নাকি নিল বিদায়
এক বছরের তরে,—
সজল চোখে বলল হেসে—
আস্‌ছি আবার ঘুরে।
তাইতে বুঝি উজল শরৎ
ফিরে এল আজি,
দশভুজার পূজার লাগি
লয়ে ফুলের সাজি।

পূজার ছুটি এসে গেল
আনন্দ তাই ভারী
কেউ বা যাবে দেশ ভ্রমণে—
কেউ বা মামার বাড়ী।
কেউ বা যাবে সিমলা শিলং
হচ্ছে তারি জল্পনা,
কত রকম হচ্ছে হিসাব—
লিষ্টি কারো অল্প না।

আমরা সবে করব পূজা—দশভুজা মায়ে,
ভক্তিভরে দিব অর্ঘ্য মায়ের রাঙা পায়ে।

আধফোটা-কমল

শ্রীনির্ম্মলেন্দু সেনগুপ্ত

স্রোতোহীন বিলের জলে প্রকৃতির স্বচ্ছ প্রতিবিম্বের মত চাঁদের প্রথম আলোর পাথারে ফুটে রয়েছে জমিদার হরবিলাস ভাদুড়ীর বাড়ী। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন শুভ্র মেঘের মাঝে নিপুণ কারিকরের তৈরী একখানা তিন-মহল্লা বাড়ী।

তিন-মহল্লা বাড়ীর দ্বিতলের একখানা সাজানো বারান্দাতে হরবিলাস ভাদুড়ীর বড় ছেলে সমর ডেক-চেয়ারে শুয়ে রবি ঠাকুরের একখানা বই পড়তে পড়তে কয়েকটি ছত্রের উপর দৃষ্টিটা বদ্ধ ক'রে আপন মনেই ব'লে উঠল— "সত্যে মিথ্যায় মানুষের জীবন একরকম ভাবে কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়······।" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর আবার ব'লে উঠল—"বন্ধু অজিতের জীবনটাও এভাবেই গ'ড়ে উঠছিল; কিন্তু পাঁচজনে তা'কে আর গ'ড়ে তুলতে পারেনি। সে নিয়েছিল চির-শান্তির মাঝে আশ্রয়—যার সংস্থান ক'রে দিয়েছিল এ গ্রামের তিনজন নামজাদা লোক।" কথাটা শেষ হবার সাথেই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলল সমর; পরমুহূর্ত্তেই দীর্ঘ-নিশ্বাসের পরিবর্ত্তে মাথায় এল একটা একটানা চিন্তা।

ভোরের আলো আগুনের শিখার মত কেঁপে কেঁপে কালো মেঘের বুক ফেটে ঝ'রে পড়তে লাগল। তখনও গ্রামের কেউই পথে বের হয়নি; শুধু অজিত হন্-হন্ ক'রে ছুটছিল সমরদের বাড়ীর দিকে। সমর তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করতে আরম্ভ করেছে; হঠাৎ অজিতকে অমন ভাবে ছুটে আসতে দেখে বিস্ময়ের সাথে সমর জিজ্ঞেস করল—"কিরে অজিত, হঠাৎ এসময়ে ছুটে আসলি যে! কোন নূতন খবর আছে নাকি?"

সমরের প্রশ্নের উত্তরে অজিত বললে—"রতনগাঁয়ের অমর নামে যে ছেলেটি আমাদের 'তরুণ-সমিতি'র সভ্য, তা'র কাল থেকে কলেরা হয়েছে। বন্ধুদের দেখবে ব'লে আমার কাছে বারবার অনুরোধ করেছে তোদের ডেকে নিয়ে যেতে। চল ভাই, ওকে দেখে আসবি!"

অজিতের কথা শুনেই সমর মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় পরতে দোতালায় গেল। কিছুক্ষণ পরে যখন সে উপর থেকে নীচে নেমে আসছে, তখন হরবিলাসবাবুও সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সমরকে বের হতে দেখেই তিনি বললেন—"কোথায় যাচ্ছ সমর?"

—"রতনগাঁয়ের অমরকে দেখতে। ওর কাল থেকে কলেরা হয়েছে; তাই আমাদের ও দেখতে চায়।"

—"যে কেউ তোমাকে ডাকলে তুমি ছুটে চ'লে যাও; কেউ একটা কাজ করতে বললেই তুমি সেটা শিরোধার্য্য ক'রে নাও। আমি তোমাকে যে পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি সেদিকে একটি বারের জন্য পা বাড়াতে চাও না। উপরন্তু অন্যের কথায় পরিচালিত হয়ে তুমি যে আদর্শকে সম্মুখে রেখে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ—সেটা কি জান? সে আদর্শ ভুল। মরুভূমির মাঝে আলেয়া দেখতে পেয়ে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যেমন ছুটে যায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, তুমিও ঠিক সে রকম ভাবেই তোমার জীবনের গতি-পথকে চালিয়ে দিয়েছ। তবে এ ছুটোর মাঝে তফাৎ মাত্র এইটুকুন যে, পথিক মরুভূমির মাঝে থেকে ছুটে যায় আলেয়ার পানে—আর তুমি রাজার হালে থেকে ভুল আদর্শের পানে চলেছ ছুটে।"

পিতার কথা শুনবার পর কতক্ষণ মাথা হেট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সমর। মাথা তুলে পিতার পানে চেয়ে বললে—"আপনার কথাই আমি মাথা পেতে নেব; তবে আজ আমায় একটু ছুটি দিন্। আমি অমরকে দেখে আসব অজিতের সাথে।"

—"না……না……না……তুমি যেতে পারবে না ঐ অমরদের বাড়ী—যেতে পারবে না ঐ হতচ্ছাড়া অজিতের সাথে। ওদের সকলকে ব'লে দেবে যে আমার আদেশ, কাল থেকে আর তুমি ওদের সাথে মিশতে পারবে না—কথা বলতে পারবে না। ঐ অজিতের বাবাই ছিল এককালে আমার চির-শত্রু। আমার সাথে ঝগড়া ক'রেই রতন-গাঁয়ে আশ্রয় নিলে। তারপর থেকে সুরু হয়েছে মারামারি আর কাটাকাটি। আর তা ছাড়া তুমি জমিদারের ছেলে হয়ে যাবে ঐ এক ক্রোশ দূরে রতনগাঁয়ে—যেখানে আমার বাপদাদার আমল থেকে জমিদারী নিয়ে চলেছে মারামারি; আর যার মাটি লাল হয়ে উঠেছে ক্ষুধিত লেঠেলদের মাথা-ফাটা রক্তের চাপে।"

এই ব'লে হরবিলাসবাবু পায়চারী করতে করতে বেরিয়ে গেলেন কাছারী-বাড়ীর দিকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে অজিত শেষটায় সমরের ঘরে ঢুকে দেখে যে, সমর একটা সোফায় ব'সে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে। ধীরে ধীরে সমরের পেছনে গিয়ে অজিত ডাকল—"সমর! অমরকে দেখতে যাবি না।"

অজিতের কথায় সমর উঠে দাঁড়াল এবং চোখ দুটো ভাল ক'রে মুছে নিয়ে বললে—"চল, অমরকে দেখে আসি। যদি না যাই হয়ত বা ভাববে যে বড়লোক হওয়ার অহঙ্কারে আমি ওকে দেখতে যাইনি।" এই কথা ব'লে সমর অজিতকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রতনগাঁয়ের দিকে।

আধ ঘণ্টা পরে—

কাছারী-বাড়ী থেকে ফিরে এসে হরবিলাস-বাবু যখন দেখলেন যে, সমর বাড়ীতে নেই,—অজিতের সাথে বেরিয়ে গেছে, তখন ক্রুদ্ধ হয়ে নায়েব ব্রজেনবাবুকে ডেকে বললেন—"আপনি বহুদিন ধ'রেই আমার জমিদারীতে কাজ করছেন এবং আপনাকে আমি বিশ্বাস করি ব'লেই আজ আপনাকে এমন একটা কাজের ভার দিতে চাই—যার কথা আমি, আপনি আর দারোয়ান রামসিং ছাড়া আর কেউই না জানতে পারে। এ কাজ আপনাকে করতেই হবে। রতনগাঁয়ের শিবনাথ বাবু আর তা'র ছেলে আমার

বুকে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে—সে আগুনই আমাকে টেনে নিয়ে যাবে ধ্বংসের

পথে, যদি আপনার কাজের ফলটা শীতল বারি হয়ে আমার বুকের আগুন সত্যি সত্যি নিভিয়ে না দেয়।”

—“আজ্ঞে, সে কথা আর ভাবতে হবে না; এই ব্রজেন যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কাকপ্রাণীও জানতে পারবে না এই গোপন কথা।”

নায়েববাবুর কথায় হরবিলাসবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে নিম্নস্বরে গোপন কথা বললেন। সমস্ত কথার মাঝে শুধু এইটুকুন শুনা গেল যে তিনি বলছেন—“আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করতে হবে এই কাজ। পূজোটা এসে পড়েছে; তার পূর্ব্বে এই গোলমালের কাজ শেষ করতে চাই।”······

* * * *

সমর তখনও ডেক-চেয়ারে বসে কেবলই চিন্তা করছে ঘটনাটির কথাগুলো—পাথরে গড়া নিশ্চল মূর্ত্তির মত। পেছন থেকে হঠাৎ ছোট বোন দীপিকা এসে বললে—“দাদা, মা তোমায় ডাকছেন।”

বোনের কথায় হঠাৎ চিন্তার সূক্ষ্ম তারটা আচমকা ছিঁড়ে গেল। দীপিকার কথায় সমর ফিরে এল বাস্তব জগতে; অভিভূতের মত দীপিকার পেছন পেছন চললে মার কথা শুনতে।

* * * *

মিনিট দশেক পর—

সমর আবার ফিরে এল তা'র পূর্ব্বের স্থানে; তখন চাঁদের প্রথম আলো কেটে গিয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়ে তপ্ত ধরণীকে, মানবের ক্লান্ত হৃদয়কে, পশুর পরিশ্রান্ত দেহকে শীতল করবার জন্য আকুল হয়ে কোলাকুলি করতে চাইছে। তারই মাঝে সমর দেখলে—দূরে চ'লে গেছে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্যপথটি দিগন্তের কোল ঘেসে—যেখান দিয়ে যাতায়াত করলে দেখা যায়, তুলসী দাসের মাঠের বুকে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড বটগাছটি। ক্রমে ক্রমে সমরকে পুনরায় চিন্তার একটানা রেশটা টেনে নিয়ে গেল বটগাছের নীচে।······

•

তারপর একদিন চাঁদের এমনি আলোতে অজিত ঐ বটগাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ একটা আবছা কালো মূর্ত্তি অজিতের দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে গেল। থমকে

দাঁড়িয়ে পড়ল অজিত ; সাথে সাথে একটা পিচ্‌কারী ছোটবার শব্দ হ'ল—পর মুহূর্ত্তে এক ঝলক টাট্‌কা রক্ত এসে অজিতের সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলল।

—"উঃ......জল......জল"—একটা করুণ চীৎকার কানে এল নিকটবর্ত্তী একটা ঝোপ থেকে। অজিত দৌড়ে গিয়ে দেখে একটা লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে পিপাসায় কাতরাচ্ছে ; কিন্তু ধীরে ধীরে লোকটার জীবনের যবনিকার কালো পর্দ্দা নেমে এল। উপুড় হয়ে অজিত দেখলে ধারালো একটা ছোরা লোকটার পেটে আমূল বিঁধে গেছে। ছোরাটা টেনে তুলবার সাথে সাথেই লোকটা ম'রে মুখ গুজে পড়ে রইল—আর অজিত মৃন্ময় মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

নিয়তির পরিহাসই হোক আর জমিদার হরবিলাস ভাদুড়ীর চক্রান্তেই হোক ঠিক সেই সময় দারোয়ান রামসিংএর আবির্ভাব হ'ল ভেল্কীর মত। তারপর হতভাগ্য, দুর্ব্বল, অত্যাচারিত ব্যক্তির ভাগ্যে যা লেখা থাকে, অজিতের ভাগ্যেও তাই হ'ল।

সারা গ্রামে প্রচারিত হয়েছে—"অজিতের বাবার চির-শত্রু নরহরি তালুকদার তুলসীদাসের মাঠে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। হত্যাকারী গ্রামের 'তরুণ-সমিতি'র নেতা অজিত।"

হৈচৈ আর হট্টগোলের সাথে সাথে এক মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা কেউই লক্ষ্য করেনি ; কিন্তু চমকে দিলে যখন থানার থেকে ওয়ারেণ্ট বের ক'রেও এক মাসের মধ্যে ধরতে পারল না অজিতকে। তখন জমিদার হরবিলাস ভাদুড়ীর প্ররোচনায় থানা থেকেই পুরস্কার ঘোষণা হল।

কিন্তু অজিত কাউকে পুরস্কার গ্রহণ করবার সময় না দিয়েই ফিরে গেল তুলসীদাসের মাঠে—যেখানে নিহত হয়েছিল নরহরি তালুকদার। তারপর টেনে

দিলে নিজের হাতে নিজের জীবন-খাতার পাতার মাঝে এক পোঁচ কালির টান—অর্থাৎ অজিত আত্মহত্যা করলে। শুধু শেষ স্মৃতিটুকুন রেখে গেছে সমরের কাছে চিঠি লিখে—সেটা পাওয়া গেছে তুলসীদাসেরই মাঠে।

প্রিয় বন্ধু সমর!

ওপারের ডাক এসেছে আমার; তাই চ'লে যাচ্ছি অমরদের সভার মাঝে। কিন্তু এবার ওপারের সভার মাঝে নগণ্য লোক হয়েই থাকতে চাই। এবার আর দলপতির কাছ দিয়েও যাব না।

তোমরা জোর ক'রে 'তরুণ-সমিতি'র দলপতি করেছিলে আমাকে; তারপর থেকেই আপ্রাণ খেটেছি 'তরুণ-সমিতি'র পেছনে—যাতে গ্রামের উন্নতি হয়, গরীবেরা সাহায্য পায় এবং উপবাসীরা আহার পায়। কিন্তু তা'কে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না। শুধু রেখে গেলাম শেষ কালিমাটুকু।

যদি পার আসছে পূজোয় 'তরুণ-সমিতি'র কালিমাটুকু ধুয়ে ফেলে পুনরায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা ক'রো—তাতে পাবে ঈশ্বরের আর গরীবের আশীর্ব্বাদ। জীবনের শেষ দিনে যে তোমার কাছে একবার যেতে পারলাম না এটা রইল একটা দুঃখ। ইতি—

তোমার বন্ধু অজিত

* * * * * *

চিন্তার মাঝে অজিতের চিঠির অক্ষরগুলো যেন করুণ একটা সুর বাজাচ্ছিল। চিন্তার জগৎ থেকে সমর ফিরে এল সত্যিকারের জগতে।

অদূরে শরতের স্নিগ্ধ বাতাসের সাথে নাটমন্দির থেকে ভেসে আসল পূজোর ঢাকের শব্দ।

দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সমরের গাল বেয়ে।

শস্যের শত্রু

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ

আজকাল ভারত সরকার থেকে আরম্ভ ক'রে বিশিষ্ট সকল লোকই বলছেন, Grow more food, grow more fruits ; অর্থাৎ আরও খাদ্য জন্মাও, আরও ফল জন্মাও। একথা তোমরাও খবরের কাগজে দেখছ এবং রোজই শুনছ। দেশে বর্ত্তমানে সত্যই খাদ্যের অভাব ঘটেছে অত্যন্ত বেশী ; সুতরাং আগের চেয়ে বেশী ফসল, বেশী ফলমূল না জন্মালে উপায় নেই।

সহরে তো আর কিছুই জন্মায় না, কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য সবই হয় পল্লীগ্রামে কৃষকের দ্বারা। দরিদ্র কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য যে ভয়ানক কষ্টসাধ্য তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু ফলমূল, শস্য যা-ও কিছু সে জন্মাতে পারে, তা'রও শত্রু আছে বহু। মানুষ যদি শত্রু হয়, তা'র হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, কিন্তু ছোট-বড় অসংখ্য রকমের পোকা-মাকড় যদি অদৃশ্যভাবে থেকে শত্রুতা সাধন করে, তা'হলে ফল, মূল ও শস্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাজারে যে বড় বড় করলা বিক্রী হয় তা দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি মুখরোচক ; কিন্তু যে লতায় এই করলা ফল জন্মায়, সেই লতার পাতা ও ডগা খেয়ে একেবারে মেরে ফেলবার জন্য যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা দিনরাত চেষ্টা করে, তাদের সর্ব্বনেশে আক্রমণ থেকে লতাটি রক্ষা করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তা শুধু চাষীই জানে। বহুগাছ ম'রে যায় ফল দেবার ঢের আগেই। যদি করলার এই গুপ্তশত্রু না থাকত, তাহলে যে ক্ষেতে যে পরিমাণ করলা জন্মায়, সেই ক্ষেতে তার চেয়ে অনেক বেশী করলা ফলতে পারত, আর লোকেও ঢের সস্তা দামে কিনতে পারত।

ধানগাছেরই কি শত্রু নেই ? মারাত্মক শত্রু আছে, কিন্তু সে শত্রুকে বিনাশ করবার কোন উপায় নেই। 'পামরী' পোকায় যখন ক্ষেতের পর ক্ষেতের সবুজ ধানের শীষ দুই-তিন দিনের মধ্যে খেয়ে শেষ ক'রে দেয়, নিরন্ন নিরুপায় চাষী তখন এটাকে দৈব-নিগ্রহ মনে ক'রে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ে।

শস্যের এ রকম মারাত্মক শত্রু যে কেবল আমাদের দেশেই অপ্রতিহত গতিতে বিচরণ করে তা নয়, পৃথিবীর সব দেশেই আছে। এর প্রতিকারের চেষ্টাও চলছে বহুদিন থেকে, কিন্তু তেমন সুফল পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ইয়েগার বহুদিন ধ'রে গবেষণা ক'রে এর প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কার করেছেন।

এই পন্থার মূল কথা হচ্ছে প্রাণিহত্যা। মানুষই তো আজকাল সারা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে মারা যাচ্ছে পোকামাকড়ের মত, সুতরাং পোকামাকড়ের প্রাণের তো কোন মূল্যই নেই। এই জাতীয় প্রাণিবধ করবার উদ্দেশ্যে ডক্টর ইয়েগার নানা রকমের বিষ খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ ক'রে দেখেছেন, যেমন আর্সেনিক, ফ্লুওরাইডস্, নিকোটিন, পাইরেথ্রাম, রোটেনোন। মানুষের পক্ষে যে বিষ মারাত্মক, সকল পোকার পক্ষে সেই বিষই মারাত্মক নাও হ'তে পারে, বহুদিনের পরীক্ষার ফলে ইয়েগার এই সিদ্ধান্তই করেছেন।

যে সব পোকাদ্বারা শস্যের ভয়ানক ক্ষতি হয় সেই সব পোকার শ্রেণীবিভাগ তিনি ক'রে দেখেছেন। অন্যূন দশ হাজার বিভিন্ন রকমের কীটের শ্রেণী দুনিয়াময় সকল দেশের শস্যক্ষেত্রে ও ফুল-ফলের বাগানে অবাধে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যে অনিষ্ট করে, তা'র পরিমাণ কত, তা শুনলে আমাদের তাক লেগে যায়। আমাদের দেশে কীট-পতঙ্গ-দ্বারা কত যে ক্ষতি হয় তার খবর কে রাখে? আমেরিকার বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ তিনি স্থির করেছেন। টাকার হিসাবে সে সংখ্যাটা দেখলে আমাদের চোখ কতটা বড় হয়ে উঠতে পারে একবার ভেবে দেখ দেখি। সংখ্যাটা হচ্ছে—৫০ কোটি ডলার! যদি এক ডলারে ২॥০ টাকা হয়, তবে এই সংখ্যাটিকে টাকায় নিয়ে একবার দেখ দেখি। আমরা কিন্তু এর ধারণাই করতে পারি না। ধারণা করতে পারি আর না পারি, আমাদের দেশের কৃষিসম্পদের বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ এর চেয়ে বিশেষ কম নয়।

ফ্রাঙ্কলিন্ ইয়েগার বহু রকমের পোকা খুব যত্নের সহিত অসংখ্য খাঁচায় পূরে রেখে এবং বেশ ভাল ভাল খাদ্য খেতে দিয়ে তাদের দেহের গঠন, হৃদ্‌যন্ত্র ইত্যাদি খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কখনো কখনো অস্ত্রোপচার ক'রে হৃদ্‌যন্ত্রের শক্তি নির্দ্ধারণ করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানাগারে এই জন্য খুব ছোট ছোট নানা রকমের যন্ত্র আছে, কোন যন্ত্রই দুই ইঞ্চির বেশী বড় নয়, এক ইঞ্চির ছোটও আছে ঢের। এসব যন্ত্র তাঁকে তৈরি করিয়ে নিতে হয়েছে।

সৈন্যবাহিনীর মত অসংখ্য কীটের বাহিনী শস্যক্ষেত্র ও বাগানে অভিযান করে, সুতরাং এদের একটি একটি ক'রে মারলে তো আর চলে না, এদের মারতে হয় ঝাঁক সুদ্ধ, কোটি কোটি একসঙ্গে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ইয়েগার সাহেব বিভিন্ন রকম কীটের হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা সুরু করেন। এই পরীক্ষা মোটেই সহজ নয়, মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড পরীক্ষা করার চেয়েও ঢের বেশী কঠিন। কীট অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, যে সব কীট শস্যের অনিষ্ট করে, তা'র মধ্যে সব চেয়ে বড়টির দৈর্ঘ্য দুই ইঞ্চির বেশী নয়। ঘরে যে সব কীট খাদ্যদ্রব্য দূষিত করে ও ব্যাধির জীবাণু বিস্তার করে, সে সব কীটও খুব যত্নের সহিত পুষে বিজ্ঞানাগারে নিয়েও তিনি পরীক্ষা করেছেন; যেমন আরস্যুলা; খুব চেষ্টা করলেও কোন বাড়ী থেকে আরস্যুলা সম্পূর্ণরূপে দূর করা খুবই দুরূহ।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন্ ইয়েগার আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে একটি আরস্যুলার দেহে অস্ত্রোপচার করছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি অটোম্যাটিক ক্যামেরা এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির উপর হৃদ্‌যন্ত্রের পরিবর্তনের ছবি তুলে নিচ্ছে।

ডক্টর ইয়েগার পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, প্রায় সকল শ্রেণীর কীটের হৃদ্‌যন্ত্রটি সঙ্কুচিত হওয়ার ঠিক পূর্ব্বেই হঠাৎ সম্প্রসারিত হয়; নানা রকমের বিষ খাদ্যে মিশিয়ে প্রয়োগ ক'রে তিনি দেখে বিস্মিত হয়েছেন যে, অনেক বিষই কীটের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এত ক্ষুদ্র প্রাণীর হৃদ্‌যন্ত্র যে কত ক্ষুদ্র তা আমরা ধারণা করতে পারি না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এর সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন বোঝবার উপায় নেই। ইয়েগার এই সব ক্ষুদ্র

কীটের উপর অস্ত্রোপচার ক'রে হৃদ্‌যন্ত্র বার করেছেন এবং তাজা রাখবার সমস্ত উপায় অবলম্বন ক'রে ক্রমাগত এর বিভিন্ন ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। এর ফলে জানা গেছে যে, নুনের জলের সঙ্গে নিকোটিন মিশিয়ে প্রয়োগ করলে কীটের হৃদ্‌যন্ত্র ক্রমাগত সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে অসাড় হয়ে পড়ে, এর ক্রিয়া যায় বন্ধ হয়ে, অর্থাৎ পোকাটি যায় ম'রে।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন্ ইয়েগার একটি কীটের দেহে ইন্‌জেক্‌শন করছেন।

শহরে অনেক বাড়ীতে "ফ্লিট্" আজকাল ব্যবহার করা হয়, তোমরা দেখেছ। এটাও হয়তো লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে, ঘরের মশা এতে ম'রে যায়। মশা মারা গেলেও এতে অন্যান্য শক্ত কীটের কিছুই হয় না। অথচ ধ্বংস করাও একান্ত প্রয়োজন। কাজেই সহজে ও সুলভ উপায়ে বাগানের ও শস্যক্ষেত্রের কীটের ঝাঁক ধ্বংস না করতে পারলে কৃষির অবস্থা যেমন আছে, তেমনি থেকে যায়; কোন উন্নতি তো হয়ই না, কোন কোন জায়গায় সর্ব্বনাশ ঘটে। সবুজ ক্ষেত যখন মরুভূমির দৃশ্য ধারণ করে এই কীটের উৎপাতে, তখন কৃষকের সর্ব্বনাশ হয় বই কি! আশা করা যায় যে, খুব শীঘ্রই ইয়েগারের গবেষণার ফলে সারা জগতে শস্যের অপার শ্রীবৃদ্ধি হবে। রোগের বীজাণু ধ্বংস করার নানা পন্থা আবিষ্কার ক'রে বিজ্ঞান-সাধকগণ যেমন মানবজাতির অশেষ কল্যাণ করেছেন, এই সব কীট ধ্বংস করার ব্যবস্থা ক'রেও ইয়েগার সেই মহা কল্যাণই সাধন করেছেন। কীটজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের চেষ্টা কি তুচ্ছ? কীট আমাদের কাছে তুচ্ছ বটে, কিন্তু কীট নিঃশব্দে, অদৃশ্যভাবে যে কাজ করে, তা'র ফলে আমাদের যে ক্ষতি হয়, তা'র পরিমাণ অতি বিশাল।

ঘুমোয় খোকন-সোণা

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি.

ঘুমোয় খোকন-সোণা !
স্বপন-পরী আশেপাশে করছে আনাগোনা।
কলের গাড়ী নিয়ে খোকা অনেক খেলা করে'
শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে হুটোপাটির পরে।

ঘুমোয় খোকা-মাণিক !
উঁকি মেরে চাঁদমালা তায় ছাখে খানিক খানিক।
খাওয়ার পরে খোকন-মণি পড়ল ঘুমে ঢুলে ;
বাতাস এসে দোল্ দিয়ে যায় কোঁকড়া কালো চুলে

ঘুমোয় আপন-ভোলা !
কত সাধের বইটা ছবির পাশেই আছে খোলা।
যে বইতে হাত দিলে কেউ কাটতে যেত' মাথা,
হাওয়ায় বুঝি যাচ্ছে ছিঁড়ে এখন তার-ই পাতা !

ঘুমোয় খোকা সুখে !
সাধ হয় যে চুমো খেতে ঢল্‌ঢলে তার মুখে।
দেবদূতেরি সরলতা মুখখানিতে মাখা,
এখনো যে ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি আঁকা।

ঘুমো' খোকন ঘুমো' !
ভাঙাব না ঘুমখানা তোর আল্‌গোছে খে' চুমো।
সাবধানেতে শুইয়ে দেব' মায়ের বুকের পাশে,—
খোকা ঘুমোয় অঘোরেতে—আকাশে চাঁদ হাসে।

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

অকূলের কূল

সাগর-তরঙ্গ আসিয়া শোঁ-শোঁ, ঝম্-ঝম্, দুরুম-দুরুম করিয়া প্রবাল দ্বীপের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সেই সাগরের অনন্ত কলরোল, জল আর মাটির সম্মিলিত চিৎকার। এ প্রচণ্ড শব্দেও সুরেশের চৈতন্যোদয়ের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মাথা তুলিয়াও দেখিল না,—যেন অসাড় নিঃস্পন্দ। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, সোনালী রৌদ্র চারিদিকে ঝিকমিক করিতেছে।

উচ্ছৃঙ্খল সাগর-তরঙ্গ খেলিতে খেলিতে কাঠখানিকে তীরে রাখিতে আসিয়া পিছলাইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল। ভূমি স্পর্শ করিয়া সুরেশের যেন কথঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল, সে কাঠটি রাখিয়া মাটি আকড়াইয়া মুখ গুজিয়া পড়িয়া রহিল। তরঙ্গের জল ফিরিবার মুখে তাহাকে সঙ্গে নিতে পারিল না।

স্থলভূমির জন্য সে মরিয়া হইয়া এত লড়াই করিয়াছে, কিন্তু এখন তাহার আর আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বা নিরানন্দ কিছুই নাই;—ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ, সংজ্ঞাহীন। ভূমির স্পর্শে সহজাত সংস্কারবশতঃ উঠিয়া দাঁড়াইল, তীরের দিকে টলিতে টলিতে চলিল, চক্ষু কিন্তু তখনও অর্দ্ধমুদ্রিত।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলিবার পর যেন ধীরে ধীরে চৈতন্যের সঞ্চার হইতে লাগিল। আবার ঢেউ আসিলে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। সুতরাং ডাঙ্গায় পৌছিতেই হইবে। কখনও পায়ে হাঁটিয়া, কখনও সাঁতার কাটিয়া আবার মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়া সে তীরে চলিল। বহুক্ষণ চলিবার পর ধপাস্ করিয়া বালুকার উপর বসিয়া পড়িল। একবার চাহিয়া দেখিল, ঢেউ এতদূর আসে কিনা।

স্থানটা নিরাপদ, ঢেউ আসিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া একটি প্রবালস্তূপে হেলান দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। দেহের সর্ব্বত্র, জামা-কাপড়ে পুরু হইয়া লবণ জমিয়াছে, মাথার চুলগুলি অসংযত। দেহ এত ক্লান্ত যে, আর নড়িবার শক্তি নাই, হাত-পা যেন শক্তিহীন, অক্ষম।

দুইটি দিন বিরাট শক্তিমান সাগরের সঙ্গে সে যুদ্ধ করিয়াছে। মানুষের সাধ্য নাই এ ভাবে আত্মরক্ষা করে। তাহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ইহাতে তাহার নিজের কোনও কৃতিত্ব নাই, নারায়ণ সুযোগ দিয়াছিলেন, সাগর পার হইবার জন্য ভেলা দিয়াছিলেন। ডাঙ্গায় উঠিয়াছে সহায়হীন, সঙ্গীহারা, শক্তিহীন। আর হয়তো পারিবে না, কোনমতে জীবনরক্ষার উপায় নাই।

চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দৃষ্টি যেন জ্যোতিহীন, ভাবহীন, অর্থহীন। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সাগর, সাগরের বুকে সূর্য্য অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি সূর্য্যালোকে লম্ফঝম্প করিতেছে। তরঙ্গ তাহাকে টানিয়া নিতে চায়, তাহাকে ডাকিতেছে, অস্পষ্ট ভাষায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।

প্রবালস্তূপ হইতে সে মাথা তুলিল। একটু বিশ্রাম করিয়া যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সম্মুখে একটি নারিকেলগাছ। মাথা ঘুরাইয়া দেখিল, ওদিকে একটি লতাগুল্মময় পাহাড়, পাহাড় হইতে একটি ঝরণা আসিয়া ছোট একটি হ্রদে পড়িয়াছে। এদিকে সমুদ্রতীরে অসংখ্য নারিকেল-গাছ, তাহার আশেপাশে গাছের নীচে দুই চারিটি নারিকেল পড়িয়া রহিয়াছে। এবার মনে আশার সঞ্চার হইল, হামাগুড়ি দিয়া নারিকেল ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।

একটি নারিকেল কুড়াইয়া লইয়া কোমরের বেল্ট হইতে ছুরী খুলিয়া লইয়া তাহার মাথায় একটি ছিদ্র করিল। সেই ছিদ্রে মুখ লাগাইয়া ধীরে ধীরে নারিকেলের জল পান করিল। এ জল যেন অমৃতের মত তাহার জীবন দান করিল। একটু বিশ্রাম করিয়া আরও একটি নারিকেল কুড়াইয়া লইয়া তাহার জলও পান করিল।

দুইটি নারিকেলের জল পান করিয়া ক্লান্তি বোধ হওয়ায় সে শুইয়া পড়িল এবং বহুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে মাটিতে পড়িয়া রহিল।

ওদিকে গাছের আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। সুরেশের আর পিপাসা নাই, দেহেও একটু শক্তি আসিয়াছে; কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে। একটি নারিকেল তুলিয়া লইয়া তাহাতে ছুরী লাগাইয়া গাছের সহিত গুঁতা মারিতেই নারিকেলটা দুই ফাঁক হইয়া গেল, তখন ভিতরের সাদা শাঁসটি ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাইতে লাগিল।

কতক্ষণ স্থিরভাবে থাকিবার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন দেহে যেন আবার শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। চাহিয়া দেখিল, দ্বীপটি পরিচিত বলিয়া মনে হয় কিনা; কিন্তু কোনদিন এ স্থান দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। আবার ভাবিল, সে যাহা দেখিতেছে তাহা কি সত্য না স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি বাস্তব পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের হাতে একটি চিমটি কাটিল, চুল ধরিয়া টানিল, চিন্তা করিয়া দেখিল ঠিক ঠিক ব্যথা পাইল কিনা এবং ব্যথাটি জাগ্রত অবস্থার ন্যায় মনে হয় কিনা। একটু ছুটিয়া দেখিল ঠিক মত দৌড়াইতে পারে কিনা, স্বপ্নে দৌড়াইতে গেলে পা পিছলাইয়া যায় ও মাটির স্পর্শ তো অনুভূত হয় না।

এ যে স্বপ্ন নয় এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া পূর্ব্বদিনের কথা ভাবিল। আবার দ্বীপটার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। এবার বুঝিতে পারিল, সে বঙ্গোপসাগরের একটি অজ্ঞাত দ্বীপে তরঙ্গাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং দ্বীপটি পরিচিত স্থান হইতে বহুদূরে।

তখন সে ভাবিল, এ দ্বীপে মানুষের বসতি আছে কিনা। যদি অসভ্য কোনও জাতি এ দ্বীপের অধিবাসী হয়, তবে কি উপায় হইবে। অথচ একটি আশ্রয়স্থলের দরকার, রাত্রি কাটাইবার জন্য। আর এই ভিজা কাপড় পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, নতুবা অসুখ হইতে পারে। একটু আগুনে গা সেঁকিয়া লইলে ভাল হয়। এসব করিতে হইলে তো লোকালয়ে যাইতে হয়। যদি লোকালয় এ দ্বীপে থাকে, তাহারা কোন্ প্রকৃতির লোক তাহা জানা নাই। এ রাত্রি এই বালুকার উপর শুইয়া কাটাইতেই হইবে, অন্য উপায় নাই।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর সুরেশ হ্রদ হইতে স্নান করিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া দুইটি নারিকেল কাটিয়া আহার সমাপন করিল। এখন তাহার সকল চিন্তার বড় চিন্তা জীবন রক্ষা করা, আর জীবন রক্ষা করিতে হইলে আহারে মনোযোগী না হইলে চলে না, সুতরাং আরও দুইটি নারিকেলের জল ও শাঁস খাইয়া লইল।

তখন দ্বীপটির সহিত পরিচিত হইবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। হাত দিয়া রৌদ্র ঢাকিয়া, একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কোথাও জনমানবের কোনও চিহ্ন নাই, একদিকে তরুগুল্মাচ্ছাদিত পাহাড়, অপরদিকে বিরাট সমুদ্র এবং মধ্যস্থলে একটি ছোট হ্রদ। জীবজন্তুর মধ্যে মাত্র সামুদ্রিক কাঁকড়া ব্যতীত কিছুই দেখা গেল না, অসভ্যদের পর্ণকুটীরেরও কোন চিহ্ন নাই।

সে নিজে ভাল নাবিক, লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল দ্বীপে কোনদিন কোনও জাহাজ আসে নাই। হ্রদটির মধ্যে জাহাজ ঢুকিবার পথ আছে বটে, কিন্তু জল এত অল্প বলিয়া মনে হইল যে, তাহাতে ছোটখাটো নৌকাই চলিতে পারে, জাহাজ চলিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হইল যে, এ দ্বীপ হইতে আর উদ্ধার পাওয়ার আশা দুরাশা। এ দ্বীপে জাহাজ আসিলে ঐ অতদূর থাকিবে, সেখান হইতে তীরে নৌকা পাঠাইবে, কিন্তু পারের যা অবস্থা ও ঢেউয়ের যা তোড় তাহাতে নৌকা তীরে ভিড়াইতে গেলে চূর্ণ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

এ দ্বীপে কেহ আসে না, আসিবার সম্ভাবনা নাই এবং কেহই বাস করে না বুঝিতে পারিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। আবার ভাবিল, যদি মানুষের বাস থাকে ও তাহারা হিংস্র না হয়,

তবে সহায়তার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু যদি অসভ্যদের বাস থাকে, তবে সমুদ্র তাহাকে যাহা করে নাই, উহারা তাহা সম্পন্ন করিবে।

রাত্রে শুইবার জন্য কতকগুলি নারিকেলের পাতা কাটিয়া স্থানটি ঘেরাও করিয়াছিল এবং কয়েকটি ডেগো বিছাইয়া লইয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল ছুরী দিয়া কাটিয়া, চাঁছিয়া ও বাছিয়া লইয়া একটি ছোট্ট পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিল। আরও কতকগুলি ডেগো কাটিয়া আনিয়া সেই কুটীরে বেড়া দিল, দরজা করিল ও শুইবার জন্য অতি যত্নে একটি মাচা প্রস্তুত করিল। দূর হইতে দেখিলে কুটীরটি অসভ্যদের বাড়ী মনে হয়, অথচ খুবই মজবুত হইল। চারিদিকের বেড়ায় ভাল করিয়া ঠেলিয়া দেখিল বেশ শক্ত।

রাত্রিতে থাকিবার জন্য ঘর প্রস্তুত করিয়া সুরেশ দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে রওনা হইল। তাহার হাতে একটি নারিকেলের ডেগোর লাঠি ও কোমরে ছুরী। কিছুদূর আসিয়া "এ হরি!" বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আশ্চর্য্য, নরম বালুর উপর মানুষের পায়ের দাগ!

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ভুল হইয়াছে কিনা। ভুল হয় নাই, এ মানুষেরই পায়ের দাগ। হয়তো রাত্রে যখন ঘুমাইয়াছিল তখন কেহ এখানে আসিয়াছিল, দাগ বেশ টাটকা। আবার ওদিকেও বেশ পরিষ্কার পায়ের দাগ। তবে এ দ্বীপ সম্পূর্ণভাবে জনমানবহীন নহে, আশার কথা। আবার ভয় আসিল, অসভ্য জাতিও তো হইতে পারে,—যাহারা লোভী, পরশ্রীকাতর সভ্য জগতের লোক দেখিলেই ক্ষেপিয়া যায়।

কে এ ব্যক্তি? অসভ্য হইলে তো অক্লেশে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিত, ইচ্ছা করিলে খুনও করিতে পারিত। তবে কে? হয়তো তাহারই মত কোনও আশ্রয়হীন হতভাগা, এখানে আসিয়া রহিয়াছে। তাহা হইলে এত নিকটে আসিয়াও কেন লুকাইল?

একজন সঙ্গী পাইলে উভয়ের পক্ষেই ভাল হইত, উভয়েই সুখী হইতে পারিত। চোরের মত তাহাকে এড়াইয়া পলায়ন করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

বাসের জন্য একটা নিরাপদ স্থানের সন্ধান করা দরকার। এ লোক ভাল না-ও হইতে পারে, রাত্রে আসিয়া আক্রমণও করিতে পারে। চলিতে চলিতে জঙ্গলে বাঁশঝাড় দেখিয়া তাহা হইতে একখানি লাঠি কাটিয়া হাতে লইয়া চলিল। যদি বিপদ হয় আত্মরক্ষা করা চলিবে।

অনেকটা অগ্রসর হইল, জঙ্গলের পাশে একটা প্রবালস্তূপে দাঁড়াইয়া সম্মুখের বনের দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ও কি ও? হঠাৎ ঝোঁপটার ভিতর হইতে একটি তোতাপাখী বিশ্রী শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া চলিল। পাখীটি যেন ভয় পাইয়াছে। যে ঝোপ হইতে পাখী উড়িয়াছে, তাহার লতাগুল্মও যেন একটু নড়িয়া উঠিল।

ঝোঁপটি নড়িতে দেখিয়া সুরেশের কি মনে হইল; সে এক লাফ দিয়া কতকটা নীচে একটা বালুর ঢিবির আড়ালে পড়িল।

'দুরুম' করিয়া একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল, ঝোঁপ হইতে সাদা ধোঁয়া বাহির হইল ও শাঁ করিয়া একটা গুলী চলিয়া গেল। আওয়াজটি দ্বীপের নানা স্থানে প্রতিধ্বনিত হইয়া কামানের গর্জ্জনের মত শুনা গেল। আর একটু দেরী হইলে সে গুলীর আঘাতে হয়তো পড়িয়া যাইত।

সুরেশ বালুকাস্তূপের আড়ালে যতদূর সম্ভব ছুটিয়া গেল। তারপর লুকাইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল, কে গুলী করিল। এবার তাহাকে গুলী করিতে হইলে আততায়ী আর ঝোঁপের মধ্য হইতে নিশানা করিতে পারিবে না, উন্মুক্ত স্থলে আসিতে হইবে। লাঠিটা শক্ত করিয়া বাগাইয়া ধরিল যদি লোকটা বাহিরে আসে।

সে আর আসিল না।

হ্রদের জলের হাঁসগুলি একবার কলরব করিল, আকাশে উড়িল, আবার জলের মধ্যে আসিয়া ভাসিতে লাগিল। সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল অতি সাবধানে—যেন অতর্কিত আক্রমণ না হয়। আর বিস্ময়ে অভিভূত হইল এই ভাবিয়া যে, কে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে চায়। তাহার মত অসহায় বিপন্নকে মারিয়া কাহার কি লাভ? (ক্রমশঃ)

পেট্রোল

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

তোমাদের মধ্যে যাদের মোটর গাড়ী আছে, তা'রা বেশ বুঝতে পারছ যে, আজকাল আর আগের মত আরাম ক'রে মোটরে চ'ড়ে হাওয়া খাওয়া যাচ্ছে না। এর কারণও তোমরা জান নিশ্চয়ই। পেট্রোলের অভাব। এই পেট্রোল সম্বন্ধে তোমাদের হু'চারটি কথা বলব; কি ক'রেই বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা মোটরের তেল তৈরী করছে, সে সম্বন্ধেও কিছু বলব।

পেট্রোল কি? পেট্রোল হচ্ছে এক রকম তেল। খনিজ পেট্রোলিয়াম হতে বিশোধন ক'রে এই তেল পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়ামের খনি নানা দেশে আছে। আমাদের দেশেও পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। ডিগবয়ের পেট্রোলিয়ামের খনি বিখ্যাত।

পেট্রোলিয়াম খনি মাটির নীচে থাকে। প্রথমে মাটির স্তর, তারপরে প্রস্তরের স্তর, প্রস্তরের পর গ্যাসের স্তর, তারপরে থাকে পেট্রোলিয়ামের স্তর। তারপর থাকে লোনা জলের স্তর।

মাটির নীচ হ'তে পেট্রোলিয়াম তোলবার জন্যে অনেক নীচ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তেলের স্তর পর্য্যন্ত একটি নল বসান হয়। নল বসাতেই প্রথমে গ্যাসের চাপে কতকটা তেল ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে আসে। যে পর্য্যন্ত গ্যাসের চাপ থাকে কেবল ততক্ষণই গ্যাস নিজ থেকে বের হয়। চাপ কমে গেলে পাম্পের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম মাটির উপরে তোলা হয়, যেমন ক'রে টিউব-ওয়েলের জল তোলা হয়।

পেট্রোলিয়াম মাটির উপরে তোলা হলে ওকে বিশোধন করতে হয়। খনি হতে পেট্রোলিয়ামের সাথে কিছুটা জলও চ'লে আসে। জল পৃথক করা হয় বৈদ্যুতিক উপায়ে বা electrolysis উপায়ে। জল তাড়ান হলে পেট্রোলিয়ামকে ফুটান হয়, যাতে ক'রে ওর মধ্যেকার সমস্ত মিশ্রিত গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে। তারপর ঐ পেট্রোলিয়ামকে Boiling point অনুসারে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়। কোন তরল পদার্থ যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ফোটে এবং গ্যাসে পরিণত হয় তাকে ঐ তরল পদার্থের বয়েলিং পয়েণ্ট বলে।.. যেমন জলের বয়েলিং পয়েণ্ট ১০০° সেঃ। এর মানে, জল ১০০ ডিগ্রী

সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। খনিজ পেট্রোলিয়ামকে তারপর উত্তপ্ত করা হয়। বিভিন্ন ডিগ্রী উত্তাপে বিভিন্ন অংশ গ্যাসে পরিণত হয় এবং তাদেরে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা হয়। এরূপে পেট্রোলিয়ামের তিনটি অংশ পাওয়া যায়, যথা—

(ক) ন্যাপথা (Naptha) বা বেনজাইন (Benzine)।

(খ) কেরোসিন (Kerosine)।

(গ) গুরু তেল (Heavy oil)।

প্রথম অংশটিকে আরও বিশোধিত ক'রে আরও কয়েকটি অংশ পাওয়া যায়। পেট্রোল তাদেরই একটা। এই পেট্রোল বা গ্যাসোলিনই এখন মোটর, এরোপ্লেন, এবং সর্ব্বত্র কলকজার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা এই পেট্রোল ছাড়া চলতে পারে না। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে হবে যে, একদিন না একদিন পৃথিবীর সব পেট্রোলিয়ামই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেদিন মানুষের ভাগ্যে কি হবে? সেদিন কি মোটর, এরোপ্লেন সবই বন্ধ হয়ে যাবে? না, তা কখনই হবে না। মানুষ কেবল খনিজ পেট্রোলের আশায় আজ ব'সে নেই। সে যেমন আবিষ্কার করেছে অগণিত মোটর গাড়ী, বিমানপোত, তেমনি তা চালনার জন্যে কেবল খনির পেট্রোলের উপরই ভরসা ক'রে ব'সে নেই। আজ বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দিয়ে মোটর স্পিরিটও (motor spirit) প্রস্তুত করেছে।

সুরা বা মদ (alcohol) এতদিন পর্য্যন্ত মানুষের কেবল পানের জন্যই ব্যবহৃত হত। কিন্তু আজকাল এর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে, যখন মানুষ জানতে পেরেছে এই সুরা দিয়ে মোটর চালান যায়।

সুতরাং আধুনিক প্রচেষ্টা চলেছে কেমন ক'রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুরা তৈরী করা যায়। অবশ্য খরচ খুব কম হওয়া চাই। কয়েকটি নিয়ম বিজ্ঞানীগণ আজকাল ব্যবহার করছেন। তাদের একটি এখানে বলছি।

যে গুড় তোমরা খাও, তা হতেই আজকাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুরা (alcohol) প্রস্তুত হচ্ছে যা দিয়ে অনায়াসে মোটর চালান যেতে পারে। এই সুরাকে বলে পাওয়ার এলকোহল (Power alcohol)। তোমরা জান, খেজুর-রস কিংবা অন্য কোনও চিনির রস অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রেখে খেলে মাথা কেমন যেন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে। এর কারণ ঐ রস সুরায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ফারমেনটেশন

(Fermentation) বা সন্ধান-ক্রিয়া বলে। ঈস্ট্ (Yeast) নামে এক রকম উদ্ভিজ্জাণুর সাহায্যে এই সন্ধান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ইহাই বিজ্ঞানীরা বলেন।

তাই গুড়ের একটি সলিউশনে ঈস্ট্ দিয়ে রাখা হয়। ফলে কয়েকদিন পরে ঐ গুড়ের রস সুরায় পরিণত হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় এই সুরা খুব তরল থাকে। তাই পরিস্রবণ (distillation) উপায়ে সুরা জল হতে পৃথক ক'রে নেওয়া হয়। তারপর ঐ সুরাকে আরও বিশোধিত ক'রে কাজে লাগান হয়। এই সুরাই হচ্ছে পাওয়ার এলকোহল। মোটর স্পিরিটরূপে আজকাল এর ব্যবহার হচ্ছে। আজকাল আলু এবং ভাত হতেও এই পাওয়ার এলকোহল প্রস্তুত হচ্ছে।

এ তো বললাম মোটর স্পিরিট প্রস্তুত করবার একটা উপায়ের কথা। আর আর যে সব নিয়মে আজকাল মোটর স্পিরিট তৈরী হচ্ছে, তা তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে। তোমরাও নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার ক'রে নিজের দেশের পেট্রোলের অভাব ঘুচাবে। তোমরা বিজ্ঞানের উন্নতি ক'রে দেখাবে যে, ভারতবাসীও বিজ্ঞান-জগতে অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সমপর্য্যায়ে স্থান পাবার উপযুক্ত। ভারতে জগদীশ বসু কেবল একজন নহে, প্রফুল্লচন্দ্র কেবল একজন নহে, হাজার হাজার জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টি হবে। দেশের দুর্নাম ঘুচবে।

ডাকের চিঠি

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ

চিঠি পাওয়া বা চিঠি লেখা আজকাল আমাদের কাছে খুবই সাধারণ এবং সহজ ব্যাপার। সেইজন্য, এর পিছনে যে আবার মস্ত একটা ইতিহাস আছে, তা' আমরা ভাবতেও পারিনে।

ডাক-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা এখন পোষ্টমাষ্টার জেনারেল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় কলকাতায় প্রথম পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হন। ক্লাইভের সময়ে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে কোম্পানীর ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য অবশ্য এই ধরণের ডাকের ব্যবস্থা হয়েছিল; কিন্তু তখন পোষ্টমাষ্টারদের যেতে হ'ত

উপরওয়ালাদের বাড়ীতে বাড়ীতে চিঠিপত্র থলিতে পুরে শিল-মোহর ক'রে দিতে। আর একটা মজা ছিল তখন, জনসাধারণ পত্রাদি লিখলে তা'র জন্য কোনও খরচ দিতে হ'ত না—কোম্পানীই ডাকের সমস্ত খরচ বহন করত।—ভাবটা, তুমি ত ভাই নৌকা ভাড়া ক'রে যাচ্ছই—আমাকেও অমনি নিয়ে যাও!

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এক নতুন আইনে ঐ প্রথা বন্ধ ক'রে ডাকের হার নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেন। সেই সময়ে প্রতি তোলা ওজনের একখানি পত্র একশো মাইল যেতে দু' আনা খরচ ধার্য্য করা হয়।

জনসাধারণের সুবিধার জন্য তামা দিয়ে তৈরী এক রকম টিকিট বিক্রয় ক'রে তখন ঐ খরচ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।
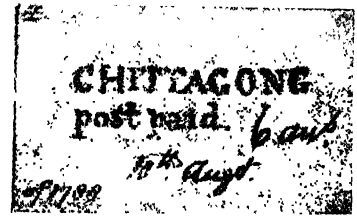
বেরিং (Bearing) পত্রের প্রচলন তখন থেকেই আছে। বেরিং চিঠিতে কালো কালী এবং যে চিঠির মূল্য আদায় হয়েছে, সেটায় লাল কালীর ছাপ মেরে চিহ্ন করা হ'ত। তখন ত আর রেল-ষ্টীমার হয়নি; কাজেই ভাল পথ-ঘাট না থাকায় হরকরারাই পত্র বয়ে নিয়ে যেত। তাদের সঙ্গে আলো, মাদল এবং তীরন্দাজও দেওয়া হ'ত। এখনও যে সব জায়গায় কোনও যান-বাহনের সুবিধা নেই, সেখানে হরকরাই ডাক নিয়ে যায়। সে দৌড়ে যায় ব'লে তা'কে 'রানার'ও বলা হয়। তা'র সঙ্গে থাকে একটা বল্লম আর বল্লমের মাথায় ঘুঙুর।

সেকালের ডাক টিকিট

কিন্তু কোম্পানীর আমলের বহু পূর্ব্বেই এদেশে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ইবন বটুটার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হিন্দুস্থানে ঘোড়ার ডাক ও হরকরা দুই-ই দেখতে পাওয়া যেত। চার মাইল অন্তর তাদের ঘাঁটি থাকত এবং এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে হরকরাগণ খুব দ্রুত ছুটে যেত।

সম্রাট্ বাবর (১৫২৬—১৫৩০) আগরা থেকে কাবুল পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই ডাকের জন্য শের সাহের (১৫৪০—১৫৪৫) নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সিন্ধুদেশ থেকে পাঞ্জাব হয়ে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ২০০০ মাইল বিস্তৃত যে পথ তৈরী করান, তা'র উপর ডাক-চৌকী ও ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করেন। নানা পথের উপর তিনি সর্ব্বসমেত ১৭০০ ডাক-চৌকী এবং তাদের প্রত্যেকটিতে দু'টি ক'রে ঘোড়া স্থাপন করেন। এই কাজে তাঁর ৩৪০০টি ঘোড়া খাটাতে হয়েছিল।

ওই সব ঘোড়ার ডাকের উদ্দেশ্য ছিল কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহ কি রাজনৈতিক গোপন সংবাদ প্রভৃতির আদান-প্রদান করা। সাধারণের পত্রাদি পাঠানোর জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনও উপায় তখন ছিল না। পায়রাকে অবশ্য বহু পূর্ব্ব থেকেই মিশর, গ্রীস, রোম এবং রাজপুতনা প্রভৃতি দেশ পত্র-বাহকরূপে ব্যবহার করেছে দেখা যায়; কিন্তু সেজন্য বাঁধাধরা কোনও স্থান, কাল বা নিয়মকানুন ছিল না।

এই ত গেল মোটামুটি ভাবে ডাক-চিঠির কথা। কিন্তু যে পোষ্টকার্ডে আমরা এখন চিঠি লিখছি তা'র এই বর্ত্তমান রূপটা কি একদিনে হয়েছে? আগে পোষ্টকার্ডের দাম ছিল এক পয়সা—অবশ্য তা'র আকারও ছিল এখনকার পোষ্টকার্ডের প্রায় অর্দ্ধেক। তা' ছাড়া ঐ যে পোষ্টকার্ডের উপর "Address only" কথাটা রয়েছে, ওটাও অনেক ঘসা-মাজার পর তবে ঐ রূপ পেয়েছে। কথা হ'ল পোষ্টকার্ডের ঐ ঠিকানা লিখবার জায়গায় এমন কথা ছাপিয়ে দিতে হবে যা' খুব সংক্ষিপ্ত অথচ যার অর্থ খুব পরিষ্কার বুঝা যায়। গ্রেট ব্রিটেনে এইজন্য পোষ্টকার্ডের উপর প্রথমে লেখা হ'ল,—"Nothing but the address can be placed on this side." কথাটা সত্যি নয়, সংক্ষিপ্ত নয় এবং পরিষ্কারও নয়; 'can' কথাটির জন্যই বাধল গোলমাল। তখন ঐ can উঠিয়ে করা হ'ল—"Nothing but the address to be on this side", কিন্তু এবারও বড় লম্বা হয়ে গেল কথাটা। তখন নতুন ক'রে লেখা হ'ল—"Write only the address on this side." এবারেও "write" কথাটি নিয়ে গোলমাল। Write করতে বলা হয়েছে, তা' হ'লে টাইপ করা চলবে না নিশ্চয়ই! কারণ, লেখা আর টাইপ করা এক জিনিস ত নয়! তারপর আরও অনেক আলোচনার পর তবে "Address only" কথাটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

পল্লীর এ ছবি দেখে নাই আর—

বন্দে আলী মিয়া

টুটু আর মিনা দুটি ভাই-বোন—
শহরেতে থাকে তা'রা, পাড়াগাঁয়ে যায়নি কখন।
হঠাৎ খবর আসে—যুদ্ধ লেগেছে খুব ভারী—
প্রাণভয়ে সবে তাই চ'লে যায় কল্‌কাতা ছাড়ি'।
ভাবে নি কখনো কেহ এইরূপে যেতে হবে গাঁয়,
বাপ-মা'র সাথে এলো টুটু মিনা দেশের ভিটায়।
একতলা ছোটো বাড়ী—আশে পাশে ঝোপ আর ঝাড়,
সাঁঝ হতে ঝিঁঝিঁ ডাকে—জোনাকিরা নাচে চারিধার;
বাদুড় উড়িয়া আসে—পেঁচা ডাকে গাছের আগায়,
দল বেঁধে শিয়ালেরা বাঁশবনে খাম্বাজ গায়।
শুয়ে শুয়ে বিছানায় চেয়ে দেখে দূর নভতলে—
হরিণশিশুর মতো দলে দলে মেঘ ছুটে চলে;
আমের শাখার ফাঁকে আধখানা চাঁদ দেখা যায়,
জোছ্‌না কাঁপিছে দূরে নারিকেল পাতায় পাতায়।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি দুই জন
চেয়ে রয় দূর মাঠে—সেথা যেতে চায় যেন মন;
শ্যামল ধানের গাছ দোল খায় বাতাসের সাথে,
তাই দেখি ভাই-বোন বাহিরিয়া আসে আঙিনাতে।
পায়ে পায়ে যায় ওরা ধীরে ধীরে 'আল্'-পথ ধরি,
মাঠ চিড়ে এই পথ ওই গাঁয়ে গেছে সরাসরি;
'আল্' বেয়ে চলে তা'রা—দুই পাশে ধান আর পাট—
সবুজ গালিচা যেন জুড়ে আছে একখানি মাঠ!

চড়াই শালিক এসে দল বেঁধে খুঁটে খায় দানা,
কত পাখী উড়ে যায়—নাম কারো নাহি যায় জানা।
রাখাল ছেলেরা এসে ক্ষেতে ব'সে কাটিতেছে ঘাস,
বিলের জলের 'পরে সাঁতরায় ছুটি বেলে হাঁস ;
অচেনা কত না ফুল ফুটে আছে হোথা চারিধারে,
বাব্‌লার শাখা পাতা বাতাসেতে দোলে বারে বারে।
বিহানের এই রূপ দেখে ওরা বিস্ময়ে চেয়ে—
টুটুর হাতটি ধরি ছোটো মিনা চলে আল্ বেয়ে।
শহরে দেখেনি তা'রা আকাশের এত হোলি-খেলা
মাঠের এমন ছবি—নানা-রঙা পাখীদের মেলা ;
প্রসারিত মাঠ-পারে ও-গাঁয়ের নীল রেখা 'পরে
জননীর স্নেহ সম ক্ষণে ক্ষণে মেঘ ছায়া করে।
ঘরে তা'রা ফিরে যাবে এ কথাটি নাহি মনে আর,
মাঠে মাঠে বেড়াইবে—লুকোচুরি খেলিবে এবার।

কলোরেডোর তীরে

আ. কা. মো. শা.

কালিফোর্ণিয়া দেশ। কলোরেডো নদীর তীরে সেন্ট-পিটস্ ব'লে একটা গ্রামে থাকতুম। তা'র পশ্চিমে লস্-এঞ্জেলস্। উত্তরে দেখা যায় অস্পষ্ট মাউণ্ট হুইট্‌নীর শৃঙ্গ—শুভ্র তুষারে ঢাকা।

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছিলুম। নদীর কিছুটা দূরে একখণ্ড উঁচু জমির উপরে একটি সুন্দর বাড়ী। ছবির মতো তা'র সুন্দর পটভূমি। এই বাড়ীর মালিক বৃদ্ধ ডাক্তার ও' ব্রায়েন-এর স্নেহের বাঁধনে প'ড়ে রয়ে গেলাম। ছেলের মতো আমায় ভালবাসতেন তিনি। তখন আমার বয়স ষোল। ডাক্তার নিঃসঙ্গ—আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই—সম্পূর্ণ একা! মৃদু হেসে বলতেন—আমি বন্ধনহীন!

আশ্চর্য্য ! কই ব্যথার এতটুকু সুরও তাঁর কথায় নেই। অদ্ভুত !

ভোরবেলা বৈঠক দিয়ে যখন উঠে দাঁড়াতুম, বুকের মাংস বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরতো, পেশীগুলো উঠতো ফুলে ফুলে। ডাক্তার বলতেন—হুর্‌রা ! এই তো চাই। মাংসল বুকের উপর মারতেন দড়াস্ ক'রে এক ঘুসি !—বেঁচে থাকা একেই বলে ! তোমাদের দেশের সকলেই কি এমন ? তোমার মতো ? তবুও তোমরা পরাধীন !—লজ্জিত হতুম। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের ভুল সংশোধন ক'রে দিতুম।

ডাক্তারের মুখ অপ্রতিভ হয়ে যেতো—ম্লানমুখে চেয়ে থাকতেন উত্তরের ঐ পুলটার দিকে—রেলের লাইন যার উপর দিয়ে চ'লে গেছে।······

ভীষণ প্লাবন ! ডাক্তার বললেন—তাঁর দীর্ঘ ষাট বছরের জীবনে তিনি এমন বন্যা দেখেন নি। ডাক্তারের বাড়ী (আমি তাঁর বাড়ীতেই থাকতুম) এবং আরও কয়েকজন গৃহস্থের বাড়ী উঁচু জমির উপর ছিল ব'লে রক্ষা পেল। প্রচণ্ড বাতাস ; সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছে কালিফোর্ণিয়া উপসাগরের জল। কলোরেডোর স্রোতে তাণ্ডব ! মড়্মড়্ শব্দে আমাদের বাড়ীর পেছনকার একটা পাইন্‌গাছ ভেঙে পড়লো। শোঁ-ও-ও-ও শোঁ-ও-ও ক'রে সে কী প্রচণ্ড রুদ্রনৃত্য বাতাসের !

গভীর রাত। চুপ্‌চাপ্ ব'সে আছি। আশঙ্কা উদ্বেলিত অন্তর। ডাক্তার একমনে চুরুটটা ফুঁকে চলেছেন—কোন চাঞ্চল্য নেই ! মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন—অ্যাস্‌টায়ারের বাড়ীর ওক্‌গাছটা ভেঙে পড়লো বুঝি ?···আবার সেই গম্ভীর অচঞ্চল নিঃশঙ্ক মূর্ত্তি !

হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হলো। 'টু কলোরেডো'র বাঁধ ধ্বসে গেল বুঝি ! পুলটা ভেঙে পড়লো হয়তো। 'টু কলোরেডো' একটা খাল। তার উপরে রেল চলাচলের পুল। জানালা খুললেই সেটা চোখে পড়ে—এত কাছে সেটা। জানালা খুলে ডাক্তার লম্বা টর্চটার আলো ফেললেন।

পুলের কোন চিহ্ন নেই !

টর্চটা নিবিয়ে ডাক্তার আবার এসে চেয়ারে বসলেন, একটা নতুন চুরুট ধরালেন। ঢং ঢং ক'রে দেওয়াল-ঘড়িতে দু'টো বেজে গেল !

সর্ব্বনাশ !—ডাক্তার লাফিয়ে উঠলেন। আমি চমকিত !

—কি হলো ?

—দু'টোর গাড়ী—প্রেস্‌কটের দিকে ছুটে যাচ্ছে !

দরজা খুলে মুহূর্ত্তের মধ্যে টর্চটা নিয়ে ডাক্তার বাইরে চ'লে গেলেন। বাইরে বৃষ্টি—ঝড়—ভয়ঙ্কর বাতাস। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম! সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তখুনি ছুটলুম ডাক্তারের পিছু পিছু।

ওই তো! ডাক্তার অলিভারের বাড়ীর পাশ দিয়ে ছুটছেন। রেল লাইনের উপরে—ও কি! গাড়ীও তো আসছে! ডাক্তার গাড়ীর দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছেন! একটা অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পাচ্ছি—Stop! Stop! Danger Ahead! Danger Ahead!······

তাই তো! পুলটা তো ভাঙা! উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম আবার! ট্রেন ডাক্তারের গায়ের উপর এসে পড়লো ব'লে—আর মাত্র পঁচিশ ফুট। উঃ! আমি শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করলুম!

ট্রেন থেমেছে! আরো ত্রিশ ফুট এগিয়ে এসে!

তারপর ডাক্তারের স্মৃতিমাখা ঐ গ্রাম আর আমার ভালো লাগেনি। দেশে চ'লে এসেছি।

দেবীর বোধন

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত অধিকারী, সাহিত্যবিশারদ, পুরাণরত্ন

আজ দেবীর বোধনের পৌরাণিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাংলা বৎসর যেরূপ আজকাল বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয় প্রাচীনকালে সেরূপ হইত না। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত বলিয়াই উহাকে অগ্র (প্রথম) এবং হায়ন (বৎসর) অর্থাৎ বৎসরের প্রথম বলিয়া অভিহিত করা হইত। কিন্তু পরে বৈশাখ মাস হইতেই সম্বৎসর আরম্ভ হইতেছে। কতদিন হইতে বর্ত্তমান প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা বিচারসাপেক্ষ এবং তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণই বলিতে পারেন।

এই সম্বৎসরকে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। তোমাদের মধ্যে যাহারা নবম বা দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কর, তাহারা জান য়ে, 'ই' ধাতুর (গমন করা) সহিত অনট্ প্রত্যয় করিয়া 'অয়ন' হইল। 'অয়ন' অর্থে গমন করা।

উত্তরায়ণ বা উত্তরদিকে এবং দক্ষিণায়ন বা দক্ষিণদিকে গমন করা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত দিক্‌দ্বয়ে কে গমন করিবে ?—সূর্য্যদেব।

ভৌগোলিক তথ্য পর্য্যালোচনা করিলে তোমরা জানিতে পারিবে যে, ২১শে ডিসেম্বর হইতে সূর্য্য ক্রমাগত উত্তরদিকে যাইতে থাকে। এই গতির শেষ দিন ২১শে জুন। ইহারই নাম উত্তরায়ণ। উক্ত দিনে উত্তর মেরুর সর্ব্বত্রই আলো অর্থাৎ দিন। আবার ২১শে জুন হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সূর্য্য ক্রমাগত দক্ষিণদিকে যাইতে থাকে। এই ২১শে ডিসেম্বর উত্তর মেরুতে সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বদাই অন্ধকার বা রাত্রি এবং দক্ষিণ মেরু আলোকিত।

২১শে ডিসেম্বর সাধারণতঃ বাংলা মাসের ৬ই কিংবা ৭ই পৌষ হয় এবং ২১শে জুন হয় ৬ই বা ৭ই আষাঢ়।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৌষের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সুমেরুতে দিবা এবং আষাঢ়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে পৌষের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত তথায় রাত্রি। বলা বাহুল্য যে, দক্ষিণ মেরুতে ইহার বিপরীত ফল দেখা দিয়া থাকে।

পুরাণপাঠে জানা যায় যে, দেবতামণ্ডলী সুমেরুতে বাস করেন অর্থাৎ উত্তর মণ্ডলে। আমরা যেরূপ দিবাভাগে জাগরিত থাকিয়া নিশাকালে নিদ্রামগ্ন হই, দেবতাগণও তদ্রূপ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা আষাঢ় হইতে পৌষ পর্য্যন্ত নিদ্রা যান এবং অপরার্দ্ধ জাগিয়া থাকেন।

চণ্ডী অনুসারে সত্যযুগে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে প্রথম দেবীর পূজা করেন। তারপর শাস্ত্রে আমরা তিন প্রকার দুর্গোৎসবের উল্লেখ পাইয়া থাকি।—

(ক) ত্রেতাযুগে ত্রিভুবনজয়ী রক্ষঃরাজ রাবণ দেবী ভগবতীর পূজা করিলেন। তখন বসন্ত কাল অর্থাৎ ফাল্গুন বা চৈত্র মাস। সেই সময়ে সুমেরুতে সকল দেবতাই জাগিয়া থাকেন। বোধন অর্থাৎ জাগরণ করিবার প্রয়োজন হয় না।

(খ) রাবণকে পরাজিত ও নিহত করিবার মানসে শরৎকালে (আশ্বিন মাসে) রামচন্দ্র দেবীর পূজা করিলেন। তখন দেবতাবৃন্দ নিদ্রিত, তাই অকাল। সুতরাং তাঁহাকে অকালে বোধন করিয়া দেবীর পূজা করিতে হইল। এই হেতু ইহা অকাল বোধন ও অকাল পূজা বলিয়া বিখ্যাত।

(গ) দ্বাপর যুগে গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার কামনায় দুর্গারূপিণী কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিলেন। এই পূজা হেমন্তকালে অর্থাৎ কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে হয়। তখনও অকাল। এই পূজা আমাদের বঙ্গদেশে প্রচলিত নহে।

বঙ্গদেশে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবই সমধিক আদৃত। কোন কোন স্থানে বাসন্তী পূজাও হইয়া থাকে।

শারদীয়া পূজার বোধন হয় শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে এবং বিজয়া দশমীতে দেবীর পূজা সাঙ্গ হয়। কিন্তু বসন্তকালের দুর্গোৎসবে দেবীর বোধন করিতে হয় না; দেবতাদিগের তখন দিবা—তাঁহারা জাগিয়াই থাকেন। শুধু দেবীর পূজাই করিতে হয়। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ হইয়া সপ্তমী হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত যথানিয়মে দেবীর পূজা হয়।

মিশর দেশের শিশুদের খেলনা

শ্রীসন্তোষকুমার দে, এম. এ., এইচ্. ডিপ্. এড্ (ডাবলিন)

শিশু-চিত্ত চিরদিনই খেলার জন্যে উন্মুখ। সৃষ্টির আদি কাল থেকেই মানব-শিশু ধুলা-বালি, খড়-কুটা নিয়ে খেলছে। অবশ্য এর কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে এ অনুমান সত্য ব'লেই মনে হয়। শিশুকে বুঝতে হলে, তা'র খেলাকেও বুঝা দরকার। কবি শিশুকে ভালই বুঝেন, তাই শিশু সম্বন্ধে বলেন—

জগৎ-পারাবারের তীরে—
ছেলেরা করে খেলা;
ঝঞ্ঝা ফিরে গগন-তলে,
তরণী ডুবে সুদূর জলে,
মরণ-দূত উড়িয়ে চলে,
ছেলেরা করে খেলা;
জগৎ-পারাবারের তীরে
শিশুর মহামেলা।

আজকাল যে-সমস্ত খেলনা নিয়ে আমাদের দেশের বা ইউরোপ-আমেরিকার ছেলেমেয়েরা খেলা করে, প্রাচীন মিশর দেশের শিশুরা হুবহু ঠিক সেই সমস্ত খেলনা নিয়ে খেলা করত, তা'র যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শিশুর খেলনায় তিন-চার হাজার বৎসরের মধ্যে খুব সামান্যই পরিবর্ত্তন হয়েছে, বা হয়ত একেবারেই কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। অতি প্রাচীনকালে মিশরে শিশুরা যে-সমস্ত খেলনা নিয়ে খেলা করত, তা'র কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত খেলনার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের কি ইউরোপ, কি আমাদের দেশের শিশুদের খেলনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এ-যুগের খেলনার সঙ্গে কি আশ্চর্য্য রকম মিল! খেলার ধরণ হয়ত তফাৎ হতে পারে, কিন্তু খেলার জিনিষের কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে না। সেই প্রাচীন যুগের যে ক'টি খেলনা ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষ সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তার ছবি এখানে দেওয়া হল।

এই সংগ্রহের মধ্যে দেখা যায়, গোটা কতক ভূত-পেত্নী পুতুল রয়েছে। এই পুতুলগুলোর মধ্যে হয়ত কতকগুলো ছিল ভাল ছেলেমেয়েদের খেলার জন্যে, আর কতকগুলো ছিল মন্দ ছেলেমেয়েদের খেলার জন্যে। চামড়ায় ঢাকা একটা ফুটবলও পাওয়া গিয়েছে—আজকালকার দিনের ফুটবলের সঙ্গে তা'র কোন পার্থক্য নেই। এই ফুটবলটার সেলাইগুলো জায়গায় জায়গায় আজও পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে। মাছ ও ফলের মডেলও কতকগুলো পাওয়া গিয়েছে। ছোট ছোট গোল বল পাওয়া গিয়েছে। এগুলো নিয়ে হয়ত টপ মার্ব্বেলের মতন খেলা হত। এই খেলনাগুলো বিশেষজ্ঞদের মতে দুই-তিন

হাজার বছরের আগেকার। খেলনাগুলোর বিশেষত্ব কিছুই নেই ; শুধু অত প্রাচীন কালের শিশুরা যে বর্ত্তমান যুগের শিশুদের মতই একই রকম খেলনা নিয়েই খেলত, সেইটেই বুঝাবার জন্যে এগুলো সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে ; তাছাড়া ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাচীনত্বের দাবীও এদের কম নয়।

কোন্ খেলা যে কোন্ দেশে প্রথম চলন হয়েছিল, তা বোধহয় জোর ক'রে বলা খুবই শক্ত। ফুটবল, মার্ব্বেল নাম শুনলেই মনে হয় বিলিতি খেলা ; কিন্তু এই রকম জিনিষ যখন দুই-তিন হাজার বছর আগেকার মিশরে পাওয়া গিয়েছে, তখন ঐ অনুমান করা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, সে দেশে এই সব খেলার প্রচলন ছিল। কাজেই এই খেলাগুলোকে জোর ক'রে বিলিতি খেলা বলা চলে না।

বাংলা মায়ের নূতন শোভা

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

সৃষ্টি বুঝি যায় রে ডুবে,
ডুবল ধরাতল !
ঝর-ঝর-ঝর—ঝরছে বারি,
ঝরছে অবিরল !

মেঘরাণী আজ এলো চুলে,—
ধূপছায়া তা'র শাড়ী,
আকাশ গাঙে উজাড় ক'রে
ঢালছে হেম ঝারি !

মরালেরা বেড়ায় ভেসে,
টোকা মাথায় চাষী।
বাংলা মায়ের নূতন শোভা
দেখতে ভালবাসি !

আটি আটি আউশ ধানের
নৌকা আসে ঘাটে,
কৃষক-বধূ কলসী কাঁখে
গরব-ভরে হাঁটে !

লাউ-কুমড়া তক্‌তকে সব
মাচাং গেছে ভ'রে,
পুঁইলতাটি লতিয়ে চলে,
শশা-মাচার 'পরে !

নূতন ধান আর নূতন পাট আজ
আসছে রাশি রাশি,
বাংলা দেশের নূতন শোভা
দেখতে ভালবাসি !

ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি

আমাদের পরম প্রিয় কবি বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর রক্তমাংসের নশ্বর দেহ, পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তিনি আমাদের অন্তররাজ্যে পূর্ব্বের মতই ভাস্বর মূর্ত্তিতে বিরাজ করছেন। সেখানে তিনি অজর অমর। তাঁর বাসনা ছিল :—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ;
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।'

ধন্য তিনি ; মানবের 'জীবন্ত হৃদয় মাঝে' শাশ্বত আসন তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। যতদিন বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গলা ভাষা থাকবে, যতদিন বিশ্ববাসীর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথ মানবের মানসলোকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁর কাব্য, তাঁর নয়নমোহন দেবদুর্ল্লভ প্রতিমূর্ত্তি বাঙ্গালীর ঘর পবিত্র ও আনন্দ-মুখরিত করে রাখবে।

রবীন্দ্রনাথের শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে প্রাচীন ভারতের ঋষিদের কথা মনে পড়ে। কবিগুরু বাল্মীকি যেন আবার বহুযুগ পরে ফিরে এসেছিলেন কাব্যের অমৃতভাণ্ড নিয়ে। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঘরের শিশুদের মতই, বিদ্যালয়ের বালকদের মতই এক সময় ছোট ছিলেন। তাঁর চিন্তা ও কল্পনা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে' শিশুদের চিরন্তন মানসভূমি তেপান্তরের মাঠ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর দেশ, ঘুমন্ত রাজকন্যার রাজপুরীতে উড়ে উড়ে বেড়াত। সেই ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ছেলেমির কাহিনী দু'একটা বলি।

একাশী বছর আগে রবীন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয় তখন কলকাতায় গ্যাস বা বিজলি বাতি আসেনি। পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপে রেড়ির তেলের আলো জ্বলত। তাঁদের পড়ার ঘরে জ্বলত দুই-সলতের একটা সেজ। মাষ্টার মশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ষ্টবুক। ছাত্র রবীন্দ্রনাথের প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখ রগড়ানি। রাত ন'টায় ছুটি পেলে ঢুলুঢুলু চোখে বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরুপথ দিয়ে যেতে হত। মিটমিটে লণ্ঠনের আভায় আলো-ছায়ার আলপনা-দেওয়া পথ দিয়ে যেতে ভূতপ্রেতের ভয়ে গা উঠত ছমছম্ করে, পিঠ উঠত শিউরে। পিছনে ফিরে দেখতে সাহস হত না। মনে হত কি জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে।

সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। ছোট সময়ে এক রাত্রিতে যাত্রাগান শুনে পরদিন-ঘুম থেকে উঠতে তাঁর দেরী হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, তাঁর মিতা রবি আকাশে উঠেছেন আর তিনি বিছানা থেকে ওঠেননি এরূপ মাত্র ঐ একদিনই হয়েছে তাঁর জীবনে। সকালবেলা পড়াশুনা শেষ করে স্নানের আগে গায়ে খুব করে তেল মেখে কোদাল দিয়ে কোপান আর এক মণ তেল ঢেলে নরম করা জায়গায় কুস্তি করতে হত তাঁদের। এভাবে সারা গায়ে মাটি মাখার পর স্নান করতে যেতেন। তাঁর মায়ের মনে আশঙ্কা হত এরূপভাবে মাটি মাখলে ছেলের গায়ের রং বুঝি খারাপ হয়ে যাবে। তাই তিনি সরবাটা, কমলালেবুর খোসা বাটা ও আরো সব কত কি দিয়ে মলম তৈরী করে দিতেন স্নানের সময় ছেলের গা ঘষে উজ্জ্বল করবার জন্য।

কারো সঙ্গে ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কখনও বাড়ি থেকে বের হবার জো ছিল না। নিঝুম দুপুরে কাঁচা আমওয়ালা হাঁক দিয়ে যায়—চাই কাঁচা আম; চুড়িওয়ালা ঝুমঝুম শব্দ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। কল্পনা-বিলাসী বালকের মন উদাস হয়ে আসে। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি ডিঙ্গিয়ে তাঁর মন চলে যায় দূরে বহুদূরে—কত নদনদী, বনমাঠ পেরিয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকে অমল নামে যে ছোট ছেলেটির চরিত্র এঁকেছেন, সে বালক রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছবি। বদ্ধ ঘরে কিছুতেই তা'র মন টেকে না। জানালা দিয়ে সে বাইরের কর্ম্মব্যস্ত লোকজন দেখে আর তা'র বাসনা হয় সেও গোয়ালা হয়ে ঐ রকম করে বাঁকে করে দই নিয়ে 'চাই দই—দই' বলে বেড়াবে; কখনও ভাবে পিওন হয়ে সে বাড়ি বাড়ি চিঠি বিলি করবে; আবার কখনও ভাবে পুঁটলিতে ছাতু বেঁধে নিয়ে লাঠি হাতে করে সেও পথিকের মত ঝরণা পার হয়ে হেঁটে হেঁটে দূরদূরান্তরে চলে যাবে।

দুপুরে চাকর-বাকর যখন ঘুমাত শিশু রবি তখন চুপি চুপি এক পাল্কীর মধ্যে গিয়ে বসতেন। এটা তাঁর ঠাকুর-মাদের আমলের যোল বেহারার পাল্কী। তখন আর কেউ তাতে চড়ত না; নীচতলার ঘরের এক কোণে পড়ে থাকত। মোহন সর্দ্দার আর আব্দুল মাঝির কাছে তিনি যেসব ডাকাতের গল্প আর ঝড়ের মধ্যে নৌকা চালানর গায়ে-কাঁটা-দেওয়া কাহিনী শুনতেন, বদ্ধ পাল্কীর মধ্যে বসে কল্পনার পুষ্পক রথে চড়ে তিনি সেই সব দৃশ্য দেখে দেখে বেড়াতেন। কখনও মনে হত পাল্কীতে চড়ে তিনি চলেছেন তেপান্তরের মাঠের মধ্যে দিয়ে; বেহারাগুলোর হাঁই হুই, হাঁই হুই, গা করছে ছমছম। ধু ধূ করে মাঠ, বাতাস কাঁপে রোদ্দুরে, দূরে ঝিকঝিক করে কালো দীঘির জল, চিকচিক করে বালি। ডাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে ফাটলধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ান পাকুড়গাছ। অদূরে ঝোপের উপর দিয়ে ডাকাতদের লাঠির আগা দুই একটা দেখা যায়। সর্ব্বনাশ! ঐখানেই যে পাল্কী নামিয়ে বেহারারা কাঁধ বদলাবে, জল খাবে, মাথায় জড়াবে ভিজে গামছা। এমন সময় রঘু ডাকাতের দল হেঁকে উঠল পাঁজর-ফাটানো

ডাক—রে-রে-রে-রে-রে-রে। আবার কখনও ভাবেন পাল্কীখানা হয়ে গেছে ময়ূরপংখী নৌকা। নদীতে বিষম ঢেউ। ঝড় উঠেছে; কূল-কিনারা দেখা যায় না। মাঝি হাঁকছে—সামাল সামাল।

ছেলেদের খাওনা-দাওয়ানর ভার ছিল ব্রজেশ্বর নামে এক চাকরের ওপর। আহারের লোভটা ছিল তা'র একটু বেশী। বালকদের খেতে বসিয়ে দিয়ে আলগোছে একখানা ক'রে লুচি তাদের সামনে দুলিয়ে বলত—দেব? দেব? এমনভাবে জিজ্ঞাসা করত যে, 'না' বললেই যেন সে খুসী হয়। মুখচোরা লাজুক রবীন্দ্রনাথ ক্ষিদে থাকলেও বলতেন, 'না'। লুচিগুলো ফিরে গিয়ে খাবারের আলমারীতে স্থান পেত, সেখান থেকে ব্রজেশ্বরের যথাস্থানে। এইভাবে কম খাওয়া অভ্যাস করে রবীন্দ্রনাথের শরীর হয়েছিল নীরোগ। ইচ্ছা ক'রে অসুখ করবার জন্য সারাদিন ভিজে-জুতা পায় রেখে, শরতের রাতে খোলা ছাদে শিশিরের মধ্যে শুয়ে থেকেও তিনি কোনদিন সর্দ্দি লাগাতে পারেননি।

গুরুমশায়ের পাঠশালায় যেতেন। সেখানে ছাত্রদের কপালে জুটত বেদম প্রহার। রবীন্দ্রনাথও বাড়ি এসে ইস্কুল খুলে বসতেন। ছাত্র হত কাঠের রেলিংগুলো। চাবুক দিয়ে মেরে তাদের আগাগোড়া দাগ করে দিতেন। ছাত্রগুলো ভারী দুষ্টু, কিছুতেই পড়তে চায় না। কত যে বকেন—বড় হলে কুলীগিরি ক'রে খেতে হবে। কিছুতেই কিছু না। তার মধ্যে কয়েকটি ছিল ভাল ছাত্র। তা'রা মার খেত না। বালক শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী জীবনে প্রকৃতই মানব-শিক্ষক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর হাতে আর কোনদিন চাবুক উঠেনি।

পূজায় বলি দেওয়ার গল্প শুনতেন। তাঁর মনে হল তাঁর সিঙ্গিকে বলি দিলে তো খুব একটা কাণ্ড হবে। অমনি একটা মন্তর বানাতে হ'ল, নৈলে পূজা হয় না।

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দি বোসের বাটুম
উলুকুটু ঢুলুকুট ঢ্যাম কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খটখট খটাস
পট পট পটাস।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার করা। কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালো বাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল।

তখন কবির বয়স বছর চৌদ্দ। অক্ষয় সরকার মশায় খণ্ডে খণ্ডে বৈষ্ণবপদাবলী প্রকাশ করছিলেন। সেগুলো তাঁর বড় দাদার নিকট আসত। গোপনে তাঁর টেবিল থেকে চুরি করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পদাবলীগুলো পড়তেন। অক্ষয়বাবুর কাছে তিনি বালক কবি চ্যাটার্টনের কথা

শুনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হল তিনি কবি হবেন এবং সুনামও তাঁকে করতে হবে। একদিন অন্তঃপুরের কোণের ঘরে শ্লেটের উপর প্রথম কবিতাটি লিখলেন—

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে।

কানে বেশ লাগল ; বারে বারে আওড়াতে লাগলেন সেই নূতন ছন্দের টুকরাটুকু। ভানুসিংহের পদাবলীর সেই হল সূত্রপাত।

বালক কবির খেয়ালের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। শিলাইদহে যখন ছিলেন, মালী প্রতিদিন ফুল তুলে এনে প্রতিদিন ফুলদানী সাজিয়ে দিত। কবির সখ হল রঙিন ফুলের রস দিয়ে কবিতা লিখবেন। ফুল টিপে যে-রস বেরোয় তা কলমের আগায় ওঠে না। বড়দাদাকে গিয়ে ইচ্ছা জানালেন। তিনি হুকুম করলেন, ছুতোর এলো কাঠ নিয়ে, তৈরী হল কল। ফুল পিষে কাদা করা হল, কিন্তু রস আর বের হল না।

পরিজনের স্নেহময় পরিবেশে বালকের কবিচিত্ত দিন দিন নূতন কল্পনা জাল বিস্তার ক'রে, নবনব সঙ্গীত-কুসুম প্রস্ফুটিত ক'রে চলল। চির অম্লান সে কুসুমের সুবাস যুগ-যুগ ধরে মানব-হৃদয়ে আনন্দ দান করতে থাকবে। কালজয়ী মহামানবকে অনুধ্যান করে আজ আমরা তাঁর জয়ধ্বনি করি।

[মহাদেবপুর (রাজসাহী) ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণতিথিতে সভাপতির অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত অনুলিপি।]

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

—ছয়—

পলায়ন

রঞ্জিত অজ্ঞান ঠিক হয়নি। হঠাৎ বিপদের নিঝুম পরশে সারা দেহ তা'র নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল। এটা সে টের পেয়েছিল যে লোকগুলো এক জায়গায় তাকে ফেলে রেখে গেছে।

চোখ মেলে চারদিকে চেয়ে দেখল, অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার নয়, আবছা-আবছা, ভাল ক'রে তাকালে মোটা জিনিষটা হয়তো মোটামুটি মালুম হতে পারে

বেশ্ ক'রে সে চারদিক চেয়ে দেখ্‌ল, কেউ নেই ব'লেই মনে হোল। শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে সে উঠে বস্‌তে পার্‌ল। কতক্ষণ ব'সে রইল—একেবারে দম বন্ধ ক'রে। নাঃ, নেই কেউ; থাক্‌লে তা'র নড়াচড়া দেখে নিশ্চয় এগিয়ে আস্‌ত।

জঙ্‌লিদের দয়া আছে বল্‌তে হবে। রঞ্জিতের শুধু হাতের আর পায়ের বাঁধন রেখে আর সারা গায়ের বাঁধন সব ছেড়ে দিয়েছে তা'রা। দয়া কি আর? ভেবেছে, নিঃসহায়, এখান থেকে আর যাবে কোথায়?

হাতের কব্জি তো বাঁধা। হাতের চেটোয় রঞ্জিত হাত্‌ড়ে-হাত্‌ড়ে বুঝ্‌তে পার্‌ল, সে ব'সে আছে একটা বাঁশের মাচার উপর। বুকে হেঁটে-হেঁটে অনুভব ক'রে দেখ্‌ল, চারদিকে পেটাই বাঁশের বেড়া। বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল, ভিতরের অন্ধকার তা'তেই ফিকে। মাচার বাঁশের ফাঁক দিয়ে তলায় চেয়ে দেখ্‌ল, অনেকটা নিচে মাটি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একটা গাছের গুঁড়ি আর মোটা ডালপালাও দেখ্‌তে পেল তলার দিকে। বুঝ্‌ল সে, গাছের উপর তৈরি করা মাচার ঘরে তাকে রাখা হয়েছে।

সারা ঘর হাত্‌ড়েও সাহেবের খোঁজ সে পেল না। তাঁকে রেখেছে নিশ্চয় অন্য যায়গায়।

এখন সে কি কর্‌বে?

হাত-দুটো অনেক টানাটানি ক'রে দেখ্‌ল, লতার বাঁধন কিছুতেই খুল্‌ল না। অনেক হাত্‌ড়ে পায়ের বাঁধনের গেরোটা সে পেল। বুনো মোটা লতার গেরো, খুল্‌তে বিশেষ কষ্ট হোল না। পায়ের বাঁধন খুল্‌তে পারায় মুক্তির সম্ভাবনায় মন তা'র পুলকিত হয়ে উঠ্‌ল।

কিন্তু হাতের বাঁধন নিয়ে সে কি কর্‌বে!

থুত্‌নিটা সে হাতের বাঁধনের উপর বুলোতে লাগ্‌ল। হাতের তলার দিকে পাওয়া গেল গেরো। বাঁধা দুহাতের কব্জি মুচ্‌ড়ে অনেক কষ্টে সে আন্‌তে পারল গেরোটাকে মুখের নাগালের মধ্যে। অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁত দিয়ে কাম্‌ড়ে'-কাম্‌ড়ে' হাতের বাঁধনের গেরোও সে খুলে ফেল্‌তে পার্‌ল। খুলেই রঞ্জিত উঠে দাঁড়াল। হাত-পা ঝট্‌কা মেরে দেখ্‌ল, কোনো বন্ধন আর নেই শরীরের কোথাও—নিঃসন্দেহে নেই।

আনন্দে তা'র নাচ্‌তে ইচ্ছে হোল, চেঁচিয়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে হোল।

কিন্তু সর্ব্বনাশ! তা কর্‌তে গেলেই কি-জানি কে টের পেয়ে যাবে। তার দরকার নেই। তার আগে—

ও কি! কি বিকট চিৎকার! বাইরে অল্প দূরে অনেক গলার নিদারুণ কোলাহল রঞ্জিত শুন্‌তে পেল। কি সে শব্দ! কানে তালা লেগে যায়, ভয়ে কেঁপে উঠে বুক।

তাড়াতাড়ি উঠে সে বেড়ার কাছে গেল। ফাঁক দিয়ে যা' সে দেখ্‌তে পেল, তা'তে প্রাণের সমস্ত আশা তা'র নিভে গেল। দেখ্‌ল, দূরে এক জায়গায় দাউ-দাউ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছে। তার চারদিকে শত শত জঙ্‌লি মেয়ে-পুরুষ। তা'রা নাচ্‌ছে; উদ্দণ্ড তালে নাচ্‌ছে। কি ভীষণ তাদের চেহারা! কি বিকট সব মুখ! আগুনের আলোর লাল-লাল ছোপ পড়েছে তাদের কুচ্‌কুচে কালো গায়ে, তাতে ভীষণতা বেড়ে গেছে আরো অনেক গুণ। তাদের বিশৃঙ্খল নাচের দাপটে মাটি যেন মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে, তাদের মিলিত কণ্ঠের উৎকট চিৎকারে আকাশ যেন হয়ে আছে অচেতন; বাতাস নিথর!

সেই প্রলয় কাণ্ড দেখে রঞ্জিত থ ব'নে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ দেখ্‌ল, পাঁচ-ছয়জনে মিলে একটা হাত-পা বাঁধা লোককে আগুনের উপর তুলে ধর্‌ল, তারপর ঝুপ ক'রে ফেলে দিল সেই আগুনের মধ্যে। ভয়ে রঞ্জিত চোখ বুজ্‌ল।

রঞ্জিতের শরীর হিম হয়ে এল ভয়ে। ধপ্‌ ক'রে সে বসে পড়্‌ল।

ওগো ভগবান্‌! বাঁচাও, রক্ষা করো প্রভু!

বুদ্ধি ঠিক করার জন্য সে একটুখানি সময় নিল যা'। তারপর উঠে দাঁড়াল। চারদিকের বেড়ার গায়ে হাত্‌ড়াতে লাগ্‌ল পাগলের মতো।

এই তো দরজা! ঠিক। ঘরের দরজা সে খুঁজে পেয়েছে যা' হোক। দরজা বাইরে থেকে বাঁধা। পকেটে ছুরি ছিল ভাগ্যিস। পেটাই বাঁশের বেড়া। কেটে কেটে খানিকটা ফাঁক ক'রে নিতে পার্‌ল। সেই ফাঁক দিয়ে ছুরি চালিয়ে দিল লাগিয়ে এক টান—আরেকটা—আরো দু'চারটা' বাঁধন গেল কেটে। আ—স্তে, খু-উ-ব আস্তে দরজা সে টেনে খুলে ফেল্‌ল।

তারপর.?

ঘর থেকে নামবার জন্য নিশ্চয় মই-টই একটা কিছুর বন্দোবস্ত আছে। দরজা দিয়ে বাইরে—মাচার একেবারে ধারে এসে সে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে নিচের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগল। কোথায় মই? মই-টই কিচ্ছু নেই। গাছে উঠিয়ে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছে! ওঃ!

দুর্ব্বলতায়, ভয়ে, উত্তেজনায় গা কাঁপছিল রঞ্জিতের। হঠাৎ ধপাস্‌ ক'রে সে প'ড়ে গেল নিচে একেবারে মাটিতে। উঃ! ভয়ানক লেগেছে তা'র। লাগুক্‌। লাগা-না-লাগার দিকে মনোযোগ দেবার সময় তখন নয়। ভীষণ ভয় হোল। এখনি—এক্‌খুনি নিশ্চয় অনেকগুলো লোকে ছুটে এসে তা'কে আবার বেঁধে ফেলবে। তখন!

সেই ভয়ানক মুহূর্ত্তের জন্য সে চোখ বুজে প'ড়ে রইল—দম বন্ধ ক'রে। কাট্‌ল কতক্ষণ। কেউ এল না তো! কাছে কেউ নেই নিশ্চয়। সবাই এখন উৎসবে মত্ত—নরহত্যার উৎকট উৎসবে!

ঈশ্বরের নাম নিল রঞ্জিত। অন্ধকারে সে হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌ল। চল্‌ল যেদিকে আগুন দেখা গেছে ঠিক তা'র বিপরীত দিকে। অনেকটা গেল। এবার সে সোজা হয়ে ছুট্‌ দেবে না-কি? নাঃ, অল্পের জন্যে সব মাটি হবে শেষে। সোজা হ'য়ে চল্‌লে যদি—য-দি কেউ দেখে ফেলে!

গেল আরো অনেক-খানি পথ। চারিদিকে চাইছে সে চোরের মতো। কিন্তু কতো আর হামাগুড়ি দিয়ে চলা যায়! যা' আছে কপালে; সে উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ল, জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

হঠাৎ আবার সেই চিৎকার! জঙ্‌লিদের সেই আনন্দ-কোলাহল!

আর পারল না রঞ্জিত হামাগুড়ি দিয়ে চল্‌তে। উঠি-পড়ি ক'রে ছুটতে লাগ্‌ল সে, ছুটে চল্‌ল প্রাণ হাতে ক'রে। পদে পদে সে হুঁচোট খেয়ে পড়ে যেতে লাগ্‌ল, গায়ে পায়ে বনের কাঁটা বিঁধতে লাগ্‌ল। কাঁটায় পরনের কাপড় যাচ্ছে আট্‌কে। তবু তা'র থামার উপায় নেই, তা'কে চল্‌তে হবে—তা'কে বাঁচ্‌তে হবে।

প'ড়ে যাবার আঘাত উপেক্ষা ক'রে, গায়ের কাঁটা তুল্‌তে তুল্‌তে, পায়ের কাঁটা খুল্‌তে খুল্‌তে, কাঁটায় জড়িয়ে যাওয়া কাপড় ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খসাতে-খসাতে সে এগিয়ে চল্‌ল। তা'কে বাঁচ্‌তে হবে।

মিনিটের পর মিনিট—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কতো ঘণ্টা সে চল্‌লো, তা'র কোনো হিসেব নেই, পিছনে কতোখানি পথ ফেলে এল, নেই তা'র ঠিকানা।

মনে তা'র ভাবনা—সাহেবকে এমনি ক'রে ফেলে আস্‌তে হোল! তা' ছাড়া কি-ই বা কর্‌বে? রঞ্জিত তো স্বার্থপরতার বশে কিছু করেনি। সাহেবকে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা তো তা'র ছিল না। তাঁকে রক্ষা কর্‌তে সে পারেনি; তাই ব'লে নিজের জীবনটাকেও নিশ্চেষ্টভাবে বলি দিলে কি তা'র লাভ হোত? কিছুই না। তা'তে কারোই উপকার হোত না কোনো।

চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ কি একটা শক্ত জিনিসে মুখ ধুকে গিয়ে রঞ্জিত উপুড় হয়ে প'ড়ে গেল। কিন্তু 'উঃ মাগো' ব'লে চেঁচিয়ে উঠার সুযোগ নেই, কাঁদবার সময় নেই। উঠে দাঁড়িয়ে সে হাত্‌ড়ে দেখ্‌ল, একটা পাথরের দেওয়াল যেন।

সর্ব্বনাশ! সেই ভাঙা মন্দিরটা হয় তো!—যেখানে সাহেব বাঘ মেরেছিলেন? অন্ধকারে ঘুরে-ঘুরে আবার সেখানেই সে এসে পড়্‌ল! জঙ্‌লিরা কি মন্ত্র-তন্ত্র জানে না-কি? তা নইলে পালাতে গিয়ে সে আবার সেই মন্দিরে এসে পড়্‌ল কেন? নাঃ! আর সে পারে না। পালিয়ে যখন রক্ষা নেই, কী আর করতে পারে সে? দেওয়ালে হেলান দিয়ে সেখানেই সে ব'সে রইল। মরণই যখন বরাতে আছে—

সে মন্দিরটা না-ও তো হ'তে পারে! আশার উপর ভরসা ক'রে সে আবার দাঁড়াল উঠে। দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে দরজা খুঁজে পেল। ভিতরে পা দিয়ে দেখ্‌ল, নাঃ, বেশ যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঠেক্‌ছে! সে মন্দিরটার ভিতর তো ছিল জঙ্গলে জঙ্গলময়—ছিদ্রহীন।

আবছা অন্ধকারে সে বাইরে তাকাল। সে মন্দিরটার তো বাইরে ছিল ভীষণ জঙ্গল। ছুরি দিয়ে জঙ্গল কেটে পথ ক'রে নিতে হয়েছিল। এর বাইরে তো জঙ্গল নেই।

মন্দিরের সারা ভিতরটা ভালো ক'রে বুঝার জন্য সে হাতড়াতে লাগ্‌ল। হাত ঠেক্‌ল শক্ত কিসের গায়ে! বেশ ক'রে হাত বুলিয়ে সে পরীক্ষা কর্‌ল। আনন্দে চোখ-মুখ তা'র দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। এ যে একটা শিবলিঙ্গ! বাপ্, কতো বড়!

দুই হাতে সেই বিগ্রহ রঞ্জিত জড়িয়ে ধরল।

—বাঁচাও ওগো ঠাকুর! মহাদেব! মহেশ্বর! বাঁচাও—রক্ষে করো! (ক্রমশঃ)

মা ও ছেলে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আজি মা তোমার নয়নের জলে ভিজে যায় মেটে ঘর,
তব মুখ পানে চেয়ে থাকি আর কেঁদে ওঠে অন্তর।
হাঁড়িকুঁড়ি নিয়া রাঁধিতে বসিয়া এমনি সকাল বেলা,
বসে আছ হেথা, রন্ধনে তব হেরিতেছি অবহেলা।
কিছু খেতে দাও, ইস্কুলে যাবো, পাইয়াছে বড় ক্ষুধা!
'—ঘরে নাই কিছু—জল আছে শুধু—তাই পান ক'র 'সুধা'—'

কেন পায় ক্ষুধা? পারো কি বলিতে পেট জ্বলে কেন এত?
পাশের বাড়ীর রায়েদের 'রামু' খাবার খায় মা কত!
ঘৃত ব্যঞ্জন নানা ফল-মূল, শেষে পায় দুধ চিনি,
আমাদের চেয়ে খেতে পায় ভালো ওদের বিড়াল 'মিনি'।
কিবা অপরাধ দেবতার কাছে করিয়াছি মোরা সবে?
'—বুঝিতে পারিবে মানুষের মত যেদিন মানুষ হবে,
আমাদের মত কত না 'হা-ভাতে' জল পান ক'রে থাকে,
দুই বেলা ভাত পায় নাকো রোজ, কে তার খবর রাখে!—'

কল্পনা নয়—সত্যি

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকারে আমরা যখন বাতি জ্বালি—তখন বেশ বুঝতে পারি, আলো কত শীগ্‌গির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে—মুহূর্ত্ত বলতে যে সময়টুকুর ধারণা মনে আসে তার চেয়েও অনেক কম সময়ে আলো ছিটকে পড়ে। কেমন করে এই আলো ছড়ায়?

আলো জ্বাললেই ইথারে স্পন্দন ওঠে। কথাটি আর একটু পরিষ্কার করে বলি। আমাদের এই পৃথিবীর সব জায়গায় ইথার ছড়িয়ে আছে; তাকে আমরা দেখতে পাইনে, স্পর্শও করতে পারিনে অথবা স্পর্শ করলেও অনুভব করতে পারিনে। যাই হোক, তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রকাণ্ড এক ইথারের সমুদ্রে ডুব দিয়ে বসে আছি। তাই বলছিলাম, আমরা যেই বাতি জ্বালি অমনি আমাদের চারপাশের ইথারে একটি তোলপাড় সুরু হয়ে যায়—তার মানে ইথারের বুকে কাঁপন ধরে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঢেউ-এর সৃষ্টি হতে থাকে। এই ঢেউ আলো বহন করে দূরে নিয়ে যায়।

তোমরা পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে দেখেছ—ঝুপ করে ঢিল পড়লেই অমনি জলে ঢেউ উঠে, আর সেই ঢেউ ধীরে ধীরে কূলের দিকে এগিয়ে আসে। ইথারে আর জলে ঢেউ উঠার ধরণটা ঠিক একই রকম; শুধু প্রভেদ এই—জলের ঢেউ 'গদাই-লস্কর চালে' খুব গম্ভীর মেজাজের উপর চলে, আর ইথারের ঢেউ?—এক সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল গতিবেগে ছোটে! ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখ,—ভাবতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

তোমরা তো রোজ বেতারে গান-বাজনা শোন। কেউ কেউ ত 'রেডিওর দাদুমণির' সঙ্গে বিকেলের দিকে বিলক্ষণ আসরও জমিয়ে বস দেখেছি; কিন্তু কে তোমাদের এইসব আনন্দের খোরাক যোগানোর সহায়তা করছে জান? সেই যে ইথারের ঢেউ! রেডিওর গান-বাজনাগুলো বিদ্যুতের সাহায্যে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়—এ তো তোমরা জান; আকাশে ছেড়ে দেওয়া মানে ইথারের মহাসমুদ্র আলোড়ন করে এক একটি বিশেষ মাপের ঢেউ তুলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তা হলে আমরা মোটামুটি দেখতে পেলাম আলোর ঢেউ আর রেডিওর ঢেউ একই জাতের জিনিস; শুধু তফাৎ এইটুকু—আলোর ঢেউ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম, তাই তার স্পন্দন অতিমাত্রায় দ্রুত—আর রেডিওর ঢেউ বড় বড়, তাই তার স্পন্দন কম। একটি উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে সুবিধে হবে। মনে কর সোনা আর মোহন দুটি ভাই; সোনা মস্তবড়, মোহন ছোট্ট ছেলে। দু'জনে চলেছে ঘুড়ি আর লাটাই কিনবে বলে। এখন পথ চলতে, সোনা যেখানে

দু'বার পা ফেলবে সেখানে মোহন হয়ত চারবার কি ছ'বার পা ফেলে বসে আছে—ছোট ছোট পা বলে; তাকে সোনার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হচ্ছে তো! বুঝলে এবার জিনিসটা? একে বৈজ্ঞানিকরা বলেন—ফ্রিকোয়েন্সি (frequency). বিলেত বা আমেরিকায় আলোকরশ্মি ছেড়েও রেডিওর কাজ চালানো সুরু হয়েছে আজকাল; তাকে বলে Beam Transmission. তোমরা আজকাল সিনেমায় যে টকি শোন, সেও তো এই আলোর খেলা! শিল্পীরা যখন ক্যামেরার সামনে অভিনয় করেন আর কথা বলেন, তখন অন্য একটা যন্ত্র দিয়ে সেই কথার স্বর চলে যায় এমন একটা যন্ত্রে যেখানে কথার বৈদ্যুতিক স্রোত আলোক-তরঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়ে ফিল্মের কথার ফটো উঠে যায়; সেটা হ'ল কথার রেকর্ড!

বাদ দাও রেডিও আর সিনেমার কথা, আলোর কথাই বলি। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল ধ'রে সৃষ্টি আর প্রলয় পাশাপাশি চলে আসছে। একদিকে যখন সুরু হয়েছে ভাঙ্গার কাজ, অন্য দিকে তখন হয়তো চলছে সৃষ্টি। রাতের আকাশের দিকে চেয়ে দেখে মনে হয়, নক্ষত্রেরা বুঝি চিরদিন ধ'রে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মধ্যে বুঝি ক্ষয় নেই; কিন্তু তা নয়—যত কিছু বিস্ময়কর প্রলয়, সৃষ্টি, আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন যাই বল—ওখানেই চলছে সবচেয়ে বেশী। কত নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে, কত নক্ষত্রের ঘটছে মৃত্যু, তার কে হিসাব রাখে! এই যে মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ—এরা আমাদের পৃথিবী হতে হাজার হাজার কোটি কোটি মাইল দূরে আছে। কেউ কেউ আছে তার চাইতেও দূরে—এত দূরে যে, কল্পনায় আসে না। এদেরও ক্ষীণতম আলো আমাদের কাছে এসে পড়ছে; এও সেই ইথার-তরঙ্গের কাজ—যা নাকি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে ছুটেও কোটি কোটি বৎসর পরে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে!

তা হলে তো এমনও হতে পারে—অসীম আকাশের কোন এক সুদূর প্রান্তে এমন এক নক্ষত্রের জন্ম হল যার আলো এখনও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেনি বলে তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিংবা এমন কোন নক্ষত্রের হাজার হাজার বছর আগে মৃত্যু ঘটেছে, অথচ তার আলো এই সবেমাত্র এতকাল পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুলো—আমরা দেখলাম একটা নক্ষত্র জ্বলছে; আসলে তার কোন সত্যিকারের অস্তিত্বই আর নেই! ভোজবাজী মন্দ নয় তো! তবে তো আমরা এও কল্পনা করতে পারি—এই মুহূর্ত্তে কোন এক মন্ত্রের বলে আমরা যদি এমন কোন শক্তি পাই যে, কোটি কোটি মাইল ছাড়িয়ে কোন এক নক্ষত্রলোকে অমর হয়ে চলে যেতে পারি, আর এমন এক শক্তিশালী চোখ আমরা লাভ করি যা দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পাচ্ছি—তা হলে আমাদের এই পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত সবই তো চমৎকার দেখতে পাব!

অনেক কাল আগেকার ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ। আর্য্যেরা হিন্দুকুশ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এদেশে এসে অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে—রাক্ষসেরা ঋষিদের যজ্ঞ পণ্ড করছে। তপোবনে বসে বেদের সূক্ত রচনা চলছে। আর্য্যদের মধ্যে জাতি-বিরোধ লেগে গেল। তমসার তীরে মহাকবি

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করছেন! দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা এবার চেয়ে দেখ, ওঁকে চিনতে পার? পার না? ওটি বৈশালী নগরীর রাজপথ—ভগবান তথাগত ভিক্ষাভাণ্ড হাতে ক'রে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। এঁকে চেনো? ইনি চণ্ডাশোক। তোমরা ইতিহাসে পড়নি যে, মহারাজ অশোক ছেলেবেলায় কি নিষ্ঠুর ছিলেন, তাই তাঁর নাম ছিল চণ্ডাশোক; পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে একদম বদ্‌লে যান। দেখছ না মহারাজ অশোকের লোকেরা আসমুদ্র-হিমাচল ঘুরে ঘুরে ধর্ম্মপ্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে—পাষাণের গায়ে বুদ্ধের মহান বাণী খোদাই করে দিচ্ছে! দেখতে ভাল লাগছে না বুঝি? আলোয় চোখ ক্লান্ত হয়ে এসেছে—খানিক চোখ বুঁজে জিরিয়ে নাও। এবার আবার চেয়ে দেখ পৃথিবীর দিকে। দেখতে পাচ্ছ শাজাহান বাদশাহ্‌কে? দেখছ আগ্রার দুর্গ থেকে সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে হীরার হারের মত—রংমশালের লাল আভায় দিগন্ত রঙ্গিন হয়ে উঠছে, আকাশে উঠছে ফুলঝুরির ফোয়ারা! কি হচ্ছে ওখানে—নওরোজের মেলা বসেছে বুঝি? তা হবে। দেখছ ছুটোছুটি? তাজমহল তৈরী হচ্ছে; তেহারাণ, ইস্পাহান, কাবুল—নানান দেশ থেকে গুণী জ্ঞানী মিস্ত্রি আর বাছাই-করা সব পাথর আসছে ভারতবর্ষে। সোনা-দানা, মোহর, হীরা-জহরত সব হাওয়ায় উড়ছে, দেখছ? রাজার মত মন বটে শাজাহানের।

এ আবার কি? বাদশাহ্‌ আওরঙ্গজেবের জন্মতিথিতে তুলোট উৎসব চলছে। বাদশাহের দেহের ওজনের পরিমাণ সোনা-রূপো গরীব দুঃখী ফকিরদের দান করে দেওয়া হচ্ছে। বাদশাহের দরবার বসেছে—সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে রাজা, জায়গীরদার আর নবাব বাহাদুরেরা এসেছেন সেই সভায়। ছত্রপতি শিবাজীকে অনেক বলে কয়ে নানান চেষ্টা করে ঐ সভায় আনা হল দেখছ? শিবাজী মহারাজকে বাদশাহ্‌ ডাকলেন—"আও শিবাজী মহারাজ!"

শিবাজী মহারাজ তিনবার কুর্ণিশ করে বাদশাহকে অভিনন্দন জানালেন আর দিলেন নানা উপহার। বাদশাহের ইঙ্গিতে ওমরাহ্‌রা তাঁকে এমন এক শ্রেণী লোকের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলে যে, ছত্রপতি রেগেই আগুন—"আমায় কিনা পাঁচহাজারী মনসবদারদের পংক্তিতে দাঁড় করানো!" রেগে শিবাজী হাত নেড়ে চ্যাঁচামেচি সুরু করলেন! সবাই বললে, "থামুন থামুন!" কার কথা কে শোনে—শিবাজী রাগের চোটে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন! সভায় মহা হৈ-চৈ—বিশ্রী কেলেঙ্কারী। বাদশাহ্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি?" একজন বললে—"জাহাঁপনা, বুনো বাঘ দরবারের আদব-কায়দা কিছু জানে না—তাই গরম লেগে ভিরমী গিয়েছে!" বাদশাহের হুকুমে শিবাজীকে অন্যত্র সরানো হল—অবশ্য আসল ব্যাপার টের পেতে বাদশাহের দেরী হল না। শিবাজী হলেন বন্দী! তারপর ঐ দেখ সেই সন্দেশের ঝুড়ি চলেছে—শিবাজী সেই কপট ব্রতের ভাণ করে পালাচ্ছেন।

বাংলাদেশের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ত। পর্ত্তুগীজ জলদস্যু আর আরাকানী মগদের কি অত্যাচার! আবার পৃথিবীর ওপাশটায় চেয়ে দেখ—আদিম রেলগাড়ী চলছে—বর্ত্তমান রেলের ওটা

পূর্ব্বপুরুষ! ইঞ্জিনের আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে লোক ছুটছে, হাঁকচে—"রাস্তা ছাড়, রাস্তা ছাড়!" আশপাশের লোক হাঁ করে তাজ্জব ব্যাপার দেখছে! ছেলেরা হাততালি দিচ্ছে।

বিশ্বাস করছ না এসব? এই ত নিজের চোখেই সব দেখলে! তাই তো! আমি ভাবছি এতক্ষণ ধরে যে তোমাদের কাছে এত কথা বললাম, সবটা বুঝি বৃথাই গেল।

শারদীয়া

শ্রীআশা চৌধুরী

আশ্বিনের শুভ সুন্দর উজ্জ্বল প্রভাত, যেন কেউ আকাশ ছেয়ে নীল আঁচল দুলিয়ে লুকোচুরি খেলছে। ক্ষণে ক্ষণে তাতে নবীন রবির অরুণ স্পর্শে সোনার ঝিকিমিকি লাগছে।

শরতের এই মোহন সাজ দেখে খুসীতে মন হয়ে উঠলো দুরন্ত শিশুর মতো চঞ্চল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মা আসছেন এইবার—বাতাস এসে সুরে সুরে এই সংবাদ জানিয়েছে। ধরিত্রীর তনু ঘিরে নবশ্যাম বস্ত্র। উদ্দাম কালো কুন্তল কাশের বনের শুভ্র বুকের পাশে ভরা নদীর বাঁকে স্রোতে স্রোতে বেয়ে চলেছে। জগজ্জননীর অর্ঘ্য রচনা হয়েছে আপন খুসীতে। এ আনন্দ-মঞ্চে বিশ্বের বুকে আহ্বান এসেছে—ওরে ধনী, দরিদ্র, দুঃখী, তাপী, সুখী, প্রেমিক, কবি! বিশ্বজননীর হৃদয়ে সবাই সমভাবে পাবি স্থান। সায়রের ফুল, বনের কুসুম, গৃহাঙ্গনের তুলসী-মঞ্জরী মায়ের কমলচরণের স্নেহস্পর্শ সবাই পাবে আজ। মায়ের আশীর্ব্বাদে সবাই হবে আজ ধন্য!

কর্ম্মনিরতা বধূর কল্যাণ-হস্তের কাঁকন দুটি বাজছে নতুন সুরে। মন চলে যায় করুণ আঁখির উদাস দৃষ্টির সাথে—অজানার উজানে—ভিন্ গাঁয়ে, যেখানে তা'র মা করছেন পূজার সাজ। সেখানে তা'র ছোট্ট ভাইটি জিজ্ঞেস কচ্ছে—মা, দিদি আসবে না—পূজো তো এসেছে? মার চোখে জল এলো—তারই ছোঁয়ায় সামনের সব কিছু মুছে যায়; মনে পড়ে আদরিণী মেয়ের কথা—এক দরিদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র উমা।

দুয়ারে বাউল গাইছে—ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী। আনন্দহীন গৃহে আনন্দহীন হৃদয়মন্দিরে এলো আনন্দময়ী—দয়াময়ী!

শরৎ করে 'আসি আসি'—

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আজ সকালে আকাশখানার
মুখখানি যে হাসি হাসি,
বাদল মেঘের অন্তরালে
শরৎ করে 'আসি আসি';
আব্‌ছা মেঘের আড়াল দিয়ে
ঝরছে আলো ঝিল্‌মিলিয়ে,
হাস্‌ছে যেন খিল্‌খিলিয়ে
সুখ স্বপনে ভাসি' ভাসি';
শরৎ করে 'আসি আসি'।

শরৎ-রাণীর চরণ-ধ্বনি
শুন্‌ছি যেন কানে কানে,
বাতাস হোলো উতল, অধীর,
ভরলে নতুন গানে গানে;
আমন ধানে অমন করে'
কার ও সোনার হাসি ঝরে,
তাজা তৃণের বুকের পরে
শিউলি ঝরে রাশি রাশি;
শরৎ করে 'আসি আসি'।

সারা বেলায় মেঘের ভেলায়
কে চলেরে দুলে দুলে,
হাজার চামর কে সে ঢুলায়
শুভ্র কাশের ফুলে ফুলে?
জগৎ-জোড়া আঁধার রাজে,—
ভীষণ মরণ-বিষাণ বাজে,
মোদের ঘরে আস্‌বে মা-যে
সকল আঁধার নাশি' নাশি';
শরৎ করে 'আসি আসি'।

বাঁচবার উপায়

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, এম্-বি

ভাদ্রের পর]

গত বারের শিশুসাথীতে বলেছিলাম—আগে অনেকের ধারণা ছিল বাঙ্গালীদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'আমিষ' অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যাংশ থাকে না বলেই সাধারণতঃ বাঙ্গালাদেশের লোকগুলো রোগাটে, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়।

কিন্তু সে ধারণার পরিবর্ত্তন হয়েছে, অর্থাৎ বাঙ্গালীদের ক্ষীণ, দুর্ব্বল দেহের জন্য একমাত্র 'আমিষ' খাদ্যাভাবই নয়, আরো অন্য কারণ আছে। সেটা কি জান? আমরা অর্থাৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা যে সব খাদ্যদ্রব্য খাদ্য হিসাবে সচরাচর খেয়ে থাকি, তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'খাদ্যপ্রাণ' বা 'ভাইটামিন' থাকে না, সেইজন্যেই আমরা বেশীর ভাগ 'তালপাতার সেপাই'। দেহে একতিল জোর নেই, বুকের পাঁজরা গোণা যায়, একটু দৌড়ালেই হাঁফ ধরে। দু'মাইল হাঁটলেই পা ব্যথায় টন্-টন্ করে। শরীরের উপর একটু অনিয়ম বা অত্যাচার হলে মাথা ঘোরে, হাত-পা কাঁপে। একটু বড় হয়ে যখন সংসারে প্রবেশ করি, তখন নিত্য উঠে চোঁয়া ঢেকুর, অম্বল, ডিস্পেপসিয়া, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়; ফলে চশমার লেন্সের পাওয়ার দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। এর উপর আজকাল আবার একটা বড়মানুষী রোগ দেখা দিয়েছে, নাম তার 'ব্লাডপ্রেসার' বা 'রক্তচাপ বৃদ্ধি'! এ-সকল ছাড়া বাত, বায়ুর দোষ, অনিদ্রা, মাথা কন্-কন্—আরো কত কি উপসর্গ ত সঙ্গে সঙ্গে আছেই!

কুণুরে বৈজ্ঞানিকের দল গবেষণা করছিলেন, কি উপায়ে কম খরচায় ভাল পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখলেন, যথেষ্ট পরিমাণে দুধ বা মাখন-তোলা দুধ খেতে পারলে শরীর ভাল হতে পারে; কিন্তু সাধারণ ছা-পোষা গৃহস্থের পক্ষে রোজ রোজ যথেষ্ট পরিমাণে দুধ বা মাখন-তোলা দুধ খাওয়া সম্ভব কোথায়? তা হলে উপায়? বৈজ্ঞানিকের দল ভেবে ভেবে একটা উপায় স্থির করলেন। খাদ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ 'ক্যালসিয়াম' (চূণ) ও 'ফস্ফরাস' মিশিয়ে একদল ইঁদুরকে খাইয়ে দেখতে লাগলেন; ফলে দেখা গেল, ইঁদুরগুলোর ওজন যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের দরিদ্র গৃহস্থরা রান্নায় একটু বেশী পরিমাণেই হলুদ লঙ্কা প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ঐ সব মশলাতে 'ক্যালসিয়াম' ও 'ফস্ফরাস' একটু বেশী পরিমাণেই থাকে। যদিও মশলা হিসাবে রান্নার সময় যে পরিমাণ 'ক্যালসিয়াম' ও 'ফস্ফরাস' খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, দেহ বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে তা আদৌ কার্য্যকরী হয় না, তবু দেহের মধ্যে যে রক্ত চলাচল করে তা'র 'ক্যালসিয়াম' ও 'ফস্ফরাসের' পরিমাণ যে বেড়ে যায় খানিকটা সে বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহই নেই। রক্তে

'ক্যালসিয়াম' ও 'ফস্‌ফরাসের' পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কিছুটা স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। কিন্তু সেজন্য রান্নার সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণ মশলা মিশিয়ে কেউ যেন আবার দুধ ও মাখন-তোলা দুধের অভাব মিটাতে অগ্রসর না হন। কেননা খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণ মশলা দিয়ে রান্না করলে, পাকস্থলী (Stomach) ও অন্ত্রের (Intestine) মধ্যে জ্বালা করে; এমন কি, অনেক সময় ঘা পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

এই সব কারণেই সাধারণতঃ যাদের ডাল-ভাতই প্রধান খাদ্য তা'রা যদি একটু দুধ খেতে পারে, তবে বোধ হয় তাদের দেহের 'ক্যালসিয়াম' ও 'ফস্‌ফরাসের' অভাবটা মিটতে পারে। কিন্তু আগেই বলেছি, শতকরা প্রায় ৯০ জন বাঙ্গালী গৃহস্থের অবস্থা এমন যে, ডানে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। সুস্থ পুষ্টিকর খাদ্য যে একমাত্র সুস্থ ও সবল দেহের জন্যই দরকার তা নয়; সুস্থ ও সবল মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিশক্তির জন্যও একান্তই প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীরা সাধারণ যে সব খাবার খান তা'র মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি আছে। অথচ সেই খাদ্য তালিকার সামান্য অদল-বদল করলেই অনেক উপকার পাওয়া যেতে পারে।

কুণুর গবেষণাগারে আমাদের খাদ্য-তালিকা সম্পর্কে ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল যে মতামত জানিয়েছিলেন, সেটা আমার মতে সকলেরই সাধ্যমত পালন করা উচিত। এবারে সেই সম্পর্কেই কিছু বলব। কেননা আমাদের শিশুসাথীর পাঠক ও পাঠিকাদের মধ্যে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও অবস্থাপন্ন সকল প্রকার লোকই আছে। সেই জন্যই আয়ের তারতম্য অনুসারে খাদ্য-তালিকা হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমেই দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থদের কথা ধরা যাক। তাদের দৈনিক একটা মোটামুটি খাদ্য-তালিকা দেওয়া হলো—

কলে ছাটা চাল	···	আধ সের।	শাকসব্জী	···	১/৮ ছটাক।
ডাল	···	এক ছটাক।	মাছ	···	১/২ „
তেল	···	১/৮ ছটাক।	মশলা (হলুদ, লঙ্কা)	···	১/২ „
তরিতরকারী	···	৩/৪ „	লবণ	···	প্রয়োজন অনুসারে

উপরে যে খাদ্য-তালিকা দেওয়া হলো, সেটা গবেষণা করে দেখা হয়েছে, ঐ খাদ্যের মধ্যে আছে—

আমিষ বা প্রোটিন-এর পরিমাণ		৫১ গ্রাম	লোহার পরিমাণ		১৫ মিলিগ্র্যাম
চর্ব্বি বা ফ্যাট্ „ „	···	১২ „	'খাদ্যপ্রাণ' বা 'ভাইটামিন 'এ'	৫০০	ইউনিট
শর্করা বা কার্ব্বোহাইড্রেট „	···	৪১৮ „	„ „ 'বি'	১৬০	„
ক্যালসিয়াম „	···	০·১৭ „	„ „ 'সি'	১৫	মিলিগ্র্যাম
ফস্‌ফরাস „ „	···	০·৭৬ „			

এই খাদ্য-তালিকা মাত্র ২১৬৩ ক্যালরি উত্তাপ বা energy দিতে পারে। অথচ আমরা আগেই বলেছিলাম, অল্প পরিশ্রমী একজন সাধারণ লোকের পক্ষে দৈনিক অন্ততঃ এমন খাদ্য

খাওয়া চাই যাতে করে অন্ততঃপক্ষে ২৪০০ ক্যালরি পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি ও নিত্য দেখছি, দরিদ্র বাঙ্গালীরা কি কষ্টে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করে! লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে! অকালে কত সুন্দর শিশু, যুবক ইত্যাদি অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরণকে আলিঙ্গন দিচ্ছে!

ওগো শিশু আর শিশুসাথী, এর প্রতিকার আজ তোমাদেরই হাতে। একদিন তোমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ দু'ঘণ্টায় হেঁটে দশ ক্রোশ পথ চলে যেতেন; হাতের কব্জীতে এত জোর ছিল যে, সামান্য একটা লাঠি হাতে বাঘের সামনে অকুতোভয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন। সে সব কথা আজ গল্পে পরিণত হয়েছে! আমাদের এই বসুন্ধরা ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা ছিল। মাঠে মাঠে এর ধান ধরত না। গোঠে গোঠে এর চরত দুগ্ধবতী ধেনু! আর আজ ঘরে ঘরে দুঃখ-দৈন্য! নিজেদেরই বুদ্ধি ও কর্ম্মদোষে আমরা আজ অধঃপতনের শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের স্বাস্থ্য নেই, প্রতিভা নেই, অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই—এক কথায় মানুষের মত বেঁচে থাকবার কিছুই নেই!

দরিদ্রের খাদ্য-তালিকা দেখলে মনে হয়, ওটা খুব নিকৃষ্ট। কেবলমাত্র 'শর্করা' ছাড়া অন্য কোন খাদ্যের অংশই উপযুক্ত পরিমাণে তাতে নেই। সেই জন্যই স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে যায়। সামনের বার আলোচনা করব, কেমন করে ঐ খাদ্য-তালিকাকেই অদল-বদল করে, ঐ খাদ্য-তালিকায় যা খরচ হয় তার চাইতে কম খরচে নতুন খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং সুন্দর সবল স্বাস্থ্য লাভ করতে পারা যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

প্রিয় **কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন** ইত্যাদি—

এ বৎসর শিশুসাথীর **চাঁদা** দেওয়া হয়নি। তাই শিশুসাথী **পাবনা**। আমার বাবার নাম **চন্দ্রকান্ত নাথ**। তিনি **ছোটনাগপুরে** বদলী হয়েছেন। বেশ্ ভাল জায়গা নয় কি? কাল **বৈকালে** খবর পেলাম। আমরা এখন **যশোহরেই** থাক্‌বো। পূর্ব্বে ত জানই, আমরা **Mymensing**এ থাকতাম। কাকা এখন আছেন **কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে** আর দাদা থাকেন **সোয়ানসিতে**। শুনেছি তাঁরা **হালে** যাবেন, অথবা **ফ্রি টাউনেও** যেতে পারেন। ভালকথা, আমাদের দেশের বাড়ীর একটি **দেওয়াল** পড়ে গেছে। দেশের বাড়ীতে গেল বছরের শিশুসাথীগুলো এক বাণ্ডিল পুরাণো কাগজের নীচে **ঢাকা** আছে। ইতি

তোমারই—**নেপাল**

উত্তরদাতাদিগের নাম

যাদের শুদ্ধ হয়েছে—সবিতা, আশিস, নমিতা আইচ, মহিষাদল; সতী সরকার, লব, কুশ, পিনাক, শঙ্কর, নিতাই, ১৭৫১৬নং গ্রাহক; ছায়া মিত্র, কলিকাতা; দেবাশিস গুহ, মহিষাদল; পটল, মধ্যম, নোটন, লক্ষ্মী, কাগ্রাম; ভগবানশরণ ও গোবিন্দদাস, ঢাকা; অনিন্দ্যসুন্দর রায়, অণি, পনি, পিকা, মল্ল, মঞ্জু, রমনা—ঢাকা; বরুণকুমার সরকার, রাউতভোগ; নৃপেন, শক্তি, অমর, হেমাঙ্গ, হরিদাস, বিমল, অমল, কালী, বৈদ্যনাথ, খগেন, অমিয়, সুকুমার, অনিল, টুনি, টোনা, রমেন, খোকা, লক্ষ্মী, টুলি, গুলু, মুক্তি, টুকু, দীপু, মন্টু, ভোলা—আমহাটি; নিরঞ্জন, প্রিয়রঞ্জন, জ্ঞানরঞ্জন, বেলা ও শীলা গুহ, বরিশাল; মাষ্টার ভোম্বল, অহিভূষণ চৌধুরী, রাজসাহী; মণ্ডল ব্রাদার্স, পোদ্দারদিহি, ১৯১০৯ নং গ্রাহক; বঙ্কিম, স্বদেশ, দুলাল, মোস্তাফা, নূর এছলাম, বামনী।

যাদের একটি ভুল হয়েছে—সুনীল রায়, কাথুলী; শান্তি চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিং; অনিল, নীলিমা, অণিমা, প্রতিমা, কায়েতটুলী—ঢাকা; মণীষা বসু, সুনীতি, সত্যব্রত ও সুহাস জিয়ালগড়া; তপন, তরল, নূপুর, বুলু, মাধুরী, মঞ্জু, মায়া ও শশাঙ্ক, কাটিয়াপাড়া; গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর; সুলেখা, শ্রীলেখা, পুরু, প্রীতিকণা, চিন্ময়ী আমিরাবাদ; গৌরী বানার্জ্জি, উয়ারী—ঢাকা; তাপস, পাপড়ি, ভানুবাবু, মণ্টুস, মঞ্জু, দীপা, কৃষ্ণা ও সুবোধ, সিয়ারশোল; সুধীন, নিয়তি, গোপাল, গুলু, আরতি, দীপু, নীরু, কমলা, ১৮৪২০ নং গ্রাহক; শিবরাম মাঝি, ত্রিভঙ্গলাল মাঝি, উমেশ সিকদার, মণীন্দ্রনাথ কুইরী, মদনানন্দ মুখোপাধ্যায়, মহবুব, আলম, রঘুনাথ মাঝি, ব্রহ্মানন্দ মাঝি, শিবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পারা মধ্যইং স্কুল; দেবেশ, রতীশ, বিকাশ, আকাশ, কালিয়াকৈর; নীলিমা রায়, পারইকোরা স্কুল; গৌরগোপাল কুণ্ড, কালিন্দীপাড়া; শান্তি, তারা, চটপটি, শঙ্কর, ঠাণ্ডু, খুসী ও অমূল্য, কাঁইচাইল; সত্যেন, শৈলেন, সমর, শচীন, রাণু, শেলী, বেলা, কবিতা, স্বপন, জাপানী, লুটু, পটু ও রেখা—ঘাটাল।

যাদের দুটি ভুল হয়েছে—লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী, মালদহ; অরুণা মিত্র, বাঁকুড়া; নীরেন্দ্রকুমার, শৈলেন্দ্রকুমার, অবনীন্দ্রকুমার, অমলকুমার, শিবরাম, প্রভাবতী, বিভাবতী ও মীরারাণী, জবড়রাপাড়া; জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্যবৃন্দ, গালিমপুর; গীতা বসু, পটুয়াখালী; পরিমল দাস, কাঁথি; বিমলচন্দ্র খাসনবিশ, বেনারস; আবুল আতহার মোহাম্মদ ছাজ্জাদুল হক, মাণিকগঞ্জ; ধ্রুবজ্যোতি দাশগুপ্ত, ১৬৪১৮ নং গ্রাহক; মণীশচন্দ্র রায়, মাণিকগঞ্জ; শান্তিধন ভট্টাচার্য্য, রাম, শাম্ভু, মলিনা, অমল, শিশির, সমীর, সন্তু, প্রতিমা ও দুলু, কাশিগৌরী; এম. বথস, রহমান, আখাজ, হেনা, মনসুর, মণি, টুকু, হানি, অহি, মহি, গোলাম, পিরোলী—যশোহর।

যাদের তিনটি ভুল হয়েছে—শ্যামপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, অভিরামপুর; রঞ্জু, পার্ব্বতী, রাণী, ভানু, পরিমল, প্রবীর, সন্টু, শক্তি, বাদল, কাঁথি; ডলি, আরতি, কঁহরী, খোকন, নাড়ু, অমল, ফটিক, রাণী ও কুমারী রেণুকা সেনগুপ্তা, বালিগঞ্জ—কলিকাতা; উমেশ, সুরেশ, সুশীল, সাধন, বীরু, বিশু, কৃষ্ণ, হরি, গামা, নন্দা খুকু, মনু, রাসু, বিপু, নীরু, শঙ্কর, চিত্ত—কুমিল্লা; গৌরচন্দ্র বিশ্বাস ও হীরেন্দ্রনাথ রায়, উলপুর।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

পোষ্টাফিসের গোলমালের দরুণ ভাদ্রমাসের পত্রিকা ডাকে দিতে আমাদের তিন দিন দেরী হইয়াছিল। এজন্য আশ্বিন সংখ্যা আমরা ২০শে ভাদ্রের মধ্যে ডাকে দিতেছি। আশা করি কার্ত্তিক সংখ্যা আমরা ১৫ই আশ্বিনের মধ্যেই গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট পাঠাইতে পারিব।

*Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Sankhari Bazar, Dacca
and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.*

একবিংশ বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩৪৯	৭ম সংখ্যা

আগমনী

শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ দত্তরায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-সরস্বতী

শরৎ আজি এলো আমার প্রাণে।
আকাশ বাতাস মুখর হলো,
পাখীর গানে গানে।

বেতস-বনটী হাওয়ায় দোলে
খেল্‌চে খেলা নদীর জলে,
যুঁই-মালতী শেফালিকার
লুকোচুরি চাঁদের সনে।

তা'রা আমার সাথী হলো,
গানে গানে মন ভোলালো,
আগমনীর সুরটী আমায়
দিল কানে কানে।

আয় রে শুচি, আয় অশুচি,
অশ্রু-বেদন আয় রে মুছি',
মায়ের পূজা করবো মোরা
হরষভরা প্রাণে।

উঠো—জাগো

ডাঃ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম্. এস্-সি., পি-এইচ্. ডি.

আজ মায়ের পূজোর শুভদিনে তোমাদেরে জাগরণের কথা শোনাব।

গ্যালিলিও যখন প্রচার করলেন, পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে—এত বড় সত্যের আবিষ্কারের পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড। ডারুইন যখন প্রমাণ প্রয়োগ ক'রে দেখালেন, মানব কিংবা অন্যান্য প্রাণী বা জীবজন্তু ভগবানের সৃষ্ট নহে—কোটি কোটি বৎসরের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে উহারা বর্ত্তমান পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন ক্রীশ্চান মহলে তাঁকে যৎপরোনাস্তি অপদস্থ হতে হয়েছিল,—কারণ বাইবেলে লেখে, ভগবান মানবের আদি পিতামাতাকে আপন অঙ্গ হতে সৃষ্টি করেছিলেন কয়েক হাজার বছর আগে। সূর্য্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণের বিজ্ঞান-সম্মত কারণ হিন্দু জনসাধারণকে বোঝাতে যাও, স্থান কাল ও পাত্র হিসাবে মার খাওয়া তোমার ভাগ্যে কিছু অসম্ভব কথা না-ও হতে পারে।

কিন্তু সভ্য জগতে আর কেহ ক্রমবিবর্ত্তন-বাদ অবিশ্বাস করে না। আর পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘোরে এবং সূর্য্যগ্রহণ হয় পৃথিবীর ছায়া সূর্য্যের উপর পড়ার ফলে,

সে-কথা আমাদের এই বৈজ্ঞানিক যুগে অবিশ্বাস করলে সভ্য লোকে তোমাকে মূর্খ এবং কুসংস্কারাপন্ন বলবে, যা আজিও অন্য দেশের লোকে আমাদের সম্বন্ধে ব'লে আসছে।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের প্রকাশ তো হবেই। সেই আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে অন্যান্য সভ্য দেশের ছেলেমেয়ে জ্ঞান-গরিমায় এগিয়ে চলেছে, আর তোমরাই কি থাকবে পিছিয়ে? তোমাদের কি কিছু কিছু জানতে ইচ্ছা করে না?

রামায়ণে তোমরা পুষ্পকরথের কথা জেনেছিলে। রঘুবংশে লঙ্কা থেকে রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের অপূর্ব্ব বর্ণনা প'ড়ে কবির কল্পনাকে তোমরা তারিফ করেছো। কিন্তু সেই কল্পনা যে আজ বিজ্ঞানের বলে বাস্তবে পরিণত হয়েছে, সেটা কেমন ক'রে সম্ভবপর হলো তা'র খবর কি তোমরা সকলেই জানবে না?

তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছো তোমাদের কাহারো কাহারো ঠাকুরদাদা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তীর্থভ্রমণে চলেছেন, মনে মনে জানেন হয়তো বা আর ফিরবেন না। কিন্তু আজ রেল, মোটর, আকাশযানের সাহায্যে দূর অতি নিকট হয়েছে, আর ফিরবো না ভাব নিয়ে তীর্থদর্শনে বা বিদেশে কাহাকেও যেতে হয় না। কে সে সব মনীষী যাঁদের বিজ্ঞান-সাধনার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে! তাঁদের কথা এবং তাঁদের সাধনালব্ধ আবিষ্কারের কথা বিশদভাবে জানতে কি তোমরা চাও না?

একটি বালক বসে বসে দেখছে, কেট্‌লির ঢাকুনিটাকে বাষ্প ঠেলে উঠাচ্ছে। হাত দিয়ে সে ঢাকনিটা চেপে ধরলো, তবুও আরও জোর ক'রে বাষ্প সেটাকে ঠেলে উঠায়! বাষ্পের এত জোর! কোন্ কাজে একে লাগানো যায়? পরীক্ষা করতে করতে আবিষ্কার হলো ইঞ্জিনের। আর একজন বাগানে বেঞ্চের উপর বসে আছে, দেখলো, গাছ থেকে একটি ফল খসে মাটিতে পড়লো। ফল কেন মাটিতে পড়ে, সেটা চিন্তা করতে করতে আবিষ্কার হলো মাধ্যাকর্ষণের থিওরি। অথচ এ তো আমরা রোজই দেখছি; কিন্তু কেমন করে দেখলে উপরের ঘটনা থেকে এত বড় আবিষ্কারের সম্ভাবনা হয়েছে, সে-কথা তোমরা জানলে তো তোমরাও একদিন এই সমস্ত অতি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে কত বড় বড় আবিষ্কার করতে পারো!

এককালে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের কাছে থেকে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর দেশ থেকে লোক আসতো জ্ঞান আহরণ করতে। তখন আমাদের দেশ ছিল জ্ঞান-গরিমায় এবং অন্য পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ। আর আজ আমাদের অবস্থা কি?

তোমরাই তো আবার আমাদের সেই নষ্টগৌরব ফিরিয়ে আনবে, নষ্টগরিমা উদ্ধার করবে। তোমাদের উপরই তো সেই ভার পড়েছে। তোমরা কি এখনও জাগবে না? সেই অতীত গৌরবের স্মৃতি আঁকড়েই প'ড়ে থাকবে?

তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে, ভারতবর্ষ কোথায় তা বিলেতের অনেকেই জানে না। সাধারণ লোকে জানে মাত্র দুইটি নাম—গান্ধী আর আগা খাঁ। আজকাল নেহেরুর নামও অনেকেই জানে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, রামন, মেঘনাদ, রাধাকৃষ্ণনের নাম জানে মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজের লোক। ৪০ কোটি ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যদি নাম করতে খুঁজে পাই আমরা আট-দশ জনকে, তাহ'লে পশ্চিম যদি আমাদের সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করে, তবে সেটা কি অন্যায় হবে?

তাই তোমাদের কাছে আমার বলার কথা—যে ভার তোমাদের উপর পড়েছে সেটা তোমরা প্রাণপণ ক'রে সম্পাদন করবে।

তোমরা উঠো—জাগো—দেখো পৃথিবী আজ আলোয় আলোয় ভ'রে গেছে, আর তোমরাই কি থাকবে সুধু আঁধারে!

পাথরের আলো

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

চল্‌তে চল্‌তে রঞ্জিৎ পিছন ফিরে তাকালো—

ঐ নিচে ডুন-উপত্যকা মেঘের মায়ায় ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে।

বাঁ দিকে পাহাড়ের গায়ে হেলান দেওয়া মাইল-পোষ্টের দিকে সে তাকিয়ে দেখলে ইংরেজী সংখ্যায় লেখা—চার। আর মাইল তিনেক উঠ্‌লেই মুশৌরী শহর।

তা'র সঙ্গে উঠছিল কয়েকজন পাহাড়ী। তাদের মাথায় টুপি, গায়ে কালো রঙের কোট, পরনে পা-জামা, পায়ে জুতো, পিঠে বোঝা মাথার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। পোষাক পাহাড়ের ধুলোয় মলিন, ঘাড়ের কাছে পুরু হয়ে ময়লা জমে শুকিয়ে আছে,

দাঁতগুলোর রঙ হলুদ ; শরীর ও পোষাক থেকে ঘাম ও ময়লার একটা উৎকট গন্ধ বার হচ্ছে। বোঝার ভারে তাদের দেহ নুয়ে পড়েছে। তা'রা একজন ছিল রঞ্জিতের আগে, দুজন ছিল পাশে, আর দুজন আসছিল পিছনে।

রঞ্জিতের ইচ্ছা হচ্ছিল, লোকগুলোকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু কে যেন তাকে পিছন থেকে টানছিল ; পা দুখানা তেমন জোরে চলছিল না ; উপরন্তু প্রখর রোদে ও শ্রমে শরীর ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত হয়ে পড়েছিল।

সে গায়ের কোটটা খুলে হাতে নিলে। তুষারের শৈত্য বয়ে বাতাসের একটা দমকা সুগভীর খদের ওপার থেকে এসে তার কপালে ও গায়ে লাগ্‌ল।

পাহাড়ীরা দুটি-একটি শব্দে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলো ; একটু একটু হাসলোও।

রঞ্জিতের মনে হ'ল, এই কথা ও হাসি যেন তাকে লক্ষ্য করেই···সে ফিরে দেখলে ; কিন্তু তাদের গৌরবর্ণ লাল্‌চে মুখ হিমালয়ের পাথরের মতই অবিকৃত। সে মনে মনে বল্‌লে—"অসভ্য, বর্ব্বর!"

সে তাদের দিকে আর মনোযোগ দিলে না। চারধারের দৃশ্যে যথাসম্ভব আনন্দ উপভোগ করতে করতে পার্ব্বত্য পথ ধ'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

পথটা যেন হিমালয়ের একটি ধমনী—আঁকা-বাঁকা, মোটা-সরু, কোথাও সাপের মত কুণ্ডলি-পাকানো, কোথাও সরল, কোথাও হঠাৎ খানিক নিচে নেমে আবার হঠাৎ উপর দিকে উঠে গেছে। একটা অভিনব কিছু করবার জন্য যে পথে মোটর চলাচল করে, সে পথ ছেড়ে রঞ্জিৎ এই পায়ে-চলা পথটি বেয়ে ডুন থেকে মুশৌরিতে উঠ্‌ছে।

পাহাড়ের গায়ে অর্দ্ধ বৃত্তাকার ছোট ছোট শস্যক্ষেত্রগুলি 'গ্যালারির' মত সাজানো, তাদের সামনে বিরাট উপত্যকা বন-সবুজ। তার উপর—বিশাল ডানা মেলে ঈগল উড়ছে। কিন্তু রঞ্জিতের নিচে পথের পরেই সুগভীর খদ্‌। তারপর সু-উচ্চ গম্ভীর পর্ব্বতগুলি মালার মত প্রসারিত হয়ে উত্তরে মেঘে মিশে গেছে। পাইনবনের ঝাঁঝাল গন্ধ আস্‌ছিল ; পথের পাশে পাথরের আড়ালে, ফাটলে, মাটিতে ফুল ফুটেছে—গাঢ় হলুদ, টকটকে লাল, ঘন নীল রঙ্‌। রঞ্জিৎ ডান দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, পাহাড়গুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ঐ পুঞ্জীভূত সাদা···নন্দাদেবীর তুষার-মুকুট নয় কি ?···না···মেঘ, সাদা মেঘের পুঞ্জ হিমে জমে অসাড় হয়ে আছে। এখান থেকে নন্দাদেবীকে দেখা যায় না।

সামনে বাঁ দিকে ঐ হিমালয়ের চূড়ায়, উপত্যকায় মুশৌরি শহর যেন মেঘের পুরু পশমী ঢাকা একপাশে সরিয়ে ফেলে রোদ পোহাচ্ছে···বাড়ি-ঘরগুলো যেন শিশুদের খেলাঘর, কোথাও ছড়ানো, কোথাও গায়ে গায়ে।

রঞ্জিতের গলা শুকিয়ে এসেছে—এই সময়ে একটু ছায়া, একটু জল যদি পেত, অথবা কারো কাছে নিজের অবস্থাটা বল্‌তে পারত !

পাহাড়ীগুলো উঠ্‌ছে সমানে বুকে হাত দুখানা চেপে সামনের দিকে ঝুঁকে। উপর থেকেও জনকয়েক নাম্‌ছিল। তবে তা'রা সকলে পাহাড়ী নয়—কেউ কেউ সমতলবাসী।

রঞ্জিৎ কিছুক্ষণ নীরবে উঠে গেল। কিন্তু এক জায়গায় পৌঁছে সে একটু বেশি রকম শ্রান্তি বোধ করতে লাগ্‌ল। নিজের আভিজাত্য ও শিক্ষার গর্ব্ব আর চাপতে পারলে না ; অগত্যা পাশের পাহাড়ীটিকে অপূর্ব্ব হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে কোথাও জল পাওয়া যাবে না ?"

কথাগুলি শুনে লোকটি একটু হেসে জবাব দিলে—"না।"

জল নেই ? হিমালয়ে জল নেই ? এদের তৃষ্ণা পায় না ? এদের দেহ রক্ত-মাংসের নয় ?

সৌভাগ্যবশত কিছুদূরে পাহাড়ের কোলে ও পথের নিচের দিকে ঢালুতে ছিল পাইন ও অন্যান্য পার্ব্বত্য বৃক্ষের একটি বন। জায়গাটি সেইজন্য হয়েছে ছায়াচ্ছন্ন, স্যাঁৎসেঁতে। নিচে থেকে ধোঁয়া উঠ্‌ছিল। পাতা ও কাঠ পোড়া গন্ধ নাকে লাগছে। রঞ্জিৎ পথের ধারে সরে গিয়ে দেখলে নিচে একটি আলিসার মত জায়গায় রয়েছে দু'তিনখানা কুটির—সম্ভবত পাহাড়ীদের। বনটা নিচে অনেকদূর পর্য্যন্ত গেছে নেমে।

সে সেই ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটিতে পাহাড়ের কোলে একখানি পাথরের উপর বসে পড়্‌ল। পাহাড়ীরাও পিঠের বোঝা নামিয়ে তা'র কাছ থেকে বসল একটু দূরে। তাদের মধ্যে জন দুই বোঝা থেকে দুটি ছোট থলি বার ক'রে সে দুটো নিয়ে গেল নিচে নেমে, বোধ হয় সেই গ্রামে।

সেই সময় হঠাৎ একটা কলরব শোনা গেল ; শব্দটা কোন্ দিক্ থেকে আস্‌ছে রঞ্জিৎ বুঝ্‌তে পারলে না। তার মনে হ'ল, কতকগুলি মেয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে করতে এগিয়ে আসছে। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল ; পাহাড়ী কয়জনও প্রথমটা একটু চঞ্চল

হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু আবার তেমনই শান্ত হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে দুটি-একটি কথাবার্ত্তা বল্‌তে লাগ্‌ল।

মিনিটখানেক কাট্‌তে না কাট্‌তে নিচ থেকে উঠে এল চার-পাঁচটি পাহাড়ী কিশোর। পথে যে আর কেউ আছে, সেদিকে তাদের খেয়ালই দেখা গেল না; এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুর্ব্বোধ্য হিমালয়ী ভাষায় তা'রা নিজেদের মধ্যে বচসা করতে করতে মাঝে মাঝে পরস্পরকে ঠেলা দিতে লাগ্‌ল। তাতে যে নিচে পড়ে যাওয়া সম্ভব সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই!

রঞ্জিৎ তাদের কথার দিকে কান পেতে থাক্‌তে থাক্‌তে—'স্কুল', 'মাষ্টার সাহেব', 'সান্‌ডে' —এমনই দুটি একটি সর্ব্বজন-বোধ্য শব্দ বুঝ্‌তে পারল মাত্র। আর বুঝল যে, এই পাহাড়ী কিশোরগুলি কোন একটি ইংরেজী স্কুলে রীতিমত পড়ে।
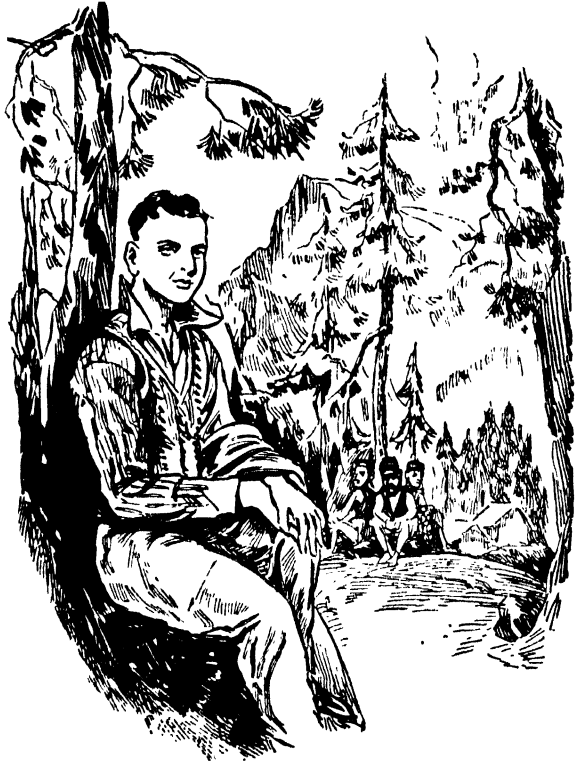
তাদের মধ্যে যে ছেলেটিকে বোধ হচ্ছিল সব চেয়ে অপরিচ্ছন্ন, সে কি একটা কথা ব'লে দল থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। বাকী সকলে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে মুখ বিকৃত ক'রে কি যেন ব'লে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোমল রক্তিম মুখে ফুটে উঠ্‌লো হাসি। পথে যারা ছিল এবার তাদের দৃষ্টি পড়লো তাদের দিকে—রঞ্জিৎও বাদ গেল না।

রঞ্জিতের ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল, এই নিরেট, কঠিন হিমালয়-সন্তান কয়টির সঙ্গে একটু আলাপ করে; দেখা যাচ্ছে, এরা ঐ কুলিগুলোর মত একেবারে বর্ব্বর নয়। ছায়ায়

বিশ্রামে যেন তা'র পিপাসার কিছু উপশম হয়েছে, শ্রান্তিও আর নেই। তবে উঠ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে না।

ছেলেগুলির মধ্যে কয়জন সেই কুলিদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলে।

রঞ্জিৎ একজনকে হাতছানিতে তা'র কাছে ডাকলে।

ছেলেগুলির মধ্যে যাকে সব চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছিল এবং দেখ্‌তেও সুন্দর—কেবল চোখ দুটি বাদ দিলে, সে বলে উঠ্‌লো—"ক্যা জী?"

বল্‌তে বল্‌তে সে রঞ্জিতের কাছে এগিয়ে এল।

রঞ্জিৎ তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

তা'রা বললে, তাদের বাড়ি নিচের সেই গ্রামে, তা'রা মুশৌরির স্কুলে পড়ে, সেদিন ছুটি।

রঞ্জিতেরও পরিচয় সে নিলে। রঞ্জিত বল্‌লে, সে বাঙালি; সেও পড়ে তবে কলেজে, পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণে বেরিয়েছে, আপাতত যাচ্ছে মুশৌরি, উঠ্‌বে রয়াল বা ডুনভিউ হোটেলে।

তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"তোমরা কি নিয়ে তর্ক করছিলে?"

ছেলেটি অপ্রসন্ন স্বরে উত্তর দিলে—"কিছু না", এবং তৎক্ষণাৎ সে সঙ্গীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

রঞ্জিৎ ঘড়ি দেখ্‌লে—বেলা দশটা। সে উঠে কোটটা কাঁধে ফেলে আবার চল্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় সে হঠাৎ একটা উল্লাস-চীৎকার শুনে ফিরে দেখে, সে যেখানে বসেছিল সেই দিকে দু' তিনটি ছেলে ছুটে এল, তারপরই কি একটা যেন তুলে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করতে লাগল। সে সেদিকে আর মনোযোগ দিলে না, সে তেমনই চলছে··· আর বেশিদূর নয়, মাইল তিনেক মাত্র। পাওয়ার হাউসের অস্পষ্ট ভোঁ ভোঁ শব্দ কানে আস্‌ছে। ঐ একটা পাহাড়ের চূড়ায় সাদা রঙের বাড়ি—চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া উঠ্‌ছে।

রঞ্জিতের শরীর এবার যেন আরও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি সব একসঙ্গে তাকে কাতর করে ফেল্‌ছে। হোটেলে গিয়ে সে বেশ এক পেট খাবে, পাঞ্জাবি খানা, মাংস ও চাপাটি। তারপর খানিকটা বিশ্রাম ক'রে সে বার হবে শহর দেখ্‌তে, পায়ে হেঁটে, নবাবের মত ডাণ্ডিতে নয়।

ঐ হোটেল দুটোর একটিতে, ডুন-ভিউ হোটেলেই সম্ভব, গত কাল তা'র মেসো-মশায়দের আস্‌বার কথা আছে। তাঁরা যদি এসে থাকেন তাহলে সে মুশৌরিতে দু' এক দিন কাটাবে; না হলে আজই তিনটেয় মোটরে ফিরবে। কেননা তা'র বিছানা ও সুটকেশ পড়ে আছে ডেরাডুন ষ্টেশনে।

সে শহরের যত কাছে ওঠে ততই তা'র লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়—ভারতবাসী, আফগানী, ইউরোপীয়ান, মার্কিন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের লোকগুলো যে এত সুন্দর, এ ধারণা তা'র আগে ছিল না,—যেমন রঙ, তেমনই মুখ-চোখ, তেমনই দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ!

শহরের সীমান্তে পৌঁছে কোটটা গায়ে জড়িয়ে তা'র ভেতরের পকেটে হাত দিয়েই সে চমকে উঠ্‌ল! তা'র পারস্‌টা? তাতে যে ছিল টাকা ও টিকিট···

তা'র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি সব একটি মাত্র অভাবে ঢাকা পড়ে গেল। সে যখন কোটটা গা থেকে খুলেছিল, তখন, অথবা যেখানে বসেছিল সেখানে, কিংবা পথের যে কোন জায়গায় পড়ে যেতে পারে। কোথায় সে খুঁজবে? পথ দিয়ে কত লোক যাওয়া-আসা করছে। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ সেটা পেয়ে থাকবে; সেই ছেলেগুলোই সেটা নিশ্চয়ই পেয়েছে। তা'রা যখন উল্লাসধ্বনি করেছিল সেই দৃশ্যটা তা'র মনে পড়ল···এই বিদেশে, আত্মীয়-স্বজনহীন শহরে··

না—ফিরে গিয়ে লাভ নেই! তা'রা আর দেবে না, পরিষ্কার অস্বীকার করবে। সে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক চিন্তা করলে, তারপর এক বুক আশা নিয়ে চলল, ডুন-ভিউ ও রয়াল হোটেলে তা'র মাসীমাদের খোঁজ নিতে। কিন্তু তাঁরা না থাক্‌লে—? কোন বাঙালিকেই ত তা'র চোখে পড়ছে না; পড়লেও তা'রা তা'র কাহিনী বিশ্বাস করবে কি?

মুশৌরির সকল সৌন্দর্য্য তা'র চোখে ম্লান হয়ে গেল—সব রুক্ষ, পাথুরে ও বিশ্রী!

সে প্রথমেই গেল ডুন-ভিউ হোটেলে। ম্যানেজার বাইরে দাঁড়িয়ে বয়কে বকছিল। কয়েকজন বোর্ডার বারান্দায় আরাম-চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছে। তাদের একজনকে দেখে মনে হ'ল বাঙালি। কেবল বাঙালি নয়, তা'র মুখখানি যেন চেনা।

রঞ্জিতের অনুরোধে ম্যানেজার খাতা দেখে—"না, ও নামে কোন বাঙালি আসেন-নি", ব'লে একটু হেসে রঞ্জিতের শুষ্ক-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকালে।

তবে বোধ হয়—রয়াল হোটেল।—"রয়াল হোটেলটা কোথায়?"

—"ঐ যে ওপরে—" বলে ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

রঞ্জিত তাকিয়ে দেখলে, উপর দিকে একটি হোটেলের মাথায় বড় বড় ইংরেজী হরফে লেখা—রয়াল হোটেল।

মেটে রঙের পাথরের পথ দিয়ে সে উপরে উঠে গেল ; তারপর হোটেলের কাঠে সিঁড়ি। রঞ্জিতের হাত-পা কাঁপছে, হৃদ্‌পিণ্ড ঘন ঘন দুল্‌ছে। সিঁড়িতে পা দিতে সিঁড়িটা যেন দুল্‌তে লাগল। বয় তাকে সেখান থেকে পরম আদরে নিয়ে চলল সে দোতালায় উঠে গিয়ে সামনেই দেখ্‌লে পাঞ্জাবী ম্যানেজার চেয়ারে বসে সিগারে টান্‌ছে।

রঞ্জিতের শেষ আশা! সে শুষ্ককণ্ঠে তা'র মেসোমশায়ের নাম বল্‌তেই ম্যানেজা হেসে বলে উঠ্‌লো—"হাঁ—হাঁ।"

—"তিনি আছেন? কোথায়? কোন্ ঘরে?"

—"এক নম্বর ঘরে তিনি ছিলেন সপরিবারে। চলে গেছেন—গত কাল…"

—"চলে গেছেন গত কাল? কিন্তু আমাকে ত—"

—"তা'র জন্যে কিছু নয়। আমাদের এখানে সকলকেই আমরা সার্ভ করি অ যত্নের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, ভাল খানা, আসবাব-পত্র দি সাজানো ঘর…বয়, কামরা খোল দেও…বলুন, কোন্ ক্লাস?"

—"দেখুন, আমি থাকতুম, কিন্তু—"

—"ডুন-ভিউর চেয়ে আমাদের এখান থেকে দৃশ্য দেখা যায় ভাল। তাছা বাঙালিকে…আপনি দেখুন কয়েকটি বাঙালি পরিবার এখানে আছেন—"

রঞ্জিৎ আর দাঁড়ালো না; এই পরিহাস সহ্য করবার মত শক্তিও তা ছিল না। সে ফিরে চললো ডুন-ভিউতে সেই বাঙালিটির কাছে। তা'র মু এমন একটা কি যেন ছিল, যাতে ধারণা হয় লোকটির মন কোমল ও সরল তাঁকে বিশ্বাস ক'রে দুঃখের কথা জানানো যেতে পারে।

না হলে…তা'র হাত-ঘড়িটা সোনার; ম্যানেজারের কাছে সেটা বন্ধক রে বাড়িতে টেলিগ্রাম করাও সম্ভব।

কিন্তু হোটেলের চাতালে পা দিতেই বারান্দা থেকে কে বলে উঠ্‌লো—"হাঁ- এই—এই—সাহেব—"

সে তাকিয়ে দেখে একটা কুলি।

বাঙালি ভদ্রলোক ও ম্যানেজার এক সঙ্গে বলে উঠ্‌লেন—"মশায়! আসুন—আসুন!··· আপনার কিছু হারিয়েছে?"

—"আ—মা—র? হাঁ—টাকা—টিকিট—এক কথায় পথের সম্বল।" ব'লে সে তাড়াতাড়ি কুলিটার কাছে এগিয়ে যেতেই সে জামার ভেতর থেকে পারস্‌টা টেনে বার করলে, এবং তুলে ধরে বললে—"সাহেব, ইয়ে তুমারা?"

-"হাঁ—হাঁ—"

সে আনন্দ সংযত করতে না পেরে কুলিটার হাত দুখানা চেপে ধরে বল্‌লে—"ভাই, তুমি আমার বড় উপকার করেছ।"

ম্যানেজার বল্‌লে—"ওরা যখন উঠে আসে তখন দেখে, যে-পাথরখানার উপর আপনি বসেছিলেন তা'র কোল ঘেঁষে ওটা পড়ে আছে। আপনি চলে এলে সেই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ওদের আপনার কথা নিয়ে আলাপ হয়। আপনি কোন্ হোটেলে উঠ্‌বেন, তা ওরা শুনেছিল। সেই সূত্রে এখানে এসেছে—"

কুলিটা রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তেমনই নির্ব্বোধের হাসি হাসলে।

রঞ্জিৎ পারস্ খুলে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে তাকে দিতে যেতেই সে হাত নেড়ে না বলে তাড়াতাড়ি হোটেলের চাতাল পেরিয়ে পথে গিয়ে পড়ে সাম্‌নের বাড়িটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই কমনীয় মূর্ত্তি বাঙালি ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"সৎ, কিন্তু নিরেট!"

সেই নিরেট পাথরের উজ্জ্বল আলোয় মুশৌরির সব যেন সহসা ঝলমল ক'রে উঠ্‌লো। রঞ্জিৎ হিমালয়ের নির্ম্মল, হিমশীতল স্বাস্থ্যকর বাতাস বুক ভরে টেনে নিলে।

ম্যানেজার বল্‌লে—"সাহেব, ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা খুলে দিই ?"

—"হাঁ" ব'লে রঞ্জিৎ পাশের চেয়ারখানায় বসে ছায়াচ্ছন্ন ডুনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

অগস্ত্য যাত্রা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফিরে না কো আর হেথা এ দিনে যে যায়,
বল চাও কাহাদিগে করিতে বিদায় ?
কাহারে বিদায় দিতে
বেদনা বাজে না চিতে ?
চলে যাক্ একেবারে ক্ষতি নাহি তায়।

যাক্ ভয়, বিভীষিকা, হিংসা ও দ্বেষ,
হানাহানি কাটাকাটি হউক নিঃশেষ।
যাক্ মোহ, যাক্ ভ্রম,
গর্ব্বের বিক্রম,
চাহি না দানব, গ্রহ, অপদেবতায়।

ধুয়ে যাক্, মুছে যাক্ রক্তের দাগ,
সন্দেহ, চাতুরী ও সত্যে বিরাগ।
যাক্ কূট কুটিলতা
বিষে ভরা মধু কথা,
আর সে ফেরে না যেন ধরা আঙিনায়।

যাক্ তা'রা যারা লয়ে স্বার্থ ও সাধ
জাতিতে জাতিতে নিতি ঘটায় বিবাদ
যারা শাসে যারা শোষে
রোষে ঘোষে বিনা দোষে
ধর্ম্মেরে অজ্ঞাত বাসেতে পাঠায়।

নিত্য স্মরয়ে অপতর্ক যাদের
গল্প সে ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের,
দর্প যাদের নিতি
বিষময় করে ক্ষিতি,
সরে যাক্ দূরে যাক্ কুলোর হাওয়ায়

মাছের ফাঁদ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ

মাছ যারা ধরে তাদের জেলে বা ধীবর বলা হয়। ধী অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তিতে তা'রা যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জলের কত নীচে থাকে সব মাছ, কোন কোন মাছের গায়ে আবার তীক্ষ্ণ কাঁটা—অথচ নিষ্কৃতি নেই কারও! রুই-কাতলা থেকে চুনো পুঁটি পর্য্যন্ত সকলকেই ধীবরের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত মানতে হবে!

বাস্তবিক মাছ ধরা একটা বড় রকমের শিল্প। এটাকে কৃষি-শিল্পের মধ্যেই ধরা হয়। এইজন্য আমরা বলি, মাছের চাষ বা মাছের আবাদ। বাংলাদেশে এই শিল্পের ক্রমোন্নতি চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রান্না ক'রে খাওয়া ভিন্ন মাছ থেকে মৎস্য-শিরীষ, মৎস্য-তেল, সার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া যায়। ডাক্তারেরা বলেন, জলবায়ু এবং আহার্য্য অনুসারে বাংলায় মাছ খাওয়ার প্রথা প্রচলিত না থাকলে স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা। মাছের মধ্যে যে 'ফস্‌ফরাস্' পাওয়া যায়, ওটা স্বাস্থ্যের—বিশেষতঃ চোখের পক্ষে খুব উপকারী।

অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়েও মাছের চাষ বেশ লাভজনক। চীন, জাপান এবং কোরিয়া দেশে সোনালী রংএর এক রকম মাছ পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশেও এই মাছের চাষ হয়। সেখানে তা'রা এর থেকে প্রচুর অর্থ আয় করে।

মাছকে মোটামুটি ভাবে আমরা যেমন নোনা জলের, মিঠে জলের, বিলের এবং খানা গর্ত্তের এই কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, তেমনি মাছ ধরবার ফাঁদকেও কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে জাল, বাঁশ দিয়ে তৈরী ফাঁদ এবং লৌহনির্ম্মিত শস্ত্র ও বড়শি প্রধান। কিন্তু এ ছাড়া আরও কত রকমের মাছ ধরবার ফাঁদ যে আমাদের দেশে বর্ত্তমান আছে, তা' ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

মাছের স্বভাব ও আকার অনুসারে বিভিন্ন জালের ব্যবহার হয়। ইলিশমাছ ধরবার যে জাল, পদ্মানদীর মাঝিরা তাকে বলে, সাঙলে। কুলপ্লাবী বর্ষায় পদ্মাবক্ষে অসীম সাহসী ধীবরেরা তাদের ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকায় 'সাঙলে' জালের দড়ি ধরে ব'সে থাকে। মাছ জালে পড়লেই তা'রা বুঝতে পারে, আর অমনি জাল টেনে তোলে। আর

এক রকম জালেও ইলিশ মাছ ধরা হয়। তাকে বলে 'বেড়াজাল'। কাঠ-শোলা বা কাছিমের
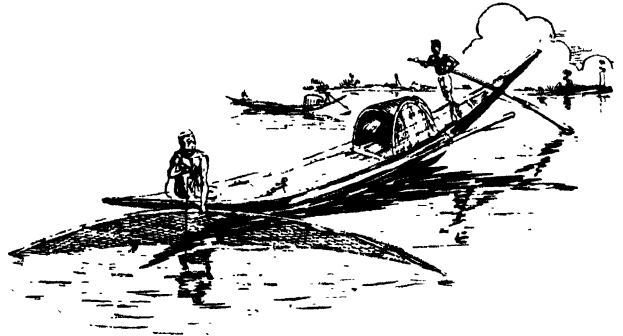
পিঠের হাড় এই জালের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। কাজেই জালের একটা দিক জলের উপর দিকে ভেসে থাকে। নদীর খানিকটা যায়গা ঘিরে আস্তে আস্তে এই জাল গুটিয়ে আনতে হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ মাছ ধরা পড়ে এই জালে।

রুই-কাতলা ধরবার অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। পুকুরের বা বিলের রুই-কাতলা অনেক সময় 'দড়া-জাল' দিয়ে ধরা হয়। 'দড়া-জাল' বেড়াজালেরই ছোট সংস্করণ। দড়া-জালে আটকে গেলে রুই-কাতলা খৈয়ের মত লাফ দিতে থাকে। এই জালের দড়ি ধ'রে টানতে হয় ব'লে কোন কোন অঞ্চলে একে 'টানা-জাল'ও বলে।

শেওলা বা ধানের জমির ভিতর বর্ষাকালে এক রকম জাল পেতে রাখা হয়—তাকে ব'লে 'কৈ-জাল'। কৈ মাছের কাণকো এই জালে আটকে গেলে আর পালাতে পারে না।

ক্ষ্যাপলা বা ঝাঁপ-জাল দিয়ে প্রায় সব রকম ছোট মাছই ধরা হয়। এই জাল চক্রাকারে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে। জালের নীচের দিকটায় থাকে লোহার কাঠি দেওয়া; কাজেই মাছ মাটিতে গিয়ে থাকলেও এই জাল তাকে টেনে তুলবেই!

আর এক রকম জাল আছে—তাকে 'ধর্ম্ম-জাল' বলে। ধর্ম্ম-জাল দৈবের উপর নির্ভর ক'রে পেতে ব'সে থাকতে হয়। খরসোল্লা বা খল্লা মাছ খুব চালাক। ঝাঁপ-জাল বা অন্য জালে তাদের ধরা শক্ত। এই ধর্ম্ম-জালেই তাদের অকস্মাৎ টেনে ফেলতে হয় ডাঙ্গার উপর।
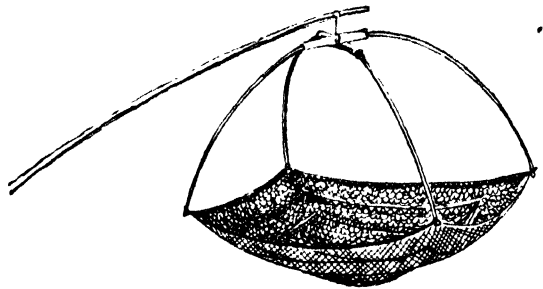
'ঘেরা-জাল' দিয়ে মাছ ধরা খুব সময়-সাপেক্ষ। কোনও খাল, বিল কি মরা নদীর মধ্যে আগে থেকে প্রচুর ডালপালা দিয়ে রাখতে হয়। মাছ গিয়ে ঐ ডালপালার মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর ডালপালায় ঘেরা ঐ দুর্গটির চারিদিকে জাল দিয়ে করতে হয় অবরোধ। ক্রমে ডালপালাগুলি তুলে ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাল আনতে হয় গুটিয়ে।

বর্ষাকালে আর এক উপায়ে রুই মাছ ধরা হয়। কোন কোন অঞ্চলে এই উপায়ে মাছ ধরবার জালকে মায়া-জাল বলা হয়। খালের মুখে বাঁশের শক্ত কাঠি পুঁতে তার সঙ্গে এই জাল পেতে রাখা হয়। ঐ কাঠিতে মাথা ঠেকলেই রুই মাছ লাফ দেয় আর অমনি আটকে পড়ে গিয়ে সেই জালে!
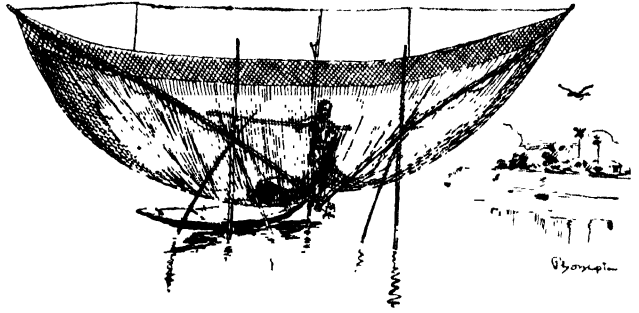
নদীতে বা' খালের মুখে বহুসংখ্যক লম্বা বাঁশ পুঁতে খুব উঁচুতে ব'সে থাকে একটি লোক 'ভ্যাসাল' বা 'ভ্যাসালি' জাল পেতে। বাঁশের একটা মস্ত বড় ত্রিভুজের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে ঐ জেলে আর সময় বুঝে আস্তে আস্তে নেমে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে জল থেকে উঠে পড়ে জাল। তা'তে দেখা যায়, কত সাদা সাদা মাছ আটকে গেছে। মাথার উপর তখন চিল উড়তে থাকে—আর জেলে তাড়াতাড়ি তার জালে ঝাঁকানি দিয়ে মাছগুলিকে নিয়ে আসে নিজের কাছে।

এইসব জাল ছাড়াও খাটান জাল, পাশ জাল, টাটোর জাল, কচাল, খুটনী এবং কোণা জাল প্রভৃতি আরও নানা রকমের জাল আছে।

এইবার বাঁশ দিয়ে তৈরী যন্ত্রের কথা কিছু বলব। চিংড়ি ও বেলে প্রভৃতি মাছের স্বভাব এই যে, তারা কোনও একটা কিছুর আশ্রয় ধ'রে চলাটাই পছন্দ করে। এজন্য দোয়াড়, বিস্তি প্রভৃতি যন্ত্র দিয়ে এদের ধরা হয়। 'খুনখুনে' ব'লে আর এক রকম বাঁশের তৈরী যন্ত্র আছে। তার উপরে ভাত ও চালের কুঁড়ো দিয়ে রাখা হয়। খাস্তটা থাকে জলের ঠিক উপরে। পুঁটি মাছ ঐ ভাত খাবার জন্যে ঢুকে পড়ে ঐ যন্ত্রের মধ্যে, তারপর আর বেরোতে পারে না।

অল্প জলের ক্ষুদ্র মাছ ধরা হয় 'ওছা' বা 'চালনী' দিয়ে। তিনখানা ছোট বাঁশ দিয়ে একটা ত্রিভুজের মত তৈরী করা হয়। ভিতরটায় জাল বা সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে বুনানি করা থাকে। ওটাকে টেনে নেওয়ার জন্যে ঐ ত্রিভুজের মাঝখান দিয়ে একটা বাঁশের লাঠি বেঁধে দেওয়া হয়।
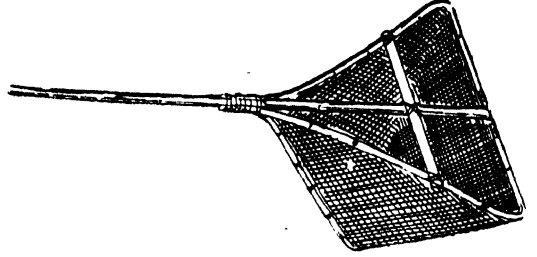
'বাণ' প্রভৃতি মাছ অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকতে ভালবাসে। এজন্য কখনও কখনও তাদের বাঁশের 'চোঙ্গ' পেতে ধরা হয়।

'চালনী' যন্ত্রের বৃহৎ সংস্করণ হচ্ছে 'সাগরা'। নদীর পাড় বেশ ঢালু ক'রে কেটে নিয়ে সেখানে 'সাগরা' পেতে রাখা হয়। সাগরার মধ্যে শেঁওড়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের ডাল দিয়ে রাখাই নিয়ম। প্রত্যহ সকালে সাগরা টেনে তুললে তার মধ্যে কত রকম মাছ পাওয়া যায়।

মাছকে তাড়া ক'রে আটকে ফেলে টেনে ধরবার যন্ত্র হ'চ্ছে 'পোলো'। বাঁশের কাঠি দিয়ে পোলো তৈরী হয়। কোন কোন অঞ্চলে মাঘ-ফাল্গুন মাসের দিকে বিলের জল কমে গেলে সেখানে 'পোলো' পড়ে। সে এক দেখবার মত ব্যাপার! পূর্ব্ব থেকে হাটে কেরোসিনের টিন পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, অমুক দিন অমুক বিলে পোলো পড়বে। নির্দ্দিষ্ট দিনে দেখা যায়, প্রায় তিন-চার'শো লোক পোলো নিয়ে এসে উপস্থিত! তারপর লাইন ক'রে তারা নেমে গিয়ে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে পোলো চালায়। পোলোতে শোল, কই, ফলুই, বোয়াল প্রভৃতি বহুবিধ মাছ ধরা পড়ে।
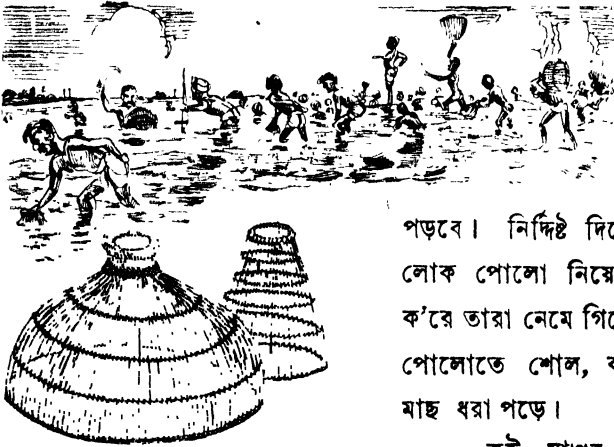
কই, মাগুর, খলসে প্রভৃতি মাছের স্বভাবই এই যে, তা'রা নতুন জল পেলেই লাফিয়ে ডাঙ্গায় উঠে। এজন্য কোন কোন পল্লী অঞ্চলে দেখা যায়, আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টিধারার পর রান্নাঘরের উনুনের মধ্যে কি গোয়ালঘরের মধ্যে কত কৈ মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে!

'চার' দিয়ে, বড়শি ফেলে এবং ট্যাঁটা, কোচ প্রভৃতি দিয়েও মাছ ধরা হয়। মাছের আকার অনুসারে বড়শিরও বহু প্রকার-ভেদ আছে।

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে 'হেড়ে কল' দিয়ে কৈ মাছ ধরা হয়। যে পুকুরে বা গর্ত্তে কৈ মাছ থাকে, তার একধারে একটা ছোট নালা মত ক'রে তার গোড়ায় একটা বড় হাঁড়ি বা কলসী পুঁতে রাখতে হয়। ঐ নালার উপর পানিফলের গাছ শেকড়সহ ছড়িয়ে রাখতে দেখা যায়। হাঁড়িটির মুখের কাছে দেয় মেথি এবং চালভাজার গুঁড়ো। তার গন্ধটা বেশ সুন্দর। কৈ মাছেরা ঐ গন্ধ পেয়ে নালা বেয়ে উঠতে থাকে এবং শেষটায় প'ড়ে যায় ঐ হাঁড়ির মধ্যে—আর উঠতে পারে না।

কচুরীপানা টেনেও কৈ মাছ ধরা যায়। কচুরীপানার শেকড়ের সঙ্গে কৈ মাছের কাণকো আটকে গেলে সে আর পালাতে পারে না।

সমুদ্রের খুব নিকটে—ডায়মণ্ড হারবার কি ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চলে জোয়ারের সময় জমি ঘিরে রাখা হয়। জোয়ার সরে গেলে হাত দিয়েই তখন কতজনে সেই মাঠের জমিতে মাছ ধরে।

মোদের গাঁয়ের পথ

শ্রীবিজয় চক্রবর্ত্তী

দেশ ছেড়েছি—বয়স তখন ছিল বছর আট,
ফির্‌ছি গাঁয়ের ভিটেয় আজ—পেরিয়ে গেছে ষাট।
'ইষ্টিশানের' পথটা গেছে সোজা 'রতনপুর',
'পদ্মদীঘি' পেরিয়ে গেলেই বাঁয়ে 'তালপুকুর';
আজও আছে দাঁড়িয়ে মোড়ে যুগল বট-অশথ,
ভুলে' আজও যাইনি ওরে—মোদের গাঁয়ের পথ।

ধানের ক্ষেতে আলের পাশে পথটি পড়ে' আছে,
বাব্‌লা গাছে ফিঙে পাখী তেম্নি করেই নাচে;
ভিন্‌-গাঁয়ে ঐ বনের পথে অচিন-পথিক যায়,
বটের ছায়ে মেঠো-সুরে রাখাল-ছেলে গায়;
এই তো খেলার মাঠ রয়েছে হোথায় হতো রথ,
ভুলে' আজও যাইনি ওরে—মোদের গাঁয়ের পথ।

শিখবীর বান্দা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তোমরা সকলেই গুরুগোবিন্দ সিংহের কথা জান। তিনি ছিলেন শিখদের একজন শ্রেষ্ঠ গুরু। ইনি ১৬৭৫ হইতে ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। এই গুরুগোবিন্দ যখন পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত নাদের নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন প্রভাতবেলা এক বৈরাগী গুরুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অতি বিনীতভাবে হাত যোড় করিয়া দরবারের এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। বৈরাগীর বলিষ্ঠ দেহ এবং মুখের মধ্যে একটা দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বৎস! কি তোমার প্রার্থনা? কি তোমার নাম?'

অতি করুণকণ্ঠে বৈরাগী বলিল,—'আমার নাম মাধোদাস। আমি আপনার

গুরু হাসিয়া বলিলেন,—'কি তোমার প্রার্থনা আমাকে বল।'

মাধোদাস বলিল,—'আমি চাই আপনার বান্দা (ক্রীতদাস) হইতে, আমি চাই শিখ হইতে—এই আমার বিনীত নিবেদন প্রভু!'

গুরু বলিলেন,—'উত্তম। আজ হইতে তোমার নাম হইল বান্দা।'

তারপর বৈরাগী মাধোদাস গুরুর কৃপায় শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আর সকলের কাছে পরিচিত হইলেন বান্দা নামে।

গুরুগোবিন্দ ছিলেন বীরধর্ম্মী। তিনি বান্দাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। বান্দা ঘোড়ায় চড়িতে, তরোয়াল ধরিতে এবং বর্শা নিক্ষেপ করিতে দক্ষ হইলেন। এইভাবে দিন যায়। তিনি সর্ব্বদা গুরুর কাছে কাছে থাকেন; তাঁহার চরণ সেবা করেন।

একদিন গুরু বলিলেন,—'বান্দা, তোমার শিক্ষা শেষ হইয়াছে। এইবার আমার উপদেশ শোন। তুমি মনে রাখিও বান্দা,—বিনয়ী ও মধুরভাষী ব্যক্তি পৃথিবী জয়

করিতে পারে। অতএব তুমি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী হইবে। দ্বিতীয় কথা এই—শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর প্রতি সম্মান করিবে। বিবাহ করিয়া সংসারে বদ্ধ হইও না, কেননা তোমার সম্মুখে রহিয়াছে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র। আর শেষ কথা এই—নিজকে কখনও গুরু বলিয়া পরিচয় দিও না। তোমার সঙ্গে যে পাঁচজন শিখ দিতেছি, সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবে।—এইবার তোমার উপর শিখগণের মান, সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষার ভার অর্পণ করিতেছি। যাও বান্দা, মোগলের সহিত যুদ্ধ করিতে যাও।'

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বান্দা চলিলেন পাঞ্জাবের উত্তর অঞ্চলে। সেখানে যে সব শিখ ছিল, তাহাদের কাছে বান্দা বলিলেন—গুরুর বাণী। বান্দা গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন,—'যাহারা গুরুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, যাহারা তাঁহার শিষ্যগণকে অপমান করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করিতে হইবে।'

বান্দার বাক্যে হাজার হাজার শিখ আসিয়া মিলিত হইল তাঁহার পতাকা তলে, আর তাহাদের "ওয়া গুরুজীকি ফতে" ধ্বনিতে পাঞ্জাবের এক নিভৃত পল্লী-প্রান্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বান্দা এখন রণনিপুণ সাহসী শিখ যোদ্ধা। তিনি গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া চলিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না।

শার্হিন্দের শাসনকর্ত্তা ওয়াজির খানের সহিতও বান্দার যুদ্ধ হইল। এ সময়ে বান্দার বীরত্ব-কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল, তাই শিখেরা নানা পল্লী হইতে—নানা নগর বন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল বান্দার সহিত যোগদান করিবার জন্য। মোগলে ও শিখে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। মোগলের পক্ষে বিপুল সৈন্য-বাহিনী, হাতী, ঘোড়া, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য—আর ছিল কামান। শিখদের সে সময়ে না ছিল কামান, না ছিল হাতী ও বিপুল সৈন্য।

মোগলের কামান গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। শিখেরা কামানের গুলি উপেক্ষা করিয়াও যুদ্ধ করিতে লাগিল। সাহসী শিখেরা প্রাণ দিয়া লড়িতে লাগিল। তাহাদের নির্ভীকতা ও সাহসিকতার কাছে অবশেষে মোগলের পরাজয় হইল। ওয়াজির খান নিজে শিখদের হাতে প্রাণ দিলেন। শিখেরা বিজয়-গর্ব্বে শার্হিন্দ নগরে প্রবেশ করিল। নিরীহ নগরবাসীরা শিখের কাছে বশ্যতা স্বীকার করিল।

ওয়াজির খানের সহিত যুদ্ধ বিজয়ের পর বান্দা চলিলেন পার্ব্বত্য রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে। এই রাজারা শিখদের বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বিদ্রোহ করিত, দল বাঁধিয়া লুঠ করিত, সুযোগ পাইলে নিরীহ শিখদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেও ছাড়িত না। বান্দা সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজাদের বিরুদ্ধে শিখদের লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্ব্বত্য নৃপতিরা পরাজয় মানিতে লাগিল। তাহারা বান্দার সহিত সন্ধি করিল এবং বলিল, ভবিষ্যতে আর তাহারা শিখদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

একজন পার্ব্বত্য নৃপতির একটি অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই রাজা তাঁহার সুন্দরী কন্যাটি সহ বান্দার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—'আপনি যদি আমার এই কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।'

বান্দা সেই সুন্দরী পার্ব্বত্য রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজার অনুরোধে তাহাকে বিবাহ করিলেন।

গুরুর আদেশ এই প্রথমবার অমান্য করিলেন বান্দা।

বান্দার এইরূপ রণবিজয়ে সহস্র সহস্র হিন্দুও শিখধর্ম্ম গ্রহণ করিল। লাহোর হইতে পাণিপথ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বান্দার নামে সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিত।

গুরুগোবিন্দ বলিয়াছিলেন,—'বান্দা, তুমি কখনও আপনাকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিও না।' বান্দা হাজার হাজার শিখের নেতা হইয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি এইবার আপনাকে গুরু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। শিখদের প্রচলিত ধর্ম্মনীতি ও আচার অনুষ্ঠানেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলেন। বান্দা আবার গুরুর আদেশ অমান্য করিলেন।

বান্দার এইরূপ আচরণে শিখদের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা গুরু-গোবিন্দেরই অনুগত রহিয়া গেলেন, তাঁহারা আপনাদের 'তাতখালশা' নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন, আর যাঁহারা বান্দার দলে রহিলেন, তাঁহাদের পরিচয় হইল 'বান্দেই খালশা'। এই ভাবে শিখদের মধ্যে দুইটি দল হইয়া তাহারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। বান্দা যখন পাঞ্জাবে এই ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সে সময়ে দিল্লীর সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্ ছিলেন দাক্ষিণাত্য প্রদেশে। তিনি বান্দার শার্হিন্দ বিজয় ও অধিকারের কথা শুনিয়া বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিলেন শার্হিন্দ পুনরধিকার

করিতে। মোগল সেনারা শাহিন্দ অবরোধ করিল। বান্দা তখন পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাদশাহ্ বাহাদুর শাহ্ পীড়িত হইয়া তিন দিন পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। বাদশাহের মৃত্যুতে চারিদিকে অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সুযোগে বান্দা একে একে কালানৌর, বাতালা প্রভৃতি অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। লুণ্ঠন ও হত্যা চলিল।

এদিকে দিল্লীর তক্তে তখন বসিয়াছেন ফর্‌রুখশিয়ার। তিনি বান্দার অত্যাচার ও দেশবিজয়ের কথা শুনিয়া লাহোরের সুবাদারের নামে হুকুমনামা পাঠাইলেন—'যেমন করিয়া পার বান্দাকে দমন কর।'

সম্রাটের আদেশে লাহোরের শাসনকর্ত্তা বান্দাকে আক্রমণ করিতে অগণিত মোগল সৈন্য পাঠাইলেন। পাঞ্জাবের সর্ব্বত্র বান্দার বিরুদ্ধে অভিযান চলিল। বান্দা তখন গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মোগলেরা দলে দলে আসিয়া গুরুদাসপুর দুর্গ অবরোধ করিল। দুই পক্ষে বহুদিন যুদ্ধ চলিল—শেষটায় বান্দা মোগলের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

মোগলেরা গুরুদাসপুর গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, হাজার হাজার শিখের রক্তাক্ত মৃতদেহ দুর্গ-প্রাকারে ও প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে।

বান্দা আটশতজন শিখসহ বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হইলেন। সেখানে একে একে সকলে মৃত্যুকে নির্ভীক ভাবে বরণ করিলেন। তাঁহারা শির দিলেন, কিন্তু শের দিলেন না। হিন্দু বৈরাগী মাধোদাস—শিখবীর বান্দার অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছে। বান্দা পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এলোমেলো

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

দিল্লী থেকে ফোন করেছেন শাহান শাহের নাতি—
সাহারাতে জ্বাল্‌তে হবে হাজার তিনেক বাতি ;
চায়না থেকে আন্‌তে কিনে বায়না নেছেন তাই
শায়াম দেশের সেনাপতির মাস্‌তুতো এক ভাই ॥

কঙ্গো থেকে বঙ্গদেশে সুড়ঙ্গ এক কেটে
এস্কিমোরা একুশ দিনে এসেছিল হেঁটে ;
তাই না শুনে তারিফ দিয়ে তাসমানিয়ার রাণী
তিমির মুখে পাঠিয়ে দেছেন খোসখেয়ালের বাণী ॥

হাওয়ার মুখে খবর এল—মঙ্গোলিয়ার জেলে
সুমুদ্দুরে শামুক ধরে রাত্তিরে জাল ফেলে ;
সেই শামুকের পেটে নাকি পেঙ্গুইনের বাসা ;—
নিজের চোখে দেখে এল চাটিগাঁয়ের চাষা ॥

কবীরপুরের কবি নাকি আঁকের কেতাব লিখে
তিন পয়সায় কিনেছিল ছটাক খানেক টিকে ;
হুক্কা খেয়ে হিক্কা ওঠে ; এই কাসে—এই হাঁচে ;
ইস্কাবনের টেক্কা দিয়ে তুরুক মেরে বাঁচে ॥

ময়লাপুরের গয়লাগুলো পয়লা তারিখ হ'লে
ইটের গুঁড়োয় ভর্ত্তি করে চিটেগুড়ের থ'লে ;
বিষম রেগে শাস্তি দিলেন কোথাকার কে রাজা—
পেট্‌টি ভরে' খেতে হবে বর্দ্ধমানের খাজা ॥

অসম্ভব সম্ভবে সে তাঁহারই কৃপায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম-এ

পূজো! পূজো! পূজো! পূজো এসে পড়েছে।

রাখালের মা বল্‌লেন—"এবারে আর পূজো দেখা বরাতে নেই। বাতে এমন হালই করেছে যে বছোর পরে মা আসবেন, তাঁকে চোখের দেখা দেখেও যে নয়ন-মন একটু সার্থক করব, তারও কোন উপায় নেই।"

রাখালের ছেলেরা বল্‌লে—"মা—মা ক'রে তো তুমি মর ঠাকুমা, মার তো কত দয়া আমাদের প্রতি!"

রাখালের মা কানে হাত দিলেন—"ও-কথা বল্‌তে নেই, ছিঃ! মহাপাপ হয়। আর কত পাপই না করেছি, তা'র ফলে এ জন্ম অবধি জের টান্‌ছি। আর তা বাড়াস্ নি ভাই!"

নাতিরা অনুযোগের সুরে বল্‌লে—"না, বাড়াবে না! মা নাকি ভারি দয়াময়ী, সর্ব্বশক্তিমতী! তবে আমাদের এত দুঃখ কেন বল্‌তে পার? হয় তাঁর দয়া নেই, নয়তো দয়া আছে, শক্তি নেই।"

ঠাকুরমা উত্তর দিলেন—"ইচ্ছেময়ী ইচ্ছে করলে সবই করতে পারেন ভাই, দয়ারও তাঁর সীমা নেই; নতুবা মানুষ বেঁচেই বা আছে কি ক'রে? তাই তো তাঁর চরণতলে গিয়ে পড়তে চাই। তা' এমনি পোড়া বরাত যে জমীদারবাড়ী গিয়ে যে তাঁকে দেখে আসব, সে শক্তিটুকুও যে আর নেই। জমীদার-বাড়ীতো আর এখানে নয়!"

এই সময়ে নাতিরা দু'জনে নিজেদের ভিতর কি খানিকটা চুপি চুপি আড়ালে গিয়ে পরামর্শ ক'রে এল। ফিরে এসে তা'রা বল্‌লে—"সেজন্যে তুমি কিছু ভেব না ঠাকুমা! তোমাকে আমরা যেমন ক'রে হোক মাকে দর্শন করাবই; কিন্তু মা ভগবতী যে সর্ব্বশক্তিমতী তা' প্রমাণ ক'রে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।"

যুক্তি, প্রমাণ প্রভৃতির কথা পরে হবে। আমরা এখানে রাখালের মা ও তাঁর নাতিদের একটু পরিচয় দি। রাখাল ভদ্রঘরেই জন্মেছিল। গ্রামের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়াও কিছু সে শিখেছিল। কিন্তু তা'র পিতার জীবনে দুর্দ্দিন এসে সব ওলটপালট ক'রে দিল। পিতা গেলেন মারা। তারপর সংসারে অনেক রকমেরই টালমাটাল এল। সব কিছু সামলে নিয়ে রাখাল 'ভদ্রগিরি'তে ইস্তাফা দিয়ে শেষে গাড়োয়ানী ব্যবসা সুরু করলে।

যারা অভাবের সময় একমুঠো চা'ল দিয়ে কখনও সাহায্য করেনি, তা'রাই কিন্তু তাকে দেখে এখন নাক সেটকায়,—"হায় রে! শেষে কিনা গাড়োয়ানী!" সে যাই-হোক না কেন, রাখালের সংসারের চাকা কিন্তু এরপর একরকম সুখেই চলতে লাগল।

রাখাল নিজে, তা'র মা, ছোট ছোট দুটি ছেলে ও তাদের মা,—এই পাঁচটি প্রাণী নিয়ে তা'র সংসার। এ ছাড়া এক জোড়া বলদ আর একখানি গাড়ী ছিল তা'র সম্বল। গাড়োয়ানী ক'রে তা'র একরকম ভাল ভাবেই চ'লে যেতো।

কিন্তু এ সময়ে হঠাৎ রাখাল কোথায় চ'লে গেল। সকলে বল্ল, রাখাল সন্ন্যেসী হয়ে গেছে। রাখালের মা আর তা'র স্ত্রী মুড়ি ভাজে, চিড়ে কোটে, কাঁথা সেলাই করে। এমনি খাটুনি খেটে রাখালের ছেলে দু'টিকে তা'রা বাঁচিয়ে রাখে, বড় করে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও বেঁচে থাকে। রাখালের ছেলে দু'টিও অল্প বয়সে দুঃখ পেয়ে পেয়ে এখন বেশ বুঝতে শিখেছে।

এমনি ক'রে চল্‌তে চল্‌তে কয়েক বৎসর কালের করাল গর্ভে বেমালুম ডুব মার্‌লে। রাখালের মা একে বৃদ্ধা, তা'তে সম্প্রতি বাতে হয়ে উঠেছেন পঙ্গু। সংসারে দুঃখের কালছায়া আবার নূতন ক'রে বুঝি দেখা দিল। দিক্—উপায় কি!

এইবার পুনরায় 'নাতি-ঠাকুরমা-সংবাদে' ফিরে যাওয়া যাক্।

পূজো এসে গেল। রাখালের ছেলেরা তাদের পুরাণো গাড়ীখানা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। বলদ দু'টি পূর্ব্বেই বেচে ফেলা হয়েছিল, গাড়ীখানা তখনও ভালই ছিল। বলদের বদলে তা'রা দু'ভাই ওটা টানবে ঠিক ক'রে এসেছে। করলেও তা'রা তাই। শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরমাকে তা'রা সেই গাড়ীতে চড়ালে। মাকেও ছাড়লে না। 'বাঃ রে! ঠাকুমা বুঝি একা যাবে?' সুতরাং বাধ্য হয়ে মাকেও শেষে গাড়ীতে চড়তে হ'ল। তারপর বালক দু'টি নিজেরাই মহা-উৎসাহে টেনে নিয়ে চললো গাড়ীখানা জমীদার-বাড়ীতে—মা, ঠাকুরমাকে ঠাকুর দেখাবার তরে। তাদের এই ব্যাপার দেখে, দর্শকদের প্রাণ সিক্ত হয়ে

উঠ্‌লো। তা'রা বালক দুইটির অজস্র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলো না। সকলেই তাদেরকে একেবারে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল।

ঠাকুরমা ও মাকে সঙ্গে নিয়ে বালক দু'টি মহামায়ার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করলে। অনেকক্ষণ ধ'রে তা'রা তাদের প্রাণের ঐকান্তিক কামনা নিবেদন করল। বুড়ীর প্রণাম আর শেষ হ'তেই চায় না। মায়ের সাম্‌নে সেই যে সাষ্টাঙ্গে বুড়ী প্রণাম করতে জমি নিলেন, উঠতেই চান না। বহু—বহুক্ষণ পরে প্রণাম সেরে বুড়ী যখন উঠ্‌লেন তখন তাঁর মুখে হাসি ও চোখে পরিতৃপ্তির ঔজ্জ্বল্য ফুটে বেরুচ্ছে। তিনি বল্‌লেন—"হাঁ, জীবন আজ সার্থক হ'ল রে, তোরা আজ আমার জীবনটা সার্থক করলি ভাই! মহামায়া মা আমার তোদের জীবনও সার্থক করবেন।"

তারপর বালক দু'টি ঠাকুরমা ও মাকে পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়ে আগেকার মতই গাড়ী টেনে বাড়ী ফিরে এল।

কিন্তু একি আশ্চর্য্য! বাড়ী ফিরে এসে তা'রা দেখ্‌লে,—দাওয়ার উপর রাখাল ব'সে আছে। তা'র গায়ে ভদ্র বেশভূষা।

অতঃপর এমন অবস্থায় হারানিধি ফিরে পেলে যেমন যেমন হয়ে থাকে সব ঠিকঠিক তেমন তেমনই হ'ল। কিছুরই ব্যতিক্রম হ'ল না।

এরপর জানা গেল যে, দুঃখে প'ড়ে রাখাল প্রতিজ্ঞা করে—অবস্থা তা'র ভাল না ক'রে সে আর দেশে ফিরবে না। এখন অবস্থা ফিরিয়েই সে ঘরে ফিরেছে। কলকাতায় গিয়ে প্রথমে মুটেগিরি প্রভৃতি অনেক কিছু ক'রে ও অনেক কষ্ট সয়ে সে কিছু সঞ্চয় করে। পরে মোটর ড্রাইভারী শেখে। তারপর কত কষ্টে টাকা জমিয়ে জমিয়ে এখন সে নিজেই প্রায় নূতন একটা লরী 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' কিনেছে। কিছু টাকা ও সেই লরীসহ এইবার পূজোর সময় সে দেশে ফিরেছে। দেখা যাক্—এখন তা'কে কেউ ডাকে কিনা!

সব শুনে রাখালের মা, তাঁর নাতীদেরে বল্‌লেন—"দেখরে পুঁচকে ছোঁড়ারা দেখ, মহামায়া মা আমার কি না করতে পারেন।"

ছোঁড়ারা বল্‌লে—"তোমাকে যদি তিনি অমর করতে পারতেন ঠাকুমা!"

বুড়ী বল্‌লেন—"তোদের ভিতর দিয়েই আমি চিরকাল অমর হয়ে থাক্‌ব ভাই!"

অস্থানজ মূল

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ

উদ্ভিদের মূল সাধারণতঃ ভ্রূণমূল বর্দ্ধিত হইয়াই উৎপন্ন হয়। কিন্তু অস্থানজ মূল, উদ্ভিদ্‌বিশেষের কাণ্ড, শাখা, এমন কি পাতা হইতেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আমাদের পরিচিত বহু উদ্ভিদেই এই শ্রেণীর মূল গঠিত হইয়া থাকে। এই সকল মূল খাদ্য সংগ্রহ ছাড়াও যে কোন কোন উদ্ভিদের বিশিষ্ট কাজের সহায়ক, তাহা আমরা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি। দুই-চারিটি পরিচিত উদ্ভিদের উদাহরণদ্বারা এখানে তাহার আলোচনা করা হইল। তাহাদের বিশিষ্ট কার্য্য, উৎপত্তি এবং গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়া থাকে।

বটের বহুপল্লব-সমন্বিত সুদীর্ঘ স্থূলাকার শাখা এত ভারী হয় যে, কাণ্ডের সহিত সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকা, বিশেষতঃ ঝড়বৃষ্টির সময়, একরূপ অসম্ভব। সেজন্য উহাদের বহনোপযোগী কতকগুলি মূল, এই সকল শাখা হইতে বাহির হইয়া মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ মোটা হইয়া খুঁটির কাজ করিয়া থাকে। সেজন্য উহাদিগকে বহনকারী মূল বলা হয়। কেতকী বা কেয়া গাছের কাণ্ডের অগ্রভাগ বহু বড় বড় পাতা, শাখা-প্রশাখাতে এত বিস্তৃত এবং ভারি হয় যে, কেবলমাত্র প্রধান মূলের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান থাকা, বিশেষতঃ ঝড়ের সময়, কখনও সম্ভবপর নয়। সেজন্য উহার কাণ্ডের নিম্নভাগে, চতুর্দ্দিকে, বহু অস্থানজ মূল ঠেকার ন্যায় হেলানভাবে উৎপন্ন হইয়া, কাণ্ডকে মাটির সহিত দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এইরূপ অস্থানজ মূলকে ঠেকা মূল কহে।
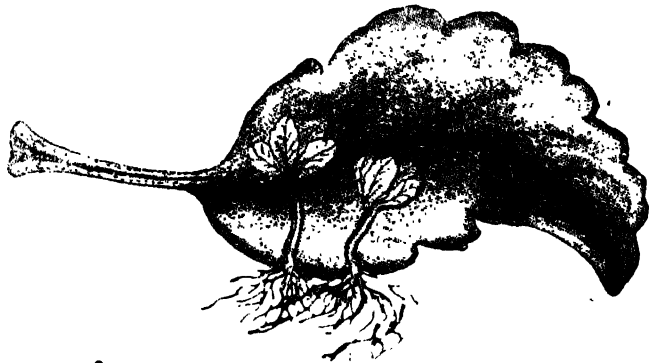
পাথরশিলা

হিমসাগর বা পাথর-শিলা, হাতীর কাণ প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতা কিছুদিন মাটির উপর পড়িয়া থাকিলে পাতাতে বহু অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। এই সকল অঙ্কুরের নীচের দিকে যে সকল মূল উৎপন্ন হয়, তাহাদের উৎপত্তিস্থান এই

পাতা। সুতরাং উহাদিগকে পত্রোৎপন্ন মূল বলা হয়। অবশ্য এই শ্রেণীর মূলের খাদ্য সংগ্রহই প্রধান এবং একমাত্র কাজ।

পান, চৈ, গাছপালই, পিপুল প্রভৃতি কোন কোন লতাজাতীয় গাছ কাণ্ড হইতে উৎপন্ন মূলের সাহায্যে আশ্রয়ের উপর উঠিতে থাকে। উহাদের কাণ্ডোৎপন্ন এই মূলগুলি আশ্রয়ের ভিতর ঢুকিয়া, কাণ্ডবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লতাকে ঊর্দ্ধ দিকে উঠিবার পক্ষে সাহায্য করে। উহাদের এই সকল অস্থানজ মূলকে বাহক মূল নামে অভিহিত করা হয়। দূর্ব্বা, আম্রুল শাক, থানকুনী, শুশ্‌নী শাক প্রভৃতি বহু উদ্ভিদ্ আছে, তাহারা মাটির উপর যখন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে, তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই সকল উদ্ভিদের প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে মূল উৎপন্ন হইয়া, উহাদের ক্রমবিস্তৃতির সাহায্য করিতেছে। এই সকল মূলকে ক্রিপিং মূল (Creeping Root) কহে।

পিপুল   গাছপালই

আমাদের দেশে খাল, বিল, এমন কি পুকুরে পর্য্যন্তও কেশরদাম নামক একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। বহু অস্থানজ মূল উহার ভাসমান শাখার প্রতি গ্রন্থি হইতে উৎপন্ন হয়। উহারা সাদা স্পঞ্জের মত আবরণে আবৃত থাকে। এই স্পঞ্জের ভিতর বায়ু আবদ্ধ থাকাতে শাখাগুলি একদিকে যেমন জলের উপর ভাসিয়া থাকার সুযোগ পায়, তেমনি আবার সেই বায়ুদ্বারা শ্বাস গ্রহণেরও সুবিধা করিয়া লয়। সেজন্য উহাদের এই অস্থানজ মূলগুলিকে শ্বাসযান্ত্রিক মূল (Breathing Root) বলা হয়। জলাভূমির কোন কোন উদ্ভিদে বিশিষ্ট শ্বাসযান্ত্রিক মূল দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার
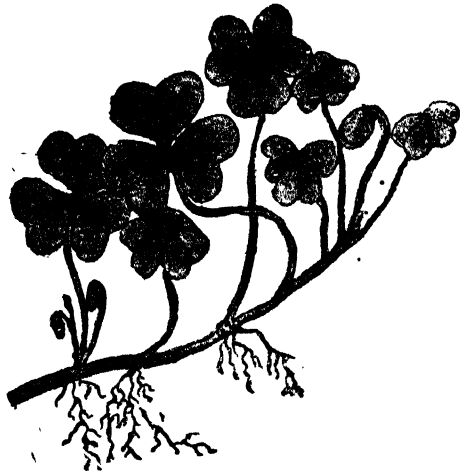
আম্রুল শাক

নিকটবর্ত্তী ধাপার মাঠে জলাভূমির ধারে এরূপ উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়। উহাদের মূলের অগ্রভাগ বাঁকা হইয়া জলের উপরে দেখা দেয়। এই মূলের চতুর্দ্দিকে বায়ু যাতায়াতের জন্য বহু ছিদ্র থাকে।

পুরাতন আম, কুল প্রভৃতি গাছের কাণ্ড এবং শাখায় নানা জাতীয় রাস্না (Orchid) গাছ জন্মিতে দেখা যায়। উহারা আশ্রয়দানকারী গাছের শাখা হইতে
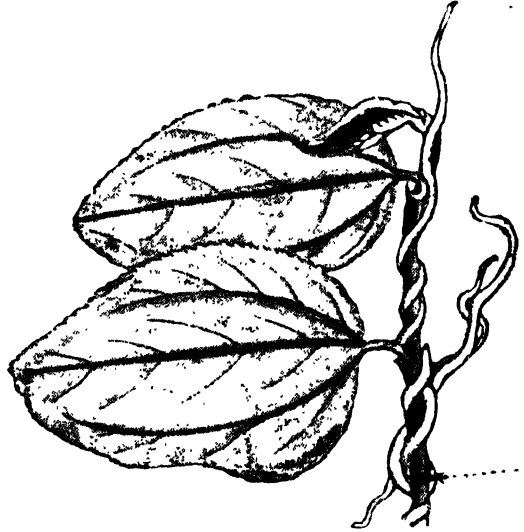
রাস্না কুলের শাখায় স্বর্ণলতা

কখনও খাদ্য শোষণ করে না। উহাদের কাণ্ড হইতে উৎপন্ন কতকগুলি মূল বাতাসে ঝুলিতে থাকে। এই মূলের সাহায্যে উহারা বায়ু হইতে খাদ্য শোষণ করে। উহাদিগকে বায়বীয় মূল (Aerial Root) কহে। স্বর্ণলতা জাতীয় পরপুষ্ট-জীবী (Parasite) উদ্ভিদ্ উহাদের কাণ্ডোৎপন্ন মূল অন্য গাছের কাণ্ড ও শাখার ভিতর প্রবেশ করাইয়া খাদ্য শোষণ করে। উহাদের এই অস্থানজ মূলকে চোষক মূল নামে অভিহিত করা হয়। অন্যান্য উদ্ভিদের প্রতি লক্ষ্য করিলেও অস্থানজ মূল সম্পর্কে আরও তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায়।

দাহুর বিষ-ভক্ষণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ভাঁড়ের মত ভুঁড়ি এবং টাক্ দেখেনি কেহ,
গুড়ের বড় নাগ্‌রি যেন দাহুর বেঁটে দেহ।
দাহুর সাথে ঠাকুরমার ছিল যখন ভাব,
টপ্পা গেয়ে চাইতো বুড়ো বুড়ীর কাছে মাফ্।
হু' দিন হলো বুড়ো বুড়ীর নেইকো মোটে মিল,
যেম্নি ওদের ঝগ্‌ড়া বাধে, ওড়ে শকুন চিল।
বুধী গাইয়ের নাচন দেখে এগোয় নাকো কেউ,
খ্যাঁদন কুকুর চেঁচিয়ে ওঠে, বেড়াল ডাকে মেউ।
ঠাকুরমার চোখের জল ভাস্‌তে থাকে নথে,
নাকি স্থুরের কান্না শুনে লোক জমে যায় পথে।

কিছুতে আর খোলে না দোর স্থুযোগ ভারী পেয়ে,
বল্‌লে দাহু—'এবার আমি মর্‌বো বিষ খেয়ে।'
সারাদিনতো কাট্‌লো বুড়োর হুয়ার দেওয়া ঘরে,
কেঁদেই বুড়ী বল্‌লে শেষে—'আজ্‌কে যদি মরে!'
সন্ধ্যে বেলা ডাক্‌ছি যত, বল্‌ছে দাহু মোরে—
'খাচ্ছি বিষ, এখন কেহ ঘা দিস্ না দোরে।'
পাশের বাড়ীর জানালা হু'তে বল্‌লে হেসে খুকু
—'কলার ছড়া শেষ হয়েছে,—এখন হুধটুকু—'
শুনেই মোরা আনন্দেতে গেলেম পাশের বাড়ী,
দাহুর ঘরে তাকিয়ে দেখি হুধে ডুব্‌ছে দাড়ী!

আমরা সবে চেঁচিয়ে কহি—'বিষ খেয়ো না অত—'
—'দেখিনি আর তোদের মত ফচ্‌কে ছেলে যত—'
দাদুর কথায় আমরা হাসি, সবাই আসে ছুটে,
রাগের চোটে বৃদ্ধ শেষে নাচ্‌তে থাকে উঠে।
আমরা নাচি জানালা ধরে, শুনি দাদুর গালি,
ছোট্ট ছেলে মেয়ের দল লাগায় হাততালি।

বুড়ো বুড়ীর মিল হোলো যে কখন দুপুর রাতে
কেউ জানে না—সকাল বেলা দেখি দু'জন ছাদে।
হেসে তখন লুটিয়ে পড়ি, হাসেন দাদু খুব,
বুড়ী কহেন—'টের পাবে কেউ, কর্‌না বাপু চুপ্‌—
বকুল কেয়া শিউলি হাসে কানন-বীথি 'পরে
রোদ্দুরেতে সকালবেলা বৃষ্টি পড়ে ঝরে'।
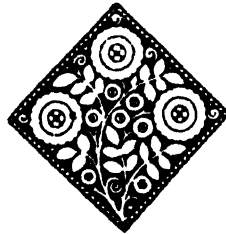
যোধপুরের কথা

শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছরের কার্ত্তিক মাসের শিশুসাথীতে যোধপুর সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সময়ের অভাবে লেখা হইয়া উঠে নাই। দেশীয় শ্রেষ্ঠ রাজ্যগুলির মধ্যে যোধপুর অন্যতম। অনেকখানি অংশ জুড়িয়া মরুভূমি থাকিলেও লোকসংখ্যা নেহাৎ কম নয়। পশুর চামড়া, চর্ব্বি, মাকরাণা পাথর, লবণ প্রভৃতি যোধপুরের প্রধান সম্পদ। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল গড়িয়া উঠিয়াছিল এই মাকরাণা পাথরে। নিজস্ব রেল থাকায় এবং কাষ্টমসের অত্যধিক প্রতাপে যোধপুর গভর্ণমেণ্ট একটা মোটা আয়ের অধিকারী। যে কোন যাত্রী যোধপুর রাজ্যে প্রবেশ করিলে কাষ্টমস্ অফিসার তাঁর বাক্স, বিছানা সমস্তই সার্চ্চ করিবেন এবং নূতন দ্রব্যাদির জন্য কাষ্টমস্ চার্জ্জ করিয়া বসিবেন। জিনিষের দাম অনুযায়ী রেট বাঁধা আছে। যাত্রীদের পক্ষে এই কাষ্টমস্ আফিস একটা বিভীষিকা।

যোধপুর রাজবংশ বহু প্রাচীন। মোগল শাসনকালে যোধপুরের বহু খ্যাতি ছিল। মহারাজা যোধসিং যোধপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই কনিষ্ঠ বিকা সিং বিকানীর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কয়েকজন মন্ত্রী এবং লোক-পরিষদ নামে এক সভার সাহায্যে মহারাজা রাজ্যশাসন করেন। বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুমের সিংজী মহারাজা ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায় মধ্যম ভ্রাতা স্যার উমেদ সিংজী রাজা হইয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অজিত সিংজী এক্ষণে অন্যতম মন্ত্রী। একটা মজার ব্যাপার, রাজপরিবারে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সকলেই মহারাজা নামে অভিহিত হন। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত মহারাজা থাকেন, চতুর্থ পুরুষ হইতে ঠাকুর সাহেব নামে পরিচিত হন। রাজাকে 'বাপজী' বা 'দরবার সাহেব' বলিয়া ডাকা হয়। প্রজাগণের সুখ-সুবিধার জন্য রাজপরিবারের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। মহারাজার জন্য প্রজারা প্রাণ পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত চিত্তে দিতে পারে। বর্ত্তমান মহারাজা বিমান-চালনায় সুদক্ষ। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তাঁহাকে 'Air Commodore' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। মহারাজার একান্ত আগ্রহে যোধপুরে একটি সুবৃহৎ Aerodrome প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ Aerodromeগুলির মধ্যে যোধপুর Aerodrome অন্যতম। Trans-India Air Routeএ যোধপুর Night halting station. Indian Trans-Continental Airways, Indian National Airways প্রভৃতি কোম্পানীর জাহাজগুলি এখানে Night halt করিয়া থাকে।

সহরে জল সরবরাহ করিতে যোধপুর গভর্ণমেণ্টকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। পাহাড়ের উপর সুবৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করিয়া সারা বৎসরের বৃষ্টির জল সেখানে সঞ্চিত রাখা হয়। পাইপ যোগে সমস্ত সহরময় সেই জল সরবরাহ করা হয়।

ম্যাণ্ডোরের একটি মন্দির

শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট খরচ করে। অশিক্ষিত মারবারের আজ রাস্তায় রাস্তায় ম্যাট্রিকুলেট এবং গ্র্যাজুয়েটের ভীড়। অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে।
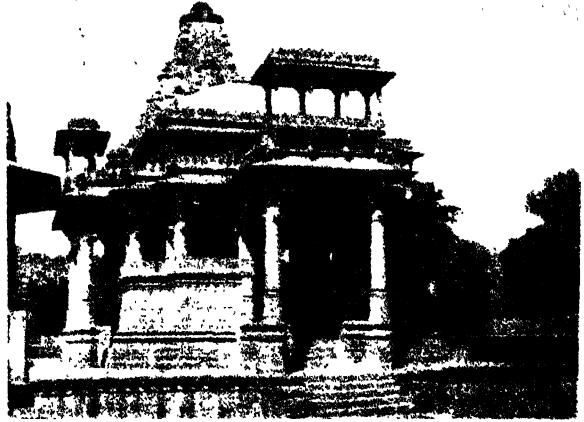
স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে যোধপুর অনেকখানি দাবী করিতে পারে। পুরাতন রাজধানী ম্যাণ্ডোরের প্রাসাদ এবং মন্দিরগুলির কারুকার্য্য দেখিলে সত্যিই আনন্দ হয়। পাথরের উপর সূক্ষ্মকাজ দর্শকগণের কৌতুহল বৃদ্ধি করে। সহর হইতে ৪০ মাইল দূরে সর্দ্দার সমন্দ নামে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। হ্রদের উপরই মহারাজার একটি প্রাসাদ আছে। প্রাসাদটি দেখিতে অতীব সুন্দর।

সর্দ্দার সমন্দ হ্রদের তীরস্থ প্রাসাদ
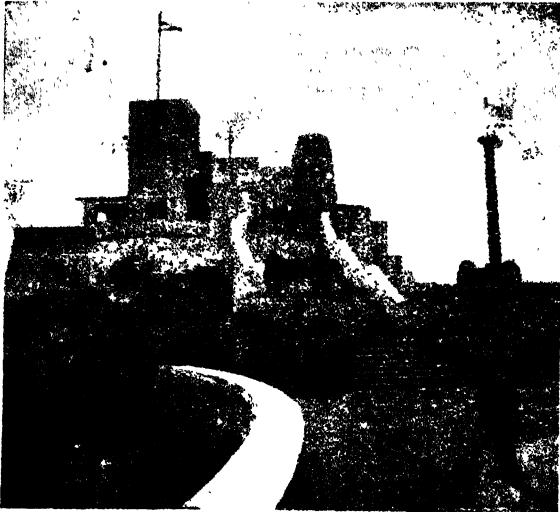
সেবারকার মরুর দেশে কয়েকজন বাঙ্গালীর সহিত পরিচয় করাইয়াছিলাম। আরও কয়েক-জনের সহিত পরিচয় করাইবার সুযোগ হেলায় হারাইব না। এতগুলি বাঙ্গালীকে যোগ্য পদ প্রদান করায় পাঠকবর্গের বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, মহারাজার বাঙ্গালী-প্রীতি কতখানি বেশী।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় Deputy Jail Superintendent ; তাঁহার স্বর্গগত দাদামহাশয়ও জেলার পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় Assistant Economic Development Officerএর পদে আছেন। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Cittor
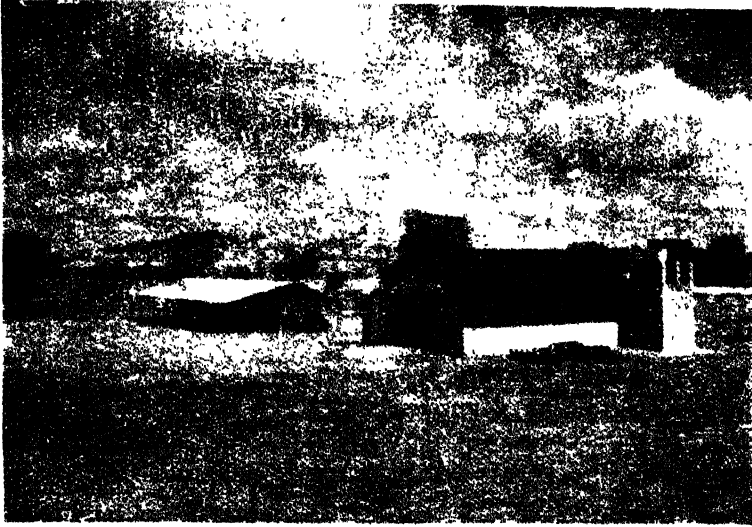
সর্দ্দার সমন্দ হ্রদের তীরস্থ কৃষিক্ষেত্র

Palace Construction বিভাগের Superintendent. এছাড়া আরও অনেক বাঙ্গালী বড় পদে আছেন।

বাঙ্গালীদের বঙ্গশ্রী ক্লাবে সরস্বতী পূজা ও থিয়েটার হইয়া থাকে। তা ছাড়া বিজয়া, নববর্ষ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবগুলি খুবই ধুমধামের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। হাতে লেখা সচিত্র বঙ্গশ্রী পত্রিকা মেম্বারদের ভাষার ও শ্রীর প্রতি একাগ্রতার পরিচয় দেয়।

ইংরাজ সমাজ যোধপুরে বেশ মিরাশী পাট্টা বাঁধিয়া আছে। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পদগুলির প্রায় সবগুলি তাহাদের দখলে। চীফ মিনিষ্টার স্যার ডোনাল্ড ফিল্ড ; অর্থবিভাগ—মেজর ষ্টীল ; চীফ মেডিক্যাল অফিসার—হেওয়ার্ড ; পি. ডবলু. ডি. অফিসার—এডগার ; চীফ পাইলট—গডউইন ; রেলওয়ে চীফ ট্রাফিক ম্যানেজার—গর্ডন ; চীফ আরকিটেক্ট—গোল্ডষ্ট্রো ; ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার—উইলসন ; ডেভালপমেণ্ট অফিসার—ফ্লেচার। সকলেই বেশ মোটা মাইনের অধিকারী।

স্বাস্থ্য এখানকার বেশ ভাল। স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালীগণ যাঁহারা এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাদের কিছুদিন যোধপুরে বাস করিতে অনুরোধ করি। শীতকালটা বেশ আরামপ্রদ।

দিদিমার আসর

শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমাদের আসর ছিল—দিদিমার আসর। সেই আসর বসতো রোজ রাতে শোবার সময়। আসর পরিচালনা করতেন আমাদের দিদিমা। আর সভ্য ছিলাম আমি, অলক, অরুণ, কিষণ, মান্তু, সুজন আর বীণাদি।

আমাদের আসরের আইন ছিল কিন্তু খুব কড়া; আসর যখন বসবে তখন বাজে কথা কেউ একটাও বলতে পারবে না। ঘুমোবার আগে এক ঘণ্টা গল্প হবে রোজ। আমরা করবো দিদিমাকে প্রশ্ন, আর তিনি তার উত্তর দেবেন গল্পে। এমনি বহু গল্প আমরা দিদিমার কাছে থেকে শুনেছি। অবশ্য সব মনে নেই, তবে তার থেকেই আজ একটা তোমাদের ব'লে শোনাই।

একটা মজার কথা ব'লে রাখি—আমরা রোজ রাত্রে যে প্রশ্নটা দিদিমাকে করবো, সেটা সকলে মিলে আগে থেকে ঠিক ক'রে নিতুম দিদিমার আড়ালেই। দিদিমাকে প্রশ্ন ক'রে হারানই ছিল আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা, কিন্তু একদিনও হারাতে পারিনি আমরা। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক প্রশ্নেরই উত্তর আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

সেদিনের আসরে আমাদের প্রশ্ন ছিল—"কে বড়?—রাজা না পণ্ডিত?"

দিদিমা এককথায় উত্তর দিলেন—"পণ্ডিত।"

আমি বল্লাম—"তা' কেমন ক'রে হয়? রাজার ধন-সম্পত্তি প্রচুর রয়েছে, সৈন্য-সামন্তের অভাব নেই, খাওয়া-পরা, জায়গা-জমির অভাব নেই, কিন্তু পণ্ডিতের কি আছে?"

মান্তু ও মণি বল্লে—"ঠিক বলেছ দাদা, রাজাই বড় পণ্ডিতের চেয়ে।"

দিদিমা বল্লেন—"শোন তবে বলি—তোদের মত এ প্রশ্ন বহু পুরাকালে একদিন এক রাজা করেছিলেন তাঁর সভাপণ্ডিতকে যে—'রাজা বড় না পণ্ডিত বড়?' পণ্ডিত মশাই ছিলেন নির্ভীক ও সত্যবাদী, তাই রাজা মশাইকে তার উত্তরে বল্লেন—'মহারাজ, পণ্ডিতই বড়।' মহারাজ বল্লেন—'প্রমাণ?' কিন্তু মহারাজের সভাস্থ সকলে চিৎকার ক'রে তখন ব'লে উঠলো—'মহারাজ, ওঁকে রাজ-দরবার থেকে তাড়িয়ে দিন, বড় গর্ব্ব হয়েছে ওঁর।' আবার কেউ কেউ বল্লে—'ওঁকে শূলে চাপান। এত বড় ওঁর স্পর্দ্ধা যে, বলেন কিনা রাজার চেয়েও পণ্ডিত বড়!'

"যাই হোক রাজামশাই পণ্ডিতমশাইকে তাঁর রাজত্বের বাইরে তাড়িয়ে দিলেন।"

আমরা বল্লাম—"এই তো! পণ্ডিতকে রাজা তো তাড়িয়ে দিলেন?"

দিদিমা বল্লেন—"তারপর শোন কি হলো। পণ্ডিতমশাইকে তাড়িয়ে দেবার কয়েক বছর পরে, রাজামশাইয়ের সঙ্গে অপর এক দেশের রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধও হলো খুব, শেষে আমাদের এই রাজামশাই হলেন পরাজিত ও বন্দী। তাঁকে এই রাজার দরবারে নিয়ে এলো বিচারের জন্যে।

"রাজামশায়ের বিচার হলো। বিচারে শাস্তি হলো—রাজামশাই তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলেন। প্রাণদণ্ড আর হলো না। এমন সময় কোথা থেকে আমাদের সেই পণ্ডিতমশাই এই রাজামশাইয়ের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এই অধমকে কি আজ মনে পড়ে?'

"রাজামশাই বল্লেন—'নিশ্চয়ই পণ্ডিতমশাই। আপনিও আমার প্রতিনমস্কার গ্রহণ করুন। কিন্তু পণ্ডিতমশাই, আপনি এখানে কোথা থেকে এলেন?'

"পণ্ডিতমশাই বল্লেন—'আপনার সভা থেকে বিতাড়িত হয়ে, আপনার আশীর্ব্বাদে, আমি এই রাজদরবারে এসে এই রাজ্যের প্রধান সভাপণ্ডিতের পদ লাভ করেছি।'

"আমাদের রাজামশাই ঐ কথা শুনে পণ্ডিতমশাইয়ের হাতদুটো ধ'রে বল্লেন—'পণ্ডিতমশাই, আমায় ক্ষমা করুন। কারণ আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে, পণ্ডিতের আদর সর্ব্বক্ষেত্রেই। কিন্তু রাজার আদর তা'র নিজের রাজ্যের মধ্যে, নিজের প্রজাদের কাছে। আজ বিচারে আমার হয়েছে নির্ব্বাসন। এখন আমি দেখছি কোন গুণই আমার নেই। আজ আমি দরজায় দরজায় গিয়ে ভিক্ষে চাইলে 'দূর-দূর' ক'রে সকলে তাড়িয়ে দেবে। আপনার কাছে পণ্ডিতমশাই, আমার এই অনুরোধ যে, আজ থেকে আমায় আর মহারাজ বলে ডাকবেন না, আজ আমি পথের ভিখারী।'

"পণ্ডিতমশাই বল্লেন—'সে কি, মহারাজ! মহারাজ বলবার অধিকার আমার চিরকালই থাকবে। আজ না হয় ভাগ্যদোষে আপনি আপনার রাজ্য থেকে বঞ্চিত, তাই বলে কি আপনাকে আগেকার মত, সম্মান আমি করবো না? একদিন আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছি, আর সকলে নিমকহারামী করতে পারে, কিন্তু আমি পারি না।' রাজামশাই আনন্দে নিজেকে আজ আর সামলে রাখতে না পেরে পণ্ডিতমশাইয়ের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বল্লেন—'হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই,

আপনার কথাই আজ সত্য বলে বুঝতে পারলাম। পণ্ডিতই রাজার চেয়ে সবদিক দিয়েই বড়।'

"এমন সময় এখানকার রাজামশাই পণ্ডিতমশাইকে ডেকে সব ব্যাপার শুনে তাঁর সেনাপতিকে আদেশ করলেন, আমাদের রাজামশাইকে মুক্তি দিতে। তারপর ওঁকে বল্লেন—'আপনি আজ মুক্ত। আপনি আবার আপনার সমস্ত রাজ্য ফিরে পাবেন। কিন্তু মনে থাকে যেন, আপনার রাজ্যে পণ্ডিতের অনাদর আর যেন কখনও না হয়। মনে থাকবে তো কথাটা?'

আমাদের রাজামশাই তখন বল্লেন—'আর ও-কথা বলে কেন লজ্জা দিচ্ছেন মহারাজ! আমাকে যখন এতো দয়াই করলেন তখন আমার একটা প্রার্থনা আছে, সেটাও দয়া ক'রে পূরণ করতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে, আমার এই পণ্ডিতমশাইকে আমার রাজ্যে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

"তারপর আমাদের রাজা মশাই আমাদের এই পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে তাঁর রাজ্যে আবার ফিরে গেলেন।

"ব্যস্, এখন তোরা প্রমাণ পেলি তো—রাজা বড় না পণ্ডিত বড়!"

আমরা সব চুপ ক'রে রইলাম, দিদিমাকে হারাতে পারলুম না বলে। যে যুক্তি উনি দেখিয়েছেন, তার পরে রাজাকে বড় আর কিছুতেই কি বলা চলে?

সেদিনকার মত আমাদের দিদিমার আসর ঐখানেই ভেঙে গেলো, অর্থাৎ আমরা ঘুমোবার জন্যে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

সক্কলে বাঁচে হাঁফ্ ছেড়ে

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

ভোজনগরের বড় জমিদার ভোজন-বিলাসী শর্ম্মা সে,
রোজ তার ভোজ তৈরি যে হয় হরেক রকম ফরমাসে।
গর্মা-গরম লুচি পুরী আর কালিয়া পোলাও রকমারি,
বাড়ীর সবাই হিম্‌সিম্ খায়, হায় হায় একি ঝক্‌মারি!

নতুন রকম খাদ্য না হলে শর্ম্মা থাকেন গর্জ্জিতে,—
ঠাকুর চাকর নাজেহাল হায় খাম্‌খেয়ালীর মর্জ্জিতে।
সবই খাওয়া চাই ; যাহা কিছু আছে বিখ্যাত আর অখ্যাত,
খাওয়া ছাড়া কিছু আছে দুনিয়ায়, শর্ম্মার সেটা অজ্ঞাত।

মাদ্রাজী ঝাল, বোম্বাই টক্, দিল্লীর কড়া চাট্‌নীতে
অরুচি যে নাই ; যেখানেই থাক্ কাটোয়া কিম্বা কাট্‌নীতে,
চাই তার চাই, না করে যাচাই, আন্‌তে হবে তা চট্ করে',
ভুঁড়ি বেড়ে ক্রমে হোলো যেন জালা, কবে ফেটে যায় ফট্ করে' !
মুখখানা হোলো হাঁড়ির মতন, এক হোলো ঘাড়ে গর্দ্দানে,
তবুও শর্ম্মা ব্যস্ত সদাই নতুন খাবার সন্ধানে ।
বাড়ীর মেয়েরা কেঁদে কেঁদে সারা, বলে "ভালো নয় লক্ষণ ও,
এম্‌নি 'হাভাতে' রোগ যদি হয়, রোগী নাহি বাঁচে কক্ষণো ।"
এলো ডাক্তার, এলো কবিরাজ, ফিরে গেল মুখ ভার করে',—
শর্ম্মা তাদের গালাগালি দিয়ে ঘর থেকে দিল বার করে' ।
শর্ম্মার ছিল চতুর ভাগ্নে, বাস করে আও-রংবাদে,
হঠাৎ হাজির ভোজনগরেতে মাতুলের এই সংবাদে ।
এসে বলে হেসে, "হে মামা জানিও, এনেছি পানীয় আন্‌কোরা,
হেন সরবৎ যার তার কভু সাধ্য নহেক পান করা ।
চীনেবাদামের রস বের করে' বিলাতী বেগুন সাঁত্‌লিয়ে,—
কাবুলের মেওয়া চট্‌কিয়ে আর আঙ্গুরের ঘন ক্বাথ্ দিয়ে ।
কিস্‌মিস্ আর পেস্তা মিশিয়ে দেওয়া আছে এই সরবতে,
তিব্বতীগণ এই সরবৎ খায় হিমালয় পর্ব্বতে ।"
আসলে ভাগ্নে করেছে কি জানো ? গোপনেতে বসে চুপ্ করে'
ক্যাষ্টর-অয়েলে হরিতকী গুলে, ঝোলাগুড় দিয়ে খুব করে',
সরবৎ করে' মামারে দিল সে, মামা হাতে নিল উৎসাহে ।
নতুন খাবার খায় বারবার ; কে আর রটাবে কুৎসা হে ?
তারপরে যেতে ঘণ্টা খানেক, ওষুধ ধরিল কর্ত্তারে,—
লোটা নিয়ে মামা ছোটাছুটি করে, জোলাপ ধরেছে জোর তারে ।
পরদিন মামা আধখানা হোলো, খাদ্যের নামে কাঁপ্‌ছে রে,—
ভাগ্নের হোলো জয়জয়কার, সকলে বাঁচে হাঁফ্ ছেড়ে ।

কালো বেড়ালের কথা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বয়স হয়ে গেছে, তাই আমায় কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না। এমন একদিন ছিল যখন রাতের অন্ধকারে আমার চোখ দুটো জোনাকীর মতো জ্বলতো, আর আমি লাফে লাফে ইন্দুর ধ'রে কর্ত্তার ধানের গোলা রক্ষা করতাম।

এখন চোখের আর সে জ্যোতি নেই—পায়েরও নেই জোর! তাই দিনরাত চুপচাপ ঘরের দাওয়ায় বসে থাকি—ঝিমুই বল্লেও চলে। বিন্দে ঝি দয়া করে দু'মুঠো ভাত দেয় ত' খাই, নইলে আমার সারাদিন উপোসেই কাটে!

কিন্তু এই বাড়ীতেই আগে আমার কী রকম আদর ছিল শুনলে তোমরা সবাই অবাক হয়ে যাবে।

আমি ঘরের দাওয়ায় কিম্বা যেখানে-সেখানে ঘুমোতাম ভেবেছ?—মোটেই না।

দিদিমণির কোলই ছিল আমার শোবার বা আরাম করবার যায়গা।

প্রথম যেদিন কর্ত্তা তাঁর ধানের গোলা ইন্দুরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমায় নিয়ে এলো—সেদিন বাড়ীতে আমার খাতির দেখে কে!

দিদিমণি সক্কলের আগে ছুটে এসে আমায় কোলে নিলে। তারপর দিদিমণির কাছ থেকে দাদামণির কোলে, দাদামণির কাছ থেকে পিসিমার কোলে, পিসিমার হাত থেকে মা-মণির পিঠে···, মা-মণির পিঠ থেকে বিন্দে ঝির মাথায়·· আমি যেন টপ্‌কে টপ্‌কে বেড়াতে লাগলাম।

বাড়ীতে জামাই এলেও বোধ করি এতটা হৈ-চৈ পড়ে যায় না!

সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্যে আলাদা দুধের বরাদ্দ হল। কর্ত্তা বল্লেন, ওর জন্যে আলাদা একটা গাই-ই কিনে নিতে হবে। ভালো রকম দুধ না পেলে ইন্দুর ধরবে কি ক'রে? ওই যে দেখছ উঠোনে ধবলী জাবর কাটছে···ও এবাড়ীতে এসেছে আমারই দৌলতে। কিন্তু আজ এ সংসারে ওর যা খাতির আমার তার কাণা-কড়িও নয়।

ইন্দুর ধ'রে ধ'রে আমি বাড়ীর উঠোনে স্তূপাকার ক'রে ফেল্লাম। ইন্দুরের দলে আমার নাম হয়ে গেল "কালো যম", বুঝ্লে? কেউ কেউ ঠাট্টা ক'রে "কালোজাম" বলেও ডাকত।

সেবার গঞ্জের হাট থেকে ফিরে কর্ত্তা বল্লেন,—কালোর জন্যে এবার আমার দু' হাজার টাকা লাভ হয়েছে। অন্যান্য বার এই লাভ ইন্দুরের দাঁতে নষ্ট হয়ে যায়,—ওর পা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো।

সে সব দিনের কথা মনে পড়লে এখনো লাফিয়ে লাফিয়ে ইঁন্দুর ধ'রে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে,...কিন্তু উপায় নেই, পায়ের জোর কমে গেছে। ইন্দুরেরা যে চালের বস্তার এপাশ-ওপাশ থেকে দাঁত বের ক'রে ফিক্-ফিক্ হাসে তা বুঝি আমি টের পাইনে? তবু এই বুড়ো বয়সেও কিছু ইন্দুর মারতে পারি।

আজ সকালবেলা রদ্দুরে বসে...পিঠটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে একটু আলস্যটা ভাঙ্ছিলাম · কর্ত্তা ঠিক সেই সময় ছাতা হাতে কি একটা কাজে বেরুচ্ছিলেন। আমায় দেখতে পেয়ে পা দিয়ে একটা লাথি মেরে আমায় ফুটবলের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন, বেরুচ্ছি একটা শুভ কাজে—অযাত্রা কালো বুড়োটা কোথাকার!

মনটা ভারী দমে গেল!

এক-পা দু'পা ক'রে দিদিমণির পড়বার ঘরে গিয়ে হাজির। বড় দিদিমণির ত' বিয়ে হয়ে গেছে...ছোট দিদিমণি পা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ছে।

আমায় দেখেই পড়া থামিয়ে নাকে কাপড় গুঁজে বল্লে, কালোটার গায়ে কী দুর্গন্ধ!

ভাবলাম, তাইত! কেউ আমায় দেখতে পারে না! মনের দুঃখে আরও একটু এগিয়ে এলাম।

সাম্নেই রান্নাঘর। বারান্দায় বিন্দে ঝি দুধ জাল দিয়ে বাটিতে বাটিতে রেখে কড়া থেকে চাঁছি চাঁচ্ছে।

আমি ওখানে গিয়ে সবে একটু ডেকেছি ম্যা—ও, অমনি বিন্দে ঝিটা করলে কি আঁচলের আড়াল দিয়ে এক বাটি দুধ চোঁ-চোঁ ক'রে খেয়ে নিয়ে চীৎকার সুরু ক'রে দিলে,—ওমা, দেখবে এসো—বুড়ো কালোর কাণ্ড! এক বাটি দুধ—পেছন থেকে এসে একেবারে চোঁ-চোঁ ক'রে খেয়ে নিলে!

বিন্দে ঝির চ্যাঁচামেচিতে বাড়ীশুদ্ধ্ সবাই এসে জড় হল। আমি তো তোমাদের মতো কথা বলতে পারি না। তাই বিন্দে ঝির আসল দুষ্টুমির কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারলাম না।

শুধু একবার ডাকলাম—ম্যাঁ-ও—ও—

কিন্তু বিন্দে ঝির কথাটাই সবাই বিশ্বাস ক'রে নিলে। দাদামণি কোত্থেকে ছুটে এসে আমায় এমন লাঠি-পেটা করলে যে আমি একেবারে আধমরা হয়ে গেলাম।

সারাটা দিন আমি খেলাম কিনা কেউ একবার খোঁজও নিলে না।

ভুলোটার সঙ্গে সন্ধ্যের মুখে দেখা। সে কোন এক নেমন্তন্ন বাড়ী থেকে হাড় কুড়িয়ে এনে চোখ বুঁজে মনের আনন্দে চিবুচ্ছিল। আমি একটু চাটতে চাইলাম। কিন্তু ভুলোটা এমন নেমকহারাম যে আমায় খ্যাঁক্ ক'রে কামড়াতে এলো।

অথচ ওকে আমি কতদিন আমার দুধের ভাগ দিয়েছি।

সন্ধ্যের পর চুপ্‌চাপ গিয়ে পড়ে রইলাম ধানের গোলার এক কোণে।

আশে-পাশে ইন্দুরেরা ছুটোছুটি কচ্ছে···কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা নেই যে উঠে গিয়ে থাবা দিয়ে একটাকে মেরে ফেলি। দাদামণি আজ আমাকে বড্ড মেরেছে!

আমায় অমন চুপ্‌চাপ বসে থাকতে দেখে একটা বুড়ো ইন্দুর সাহস ক'রে ধানের বস্তার পাশ থেকে বল্লে,—কালো-যম খুড়ো, নমস্কার······

আমি গোঁফটা শুধু একটু নাড়লাম—

এ-ও আমার কপালে ছিল। একটা ইন্দুর এসে আমায় খুড়ো বলে ডাকবে!

কিন্তু কিছু করবার যো নেই। একবার উঠতে গেলাম, কিন্তু শিরদাঁড়াটা একেবারে টন্-টন্ ক'রে উঠল।

আমি একটু রাগ ক'রেই জবাব দিলাম, কি বল্‌বে বল।

বুড়ো ইন্দুর বল্লে,—তোমার দুঃখু আমি বুঝি কালো-যম খুড়ো, আমি নিজেও ত বুড়ো হয়ে পড়েছি। কর্ত্তা তোমায় আর মোটেই আদর-যত্ন কচ্ছেন না···

আমি একটু চটে উঠেই বল্লাম,—তাতে তোর কি?

—আহা চটো কেন—কালো-যম খুড়ো, আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। বুড়ো ইন্দুর জবাব দিলে।

—কি বলবে বলো, বুড়ো বয়সে তোমার ঠাট্টা শুনতে চাই নে! আমি ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিলাম।

বুড়ো ইন্দুর বল্লে,—তুমি আমাদের কথাটা মন দিয়ে শোনো। তুমিও বুড়ো হয়েছ···আমিও বুড়ো হয়েছি, তুমি আমার সঙ্গে সন্ধি করো। তুমি যদি কথা দাও যে আর কোনো ইন্দুরের বাচ্চাকে মারবে না, তবে আমি তোমায় এমন বুদ্ধি বাৎলে দিতে পারি যার জন্যে সারা জীবন তুমি বসে বসেই দুধভাত খেতে পাবে। আর তোমার কষ্ট ক'রে ছুটোছুটি করতে হবে না।

কথাটা শুনে ভারী লোভ হল। তাই জিজ্ঞেস্ করলাম,—কি তোমার বুদ্ধিটা শুনি?

বুড়ো ইন্দুর জবাব দিলে,—প্রতিদিন কর্ত্তা গাদা গাদা নোট এনে বালিশের তলায় রাখে। জান তো যুদ্ধের জন্যে ধানের দর খুব বেড়ে গিয়েছে। কর্ত্তার এবার তাই ভারী বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে।

আমি জবাব দিলাম,—তাতে আমার কি লাভ শুনি?

বুড়ো ইন্দুর দাঁত বের ক'রে হেসে বল্লে,—তোমার কি লাভ এইবার সেই কথাই ত' বলব! একদিন তুমি সুযোগ বুঝে এক তাড়া নোট সরিয়ে আমার কাছে দেবে। কর্ত্তার মাথায় তখন বাজ ভেঙে পড়বে। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যাবে। কিন্তু কেউ সে নোট খুঁজে বের করতে পারবে না। আমি তার পরদিন আমার ধারালো দাঁত দিয়ে সেই নোটের ধারগুলো এমন ভাবে কেটে দেবো যাতে নোট নষ্ট না হয়। তুমি তখন সেই নোটগুলো কামড়ে ধ'রে কর্ত্তার পায়ের কাছে নিয়ে ফেলে দেবে।

আমি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—তাতে কি হবে?

বুড়ো ইন্দুর আবার ফিক্ ক'রে হেসে জবাব দিলে,—বুড়ো হয়ে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে কালো-যম খুড়ো! এই সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? তবে শোন বলি—ইন্দুরে কাটা নোট দেখেই কর্ত্তা বুঝতে পারবেন—আমরাই ওগুলো চুরি ক'রে আমাদের গর্ত্তে নিয়ে এসেছিলাম—আর তুমি ইন্দুর মেরে বীরের মতো সেই নোটগুলো

উদ্ধার করেছ। তখন কর্ত্তার কাছে তোমার খাতিরটা কেমন বেড়ে যাবে আঁচ ক'রে নাও—

কথাটা শেষ ক'রে বুড়ো ইন্দুর দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগলো।

কথাটা আমার ভারী মনে লাগলো। বুড়ো ইন্দুরকে আত্মীয় বলে মনে হতে লাগ্‌লো। বুড়োর সঙ্গে বুড়োর ভাব কেন এত বেশী হয় তা বেশ ভালো ক'রেই বুঝতে পারলাম। এই নিয়ে রাত্তির বেলা বুড়ো ইন্দুরের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা হল এবং সন্ধির কথাটাও পাকা হয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যের মুখে যে কথা সেই কাজ! নোটগুলো মুখে ক'রে এনে—ইন্দুর বন্ধুর হাতে তুলে দিলাম। রাত্তির বেলা সেগুলো সিন্ধুকে তুলতে গিয়ে কর্ত্তা মশায়ের যে মুখের চেহারা হল—তা' দেখে আমি আড়াল থেকে হেসে বাঁচি না! সঙ্গে সঙ্গে বিন্দে ঝির চাক্‌রী গেল। কারণ সন্ধ্যের পর সেই নাকি ঘরে আলো জ্বালাতে এসেছিল।

কেমন মজা···নিজে এক বাটি দুধ খেয়ে আর আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে?

সেদিন রাত্তির থেকে পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত বাড়ীতে এক হুলুস্থূল! যেন রাশিয়া আর জার্ম্মাণীর যুদ্ধ লেগেছে!

আমি আনাচ-কানাচ দিয়ে হাঁটি আর আপন মনে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি!

পুলিশ এসে আর এক গোলমাল বাঁধালে! শেষ পর্য্যন্ত পুকুরে জাল অবধি ফেললে। তাতে আমার মাছ খাবার সুবিধে হল বটে, কিন্তু নোটের কোনো সন্ধানই হল না।

আবার সন্ধ্যে হল। আমিও ইন্দুর বন্ধুর পরামর্শমত কোণে ইন্দুরে খাওয়া নোটগুলো মুখে ক'রে এনে কর্ত্তার পায়ের কাছে রেখে ম্যা-ও—ম্যা-ও ক'রে ডাকাডাকি সুরু করলাম।

তারপর কি হল বলত' তোমরা?

বাড়ীতে আমার আদর দেখে কে!

সেই দিনই আমার নাম রাখা হল—'কালো মাণিক'।

এখন আমি শুধু চুক্-চুক্ ক'রে দুধ খাই আর দিদিমণির কোলে ঘুরে বেড়াই।

ভালো কথা, ইন্দুর বন্ধুর সন্ধির সর্ত্ত আমি রক্ষা ক'রে চলছি।

ফ্রণ্ট লাইনের ট্রেঞ্চ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

[মস্কোর সীমান্তে একটি ট্রেঞ্চ। ডানদিকে কয়েকটি সিঁড়ি উপর দিকে উঠে গেছে। ভিতুরে জানলা দরজার বালাই নেই। কাঠের তক্তা পেতে ঘরের মেঝে তৈরী হয়েছে, সাধারণ ভাবে চললেও খটখট ক'রে শব্দ হয়। বাঁ দিকটা প্রায় অন্ধকার। যাতায়াতের পথ রেখে সেই অন্ধকারে একপাশে কয়েকটি হাল্কা প্যাকিং বাক্স সাজানো আছে। প্রয়োজন মত সেগুলি টুল, টেবিল ও খাটের কাজ করে।

একপাশে কয়েক জোড়া বুট আর দু-তিনখানি ঘোড়ার কম্বল প'ড়ে আছে।

একটি প্যাকিং বাক্সের উপর একটি কাচের জলপাত্র, দু-চারখানি টিনের পেয়ালা চোখে পড়ে। প্রায় অন্ধকারে কিছুই ভালো ক'রে চোখে পড়ে না; পিছনে অবিরাম কামানের গর্জ্জন শোনা যায়, গোলার বিস্ফোরণের সঙ্গে সিঁড়ির দিক থেকে আলোর ঝিলিক এসে পড়ে, তাতেই ট্রেঞ্চের সব কিছু মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ইতিমধ্যে উপর থেকে ধীর পদক্ষেপে একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট নেবে এলো; হাতের বন্দুকটা একপাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে ঝুপ ক'রে সে একটি বাক্সের উপর ব'সে পড়লো।]

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। নাঃ, উপরের চেয়েও এখানটা বেশী অন্ধকার, বাতিটাই বা কোথায় গেল? ও আইভান, আইভান!

[ভিতর থেকে]—কমরেড!

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। একটা আলো—

[আইভান একটা জলন্ত বাতি হাতে নিয়ে প্রবেশ করলো, বাক্সের উপর বাতির ফোঁটা ফেলে বাতিটি তা'র উপর বসিয়ে দিলে।]

আইভান। এক কাপ কফি ক'রে দিই কমরেড্‌।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। মিনিট পাঁচেক সময় লাগবে তো?

আইভান। তা তো লাগবেই কমরেড্‌, তবে একটু আগে করেছিলাম, তার দু'কাপ এখনও আছে, গরম ক'রে নিয়ে আসছি।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। নিয়ে আর আসতে হবে না, আমিই যাচ্ছি, আগুনে হাত-পাগুলো একবার সেকে না নিলে আর চলছে না। এই শীতে কোন ভদ্রলোক লড়াই করতে পারে?—না লড়াই

করতে ভালো লাগে? এখন কোথায় বরফ জমা লেকের উপর স্কি করবে, তা না কামান চালাও! যত সব পাগল, সব জার্ম্মানগুলোরই মাথা খারাপ!

[আইভান ভিতরে চলে গেল।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট শিষ দিতে দিতে ওভারকোটটা খুলে ফেললে। তারপর পায়ের ফেল্টি খুলে বুটের ফিতেগুলো ঢিলে করতে করতে গুন্‌গুন্‌ ক'রে সুর ধরলো। গুন্‌গুন্‌ করতে করতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট বাহির হয়ে গেলেন। নেপথ্য থেকে তা'র গানের সুর শোনা যেতে লাগলো।

খানিক পরে এক পেয়ালা কফি নিয়ে চুমুক দিতে দিতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পুনঃ প্রবেশ করলেন।]

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। আঃ! শরীরটা এতক্ষণে একটু চাঙ্গা হোল।

আইভান। [নেপথ্য থেকে] আরেক কাপ দিই কমরেড? আর একখানা মাখন বিস্কুট?

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। মাখন বিস্কুট! মাখন বিস্কুট তো ফুরিয়ে গেছিল না?

আইভান। আজ শনিবার নতুন রসদ এসেছে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। আজ শনিবার? এখানে তাহলে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু বারের নাম মনে থাকে না, তারিখগুলোর হিসাব রাখার চেষ্টা করেছিলাম, তা'ও ভুলে গেছি।

আইভান। আমারও তাই কমরেড লেফ্‌টেন্যাণ্ট। আমিও প্রথমে কিছু ঠিক রাখতে পারছিলাম না, তারপর এক চাষার কাছ থেকে একখানি 'ডেট্‌কার্ড' জোগাড় করলাম। একটা ক'রে সকাল হয় আর আগের দিনের তারিখটা কেটে দিই, সেইজন্যই আমার মনে থাকে।

[কথা বলতে বলতে আইভান ভিতরে চলে গেল।

উপরে সিঁড়ির মুখে স্বর ভেসে এল—কে একজন শান্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে—এটা কত নম্বর কোম্পানি কমাণ্ডারের ট্রেঞ্চ?

—এক নম্বর।

—ঠিক হয়েছে। কমরেড লেফ্‌টেন্যাণ্ট নীচে আছে?

—আছে।

পদশব্দ শোনা গেল। সিঁড়িতে দেখা গেল বুটসুদ্ধ একজোড়া পা, তারপর ক্রমশঃ নবাগতের স্বরূপ প্রকাশ পেল। আগন্তুক লেফ্‌টেন্যাণ্টের সামনে এসে সৈনিকের কায়দায় স্যালুট দিলে।]

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। বসো [একটি বাক্স দেখিয়ে দিলে।]

[আগন্তুক বসলো, পকেট থেকে একখানি ছোট খাতা বের ক'রে, তার মধ্যে একটি পাতা খুলে লেফ্‌টেন্যাণ্টের সামনে ধরলো। বাতির সামনে ঝুঁকে পড়ে সেটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট সেটি আগন্তুকের হাতে ফিরিয়ে দিলে।]

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। তোমার নাম কমরেড নিকোভিচ?

নিকোভিচ। হ্যাঁ।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। নতুন ?

নিকোভিচ। সাপ্লাই ট্রেঞ্চে এতদিন ছিলাম।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। বেশ। ওভারকোটটা খুলে রাখ ওই দিকে। কফি খাবে ? বিস্কুট ?

[আইভান কফি ও বিস্কুট নিয়ে এল]

—এর জন্য আরেক কাপ কফি নিয়ে এসো আইভান, এ রজারোভের জায়গায় এসেছে।

আইভান। মাখন বিস্কুট ?

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। নিয়ে এসো না, সব নিয়ে এসো—

[আইভান বাহির হয়ে গেল]

—তারপর কমরেড নিকোভিচ, আগে কি করতে ?

নিকোভিচ। ইস্কুল-মাষ্টারী।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। ভালই হয়েছে, আমাদের ক্যাপটেনও একজন ইস্কুল-মাষ্টার।

নিকোভিচ। আপনি তাহলে কমরেড ক্যাপটেন নন ?

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। আমি কমরেড লেফ্‌টেন্যাণ্ট। কমরেড ক্যাপটেন ওই পাশে ঘুমুচ্ছে। ...বলি ক্যাপটেন, ও ক্যাপটেন, রজারোভের জায়গায় নতুন কমরেড এসেছে।

ক্যাপটেন। জানি, শুনেছি।

[যেদিক থেকে ক্যাপটেনের গলা শোনা গেল, সেদিকটা একেবারে অন্ধকার, বাতির আলো সেদিকটাকে মোটেই দৃশ্যমান ক'রে তুলতে পারেনি। কয়েকটি বাক্সের উপর শুয়ে ক্যাপটেন ঘুমোচ্ছিল, এবার সে অন্ধকার থেকে আত্মপ্রকাশ করলো। হাতে একটি সিগারেট, এগিয়ে এসে বাতিতে সিগারেটটা ধরিয়ে নিলে। নিকোভিচ উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করলো।]

ক্যাপটেন। নাম কি ?

নিকোভিচ। নিকোভিচ।

[ক্যাপটেন ভালো ক'রে মুখের পানে তাকালো।]

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। ইস্কুল-মাষ্টার।

ক্যাপটেন। ইস্কুল-মাষ্টার?

নিকোভিচ। ইস্কুল-মাষ্টার।

ক্যাপটেন। ওঃ!

[নিশ্চিন্তমনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে পদচারণা করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে আইভান হু'কাপ কফি আর চারখানা বিস্কুট এনে ক্যাপটেন ও নিকোভিচের সামনে একটি কাঠের বাক্সের উপর রাখলো। হু'জনে নিজ নিজ বিস্কুট ও পেয়ালা তুলে নিলে।]

ক্যাপটেন। কোথাকার মাষ্টার বললে কমরেড?

নিকোভিচ। কিয়েভ—এ গ প।

ক্যাপটেন। কিয়েভ সহরের পতনের পরে সবাই মাষ্টারী ছেড়ে সৈনিক হয়ে পড়লে বুঝি?

নিকোভিচ। সবাই নয়, তবে অধিকাংশ।

ক্যাপটেন। ইস্কুল-মাষ্টারদের সৈনিক হওয়া নিয়ে ভারী মজার একটি গল্প মনে পড়লো।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। গল্প!

ক্যাপটেন। গল্প হ'লেও সত্যি—সত্য ঘটনা। গত জার্ম্মান যুদ্ধে এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। মুখোমুখি ট্রেঞ্চে জার্ম্মান ও ফরাসীরা ব'সে আছে। এমন সময় ফরাসী ট্রেঞ্চে একজন জার্ম্মান গুপ্তচর এসে উঠলো, দিব্যি ফরাসী সেজে। কিন্তু জার্ম্মানটির এমন দুর্ভাগ্য যে, যে-ট্রেঞ্চে সে নেমেছে সেই কোম্পানীর কমাণ্ডার তাকে খুব ভালো ক'রেই চেনে; প্যারিসের এক কলেজে দু'জনে চার বছর এক সঙ্গে পড়েছিল। দু'জনই দু'জনকে দেখে চমকে উঠলো। জার্ম্মানটির আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। ফীল্ড মার্শালের আদেশ দেওয়াই আছে: কোন গুপ্তচর ধরা পড়লেই তৎক্ষণাৎ তাকে গুলি ক'রে মারতে হবে। কিন্তু ফরাসী সৈনিকটি তখনই তা করতে পারলো না। দু'বছর ট্রেঞ্চের নীরস জীবন যাপনের পর একজন ছেলেবেলার সহপাঠীকে পেয়ে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। একটু গল্প করার জন্য তাকে ডাকলো একপাশে। বহুদিনের বন্ধু, দিব্যি গল্প জমে উঠলো। গল্প করতে করতে ফরাসীটি কখন অসতর্ক হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জার্ম্মানটি তা'রই পাশ থেকে বন্দুকের সঙীনটি টেনে নিয়ে এক খোঁচায় বন্ধুকে ধরাশায়ী করলো, তারপরেই সরে পড়লো সেই ট্রেঞ্চ থেকে।

নিকোভিচ। ওটা বোধ হয় একটা প্রোপাগাণ্ডা গল্প।

ক্যাপটেন্। না না, লোকটির সঙ্গে আমার প্যারিসে দেখা হয়েছিল, তার পাঁজরে এখনও সঙীনের খোঁচার দাগ আছে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। ইস্কুল-মাষ্টাররা অত্যন্ত সরল হয়, বেশী ঘোরপ্যাঁচ ওদের মাথায় ঢোকে না।

ক্যাপটেন। ঠিক তাই। আমি ওই জন্যই সব কিছুরই ভালো দিকটা না দেখে সর্ব্বাগ্রে খারাপ দিকটা দেখারই চেষ্টা করি।

নিকোভিচ। পাছে সেই ফরাসী ইস্কুল-মাষ্টারটির মত আপনি কোন ভুল ক'রে বসেন! (হাস্য)

ক্যাপটেন। ঠিক তাই।

নিকোভিচ। কিন্তু ফরাসী মাষ্টারটি কি সত্যই কোন ভুল করেছিল?

ক্যাপটেন। ভুল বৈকি। সেই জার্ম্মানটিকে অমন ভাবে না ডেকে নিয়ে গেলে সে কি পালাবার সুবিধা পেত? ওই একটি লোকের খবরের উপর নির্ভর ক'রে জার্ম্মানরা সেই রাত্রেই সেই ট্রেঞ্চ আক্রমণ করলো ও দখল করলো।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট। একটি লোকের সাময়িক দুর্ব্বলতার জন্য একটি জাতির পরাজয় ঘটলো।

ক্যাপটেন। সেইজন্যই তো আমি সব সময় স্মরণ রাখি, আমি ইস্কুল-মাষ্টার।

নিকোভিচ। আমাকেও তাহলে সেই কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে।

ক্যাপটেন। নিশ্চয়ই। তবে তোমার জন্য তার প্রয়োজন হবে না।

নিকোভিচ। কেন?

ক্যাপটেন। তোমাকে লড়াই করতে হবে না।

নিকোভিচ। লড়াই করতে হবে না!

ক্যাপটেন। না। শত্রু-পক্ষের গুপ্তচর হিসাবে তার আগেই আমি তোমাকে চালান দোব।

[নিকোভিচ লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু সে কিছু করার আগেই ক্যাপটেন তা'র পানে পিস্তল তুলে ধরলো।]

ক্যাপটেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট, ওকে নিরস্ত্র কর।

[লেফ্‌টেন্যাণ্ট নিকোভিচের পকেট থেকে দু'টি পিস্তল বের করলো।]
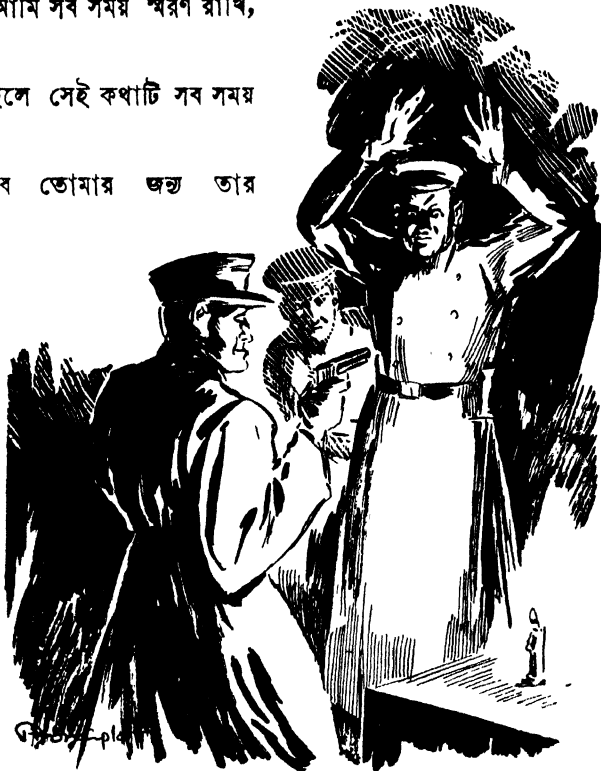
ক্যাপটেন। হান্‌স্ ফ্যালাডে, তুমিও আমাকে চেনো, আমিও তোমাকে চিনি। বার্লিনের মেডিক্যাল কলেজে তুমি আমার সহপাঠী ছিলে।

নিকোভিচ। তুমি ভুল করছ, কমরেড!

ক্যাপটেন। কিয়েভে আমি দু'বছর 'ইস্কুল অর্গানাইজার' ছিলাম, তাছাড়া এইমাত্র আমি খবর পেলাম কালকের আগে নতুন লোক আসবে না। তোমার ওই পরিচয়-পত্রটি জাল। তোমার কপালের ওই কাটা দাগটি আমি খুব ভালো চিনি। তোমাকে দেখামাত্রই সেই ফরাসী ক্যাপটেনের গল্পটি আমার মনে পড়লো। লেফ্‌টেন্যাণ্ট, দু'জন শান্ত্রীকে ডাক—

[লেফ্‌টেন্যাণ্ট সিঁড়ির সামনে গিয়ে দু'জন শান্ত্রীকে ডাকলো। শান্ত্রী দু'জন নেবে এসে স্যালুট দিলে। ক্যাপটেন নিকোভিচকে দেখিয়ে দিলেন।]

ক্যাপটেন। এঁকে নিয়ে যাও কর্ণেলের কাছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট, তুমি এদের সঙ্গে যাও—

নিকোভিচ। [সিঁড়ির ধাপ উঠতে উঠতে ফিরে দাঁড়িয়ে] গুডবাই কমরেড!

ক্যাপটেন। গুডবাই!

[সকলে বাহির হয়ে গেল। ক্যাপটেন একা একা পদচারণা করতে লাগলো।]

ক্যাপটেন। নাঃ, এভাবে আর পারা যায় না। কমরেড আইভান, বেশ কড়া ক'রে এক কাপ কাফি দাও দিকি—

আইভান [নেপথ্যে]। নিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাপটেন। [একটা চুরুট ধরালো, একটান টেনে, বিরক্তিভরে চুরুটটি ছুড়ে ফেলে দিলে] নাঃ, এভাবে আর পারা যায় না। খালি খুন আর খুন। সামান্য একটুকরো মাটির জন্য, সামান্য কিছু অর্থের জন্য মানুষ এমনভাবে মানুষকে খুন করতে পারে! [একটি বাক্সের উপর বসে পড়লো] আলোটা বড় চোখে লাগছে! [বাতিটা পায়ের দিকে জ্বলছিল, ডান পায়ের বুটটা দিয়ে চেপে বাতিটি নিভিয়ে দিলে। তারপর বাক্সগুলির উপর সটান শুয়ে পড়লো।]

আইভান। [কফি হাতে প্রবেশ] কাফি ক্যাপটেন!

ক্যাপটেন। খাব না যাও। [আইভান কফি হাতে ফিরে গেল।]

[দূরে দূরে কয়েকটি কামানের গর্জ্জন শোনা গেল। আলোর ঝিলিক ভেসে এল সিঁড়ির মুখ থেকে। দেখা গেল, ঘোড়ার কম্বল মুখে চাপা দিয়ে ক্যাপটেন শুয়ে আছে। পায়ের বুটজোড়া কম্বল থেকে বার হয়ে আছে, আর পরস্পরে আঘাত করছে। ট্রেঞ্চে আর কোথাও কেউ নেই।]

ধীরে ধীরে যবনিকা নেবে এল।

বিজয়া

এবার শরতের শেষে জগন্মাতার আগমনবার্ত্তা জানাবার জন্য আগমনীর সুর বেজে উঠেছিল। সেই সুর ছিল মায়ের সঙ্গে সন্তানের মিলনের সুর,—সেই সুরে দেয় সন্তানের প্রাণে আশা ও আনন্দের দোলা! সম্বৎসর পরে মা আসেন—সন্তানেরা কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছুটে যায় মাকে বরণ করতে। পুষ্পবিল্বদলে অর্ঘ্য দিয়ে প্রসাদ ভিক্ষে ক'রে নেয় মায়ের কাছে।—কিন্তু মা এবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন মরক! তাই না আজ বিশ্বের দিকে দিকে মরণের ভীষণ তাণ্ডব···মৃত্যুর বিভীষিকায় দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন! মৃত্যুর দূতেরা বাঁধন-হারা হয়ে ছুটে চলেছে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে! শরতের শ্যামলিমা আজ হারিয়ে গেছে—শ্যামা ধরণীর বুক বেয়ে বয়ে যাচ্ছে আজ রক্তের ধারা!—ধরণী আজ সত্যি সত্যি ক্লিষ্ট—ক্লান্ত—অসহায়!

কিন্তু মা কি আমাদের এতই নিষ্ঠুর? সন্তানের দুঃখে মায়ের প্রাণ কি এখনও কেঁদে উঠে নাই? দানব-দলনী মা ধরণীকে মুক্ত করবার জন্য আজও কি তাঁর দশ-প্রহরণ উদ্যত করেননি?

ঐ দেখ—আজ হেমন্তের প্রভাতে মা বিদায় নিয়ে চলেছেন!—থেমে গেছে আজ আগমনীর মিলনের গান,—সুরু হয়েছে বিজয়ার বিচ্ছেদের সুর!—মা আজ চ'লে যাবেন···তাই না আজ বিজয়ার ঘাটে ঘাটে দুঃখদৈন্যে জর্জ্জরিত সন্তানের মেলা! কিন্তু শোনো ঐ বিজয়ার সুর! সেই সুরে ভেসে আসছে মায়ের অভয় বাণী!—দয়াময়ী মা রেখে যাচ্ছেন বসুন্ধরাকে শস্যপূর্ণা ক'রে; ব'লে যাচ্ছেন,—"ওরে আমার নিপীড়িত সন্তান! ভয় নাই, ওরে ভয় নাই তোদের! যখনই অসুরেরা উৎপাত ঘটাবে—তখনই আমি আসব,—এসে মানবতার শত্রুকে আমি বধ করব।"

খেলাধূলা

শ্রীম—

আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা

এবারে আই. এফ. এ প্রতিযোগিতায় মুহামেডান স্পোর্টিং জয়মাল্য লাভের অধিকারী হয়ে ভারতীয়দের ফুটবল খেলার ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। আজ পর্য্যন্ত এক মহামেডান দল ছাড়া অপর কোন ভারতীয় দলই তিনবার ভারতবর্ষের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে পারেননি। এই দল ১৯৩৬ সালে প্রথম ও পরে ১৯৪১ সালে এবং এই বর্ত্তমান বৎসরে

অর্থাৎ ১৯৪২ সালে এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ক'রে ভারতীয়দের ফুটবল খেলাকে একটা সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯১১ সাল হচ্ছে ভারতীয়দের ফুটবল খেলার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণযোগ্য বৎসর। কারণ এই বৎসরই মোহনবাগান দল ভারতীয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আই. এফ. এ খেলায় জয়ী হ'ন। আই. এফ. এ প্রতিযোগিতা সুরু হয় ১৮৯৩ সালে। কিন্তু ১৯১১ সালের মধ্যে আর কোন ভারতীয় দলই এই সম্মানলাভের অধিকারী হতে পারেননি। ১৯৪০ সালে অপর একটি বাঙ্গালী দল এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। এই দলের নাম হচ্ছে এরিয়ান্‌স্। এরা সে বৎসরে ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে এই গৌরবের অধিকারী হঁন। আজ পঞ্চাশ বৎসর আই. এফ. এ খেলার প্রতিযোগিতা চল্‌ছে, এর মধ্যে মাত্র তিনটি ভারতীয় দল মাত্র পাঁচবার জয়ী হয়েছেন। এ অত্যন্ত লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় আমাদের দেশে যদি ভালো ভালো খেলোয়ার তৈরী করবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়, তা হ'লে প্রত্যেক বৎসরই কোন না কোন ভারতীয় দলের পক্ষে আই. এফ. এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

এবারের আই. এফ. এ প্রতিযোগিতায় অনেকগুলো ভারতীয় দল যোগদান করেছিলেন—বিশেষ ক'রে বাংলার মফঃস্বলের অনেক সহর থেকে। মফঃস্বল থেকে আগত ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র মাইশোর রোভার্স দল ছাড়া অপর কোন দলই সেমিফাইনাল পর্য্যন্ত টিঁকে থাকতে পারেননি। মধুপুর তরুণ সমিতিকে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় মাইশোর রোভার্স ৯—০ গোলে হারিয়ে ক্রীড়ামোদীদের একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা'রা এরূপ কৃতিত্ব আর দেখাতে সমর্থ হ'ন নি। তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় এই দল যারা এবার লীগের খেলায় সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করেছেন সেই কাষ্টমস দলকে মাত্র ১—০ গোলে হারিয়ে দেন। তারপর চতুর্থ রাউণ্ডের খেলায় বার্ণপুর ইউনাইটেড্ ক্লাবকে ২—১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেন। এই দল সেমিফাইনাল খেলায় মহামেডান দলের কাছে ৩—০ গোলে হেরে যায়। ইস্টবেঙ্গলের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়ার মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণ এই দলে এবার খেলেছিলেন।

শীল্ডের আর একটি উল্লেখযোগ্য খেলা হচ্ছে দ্বিতীয় রাউণ্ডের মোহনবাগান ভেটারান্‌স্ বনাম ইস্টবেঙ্গল। মোহনবাগানের যে সমস্ত খেলোয়ার ক্রীড়াজগৎ থেকে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন সেইসব বয়োবৃদ্ধ খেলোয়ারেরাই নেমেছিলেন এই দলে। অনেকে ভেবেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে এরা অনেক গোলে হেরে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। এদের ২—০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে উঠবার অধিকারী হয় ইস্টবেঙ্গল। এদের দুটি গোল যে খুব সহজেই ইস্টবেঙ্গল দিতে পেরেছে তা ভেবো না; খুবই বেগ পেতে হয়েছিল তাদের। এই ভেটারান্‌স্ দলে ডাঃ মণি দেব, হামিদ ও বলাইদাস চ্যাটার্জ্জী সেদিন যে ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক যুবক খ্যাতনামা খেলোয়ারেরও ঈর্ষার

বিষয় হতে পারে। ইস্টবেঙ্গল দল রেঞ্জার্স দলকে সেমিফাইনাল খেলায় হারিয়ে ফাইনালে যান। এদের প্রথম দিনের সেমিফাইনাল খেলা ১—১এ ড্র হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২—০এ ইস্টবেঙ্গল রেঞ্জার্সকে হারিয়ে দেন। ইস্টবেঙ্গল দল এবার লীগ খেলায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাতে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে, এ দল এবারে হয়ত বা শীল্ড বিজয়ীও হতে পারবেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দল সবাইকে নিরাশ করেছে ফাইনাল খেলায় মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে ১—০ হেরে গিয়ে। যদিও পেনাল্টি কিকের ফলে এই গোলটি হয়, তার জন্য এ মনে করবার কোন কারণ নেই যে, ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় তাদের দুর্ভাগ্যের ফলেই হয়েছে। কারণ মহামেডান দল এদিন ইস্টবেঙ্গল অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-চাতুর্য্য প্রদর্শন করেছেন।

এবারের মত ফুটবল খেলা একরকম শেষ হয়ে গেলো। এখন সুরু হবে ক্রিকেটের মরসুম।

অঙ্কের ধাঁধা

[উত্তর ১২ই কার্ত্তিকের মধ্যে শিশুসাথী কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই]

তিনজন ফেরিওয়ালা রামচন্দ্র, মফিজ, আর হাবুল কতকগুলো আম নিয়ে বিক্রী করতে বেরুল। রামচন্দ্র নিলে ২৭, মফিজ ২৫, আর হাবুল ১৯টি। তা'রা স্থির করেছিল বেলা ২টা পর্য্যন্ত তা'রা সবাই একই দামে তাদের আম বিক্রী করবে। এর পরে যে আম অবিক্রীত থাকবে তা-ও একই দামে বেচ্‌বে; কিন্তু প্রত্যেকটি আমের দাম দু'আনার কম হবে না। এই ভাবে বিক্রী করে দেখা গেল—প্রত্যেকে ৫।/০ আনা পেয়েছে। এখন বল দেখি, তা'রা বেলা দু'টা পর্য্যন্ত কে কতটা আম কি দরে বিক্রী করেছিল আর তারপরেই বা কি দরে কে কতটা বেচেছিল? ফল কিন্তু পূরো আনাতেই দিতে হবে ভগ্নাংশ হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—গেলো মাসে ধাঁধার উত্তর সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কয়েকজন গ্রাহক-গ্রাহিকার নাম ছাপা না হওয়ায় তাহারা অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু ডাকের গোলমালে চিঠিপত্র পাইতে বিলম্ব হয়। সেজন্য যাহাদের পত্র আমাদের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পরে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাদের উত্তর ছাপা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ইহা আমাদের ক্রটী নহে।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Shankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

একবিংশ বর্ষ　　অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯　　৮ম সংখ্যা

হেমন্ত-শ্রী

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

শরতের　শেফালীর　ঝরে' গেছে　ফুলদল।
রিক্ত　শাখার বুকে　ঝরে তাই　আঁখিজল।
ঝরিছে　নয়নে তা'র　শিশিরের　ব্যথাভার,
শ্যামল　ঘাসের শিরে　জমে আছে　আঁখি ধার।
ঝুমকা　ফুলের দুলে　সেজে এল　হিমরাণী,
কুয়াসা　ওড়না মুখে,　তবু যেন　চিনি চিনি।
সোনার　ঝাঁপিটি ভরে'　দুলিতেছে　পাকাধান,
দোয়েল　আজিও শেষ　করেনি ক'　শেষ গান।

উঠেছে সোনার রবি হাসিভরা দশদিক্,—
তরুণ অরুণ আলো তরুশিরে ঝিক্‌মিক্ !
শীতের হিমানী ঝরে,— তবু যেন হাসি মুখ,
খুঁজিয়া পেয়েছি ফিরে জীবনের হারা সুখ !
নূতন গুড়ের স্বাদ,— 'বনভাত' বনে বনে
করিছে শিশুর দল রাঁধাবাড়া খেলা সনে !
এমন সোনার ছবি বাংলার বুক ছাড়া,
কোথাও পাব না তাই— ভিজে এল আঁখি-তারা !

দ

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত-গুপ্ত, কবিরত্ন, এম্‌-এ

তোমাদিগকে একটি খুব প্রাচীন গল্প বলিতেছি। গল্পটি আছে একখানি উপনিষদে। উপনিষদ্ কাহাকে বলে তাহা হয়ত তোমরা সকলে জান না। 'শ্রুতি' বা 'বেদ' বলিতে হিন্দুরা যাহা বুঝেন তাহার দুইটি ভাগ; একটিকে বলে 'কর্ম্মকাণ্ড,' আর একটিকে বলে 'জ্ঞানকাণ্ড'। 'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ যজ্ঞ; বেদের যে ভাগে মন্ত্র সকল এবং তা ছাড়া যজ্ঞীয় দ্রব্য ও অন্যান্য বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ আছে, তাহাই কর্ম্মকাণ্ড। আর যে ভাগে আত্মা কি, আত্মা কেন দেহের সঙ্গে যুক্ত হইয়া জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি ইত্যাদি দুঃখ ভোগ করে, এবং কি প্রকারেই বা চিরদিনের জন্য এই সব দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, এই সকল তত্ত্ব-কথার উপদেশ আছে, তাহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদ্ এই জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

উপনিষদ্ একখানা নয়, বহু। যে উপনিষদ্ হইতে তোমাদিগকে এই গল্পটি বলিতেছি, সেটি উপনিষদ্‌গুলির মধ্যেও খুব প্রাচীন। খুব সম্ভব অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ভাবিয়া দেখ গল্পটি কত প্রাচীন।

দেবতা, মানুষ, এবং অসুর—ইহারা সকলেই প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান। ইঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হইল, পিতা প্রজাপতি হইতে পরম মঙ্গলকর তত্ত্ববিদ্যা শিখেন। সেইজন্য ইঁহারা তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন,—"বেশ, ব্রহ্মচর্য্য কর, অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা গ্রহণ করিতে হইলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, সুনীতি ও সদাচার পালন করিয়া তাহা অর্জ্জন কর।" ইহাই এদেশের পুরাকালের ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুরা জানিতেন ও মানিতেন যে, দেহ ও মন শুদ্ধ না হইলে বিদ্যা ঠিকভাবে গ্রহণ করা যায় না। যেমন সার দেওয়া মাটিতে বীজ বুনিলেই গাছ বাড়ে ও ফুল ফল প্রসব করে, সেইরূপ দেহ ও মন শুদ্ধ থাকিলেই বিদ্যা বাড়ে ও সুফল দেয়।

প্রজাপতির কথায় দেবতা, মানুষ, অসুর সকলেই বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

তাঁহারা বহু বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেন, এবং পরে যথাসময়ে পিতা ও গুরু প্রজাপতির কাছে গেলেন।

প্রথমে গেলেন দেবতারা, কেননা তাঁহারাই গুণে গরিষ্ঠ। তাঁহারা বলিলেন,—"ভগবন্, আমরা আপনার আদেশ মত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছি। এখন আমাদিগকে উপদেশ দিন্।"

প্রজাপতি বলিলেন,—"দ"। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বুঝিলে ত ?"

দেবতারা উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, বেশ বুঝিলাম।"

প্রজাপতি। কি বুঝিলে ?

দেবতারা। আপনি আমাদিগকে বলিতেছেন,—'তোমরা স্বভাবতঃই দম গুণহীন অর্থাৎ অসংযমী। এখন হইতে দান্ত হও, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুতা করিতে শিখ। ইন্দ্রিয়-সংযমই তত্ত্ববিদ্যা লাভের প্রকৃষ্ট পথ। আপনার 'দ' কথার অর্থ দম।'

প্রজাপতি বলিলেন,—"বেশ বুঝিয়াছ।" আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

দেবতাদিগের পর মানুষদের পালা। কেননা গুণে তাঁহারা মধ্যম। তাঁহারা প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্, আমরা আপনার আদেশ পালন করিয়াছি। এইবার আমাদিগকে উপদেশ দিন্।"

প্রজাপতি বলিলেন,—"দ"। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বুঝিলে ত?"

তাঁহারা উত্তর দিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, বেশ বুঝিলাম।"

প্রজাপতি। কি বুঝিলে?

মানুষগণ। আপনি আমাদিগকে বলিতেছেন,—'তোমরা স্বভাবতঃ বড় লোভী, পরের ধন আত্মসাৎ করিতে চাও। ঐ দোষ ছাড়, দান করিতে শিখ।' আপনার 'দ' কথার অর্থ দান।"

প্রজাপতি বলিলেন,—"বেশ বুঝিয়াছ।" আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

এইবার অসুরদের পালা। তাহারাও যথাসময়ে আসিয়া প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্, আমরা আপনার আদেশ পালন করিয়াছি। এখন আমাদিগকে উপদেশ করুন্।"

প্রজাপতি বলিলেন,—"দ"। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বুঝিলে ত?"

অসুরগণ বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, বেশ বুঝিলাম।"

প্রজাপতি। কি বুঝিলে ?

অসুরগণ। আপনি আমাদিগকে বলিতেছেন,—'তোমরা বড় হিংসাপরায়ণ; ঐ দোষটি ছাড়। দয়া করিতে শিখ।' আপনার 'দ' কথার অর্থ দয়া।

প্রজাপতি বলিলেন,—"বেশ বুঝিয়াছ।" তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া অসুরদিগকে বিদায় দিলেন।

গল্পটির শেষ এইখানেই; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গল্পটি আছে একখানি উপনিষদে অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে, যাহা আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর উপদেশে পূর্ণ। সুতরাং এই গল্পটিকে একটা বাজে গল্প মনে করিও না। যাঁহারা বেদের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা এই গল্পটি নিয়া নানারকম বিচার করিয়াছেন। সেই সকল বিচারেরও কিছু কিছু তোমাদিগকে বলিতেছি।

দেবতা, মানুষ ও অসুর ইঁহাদের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ পাইবার যোগ্য—তাহা না হয় ধরিয়া লওয়া গেল। কিন্তু এস্থলে লক্ষ্য ইঁহাদের একই; সকলেই চাহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞান। প্রজাপতিও একটি মাত্র অক্ষরেই তিন দলকে উপদেশ দিলেন। এরূপ অবস্থায় ইঁহারা ঐ একটি অক্ষরের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কল্পনা করিয়া নিজেরাও তুষ্ট হইলেন, প্রজাপতিকেও তুষ্ট করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?

এই সন্দেহের উত্তরে বলা হইয়াছে, দেবতা, মানুষ ও অসুর ইঁহারা সকলেই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করিয়া মনটা এমন শুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ইঁহারা নিজ নিজ স্বভাবগত দোষ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছিলেন। আর দোষ সংশোধনই সর্ব্বাগ্রে

আবশ্যক, সেইজন্য পিতা বা গুরু পুত্রের বা শিষ্যের দোষ সংশোধনের দিকেই প্রথমে মন দেন। এস্থলে যিনি উপদেষ্টা, তিনি পিতাও বটেন, গুরুও বটেন। সুতরাং তিনি যখন একটি মাত্র অক্ষরে উপদেশ দিলেন, তখন তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিষ্যেরা নিজ নিজ প্রধান দোষ সংশোধনের আবশ্যকতার কথাই ভাবিলেন। নিজ দোষ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অল্প উপদেশেই কাজ হয়, সেইজন্য প্রজাপতিও তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

তারপর বিচার করা হইয়াছে, আচ্ছা, প্রজাপতির যে উপদেশ—দম, দান, দয়া, ইহার সবগুলি পরবর্ত্তীকালের মানুষদের আচরণীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে কি? অসুরগণ অতি নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক, তাহাদের জন্য প্রজাপতি যে উপদেশ দিয়াছেন, সেটা মানুষেরা কেন আচরণ করিবে? আর দেবতাদের জন্য যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মানুষদের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া বাদ দিলেই বা দোষ কি?

এই সন্দেহের উত্তরে বলা হইয়াছে—দেবতা, মানুষ ও অসুর অন্য দোষে ও গুণে যতই ভিন্ন হউক, এস্থলে সকলেই প্রজাপতির পুত্র বলিয়া তুল্যই মনে করিতে হইবে। পুত্রদের পক্ষে যাহা যাহা মঙ্গলজনক তাহাই তিনি বলিয়াছেন; সুতরাং সকলেই এই তিনটি গুণ কল্যাণজনক মনে করিয়া লাভ করিতে চেষ্টা করিবে।

অথবা বুঝিতে হইবে, দেবতা, মানুষ ও অসুর এই তিন নামে প্রকৃতপক্ষে তিন প্রকার প্রকৃতির মানুষদিগকেই বুঝাইয়াছে। মানুষদের মধ্যে—যাহারা দম-গুণে হীন, কিন্তু অন্যান্য উত্তম গুণসম্পন্ন তাহারাই দেবতা; যাহাদের বড় দোষ লোভ, তাহারা মানুষ; যাহারা বিশেষভাবে হিংসাপরায়ণ ও ক্রূর, তাহারা অসুর। গল্পটি শেষ করিয়া—শ্রুতি (উপনিষদ্) বলিয়াছেন, প্রজাপতির উপদেশ এখন পর্য্যন্ত দেববাণীরূপে মেঘের ডাকে শুনা যায়। মেঘ কি বলিয়া গর্জ্জন করে?—"দ—দ—দ, দ—দ—দ"; অর্থাৎ দান্ত হও, দান কর, দয়া কর; সংযম শিখ, লোভ ছাড়, ক্রোধ ছাড়।

আমরা ঘামি কেন

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি

ক্লাসের ফার্ষ্ট-বয় যখন মাষ্টার মশায়ের প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে না পারে, তখন সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে, আর তা'র কপালে একটি-দু'টি করে' স্বেদ-বিন্দু ফুটে উঠতে থাকে। শুধু ক্লাসের ফার্ষ্ট-বয় নয়, আমরাও যখন সহসা দারুণ লজ্জায় অথবা অপমানে অপ্রতিভ হয়ে পড়ি, কিংবা কেউ যখন এক-ঘর লোকের সামনে আমাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে দেয়, তখন শীতের দিনেও আমরা ঘামতে থাকি। এছাড়া বেশ খানিকটা ছুটোছুটি কিংবা কোনো ভারী পরিশ্রম করলেও খুব ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হই।

ঘাম হওয়া এমনই একটা সাধারণ ব্যাপার যে, সে-সম্বন্ধে কিছু ভাববার আমাদের অবকাশই থাকে না। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়—এই বিশ্রী জিনিষটা তৈরী না হলে কি চল্‌তো না? সেজেগুজে দিব্যি ফিট্‌ফাট্ হয়ে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গেছি, সেখানে লোকের ভীড়ে আর গরমে এমন ঘাম আরম্ভ হল যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সযত্ন-মার্জ্জিত মুখের স্নো-পাউডার ধুয়ে গিয়ে একেবারে স্রেফ্ তেল-চক্‌চকে আসল রূপটি প্রকাশ ক'রে দিলে। তখন ভারী রাগ ধরে এই ঘামের উপর, নয়? আমরা ছেলের দল—দিদিদের মতন তো আর ভ্যানিটি-ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে পারি না। তাই যতদূর সম্ভব ভীড় পরিহার ক'রে এবং গরম বাঁচিয়ে আমাদের চলতে হয়, যাতে এই বিশ্রী ঘাম থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

আপাত-দৃষ্টিতে যা সাধারণ, বৈজ্ঞানিকের দূর-দৃষ্টি তা'রই মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পায়, এবং যখন তাঁর অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে সেই আপাত সাধারণের অন্তর্নিহিত রহস্যটি ধরা পড়ে, তখন আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। মনে হয়, এই তুচ্ছ জিনিষের ভিতরে এত কারিকুরি রয়েছে!

আমরা ঘামি কেন? ঘাম কি এবং কোথা থেকে আসে?—এসব প্রশ্ন আমাদের মনে সহসা স্থান পায় না। তার কারণ আমাদের অনুসন্ধিৎসা তেমন প্রবল নয়। বিলেতের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে এইখানেই আমাদের তফাৎ। জানবার আগ্রহ না থাকলে কি বড়ো হওয়া যায়? বড়ো হতে গেলে কোনো-কিছুকেই সামান্য জ্ঞানে উড়িয়ে দিলে চলবে না। এ হল কালের দাবি। আধুনিক যুগ আমাদের কাছে থেকে দাবি করছে বড়ো হওয়ার। ছোটবেলা থেকেই আমাদের অনেক জিনিষ জানতে হবে, অনেক বিষয় শিখতে হবে—সাগর-পারের ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমরা এদেশের ছেলেমেয়েরা যে কোনো অংশেই ছোট নই, কোনো বিষয়েই পিছনে পড়ে নেই, এইটেই আমাদের প্রমাণ ক'রে দিতে হবে।

শরীর-তত্ত্ববিদ্‌গণের বহু আয়াসের ফলে ঘামের সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তাই নিয়েই আজকের আলোচনা সুরু করা যাক।

মানুষ এবং প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে এমন কতকগুলি যন্ত্র আছে যা থেকে একরকম রস আপনা-আপনি তৈরী হয়। এই সব রস শরীর-ধারণের পক্ষে এবং সুস্থ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে খুব সহায়তা করে। এই রসোৎপাদনকারী যন্ত্রগুলির প্রত্যেকটি গ্লাণ্ড (gland) নামে অভিহিত। প্রত্যেকটি গ্লাণ্ড আবার দেহের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে অবস্থিত এবং প্রত্যেকে এক একরকম রস তৈরী করে। আমরা যাকে পিত্ত বলে জানি, সেটা পেটের ভিতরে অবস্থিত লিভার বা যকৃৎ নামক গ্লাণ্ডের রসমাত্র। এই রকম কান্না বা চোখের জল তৈরী হয় ল্যাক্রিম্যাল গ্লাণ্ড থেকে এবং থুতু বা লালা তৈরী হয় লালা গ্লাণ্ড থেকে। ঠিক অনুরূপভাবেই ঘাম উৎপন্ন হয়ে থাকে স্বেদ-গ্লাণ্ড (Sweat-glands) থেকে।

এই স্বেদ-গ্লাণ্ডগুলি কোথায় থাকে তা-ই এবার বলছি।

প্রাণি-গায়ের চামড়া বা ত্বক্‌কে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এপিডারমিস্ বা বহিস্ত্বক্ (উপরকার পাত্‌লা চামড়া) এবং ডারমিস বা অন্তস্ত্বক্ (এপিডারমিসের ঠিক নীচেকার পুরু অংশ)। এই ডারমিসের ভিতরে একরকম কুণ্ডলীকৃত সরু লম্বা নল আছে; সেটা ঠিক কর্ক্-স্ক্রুর ন্যায় এঁকেবেঁকে এপিডারমিসের ভিতর দিয়ে এসে ত্বকের উপরিভাগে খুলছে। এরই নাম হল স্বেদ-গ্লাণ্ড। শরীরের প্রায় সর্ব্বত্র এই স্বেদ-গ্লাণ্ড পরিলক্ষিত হলেও, যে অংশে লোম কম সেই অংশেই এরা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। আমাদের হাতের ও পায়ের চেটোয় লোম নেই। তাই সব চেয়ে বেশী স্বেদ-গ্লাণ্ড এই দু' জায়গাতেই দেখা যায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে ঘামও হয় সবচেয়ে বেশী। অবশ্য আমাদের কপালে এবং গলায় বিশেষ চুল অথবা লোম না থাকায় সেখানেও খুব ঘাম হয়।

বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে ঘামের কম-বেশীর পার্থক্য দেখা যায়। ঘোড়ার চেয়ে গরু কম ঘামে। কুকুর-বেড়ালের শুধু পায়ের নরম পাতাগুলি এবং কখনো কখনো নাকের অগ্রভাগটি ঘামে। শূয়োরের ঘাম হয় শুধু লম্বা নাকে। আবার ছাগল, খরগোস ও ইঁদুরের ঘামই হয় না।

আমাদের কারো কারো হাতের চেটো খুব বেশী রকম ঘামে, আবার কেউ কেউ তা' মোটে বুঝতেই পারে না। তা'রা হয়ত বলবে, বাঃ! হাতের চেটোয় যদি সব চেয়ে বেশী স্বেদ-গ্লাণ্ড থাকে, তাহলে সেখানকার ঘাম কোথায় গেল? তাদের আমি আর একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ঘাম দু'রকমের—প্রত্যক্ষ (sensible perspiration) ও পরোক্ষ (insensible perspiration)। ঘামে যখন আমাদের জামা ভিজে যায়, কিংবা জলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরতে থাকে, তখন সেইরকম ঘামকে প্রত্যক্ষ ঘাম বলা হয়। আবার অনেক সময়ে সত্যি সত্যি ঘামলেও সে ঘাম চোখেও দেখা যায় না বা বুঝতে পারা যায় না। একেই বলা হয় পরোক্ষ ঘাম। স্বেদ-

থেকে যদি অল্প অল্প ক'রে ঘাম নিঃসৃত হয়, তাহলে সেই ঘাম ত্বকের উপরিভাগে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়। আবার প্রচুর পরিমাণে স্বেদ নির্গত হলেও বাইরের বাতাস যদি খুব শুষ্ক হয়, তাহলে সেই ঘামও আমরা বুঝতে পারি না। কারণ খুব শীঘ্রই ঘামের জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হয়। শুধু মনে হয়, গায়ে যেন ধুলোর মতন কী কর্‌কর্‌ করছে। প্রকৃতপক্ষে তা হল ঘামের অজলীয় লবণ-পদার্থ। গ্রীষ্মকালটা যারা লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কাটিয়েছে তা'রা সহজেই এই পরোক্ষ ঘামের কথা বুঝতে পারবে। ও-সব দেশে গ্রীষ্মকালে একরকম অত্যন্ত গরম শুষ্ক হাওয়া বইতে থাকে। সেই হাওয়াকে ওখানকার লোকেরা বলে "লু"। এই "লুর" প্রভাবে ইভাপোরেশন বা ভিতরের জলীয় অংশের বাষ্পে পরিণত হওয়া অত্যন্ত দ্রুত হয়। বোঝা না গেলেও স্বেদ-গ্রাণ্ড থেকে প্রচুর ঘাম ক্ষরিত হতে থাকে। ঘামের শতকরা প্রায় নিরেনব্বই ভাগই জল। যখন ঘামের সঞ্চিত জলের অভাব ঘটে, তখন "লু" ভিতরকার রক্তের জলীয় অংশটাই শুষে নেয় এবং এর ফলে অনেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা পড়ে। তাই সে-সব দেশে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হয়, যাতে দেহে জলের অভাব কখনো না ঘটে। আমাদের বাঙ্‌লা দেশের গ্রীষ্ম ও বর্ষার বাতাস অত্যন্ত আর্দ্র। ভিজে বাতাসে তাড়াতাড়ি ইভাপোরেশন হবে কি করে? তাই সে-সময়ে আমাদের খুব ঘাম হয়। আবার শীতকালে বাতাস অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হওয়ায় সহজেই ইভাপোরেশন হয় ব'লে আমরা যে ঘামি তা ঠিকমত বোঝা যায় না। অথচ এই শীতকালেই যদি একটা বদ্ধ ঘরে খানিকক্ষণ অতিবাহিত করি, তাহলে বুঝতে পারি যে স্বেদ-গ্রাণ্ডগুলি নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে নেই, ঠিক কাজ ক'রে চলেছে।

একজন পরিণত বয়সের লোকের স্বেদ-গ্রাণ্ডগুলি থেকে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় এক সের ঘাম তৈরী হয়ে থাকে।

ঘামের এই স্বাভাবিক পরিমাণ কোনো কোনো উপায়ে বা কোনো কোনো কারণে পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

প্রচুর পরিমাণে জলপান করলে রক্তের জলীয় অংশ বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপিলারি ব্লাড-প্রেসার বা রক্তের চাপও বর্দ্ধিত হয়। এর ফলে বেশী বেশী ঘাম হতে থাকে।

কেন্দ্রীয় নার্ভ-প্রণালী থেকে বহু শাখা-প্রশাখা স্বেদ-গ্রাণ্ড অবধি বিস্তৃত হয়েছে। এইগুলিই প্রকৃতপক্ষে স্বেদ-গ্রাণ্ডের কার্য্য নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। এই স্বেদ-গ্রাণ্ড-সন্নিবিষ্ট নার্ভগুলিকে যদি পিলোকার্পিন, ষ্ট্রিক্‌নিন, পিক্রো-টক্সিন, ক্যাম্ফর, এ্যামোনিয়া, নিকোটিন প্রভৃতি ওষুধের দ্বারা উত্তেজিত করা যায়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে স্বেদোৎপাদন করা যেতে পারে। আবার এ্যাট্রোপিন্‌ অথবা মর্‌ফিনের দ্বারা ঐ নার্ভগুলিকে অসাড় বা নিস্তেজ ক'রে দিলে ঘামের পরিমাণ খুব কমে যায়।

নার্ভ কি তা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, নয়? নার্ভ হচ্ছে ঠিক টেলিগ্রাফের তারের মতন—এক জায়গার খবর আর এক জায়গায় পৌঁছে দেয়। সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস জানো তো, যেখানে তারের আদান-প্রদান হয়? ব্রেন বা মস্তিষ্ক হচ্ছে ঠিক তাই। নার্ভের কাজ হল মস্তিষ্কে বার্তা বা অনুভূতি নিয়ে যাতায়াত করা। আশা করি এবার আর বোঝবার অসুবিধা হবে না।

মূর্চ্ছার উপক্রম বা শ্বাসরোধ হলে, কিংবা অতিরিক্ত ভয়, লজ্জা অথবা অপমানে ঐ নার্ভগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তারি ফলে আমরা খুব ঘামতে থাকি।

প্রস্রাবের ন্যায় ঘামকেও শরীরের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশক বলা হয়। উভয়ের কাজ প্রায় একই। প্রচুর প্রস্রাব অথবা পাতলা দাস্ত হলে ঘাম খুব অল্পই হয় এবং তার ফলে ত্বক্ শুষ্ক ও খস্‌খসে হয়ে পড়ে। আবার প্রচুর ঘাম হলে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘাম হওয়া ভালই এবং স্বাভাবিকভাবে তা হবেই। এখন আমরা কোনো উপায়ে প্রত্যক্ষ ঘামকে পরোক্ষ ঘামে রূপান্তরিত ক'রে অন্ততঃ সাময়িকভাবে আমাদের সাজসজ্জা-বেশভূষাকে পরিপাটিরূপে নিখুঁত রাখতে পারি কিনা সেইটেই দেখতে হবে।

আমরা জানি, আর্দ্র ও বদ্ধ বাতাসে ইভাপোরেশন কম হলে ঘাম বেশী পরিস্ফুট হয়। এ দেশের গ্রীষ্মকালের বাতাস বেশ আর্দ্র। যদি গ্রীষ্মকালেও একটি পশমী বস্ত্র গায়ে জড়ানো যায়, তাহলে পশমের সংস্পর্শে এসে বাতাসের আর্দ্রতা অনেকটা ঘুচে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ইভাপোরেশনের ফলে বিশেষ ঘাম দেখা যাবে না। আজকাল বাজারে স্পোর্টস্-মার্ট ধরণের এক রকম পশমের গেঞ্জি বেরিয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, গ্রীষ্মকালেও কোনো কোনো ছেলে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ঐ গেঞ্জি পরে পরিবেশন করছে। এতে সত্যিই ঘাম অন্ততঃ খানিকটা কমে বলে মন হয়। তবে সুস্থ দেহে তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা চলে না। যার উপর যে কাজের ভার, তাকে সে-কাজ থেকে সহসা বঞ্চিত করলে এক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও গোলযোগের সৃষ্টি হবে। তাই যেমনটি চলছে তেমনটি চলুক—আমরা কারো চলার পথে বাধার সৃষ্টি করব না—শুধু জেনে রাখব কে কি ভাবে চলছে।

সেকাল ও একাল

শ্রীনীলরতন দাশ, বি-এ

'সোনার বাংলা'—সে ত আজি হায় কল্পনা, শুধু কবির কথা।
বাস্তবে তা'র নাই পরিচয়, নাইক' তাহার সার্থকতা।
যেথায় ফলিত সোনার ধান্য, শস্যবিহীন আজি সে মাঠ ;
সোনার কমল ফুটিত যেথায়, শুষ্ক সে দীঘি ভগ্নঘাট।
নদী খাল বিলে স্বচ্ছ সলিলে কত না মৎস্য করিত খেলা ;—
কলমি-লতায় কচুরী-পানায় বসে সেথা আজ মশার মেলা।
গোষ্ঠে হরষে খেলিত রাখাল, বাজে না সেথায় মোহন বেণু ;
সোনার ধানের স্বর্ণ শীর্ষে পায় না কৃষক স্বর্ণরেণু।
পল্লীর বুকে হাহাকার জাগে, অধরে কাহারো নাহিক' হাসি ;
যে দিকে তাকাই দেখিবারে পাই বিষাদের ঘন আঁধার রাশি।
গানে উৎসবে হাসি কলরবে মুখর হয় না পল্লীবাট ;
বারোয়ারী তলা আড্ডা জমে না, রামায়ণ সেথা হয় না পাঠ।
ভাঙা মন্দিরে দীপ নাহি জ্বলে, ভক্ত-পূজারী সেথায় নাই ;
সাধু সন্ন্যাসী পল্লীতে আসি' পায় না কোথাও একটু ঠাঁই।
দৈন্যের দায়ে পণ্য বিকায় বুঝে না কৃষক আপন হিত,
শীর্ণ শরীরে জীর্ণ কুটীরে কাটায় গ্রীষ্ম বর্ষা শীত।
ধান্যের গোলা শূন্য তাহার গো-শালায় ধেনু অস্থিসার,
ঘর ভরা রোগা সন্তান যত নিত্য বাড়ায় ঋণের ভার।
শান্তির নীড় পল্লী কুটীর আজিকে ভীষণ শ্মশানবৎ,
আলোকের রেখা যায় না যে দেখা, আঁধারে ঘিরিছে ভবিষ্যৎ।
পল্লী মায়ের করুণ দৃশ্য দেখবি যদি রে কিশোর দল,—
পল্লীর বুকে আয় সবে ছুটে, চক্ষে তোদের ঝরিবে জল।

লরেন্স সাহেব

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল শিলাইদহ বাসের সুযোগে আমরা দেশ-বিদেশের অনেক মহাপ্রাণ মানুষের অন্তরের পরিচয় পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেকালে অনেক সাহেব, জাপানী ও চীনবাসী শিলাইদহে আস্‌তেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অনেকদিন শিলাইদহে বাস ক'রে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের ইংরাজীর গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেবের কথা আমি একটু বলেছি আমার সদ্য প্রকাশিত "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথে"। লরেন্স সাহেব কিছুকাল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও ইংরাজী ভাষার শিক্ষকতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই মহাপ্রাণ সাহেবের কথা তাঁর অনেকগুলো চিঠিতে বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোণো প্রবাসীর পৃষ্ঠা খুঁজলে সেই সুন্দর চিঠিগুলো পাওয়া যাবে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সৃষ্টির ইতিহাসে এই মহাপ্রাণ সাহেবের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখ্‌বার যোগ্য।

লরেন্স সাহেবকে সাক্ষাৎভাবে দেখেছেন এমন লোক এখনও শিলাইদহে আছেন। একজন সুসভ্য ইংরাজের সেই প্রাণখোলা সহৃদয়তা আজও কেউ ভুল্‌তে পারেননি। লরেন্স সাহেব যেমনভাবে সাধারণ লোকের সাথে নিঃসঙ্কোচে ও সরলভাবে মিশ্‌তেন, তেমন আমি তো শুনিনি। সাহেবের সম্বন্ধে যে কাহিনী বল্‌ছি তা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। এই রকমের সুন্দর কাহিনী দু'দশ বছর পরে হয়তো মহাকালের গায়ে বিনীল হয়ে যাবে।

লরেন্স সাহেবের বাসের জন্য শিলাইদহ কুঠীবাড়ীর প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তে একটা বাংলো ছিল। তার চিহ্ন আজও আছে। সাহেব সেইখানেই থাকৃতেন। তাঁর দুইটী প্রচণ্ড সখ ছিল,—একটী হচ্ছে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, আর একটী পাইপে তামাক খাওয়া। নানান রকমের হুইল, ছিপ এবং ফাত্‌না, সূতো ইত্যাদি ভরা ব্যাগটী তাঁর একটা বড় সম্পত্তি ছিল।

তিনি গোপীনাথের পুকুরে (শিলাইদহের গোপীনাথ দিঘী) প্রায় প্রত্যহই একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে আস্‌তেন। সে সময়কার অনেক গ্রাম্য যুবক ও বালক তাঁর বেশ অন্তরঙ্গ হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর মাছ ধরার সঙ্গী ছিলেন তিনজন ইস্কুল-পালানো ছেলে—(১) অনন্ত রায়, (২) সতীশ সরকার, (৩) জ্যোতিষ মজুমদার (জটা মজুমদার)। এঁরা সবাই আজ পরলোকে।

সাহেব গোপীনাথ দিঘীর দক্ষিণপাড়ে এক টুল পেতে ব'সে ছিপে মাছ ধরেন, আর ঐ বালকের দল ছিপ, বড়শী, টোপ, চার ইত্যাদির তদ্বির ক'রে দেন। সাহেব মাছ ধরেন আর হরদম্ পাইপে ক'রে বিলিতি তামাক টানেন।

ঐ তিনটী প্রিয়পাত্র একদিন সাহেবকে বল্‌লেন—"স্যার, আপনি আলা তামাকের কড়া পাইপ টানেন। আমাদের দেশী তামাক খেয়ে দেখুন,—কি আরাম আর কি সুন্দর।" সাহেব পল্লীজীবনের বড় ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন; তিনি বল্‌লেন—"খুব ভাল কথা, একটা ভাল হুঁকোও চাইতো।"

সাহেব কুষ্টে থেকে বেশ বড় একটা ডাবা হুঁকো আনালেন। খোরসেদপুর বাজার থেকে গ্রাম্য দা'কাটা তামাকও জোগাড় হল। মাছ ধরবার সময় ঐ হুঁকো, ক'ল্‌কে, তামাক ইত্যাদিও ঘাটে উপস্থিত হল।

মাছ ধরা চলেছে। অনন্ত রায় বেশ যত্ন করে তামাক সেজে হুঁকোয় লাগিয়ে সাহেবকে খেতে দিলেন। সাহেব সশব্দে হুঁকো টেনে আনন্দে হাস্‌তে লাগ্‌লেন, হুঁকোর মধ্যেকার জলের গড়গড় শব্দ তাঁকে বেশী ক'রে মুগ্ধ করল। সাহেব বল্‌লেন—"বাঃ, তামাক খেতে তো বেশ।" হুঁকোর মধ্যে জল থাকায় গলা ধ'রে যায় না, আবার তামাকটাও বেশ মিষ্টি লাগে দেখে সাহেব হুঁকো আর তামাকের সুখ্যাতিতে একেবারে পঞ্চমুখ হলেন।

সাহেব একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর অনন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই রকম কালো কুচ্‌কুচে তামাক তৈরী ক'রে কেমন করে?"

অনন্ত রায় সাহেবকে ইংরাজী বাংলায় খিঁচুড়ী পাকিয়ে তামাক তৈরীর যে কাহিনী বল্‌লেন, তা সাহেব ভাল বুঝতে পারলেন না। সতীশ সরকার ছিলেন একটু বেশী রসিক। তিনি সাহেবকে ইংরাজী বাংলা হিন্দী আর অঙ্গভঙ্গী সহকারে বুঝিয়ে দিলেন—"দেখুন স্যার, এই টোবাকো গার্ডেনে জন্মে। তা কেটে ড্রাই ক'রে মচ্‌মচে

হ'লে দা দিয়ে কাট্ ক'রে, এই এ্যায়স্যা স্মল্ স্মল্ টুক্‌রো ক'রে নিতে হয়। ফিন্ তার সঙ্গে চিটেগুড় অর্থাৎ মোলাসেস মিক্স্ ক'রে চটের উপর ফেলে রাইট হ্যাণ্ড দিয়ে এই এম্‌নি এম্‌নি ভেরী ভেরী জোর্‌সে টোবাকো মেকুইং কর্ত্তে হয়, আবার বিষ্ণুপুরী বা বালাখানা দিয়ে মিক্স্ ক'রে আবার এম্‌নি ক'রে—টোবাকো মেকুইং করতে হয়।" সাহেব তামাক তৈরীর কায়দাটা খাসা বুঝ্‌লেন এবং এমন ভয়ানক হাস্‌লেন যে তাঁর হাসি আর থামে না,—বারে বারেই সতীশ সরকারকে "টোবাকো মেকুইং" বলে ডেকে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। তিনি সেই থেকে সতীশ সরকারকে "টোবাকো মেকুইং" নামেই ডাকৃতেন। বালকে বৃদ্ধে, বাঙ্গালী আর ইংরেজে এই রকম সরল প্রাণখোলা আমোদ চলতো।

স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারীর (লেখকের জ্যাঠামশাই) বড় ছেলেটী ছিলেন পাগল, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব; কারণ যুবক পাঁচুবাবু পাগল হলেও লেখাপড়া কিছু করেছিলেন আর বেশ ইংরাজী বলতে পারতেন।

পাঁচু পাগলের পাগ্‌লামী বাড়লে তাঁকে লোহার বেড়ী দিয়ে রাখা হ'ত। একবার পাঁচু ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে গভীর রাত্রে বেড়ী ভেঙ্গে দিলেন ছুট্। হাজির একেবারে কুঠিবাড়ীতে সাহেবের বাংলায় গিয়ে; সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠলেন।

তখন্ অনেক রাত; পাগল সাহেবের কাছে গিয়েই বললে—"সাহেব, বড্ড ক্ষিদে, খেতে দাও।" সাহেবের শোবার ঘরে অত রাত্রে খাবার কোথা থেকে আস্‌বে! ঘরে ছিল এক্‌ছড়া মর্ত্তমান কলা, তাই পাগলকে খেতে দিলেন। তাই দেখে পাগল চটে লাল হয়ে বলল—"Am I a monkey ?" সাহেব যত বুঝান, পাগল ক্ষিদের জ্বালায় ততই চটে ওঠে। শেষে কলা খেয়ে পাঁচুপাগল সাহেবের একটা জামা নিয়ে বাংলার দক্ষিণদিকের শার্শি পাল্লাওয়ালা একটা জানালার শিক্ ভেঙ্গে উধাও!

গোলমাল শুনে লোকজন এসে পড়লে সাহেব আমোদে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—
Panchu is a good chap ; though mad, very strong.

এর পরে সাহেব প্রায়ই পাঁচু পাগলের খোঁজ করতেন—How is Panchu ? Where is Panchu ?

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সেয়ানে সেয়ানে

"ভাইজাগের জাহাজখানা এল।"—একটি মাল্লার মুখে কথাটি শুনিয়া বনমালী চমকিয়া উঠিল, বলিল—"তাই নাকি!"

রাজেন ও বনমালী উভয়েই সেইদিকে তাকাইল।

বেণীমাধব ওমুঙ্গায় নোঙ্গর করিয়াছিল। জাহাজখানাকে কার্য্যক্ষম করা হইতেছিল। নূতন রং করান হইতেছে, নূতন মাস্তুল বসান হইয়াছে, এখন হালটি মেরামত করা হইতেছে। এখনও দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, জাহাজ ঝড়ে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল।

খুব জোর কাজ চলিতেছিল। সেই বিপদের পর ছেঁড়া পালগুলি জোড়াতাড়া দিয়া জাহাজখানি বন্দরে আনা হইয়াছে। বনমালী কোথা হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনিয়া কতকগুলি লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। সকলে মিলিয়া দারুণ পরিশ্রম করিতেছে, জাহাজটি চলাফেরা করার উপযুক্ত হইলেই আবার মালিকের সন্ধানে বাহির হইবে। এখনও অনেক কিছু বাকী।

মাল্লার কথা শুনিয়া বনমালী চাহিয়া দেখিল সমুদ্রের দিক হইতে পাহাড়ের পাশ দিয়া একখানি জাহাজ আসিতেছে। তাহার মনে সন্দেহ হইল, এ জাহাজ কেন এখানে আসে। আবার ভাবিল, কাজও তো থাকিতে পারে। মনে মানিল না, বড়ই সন্দেহ হইতে লাগিল।

রাজেনের চক্ষু কপালে উঠিল, ডান হাতটি বেল্টের রিভলবারের সহিত যুক্ত হইল। লাফাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিল,—"সেই ভাইজাগের সুন্দরম্! এই সেই বোম্বেটের জাহাজ।"

বনমালীও একটু চঞ্চলভাবে বলিল—"তেমনি তো দেখে মনে হচ্ছে।"

বেণীমাধবের দুরবস্থা দেখিয়া সুন্দরমের নাবিকদের যেন মহা উৎসাহের সঞ্চার হইল।

জাহাজটি আসিয়া বেণীমাধবের নিকটেই নোঙ্গর করিল। দেখা গেল তাহার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাফপ্যান্ট-পরা তিনটি লোক এদিকে চাহিয়া খুব হাসাহাসি করিতেছে, অন্যান্য মাল্লারা যেন খুবই আনন্দে মসগুল।

রাজেন একটু অধীরভাবে বনমালীর দিকে চাহিয়া বলিল—"আমি ও জাহাজে যাবো।"

বনমালী বলিল—"না না, তোমার যেতে হবে না। গোলমাল কোরে ক্ষতি বই লাভ নেই। তোমরা চুপচাপ থাক, আমি একবার গিয়ে খবর ক'রে আসছি।"

—"নাঃ, নাঃ, আমি ওদের মুখ দেখেই চিনেছি, ওরাই মালিককে জলে ফেলে দিয়েছে, জাহাজ লুঠ করেছে। আমি গিয়ে ঐ তিনটে গুণ্ডার মাথা কাটব, আমরা দল বেঁধে গিয়ে আগুন লাগিয়ে জাহাজ পুড়ে ফেলব, তাতে যা' হবার হবে।"

বনমালী রাজেনের হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল,—"ভুল কর কেন রাজেন? ওরা চোর, ডাকাত, বদমাস হতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে আমরা গুণ্ডামি করব কেন! আর যদি তোমার কিছু করবারই ইচ্ছে হয়ে থাকে, পরেও তো কর্ত্তে পারবে। এখন ওখানে গেলে সব মাটি, কোন খবর আর পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে ওদের না ঘাঁটিয়ে আমি খবর নিয়ে আসৃছি। আমাদের দরকার বাবুর খবর, এটা তোমায় স্বীকার কর্ত্তেই হবে।"

রাজেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—"তবে খবরই নেওয়া হ'ক। আমি কিন্তু ব'লে রাখছি ওরা জানলেও কোন খবর জানাবে না।"

ডিঙ্গিটা বোম্বেটেরাই লইয়া গিয়াছিল, এখানে আসিয়া একটি নূতন ডিঙ্গি কেনা হইয়াছে। বনমালী তাহাতে চড়িয়া বসিল, দুইজন মাল্লা দাঁড় বাহিয়া সুন্দরমের পাশে উপস্থিত করিল।

বনমালী চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাল্লারা আগ্রহান্বিত হইয়া রেলিংএর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। রাজেনের মেজাজ পূর্ব্ব হইতেই খিঁচাইয়া ছিল, এখন কাজ ফেলিয়া উঠিতে দেখিয়া ভারী চটিয়া গেল। রেলিংএর পার্শ্ব হইতে একজনকে এক ধাক্কা মারিয়া ডেকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"বামুন গেল ঘর, ত নাঙ্গল তুলে ধর! সব্বাই কাজ ফেলে মজা দেখতে এসেছেন!" রাজেনের অগ্নিশর্ম্মা মূর্ত্তি দেখিয়া যে যার মত ছুটিয়া গিয়া আবার কাজে লাগিল।

রাজেন একটি রাইফেল হাতে লইয়া, আড়ালে বসিয়া অপর জাহাজটির দিকে নিশানা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। যদি বনমালীর সহিত কোনও গোলযোগ বাধে, তবে ঐ সর্দ্দার তিনটিকে আগে শেষ করিবে।

বনমালী জাহাজের উপর উপস্থিত হইবামাত্র লোকগুলি হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া গেল। কাপ্তেনটি কোমরে হাত দিয়া একবার রিভলবারটি ছুঁইয়া দেখিল, ঠিক যথাস্থানে আছে কিনা। বনমালী বুঝিতে পারিল যে ইহারা ভয় পাইয়াছে।

ভয় দেখানর উদ্দেশ্যে বনমালী যায় নাই। তাহার উদ্দেশ্য ছিল জাহাজে সন্দেহজনক কোনও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় কিনা তাহাই লক্ষ্য করা।

নৌকায় থাকিতেই সে লোকগুলির মুখ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিল, ডাকাতির দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় কিনা; কিন্তু অন্ধকার ও অস্পষ্ট আলোকে যাহাদের দেখিয়াছে, দিনে তাহাদের মুখ চিনিয়া ফেলা তত সহজ নয়।

কাপ্তেন পিয়ারীলাল চৌধুরী অগ্রসর হইয়া বলিল—"রাম রাম জী।"

বনমালী বলিল—"রাম রাম।"

—"আপনাদের জাহাজ দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনাদের খুবই বিপদ গেছে। সাইক্লোন না কি?"

—"না ওসব কিছু নয়, বদমায়েসদের অত্যাচার।"

চক্ষু কপালে তুলিয়া চৌধুরী বলিল—"বলেন কি! ব্যাপারখানা কি?"

—"রাত্রে আমাদের জাহাজে একদল ডাকাত উঠে সব লুটে নিয়ে এই অবস্থা ক'রে রেখে গেছে। নইলে আমরা যদি পিছু ছুটি।"

—"লুটে নিয়ে গেছে! বলেন কি! তবে কি আবার বোম্বেটের কারখানা সুরু হ'লো?"

আর একজন লোক বলিল—"ব্যাপারখানা সহজ নয়! ও জাহাজটার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যেন ভারী গুরুতর কিছু হয়েছে।"

চৌধুরী বলিল—"আপনারা লোকগুলো দেখে চিনেছেন? দেখা হ'লে বেটাদের সনাক্ত করতে পারবেন বোধ হয়?"

—"তা'রা মুখে কালো রং মেখে এসেছিল, চেনা তত সহজ ছিল না।"

—"তবে আর চেষ্টা-চরিত্রি ক'রে কি হ'বে! যা' যাবার গেছে!"

—"আমি তাঁদের খুঁজে বার করবই, আর তাদেরও তখন এ কাজের জন্য পস্তাতে হ'বে।"
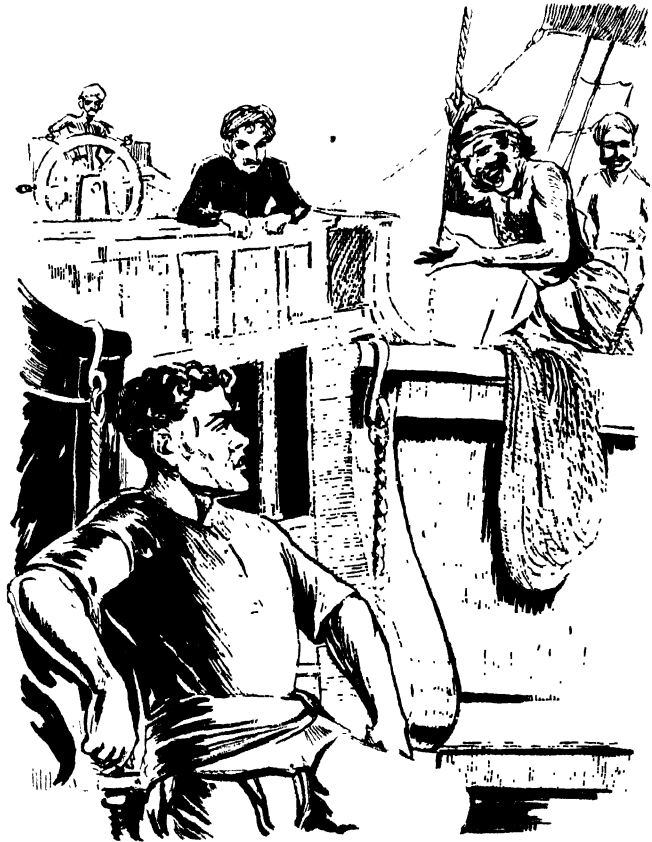
একজনে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া ফেলিল—"দেখবেন, বেচারাদের রাগের মাথায় মারধর করবেন না যেন!"

সে তখন বলিল—"আমি আপনাদের এখানে এসেছি কিছু খবর জানতে। আপনারা কি সমুদ্রে একটা লোককে ভাসতে দেখে তুলে এনেছেন ?"

চৌধুরী বলিল—"না তো, কাকে ?"

—"আমাদের কর্ত্তাকে ওরা জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিয়েছে। আমাদের কর্ত্তার নাম সুরেশ রায়, আপনারা হয়ত নাম শুনে থাকবেন।"

—"সুরেশ রায় কি মরে গেছে ?"

—"আমার মন বিশ্বাস কর্ত্তে চায় না যে, সুরেশ রায় মারা গেছে। আমাদের এই বেণীমাধব আবার মেরামত ক'রেই তা'র খোঁজ করতে বার হবো।"

—"যে লোক কয়দিন আগে সমুদ্রের জলে পড়ে গেছে, তা'কে আর কি ক'রে পাওয়া যাবে!" বলিয়া অপর একটা লোক বিকৃত মুখভঙ্গি করিল। —"সে এখন হাঙ্গরের পেটে গেছে!"

আর একজন বলিল—"তাও ভালো, কর্ত্তার খোঁজ করতে বার হচ্ছো! দেখো বাবা, আবার বোম্বেটেদের খোঁজে যেয়ো না, মারধর খাবে।"

—"আমরা আপনাদের কর্ত্তাকে দেখিনি মশায়!"—চৌধুরীর মুখে এই কথা শুনিয়া বনমালী বুঝিল যে, তাহাকে বিদায় দেওয়ার ইঙ্গিত করা হইতেছে। সে বলিল—"তবে রাম রাম, আমি চলি। আর দেরী করবার অবসর নেই।"

সেই ফাজিল লোকটা আবার বলিল—"বরুণরাজার দেশে, হাঙ্গরমামার পেটে খুঁজে দেখ ভাই, আমি শুনেছি সেই চমৎকার যায়গায় সুরেশ নামে একটা ছোকরা বেড়াতে গেছে! দেখো যেন বাবুকে না খুঁজে ডাকাতদের খোঁজ করো না, তা'রা কিন্তু ভায়া, তোমাদের ঐ নধর কান্তি দেখে লোভ সামলাতে পারবে না!"

—"সামাল রামলাল, তুই ভারী বাজে বকিস্!" বলিয়া চৌধুরী লোকটাকে ধমকাইয়া দিল।

বনমালী বেণীমাধবে ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা রাজেনের নিকট প্রকাশ করিল। রাজেন বলিল—"তবে আর ত' সন্দেহের কিছু নেই! তোমরা ছেড়ে দাও একবার, জাহাজখানা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখে আসি।"

বনমালী বাধা দিয়া বলিল—"বাজে হাঙ্গাম ক'রে লাভ নেই। চল তাড়াতাড়ি ক'রে একবার চারদিকে খুঁজে দেখি। হয়ত আশেপাশেই কোথাও পাব। বাবুর মত অতবড় সাঁতারু ত বড় দেখা যায় না, এ লোক সমুদ্রে পড়ে মরবে না।"

রাজেনের চক্ষু দিয়া যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল। একবার সুন্দরমের দিকে তাকাইয়া বলিল,—"খুঁজে যদি কর্ত্তাকে না-ই পাই তবে আমি এই সবার কাছে ব'লে রাখছি,—ঐ সুন্দরমের চৌধুরীর মাথা নেব আর ওর জাহাজে তেল ঢেলে দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেবো!"

কলির ভীম—রাজা রামচন্দ্র

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি-এ

[প্রায় একশো বছর আগে জার্ম্মাণীর 'রয়্যাল লাইব্রেরী' থেকে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতম্' নামে একখানি বই ছাপানো হ'য়েছিল। এই বইয়ের এক খণ্ড কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে এখনও আছে। এই বইখানি থেকে জানা যায়, কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বকার নাম ছিল রেউই (Reui)। রাজা রুদ্ররায় আলাবক্স নামক একজন স্থাপত্য-শিল্পীকে আনিয়ে ঐ রেউই নামক স্থানে রাজবাড়ী এবং চকবাড়ী প্রভৃতি তৈরী করান। অনেকে মনে করেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অনুসারেই বুঝি কৃষ্ণনগর নাম হয়েছে; কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের তিনপুরুষ আগেই 'কৃষ্ণনগর' হয়েছিল ওই রাজধানীর নাম।

এই বই থেকে আমরা আরও জানতে পারি, মহারাজ রুদ্ররায়ের পুত্র রামচন্দ্র ছিলেন অসীম বলশালী। তাঁর গায়ে বলও ছিল যেমন, খেতেও পারতেন তিনি তেমনি! এক কথায় তাঁকে 'কলির ভীম' বলা যেতে পারে।]

আশ্বিনের খরস্রোতা নদী। ত্রিশ মাল্লার বাইচের নৌকা তৈরী হয়ে আছে—আর এক নৌকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে বাঁচ খেলায়। নৌকাখানির লম্বা গলুইতে পিতল দিয়ে কত কারুকার্য্য করা। একশো হাত লম্বা নৌকা, মাল্লারা নৌকার দু' ধারে লাইন ক'রে বসেছে বৈঠা নিয়ে।

প্রতিযোগিতার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু আর একখানি নৌকা কই?

দর্শকেরা তখন অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে—এমন সময় দূরে দেখা গেল, আর একখানি নৌকা আসছে।—অনিবার্য্য কারণে তাদের দেরী হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয় হয়।

তখন আর প্রতিযোগিতা কি ক'রে হবে?

কিন্তু রাজকুমার রামচন্দ্র নিজে উপস্থিত,—প্রতিযোগিতার বিচার করবেন তিনি। দু'খানি নৌকা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে রাজার হুকুমের অপেক্ষায়।

রাজা তাঁর ঘোড়া থেকে নামলেন। জলের ভিতর দাঁড়িয়ে দু'খানি নৌকার গলুই ধরলেন রাজা দু'হাত দিয়ে চেপে। তারপর হুকুম দিলেন,—"চালাও!"

মাল্লারা বৈঠা রেখে হাত জোড় ক'রে বলল,—"তাও কি হয়? রাজা যে নৌকা টেনে ধরেছেন, আমরা তা কখনও চালাতে পারি?

—"চালাও, নইলে সবশুদ্ধ ডুবিয়ে দেবো!—আমি আদেশ দিচ্ছি চালাও। যে একহাত এগিয়ে যেতে পারবে,—পুরস্কার তার।"

রাজা একবুক জলে নেমে দু'খানি নৌকা স্রোতের মুখে একসঙ্গে ধ'রে বল্লেন,—"চালাও! এক,—দুই,—তিন···"

রামচন্দ্রের দৃঢ় মুষ্টির ভিতর থেকে তা'রা এক আঙ্গুলও এগিয়ে যেতে পারল না!

ঘোড়ায় চড়ে রামচন্দ্র ফিরছেন পথে। কিছুদূর এসেই ঘোড়া গেল থেমে। রাজা সম্মুখে তাকিয়ে দেখলেন, বন-বাদাড় ভেঙ্গে এক বন্য মহিষ আসছে ছুটে।

রাজা ঘোড়া থেকে নামলেন।

মহিষটি ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে শিং তেড়ে ছুটে এল রাজার দিকে। রাজা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। মহিষটি তখন তা'র সম্মুখের পা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রছে!

রাজা দুইহাত দিয়ে তা'র শিং দুটো চেপে ধরলেন অসীম বিক্রমে। মহিষটি আর্ত্তনাদ ক'রে পালাবার যোগাড় করতেই রাজা তা'কে কাৎ ক'রে ফেললেন মাটিতে।

ফৌজদার সাহেব রামচন্দ্রের বীরত্বের কাহিনী শুনে তাঁর সঙ্গে কুস্তি লড়বার জন্য এলেন নিজে। রামচন্দ্রের পিতা রাজা রুদ্ররায় দেখলেন, এর থেকেই হয়ত একটা কলহের সূত্রপাত হ'তে পারে। সুতরাং তিনি মত দিলেন না।

রামচন্দ্র ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করলে ফৌজদার তাঁকে সম্বর্দ্ধনা ক'রে বললেন,—আমি এসেছি আপনার শক্তি পরীক্ষা করতে।

রামচন্দ্র বললেন,—বেশতো, আপনি হ'চ্ছেন শাহান-শাহ্ দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি এবং বিচারক। আপনি নিজে কুস্তি লড়বেন কেন? আমিই আর কারও সঙ্গে লড়ি—আপনি তার থেকেই বিচার করুন।

কিন্তু কার সঙ্গে লড়বেন তিনি? সে অঞ্চলে সকলেই তাঁকে ভালো জানে!

ফৌজদার সাহেবের ব্যায়াম করবার জন্য দড়ির রিং বাঁধা হ'য়েছিল খুব বড় একটা গাছের মোটা ডালের সঙ্গে। রামচন্দ্র রিংটা ধ'রে দিলেন এক টান, আর অমনি অত বড় ডালটা একেবারে মড়মড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ল!

ফৌজদার সাহেব বিস্মিত হ'য়ে ফিরে গেলেন দেশে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সভায় রামচন্দ্রের খ্যাতি রটে গেল। দিল্লী থেকে এল তাঁর নিমন্ত্রণ। রামচন্দ্র গেলেন দিল্লীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কুড়ি জনের মত আহার্য্যের উপঢৌকন এল একা রামচন্দ্রের জন্য। আমীর-উল-ওম্‌রাহ্‌-এর মন্ত্রী নন্দলাল বললেন,—"অসম্ভব, একজন লোক এতসব খেতে পারেন আমি বিশ্বাস করিনে!—আমি স্বচক্ষে তাঁর আহার দেখতে চাই।"

কিন্তু রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ, শূদ্রের সম্মুখে তিনি আহার করবেন না।

তবে?—

নন্দলাল ঠিক করলেন, গোয়েন্দা রেখে জানতে হবে এতসব আহার্য্য আর কে কে খায়!

কিন্তু ইতিমধ্যে রাজপুরুষেরা এসে সম্রাটের কাছে জানাল,—"জাহাঁপনা, এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটেছে!"

—"কি?"

—"পঞ্চাশজন কুলী একখানা পাথর যমুনা থেকে তুলতে পারছিল না; আর ঐ যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এসেছেন, উনি স্নান করতে গিয়ে এই ব্যাপার দেখে একটু হাসলেন—তারপর অক্লেশে ঐ পাথরখানা একাই ছ'হাত দিয়ে ধরে ডাঙ্গায় তুলে দিলেন!"

নন্দলাল জানালেন, আমার ঐ আটশো টাকা দামের অবাধ্য ঘোড়াটাকে যদি রামচন্দ্র ছুটিয়ে আনতে পারেন, তবেই তিনি মানবেন তাঁর গায়ের জোর, এবং স্বীকার করবেন যে, রামচন্দ্র সত্যিই একজন বড় সোয়ার।

রামচন্দ্র জানালেন, নন্দলালের ঘোড়া তিনি ছুটাতে পারেন, কিন্তু ঘোড়া তাঁর চাপ সইতে পারবে না—হয়ত মারাই যাবে!

শুনে সম্রাট্ নিজেও হেসে উঠলেন। মই দিয়ে যে ঘোড়ার উপর উঠতে হয়, সেই আটশো টাকা দামের ঘোড়া পারবে না রাজার ভার সইতে!

রাজা উঠলেন সেই ঘোড়ায়—কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল,—তা'র দুই পাঁজরের হাড় রামচন্দ্রের পায়ের চাপে একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে!

মিথ্যাবাদী ছেলে

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

বাবার মতন মিথ্যাবাদী ছেলে
সত্যি মাগো, কোথাও যদি মেলে!
ফুলের বনে হঠাৎ সেদিন যেয়ে
বললো কি না, ফুলের বনে আমি
ছিলাম ফুলের মেয়ে,
তাই নাকি মা মুখটা আমার
দেখ্‌তে ফুলের মতো!—
দুষ্টু বাবার মিথ্যে কথা যতো!
ফুলের মতো মুখ যদি, মোর
মুখের মতো ফুল,
আমার মাথায় পাপ্‌ড়ী কোথা,
ফুলের কোথা চুল?
আমার যেমন কান আছে, তার
কোথায় আছে কান?
আমার মতন ফুল কি শোনে
তোমার গাওয়া গান?

বাবার মতন মিথ্যাবাদী ছেলে
সত্যি মাগো, কোথাও যদি মেলে!
আকাশ পানে সেদিন হঠাৎ চেয়ে
বললো, আমি ছিলাম নাকি হোথায়
সাঁঝের তারার মেয়ে,
সাঁঝের তারা আকাশ দোলায়
দোল্‌ দিত মা কতো!—
দুষ্টু বাবার মিথ্যে কথা যতো!
আকাশ থেকে তোমার কোলে
বাঁধা তো নেই সিঁড়ি,
কেমন করে' ওখান থেকে
এখান এলাম ফিরি'?
পাখীর মতন হেথায়-সেথায়
উড়্‌তে নারি যবে,
তারার মেয়ে কেমন করে'
তোমার মেয়ে হবে?

বাবার মতন মিথ্যাবাদী ছেলে
সত্যি মাগো, কোথাও যদি মেলে!
বক্ষে চেপে' সেদিন হামি খেয়ে
বললো, বাবার মা নাকি মা আমি—
নইক' কচি মেয়ে,
তাই নাকি তায় ঝিনুক করে'
দুধু খাওয়াই কতো!—
দুষ্টু বাবার মিথ্যে কথা যতো!
দুধু আমি খাওয়াই বটে,
মিথ্যেকারের দুধু;—
বাবা কি তা-ই খায় নাকি, মা
জিভ্‌টা নাড়ে শুধু!
তাইতে বাবার পেট ভরে যায়?
তাই অত দেয় হামি?
অতো বড়ো ছেলের মা হই
এতোটুকু আমি?

অন্ধকারে বিমান-যাত্রা

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এ

বিমানের কথা শুনেই তোমরা হয়ত ভাবছ যে, এই ১৯৪২ সালে উড়ো জাহাজের কথা আবার কি শুনব? আজ দু' বছর ধ'রে, দিন নেই রাত নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান আমাদের মাথার উপর দিয়ে বোঁ-বোঁ ক'রে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে, এতে আর নূতনত্বটা কি আছে?

তোমরা উড়ো জাহাজ সম্বন্ধে যত কথাই জান না কেন, আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আজ যে কথা বলব তা তোমাদের অনেকেই নিশ্চয় জান না; অতএব না রেগে আগে প'ড়েই দেখ।

এক সময় ছিল যখন দিনের আলোকেই শুধু বিমান চালানো হ'ত; তাও দুর্য্যোগ হ'লে, আকাশভরা মেঘ আর ঝড়-বাদল থাকলে বিমান চল্‌তো না, পদে পদে ঘটত বিপদ। অন্ধকারে চালাতে গিয়ে কত বিমান-চালক যে মারা গেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, উপরে, নীচে, সব দিকেই গাঢ় অন্ধকারের পর্দ্দা যখন চালককে ঘিরে থাকত, তখন তিনি হয়ে পড়তেন সম্পূর্ণ নিরুপায়। সামনে এক পর্ব্বত অন্ধকারে দৈত্যের মত মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। বিমানের মুখ ঠুকে গেল সেই পর্ব্বতের বুকে। বিমান সহ বৈমানিক হয়ে গেলেন চুরমার এক নিমেষের মধ্যেই। কখন কখন বৈমানিক মনে করলেন বিমান মহাশূন্য দিয়ে ঠিক পথেই চলেছে, বিমানের মুখ হয়ত নীচের দিকে এক ইঞ্চি বেঁকেছে বা ঝুঁকেছে, কাজেই বিমান প্রচণ্ড বেগে ক্রমাগত নীচের দিকেই ছুটল। ফলে কি হ'ল? মাটিতে এমন জোরে ধাক্কা লাগল যে, বিমান ও বৈমানিকের গুঁড়ো হয়ে যেতে এক সেকেণ্ড সময়ও লাগল না।

এমনি ক'রে দুর্য্যোগের দিনেও ক্রমাগত দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল, রাত্তিরে তো বিমান চালনা প্রায় বন্ধই রইল। তাই বিপদ এড়াবার জন্য নানা রকমের চেষ্টা চলল। অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন হয়েও, শত নৈরাশ্যের মধ্যেও নানা রকমের পরীক্ষা সুরু হ'ল, তাতে অনেককে প্রাণও দিতে হ'ল। এমনি ক'রেই তো এক একটা আবিষ্কার আজ মানুষের এত উপকার করতে পেরেছে। প্রথম যে যন্ত্রটি তৈরি হ'ল তা হচ্ছে একটি ফাঁপা নল, বিমানের তলায় এই নলটি একটা দাণ্ডার মত নীচের দিকে ঝুলে থাকত। এই নলের শেষ মুখে লাগানো থাকত একটা হুক্। অন্ধকারে বিমান নীচে এসে মাটিতে ধাক্কা খাওয়ার আগে এই হুক্‌টা মাটিতে ঘ'ষে যেত। হুকে ঘষা লাগলেই চালকের কুঠরীতে একটা সুইচে লাগত টান, আর অমনি জ্বলে উঠত একটি বিজলী বাতি। চালক তখনই বিপদ বুঝতে পেরে সাবধান হতেন।

মাটির তল বা উপরটা সব জায়গায় সমান নয়, উঁচুনীচু আছেই। খানিকটা নীচু জায়গার পরেই উঁচু জায়গা। এই নলটি নীচু জায়গায় মাটিতে মোটেই লাগল না, চালকও সাবধান হ'তে পারলেন না, ফলে হ'ল এই যে, সামনের উঁচু মাটিতে লাগল ধাক্কা। তা ছাড়া পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ার বিষম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনও ব্যবস্থা তো এতে ছিলই না। কাজেই এ যন্ত্র ত্যাগ করা হ'ল।

বিগত মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে অন্ধকারে বিমান-চালনার উদ্দেশ্যে মৌলিক গবেষণার জন্য আমেরিকায় একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধনভাণ্ডারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় নানা জায়গায় নানা রকমের গবেষণা সুরু হ'ল। ১৯২৭ সালে প্যারিসের খুব কাছে অন্ধকারে বিমান-চালনা শিক্ষা দেবার জন্য একটি স্কুল স্থাপিত হ'ল। ইংলণ্ড থেকে লোক পাঠালেন বিমান-সচিব এই স্কুলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য। তিনি যা দেখলেন ও শিখলেন, তার উপর তাঁর নিজের বুদ্ধি অনুসারে সুবিধামত কিছু অদল-বদল ক'রে নিলেন। তখন বেতারের যুগ সুরু হয়েছে, সুতরাং বেতার যন্ত্রের সহায়তায় অন্ধকারেও দিঙ্‌নির্ণয় এবং মোটামুটি বিমানের অবস্থান সম্বন্ধে চালক সচেতন থাকতে পারতেন। বিমান-সচিব-প্রেরিত ইংলণ্ডের এই প্রতিনিধি ডব্লিউ. ই. পি. জন্‌সন্‌ ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডে প্রথম অন্ধকারে বিমান চালনা শিক্ষার স্কুল স্থাপন করেন।

অন্ধকারে বিমান চালনার কৌশল শিক্ষা বিমান বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত হ'ল ১৯৩২ সালে। তোমরা খবরের কাগজে রোজ দেখতে পাচ্ছ যে, এবারকার যুদ্ধে আর. এ. এফ্‌. শত্রুর দেশের নানান জায়গায় বোমা ফেলে আসছে। রয়াল্‌ এয়ার্‌ ফোর্সকেই সংক্ষেপে বলা হয় আর. এ. এফ্‌. এ কথা তোমরা জান। এই আর. এ. এফ্‌.-এর শিক্ষায় ১৯৩২ সাল থেকেই অন্ধকারে বিমান চালনার কৌশল শিক্ষা বাধ্যতামূলক হ'ল।

পূর্ব্বে অন্ধকারে যাতায়াত করার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী ছিল না; আজকাল দিনের চেয়ে রাত্তিরে বিমান চালনার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, আত্মরক্ষা এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবার এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পূর্ব্বে বিমান ঘাঁটিতে জোর আলো জ্বলত, তা ছাড়া মাঝে মাঝে আলোর নিশানা দেওয়া হ'ত, বিমান-চালক তাই দেখে ঘাঁটিতে ফিরতে পারতেন, অন্ততঃ ফিরে আসবার খানিকটা সুবিধা পেতেন। যুদ্ধের সময় তো আর এমনটি হওয়ার জো নেই, সর্ব্বত্রই ব্লাক্‌ আউট্‌। রাত্তিরে সারা দেশটি যেন আলকাতরার পর্দ্দায় ঢাকা। এ অবস্থা সত্ত্বেও নানা বিমান-ঘাঁটি থেকে শত শত বিমান শত্রুর দেশের নানা জায়গায় বোমা পেটে পুরে ছুটে যায়, আবার নিজের নিজের ঘাঁটিতে ফিরে আসে। না ফিরলে তো আর রক্ষা নেই। কাজেই এতদিন ধ'রে নিরাপদে বিমান চালনার যত কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা হয়েছিল, তাতে নিরাপত্তা বিশেষ বজায় থাকেনি, প্রায়ই বিপদ ঘটেছে, কিছু কম এই মাত্র।

এরপর জার্ম্মানীতে হ'ল এক আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের ফলে রাত্রিতে বিমান চালনা প্রায় নিরাপদ হ'ল। 'প্রায়' বলছি এইজন্য যে, বিমানের বিপদের অন্ত নেই, কলকব্জা কোনখানে একটু বিগড়ে গেলেই তো দফা রফা! তা ছাড়া অন্তহীন মহাশূন্যে যাকে বিচরণ করতে হয়, তা'র পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া তো সম্ভবও নয়, প্রাণের মায়া ছেড়েই তাকে বেরুতে হয়। বোমারু বিমানের তো কথাই নেই, তা'র সবচেয়ে বেশী বিপদ ফেরবার পথে। যদি তা'র পথ ভুল হয় একটুও, তা হ'লে ঘাঁটি থেকে সে যে কত তফাতে গিয়ে পড়বে, তার তো ঠিক-ঠিকানাই নেই। জার্ম্মানীর এই আবিষ্কারের নাম লোরেঞ্জ রশ্মি (Lorenz Beam)। এরপর সকল বিমান-বিদ্যালয়েই এই প্রণালী অবলম্বন করা হ'ল। ক্রমে ক্রমে এই প্রণালীরও কিছু কিছু অদল-বদল ক'রে নিয়ে বিমান-জগতের আরও অনেকটা উন্নতি সাধান করা হ'ল। যে প্রণালী অবলম্বন ক'রে এই উন্নতি করা সম্ভব হ'ল তার নাম হচ্ছে টেলিফুঙ্কেন্ প্রণালী (Telefunken method).

এরপর থেকে বিমান-চালনা আরও বেশী নিরাপদ করবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের অবিরাম চেষ্টা চলতে লাগল। বর্ত্তমানে যে প্রণালী অবলম্বন ক'রে আর. এ. এফ্. শত্রুর দেশে বোমা ফেলে বিমান ঘাঁটিতে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসছে, তাকে বলা হয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিম্ প্রণালী (Standard beam system)। এর সব যন্ত্রপাতিই ইংলণ্ডে তৈরি। অন্ধকারে অন্ধ-বিমান কেমন ক'রে ঘাঁটিতে ফিরে আসে তোমাদের সেই কথাটাই এখন বলা যাক। এ জিনিষটি এমন অদ্ভুত যে, তোমরা এটাকে ম্যাজিক্ মনে না ক'রে পারবে না; শুধু তোমরা কেন, আমরাও সত্যিই বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত খেলাকে যাদু-বিদ্যাই মনে করি।

মনে কর লণ্ডন বিমান-ঘাঁটি থেকে রাত্তিরে বিমান বেরিয়ে গিয়ে জার্ম্মানীতে বোমা ফেলেছে, তা'কে মারবার জন্য জার্ম্মানীর বিমান-মারা কামান ক্রুদ্ধ গর্জ্জন সুরু করেছে। এক নিমেষের মধ্যেই বোমারু বিমান তো লণ্ডনের দিকে মুখ ফিরিয়ে মারলে দৌড়—জগৎ-জোড়া জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুক চিরে। তারপর?

চালকের তো চারদিকেই অন্ধকার, তিনি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কানে তাঁর একটি হেডফোন্ (Headphone) লাগানো আছে। যদি ঠিক পথ থেকে বেঁকে যান তা হ'লে আর ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারবেন না, অথচ পালাবার সময়ে তো আর কিছু ভাববার বা দেখবার অবকাশ নেই। জার্ম্মানী থেকে ছুটে তিনি এলেন ফ্রান্সের উপর অথবা বেলজিয়ামের উপর। তখন তাঁকে নির্ভর করতে হয় লণ্ডনের বিমান-ঘাঁটির সিগ্‌নালের উপর। পূর্ব্বে যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিমের কথা বলেছি, এই বিম বা অদৃশ্য রশ্মি সিগ্‌নাল দেয় সবদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত। এই সিগ্‌নাল অদৃশ্য, এ শুধু কতকগুলি শব্দমাত্র। বিমান যত বেশী উঁচুতে থাকবে তত স্পষ্ট এই শব্দ বিমান-চালক শুনতে পাবেন তাঁর হেড্‌ফোনের সাহায্যে। লেখায় যেমন ফুটুকি বা ড্যাস্ ইত্যাদি কতকগুলি চিহ্ন বা সঙ্কেত আছে, এতেও তেমনি কতকগুলি শব্দের সঙ্কেত আছে। ঠিক পথ থেকে যদি বিমান

বাঁ দিকে গিয়ে থাকে, তা হ'লে চালক এক রকম শব্দ শুনবেন, ডানদিকে গেলে আর এক রকম, আর ঠিক পথে এলে অন্য এক রকম। এই সাঙ্কেতিক শব্দই বিমানকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে আসে।

শুধু এই নয়, এ ছাড়াও বিমান চালকের ঘরেও Standard Beam প্রণালীর যন্ত্র বসানো আছে। লণ্ডনের ঘাঁটি থেকে যে সিগ্‌নাল অনবরত দেওয়া হচ্ছে, সেই অনুসারে এই যন্ত্রের কাঁটাও ডানদিকে বা বাঁ দিকে বেঁকে গিয়ে চালককে জানিয়ে দেয় তিনি ঠিক পথে চলেছেন কিনা। বিমান-ঘাঁটির একেবারে কাছে গেলে, ধরা যাক ১০০ মাইলের মধ্যে গিয়ে পড়লে, অন্য রকমেরও সিগ্‌নাল পাওয়া যায়। খুব কাছে গেলে চালকের ঘরের যন্ত্রের কাঁটার পাশে আলো জ্বলে উঠে। এর দ্বারা চালক সহজেই বুঝতে পারেন যে, তিনি নিজের ঘাঁটিতে এসে পড়েছেন, তখন তিনি ঘাঁটি তো দেখতেই পাবেন, না পেলেও অত্যন্ত পরিচিত জায়গায় সহজেই নামতে পারবেন।

ব্যাপারটা সত্যিই ম্যাজিক ব'লে মনে হয়। এই ম্যাজিকই এখন চলেছে প্রতি রাত্রে সারা জগতে।

বর্ত্তমানের এই ধ্বংসলীলার পর জগতে আবার যখন শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, মানুষ যখন আবার নিশ্চিন্ত আরামে জীবনযাপন করতে পারবে, তখন যাত্রী-বিমানও জগৎজোড়া অন্ধকার আর প্রকৃতির দুর্য্যোগকে সদর্পে অবহেলা ক'রে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি সানন্দে যাতায়াত করবে। অন্ধকারে বিমান-যাত্রা তখন হবে সাধারণ লোকের পক্ষেও আনন্দের ব্যাপার।

গহনগিরির-সন্ন্যাসী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

—সাত—

সন্ন্যাসী

কতক্ষণ রঞ্জিত আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক নেই। হুঁস হ'তে চোখ র'গ্‌ড়ে ভালো ক'রে চেয়ে দেখল, অন্ধকার কেটে গেছে। ভোর হ'য়ে এল যে! হ্যাঁ, তাই তো। এবার সে কী কর্‌বে?

উঠে দরজায় এসে চারদিক সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

ওরে বাপ্‌রে! ওটা কী? হাতী যে একটা! ওঃ, কী বিরাট! এই বুঝি বুনো হাতী! ঈ-স্‌-স্‌, কী বিশাল শরীর! পোষা হাতীগুলো এর বাচ্চার মতো।

হাতীটা যে তা'র দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল! তা'র দিকেই তাকাচ্ছে যে।

কী ভীষণ ভাবে এগিয়ে আস্‌ছে হাতীটা মন্দিরের দিকে। ভয়ে রঞ্জিতের গায়ের লোম সব খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ল। এক লাফে বিরাট বিগ্রহের পিছনে গিয়ে সে ব'সে রইল।

হাতীটা মন্দিরের দুয়ারে এসে পড়্‌ল যে! এইবারে দেবে বুঝি শুঁড় বাড়িয়ে, ধর্‌বে তাকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে, তারপর টেনে নিয়ে উপর দিকে তু'লে দিবে একটা আছাড়, রঞ্জিত যাবে ম'রে, তা'র দেহ যাবে থেঁত্‌লে—গুঁড়ো হয়ে। হায় ভগবান, বাঁচ্‌তে দিলে না?

কোন্ দিকে যাবে রঞ্জিত? কোণে গিয়ে বস্‌বে? বিগ্রহ যে দরজাটার বড় কাছে।

একটা দিক-ফাটা রবে বুক তা'র কেঁপে উঠ্‌ল। হাতীটা বুঝি শিকার পেয়ে আনন্দ-ধ্বনি কর্‌ল! পোষা হাতীর ডাক সে অনেক শুনেছে। বুনোহাতীর ডাক এত ভয়ঙ্কর!

কিন্তু হাতীটা মন্দিরে ঢুক্‌বে কি ক'রে—অমন বিশাল শরীর নিয়ে। শুঁড় কি তা'র এ পর্য্যন্ত আস্‌বে?

দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হাতীটা সাম্‌নে-পিছনে ঢুল্‌ছে। কিছু ভাব্‌ছে বোধ হয়? নাঃ, অবাক কাণ্ড! ঢুল্‌তে-ঢুল্‌তে শেষে সব দ'লে পিষে হাতীটা কাত্ হয়ে

মাটিতে পড়ে গেল। কিসের যন্ত্রণায় সে পা আছড়াতে লাগ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে গর্ত্ত হ'য়ে চাকা-চাকা মাটি পড়্‌তে লাগ্‌ল চারদিকে ছড়িয়ে। এমনি ক'রে ক'রে কতক্ষণ পরে হাতীটা একেবারে নিঃসাড় হ'য়ে পড়ে রইল।

মরে গেল না-কি? মন্দিরের কোণ থেকে রঞ্জিত ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে এল দরজায়। দেখ্‌ল, হাতীটার শুঁড়ের লাল ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছে মস্তবড় একটা বিছে। কিন্তু ওই বিছের কামড়েই অতবড় হাতীটা মরে যাবে, একথাই বা সে বিশ্বাস কর্‌বে কেমন ক'রে। ভেবে-চিন্তে কিছুই ঠিক কর্‌তে 'না পেরে সে শুধু দাঁড়িয়ে রইল অবাক হ'য়ে।

গাছের উপরে একটা পাখী ডেকে উঠ্‌ল। রঞ্জিত চারদিকে চেয়ে দেখ্‌ল, দিনের আলো ফুটে উঠ্‌ছে। আনন্দে তা'র প্রাণ উঠ্‌ল ভ'রে।

পর মুহূর্ত্তে ভয়ে তা'র মুখের সবটুকু আনন্দের আভা নিভে গেল। জংলীদের হাত থেকে সে তো পালিয়ে এসেছে, এতক্ষণেও কি তা'রা টের পায়নি সে কথা? হয়তো এতক্ষণ তা'কে তা'রা খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে। হয়তো সব দিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে-খুঁজে তা'কে না পেয়ে রাগে তা'রা মরীয়া হয়ে উঠেছে।

না, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তাড়াতাড়ি মাটিতে লুটিয়ে বিগ্রহকে সে প্রণাম ক'রে মন্দিরের দরজায় এসে দাঁড়াল। চারদিকে চেয়ে দেখে ভাবলো, কোন্ দিকে এখন যাবে সে? অজানা পথ ধ'রে চ'লে আবার জঙ্গলিদেরই হাতে গিয়ে পড়ে যদি।

কী এখন সে কর্‌বে? কোন্ দিকে যায়? মাথা ঘুরে উঠ্‌ল তা'র।

ভোরের আব্‌ছা আঁধারে ছাওয়া সেই নিঝুম বনভূমিতে অকস্মাৎ গুরুগম্ভীর কণ্ঠের ধ্বনি উঠ্‌ল—'জয় শিবশঙ্কর!'

রঞ্জিত চমকে উঠ্‌ল। তা'র সম্মুখে দেখা দিলেন এক সন্ন্যাসী; দীর্ঘ তাঁর গৌর তনু, দেহে কাঁচা সোনার আভা।

ভয়ে রঞ্জিত চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল।

সন্ন্যাসীর মুখে ফুটে উঠ্‌ল সুন্দর হাসি, যে হাসি দেখে ভয়-ডর সব দূর হ'য়ে যায়। তিনি বল্‌লেন,—"ভয় নেই ভাই, আমি মানুষ।"

মানুষ! তাঁর মুখের দিকে চাইলে সত্যি বিশ্বাস করা যায়, তিনি মানুষ।

রঞ্জিত ছু'হাত জোড় ক'রে বলল,—"আমায় রক্ষে করুন, বড় বিপদে পড়েছি।"

—"কোন ভয় নেই।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"বোসো একটু, আমি পূজো ক'রে আসি।" তিনি মন্দিরে ঢুকলেন।

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে রঞ্জিত ব'সে রইল। একবার মনে হোল, কাপালিক নয় তো! কিন্তু কই, কপালে রক্তের তিলক তো নেই, গলায় নেই হাড়ের মালা। আর তাই যদি হয়, কাপালিকই যদি হয় লোকটা, তবেই বা রঞ্জিত করতে পারে কি? এখন সে সম্পূর্ণই ওই লোকটার হাতে। পথ জানা নেই, কাজেই পালাবার উপায় বন্ধ। নাঃ, কাপালিক নয়। তা'রা তো শিবপূজো করে না। শিবপূজো যে তা'রা করেই না, একথাও রঞ্জিত ঠিক জানে না। কাপালিক তো সে দেখেনি কখনো, তাদের কথা শুনেছেই শুধু।

কতক্ষণ পরে পূজো সেরে সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন। বল্‌লেন—"আমার সঙ্গে এস।"

রঞ্জিত উঠে দাঁড়াল। তা'র কেমন সন্দেহ হচ্ছে। এক বিপদের হাত এড়িয়ে সে আরেক বিপদে পড়্‌তে যাচ্ছে না তো? সে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

সন্ন্যাসী হেসে বল্‌লেন,—"আমায় বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমারি মতো বাঙ্গালী। এ অজানা পাহাড়ে সভ্যদেশের লোক তুমি কেমন ক'রে এসেছ, জানিনে, কিন্তু কিছু একটা বিপদে পড়েছ, বুঝতে পারছি। আমার সঙ্গে চল। যতটুকু আমার সাধ্য তোমায় সাহায্য করবো।"

তাঁর স্বরে কেমন এক দৃঢ়তা। তাতে যেন মিছে কথার আভাসটিও নেই। রঞ্জিতের আতঙ্ক অনেকটা ঘুচে গেল। সে তাঁর পিছু-পিছু চল্‌ল। ক্রমশঃ

বাঁচবার উপায়

ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত, এম্-বি

আশ্বিনের পর]

আশ্বিন সংখ্যা শিশুসাথীতে সাধারণ দরিদ্র বাঙালী গৃহস্থের প্রচলিত খাদ্য-তালিকায় কি কি দ্রব্য থাকে সে সম্পর্কে জানিয়েছিলাম। তখন বলেছিলাম, সেই খাদ্য-তালিকায় যে সব দ্রব্য আছে, তা থেকে মোটামুটি আমরা ২১৬৩ 'ক্যালরি' উত্তাপ পাই। তোমরা জান একজন সাধারণ লোকের পক্ষে দৈনিক অন্ততঃ এমন খাদ্য খাওয়া দরকার, যাতে সেই খাদ্য হতে ২৪০০ 'ক্যালরি' পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যেতে পারে। কেননা হাঁটা, শোয়া ও অন্যান্য কাজ করতে হলে ন্যূনপক্ষে ২৪০০ 'ক্যালরি' উত্তাপ না হলে শরীরের যাবতীয় যন্ত্রপাতিগুলো কার্য্যক্ষম থাকবার মত 'উত্তাপ' (energy) পেতে পারে না। তোমরা জান, মানুষ সাধারণতঃ যা খায় সেই খাদ্য দ্রব্য গুলিই ভস্মীভূত হয়ে শরীরের মধ্যস্থিত কোষে উত্তাপের যোগান দেয়। মটোর বা মেসিন যেমন তেল, পেট্রল বা কয়লা না হলে চলতে পারে না, তেমনি দেহ মেসিনও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য না পেলে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম থাকতে পারে না। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকা পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য তা'রা খেতে পায় না। পূর্ব্বে সাধারণ বাঙ্গালীর যে খাদ্য-তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেটা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তার মধ্যে একমাত্র শর্করা জাতীয় খাদ্যাংশ ছাড়া অন্যান্য খাদ্যাংশ অতি অল্প পরিমাণ আছে। আমিষ জাতীয় খাদ্যাংশ একপ্রকার নেই বললেই চলে। অথচ 'প্রোটিন' বা আমিষ জাতীয় খাদ্য একটু বেশী পরিমাণে না খেলে শরীরের গঠন ও শক্তি ভাল হবে না। রোগাটে লিক্‌লিকে চেহারা হবে, ধাক্কা দিলে টলে পড়বে। সব চাইতে মজার কথা এই যে এই প্রকার অনুপযুক্ত খাদ্য খেতেও মাসে ত্রিশ টাকা খরচ পড়ে। কথাটা ভাবতেও কেমন লাগে মাসিক ত্রিশ টাকা খরচ ক'রেও শরীর রক্ষার উপযুক্ত খাদ্য মিলে না। অথচ আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীর যা আয় তাতে ওর বেশী খরচ করাও অসম্ভব।

আমাদের সকলেরই একটা ধারণা আছে—প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য বলতে মাছ, মাংস, ছানা, দুধ ইত্যাদিই বোঝায়। কিন্তু খোঁজ করলেই দেখা যাবে,

আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, মাখনের খরচ জোগার করতে পারেন। মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা থেকে আশী একশ' টাকাই বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত লোকের আয়। দরিদ্রের কথা ছেড়েই দিলাম। ত্রিশ টাকা যদি প্রতি লোক পিছু খরচ ক'রেও সুস্থ সবল দেহ না হয়, তবে মরণ ছাড়া আর উপায় কি বল! সেই সব অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রেই কুণুর গবেষণাগারের বিজ্ঞানীর দল কম খরচায় একটা মোটামুটি দেহ-পোষণকারী খাদ্য-তালিকা তৈরী করেছেন। নিম্নে সেটা দিচ্ছি :—

লাল আটা	২	ছটাক
ছোলা	১	„
শাক	২	„
নারিকেল	½	„
গুড়	½	„

এই খাদ্য-তালিকা যদি আমরা—সাধারণ গৃহস্থেরা অনুসরণ করি, তবে আমাদের খাদ্য-তালিকার মধ্যে যে আমিষ ও অন্যান্য খাদ্যাংশের অভাব আছে, তা সম্পূর্ণভাবে মেটান যায়। ফলে শরীরও সুস্থ, সবল ও কর্ম্মঠ হয়। ঐ খাদ্য-তালিকা অনুসরণ করলে আগেকার খাদ্য-তালিকার মধ্যে যে আমিষের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫১ গ্র্যাম, সেটা তখন দাঁড়ায় ৮৬'৫ গ্র্যামে। চর্ব্বির পরিমাণ ছিল ১২ গ্র্যাম, সেটা হয় ২৪ গ্র্যাম। শর্করার পরিমাণ ছিল ৪১৮ গ্র্যাম, সেটা হবে ৫৮৪'৫ গ্র্যাম। ক্যালসিয়াম ছিল '১৭ গ্র্যাম, সেটা হয় '২ গ্র্যাম। খাদ্য-প্রাণ 'এ' ছিল ৫০০ ইউনিট্, সেটা হয় ৩৫০০ ইউনিট্; 'বি' ছিল ১৬০, এতে হবে ২০০ ইউনিট্; 'সি'ও যথেষ্ট পরিমাণ থাকবে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে মাছ, মাংস, ঘি, দুধ, মাখন না খেয়েও শরীরকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম রাখা যেতে পারে সাধারণ জিনিষ প্রত্যহ আহার ক'রেই। এই ভাবে খাদ্য-তালকাকে অদল-বদল করতে হলে খরচও যে একটা অসম্ভব কিছু বেশী পড়বে তাও নয়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, এতে মাসিক ব্যয় মাত্র আর ১৷০ আনার মত বেশী পড়ে। যারা মাসিক ৩০৲ টাকা খরচ করতে পারে, তা'রা ৩১৷০ আনা খরচ করতে কেন পারবে না?

আমরা কত সময় কত বাজে খরচ করি। সহরে যারা থাকে তা'রা সিনেমা, থিয়েটার, খেলা ইত্যাদি দেখে কত পয়সাই ত' খরচ করে। গ্রামেও বাজে খরচের অন্ত নেই। অথচ সামান্য ১৷০ আনার জন্য দুর্ব্বল অস্বাস্থ্যকর রোগজীর্ণ দেহ টেনে প্রতি

মুহূর্ত্তে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনি! সাধারণ গৃহস্থেরা কলে ছাঁটা চালই ব্যবহার করেন। কলে ছাঁটা চাল অপেক্ষা ঢেঁকি ছাঁটা চাল অভাবে সিদ্ধ চাল অনেক বেশী পুষ্টিকর ও উপকারী। কেননা কলে ছাঁটা চালে খাদ্যপ্রাণ 'বি' অনেকটা কমে যায়। খাদ্যপ্রাণ 'বি' এর প্রয়োজন শরীরে অত্যন্ত বেশী। বাঙ্গলা দেশে খাদ্যের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ 'বি' এর অভাবের জন্যই এত 'বেরিবেরি' রোগের প্রাদুর্ভাব। আর ছোলার ডাল না খেয়ে তার বদলে যদি জলে ভিজান অঙ্কুরিত ছোলা গুড় ও নারিকেল দিয়ে খাওয়া যায়, খেতেও বেশ চমৎকার লাগে এবং শরীরও বৃদ্ধি হয়। "কুণুর গবেষণাগারে ৬টি ইন্দুরকে অঙ্কুরিত ছোলা $\frac{১}{৪}$ গ্র্যাম ও ·৮৮ গ্র্যাম ছোলার ডাল পর পর খাইয়ে দেখা গেছে, $\frac{১}{৪}$ গ্র্যাম অঙ্কুরিত ছোলা ·৮৮ গ্র্যাম ক্যালসিয়াম ল্যাকটেটের কাজ করে। ফলে শরীরের ওজন অনেকখানি বেড়ে যায়। পালং শাক, নটে শাক, কলমি শাক প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে। এইজন্য শরীরের পক্ষে ঐ জাতীয় শাক খুবই উপকারী।

আজ এই পর্য্যন্ত।

এর পরের বারে আমি মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

আশা করি বাঁচবার উপায় সম্বন্ধে যে সব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি ও করবো, সেগুলি তোমরা সকলেই নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ ক'রে নিজেদের বলিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ক'রে তুলবার চেষ্টা করবে। তা যদি না কর, তবে আমার এত কথা বলাই বৃথা এবং পণ্ডশ্রম হবে।

ন্যায়বিচার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পারিষদগণ বেষ্টিত হ'য়ে জমিদার যদু মিত্র,
সন্ধ্যার পরে বাহিরের ঘরে আসর জমান নিত্য।
কহিলেন তিনি—"ওহে নীলমণি, শম্ভু ঘোষাল নাকি
ছোট ভাইটার টাকা-কড়ি যত, সব দেছে ব্যাটা ফাঁকি!"
নীলমণি কয়—"মিত্র ম'শয়, ওর কথা কেন ক'ন।"
কহিল কেষ্ট—"ব্যাটা পাপিষ্ঠ!—অতিশয় দুর্জ্জন!"
একটুকু হেসে, একটুকু কেসে, কহিল নন্দ রায়—
"বেটার কী তেজ! গাঁ থেকে ওটাকে কি কোরে তাড়ানো যায়!"
বুড়া নিবারণ চুপটি করিয়া বসিয়া একটি পাশে।
শুনিয়া এসব রহে সে নীরব, মনে মনে শুধু হাসে।
হেথা মাঝে মাঝে এলেও, নহে সে তোষামোদকারী গাধা।
ভাগ্যের দোষে জমিদার কাছে বাড়ীটা যে তা'র বাঁধা!
মনে মনে তাই বলে নিবারণ—"তোমরা যুধিষ্ঠির!
ভিতরে সকলে মহাপাপিষ্ঠ, উপরে সত্যপীর!"
আকাশের দিকে চাহিয়া বারেক ওঠে নিবারণ বুড়া।
কেষ্ট কহিল—"সকাল-সকাল উঠ্‌লে কেন গো খুড়া?"
নিবারণ কহে—"দেখ ওই চেয়ে, আকাশেতে ঘন ঘটা!
বুড়ালোক ভাই, এই বেলা যাই, রাতও হ'য়েছে ন'টা।"

গেল নিবারণ; অমনি তখন উঠিল ভীষণ ঝড়।
আকাশ জুড়িয়া চমকে বিজলী—বজ্রের কড়্ কড়্!
সভয়ে নন্দ, করিল বন্ধ যতেক জানালা-দ্বার।
কাঁপা'য়ে সৃষ্টি, ঝড় ও বৃষ্টি ছাড়ে মহা হুঙ্কার!
আকাশের বুক চিরিয়া বিজলী ঘন-ঘন চমকায়।
এ-হেন সময় শম্ভু ঘোষাল যেতেছিল ও-পাড়ায়।

বাহিরে তখন প্রলয় মাতন—মুহু-মুহু বাজ পড়ে।
নিতে আশ্রয় শম্ভু ছুটিয়া ঢুকিল বাবুর ঘরে।
দেখিয়া তাহারে আননে সবার ফুটিল অসন্তোষ।
যদু মিত্রের অন্তর মাঝে ফুলিয়া উঠিল রোষ।
ঠিক সেই ক্ষণে নিকটেই কোথা পড়িল ভীষণ বাজ।
সারা ঘরখানা উঠিল কাঁপিয়া ; ভেঙ্গে পড়ে বুঝি আজ।
আবার পড়িল! আবার! আবার! কাঁপিল সবার প্রাণ।
বুঝি ধরাতল যায় রসাতল, নাহি বুঝি কা'রো ত্রাণ!
বাবু কহিলেন—"এ ঘরে আমার মহাপাপী আছে কেহ।
তা'রি পাপে ঘরে বুঝি বাজ পড়ে, বা'র করে তা'রে দেহ।"
শম্ভুর দিকে ফিরিয়া অমনি কহিলেন তাড়াতাড়ি—
"এখনি তোমাকে চলে যেতে হ'বে আমার এ ঘর ছাড়ি'।"
নীলমণি তা'রে ঠেলা দিয়া জোরে চাহে কট্‌মট্ করি'।
নন্দ উঠিয়া বার করি দিল গর্দ্দানা তা'র ধরি'।
যেমনি শম্ভু গৃহ ত্যাগ করি' আসিল পথের 'পরে,
ভীষণ বজ্র পড়িল অমনি যদু মিত্রের ঘরে।

লম্বাচিঠি

শ্রীসন্তোষকুমার দে, বি-এ

তোমরা নিশ্চয় রচনা লিখে থাক। আমরাও ইস্কুলে রচনা (essay) লিখতাম। তবে তোমরা যেমন অল্প বয়সেই সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ গল্প কবিতা লিখতে পারো, আমরা তা পারতাম বলে মনে হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের চেয়েও দুষ্টুমিতে পাকা ছিল, তা'রই একজনের কাহিনী আজ শোনাব।

তা'র নাম গোবিন্দ। নামটি নিরীহ হ'লে কি হয়, তা'র মগজটি ছিল একেবারে দুষ্টু বুদ্ধিতে ভর্ত্তি। আমাদের যিনি বাংলা পড়াতেন, তিনি তা'র দুষ্টুমিতে রাগলেও তা'র বুদ্ধিকে প্রশংসা করতেন। এই জন্য মুখে যতই রাগারাগি করুন, মনে মনে মাষ্টার

মশাই গোবিন্দের উপর প্রসন্নই ছিলেন। অবশ্য তার অন্যতম কারণ পরীক্ষায় সে কোনদিন খারাপ করত না।

একদিন মাষ্টার মশাই আমাদের 'দুধ' সম্বন্ধে রচনা লিখতে বল্লেন। কড়া আদেশ থাকল, রচনা যেন সাত পৃষ্ঠার একটি লাইন কম না হয়। আমাদের তখন দুধ খাওয়াই অভ্যাস, দুধ সম্বন্ধে সাত সাতটা পৃষ্ঠা পূরিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা তো চালাকী কাজ নয়! আমরা রীতিমত গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে গেলাম। দুধ দিয়ে খোকাখুকুদের জীবন রক্ষা হতে বাবা বিশ্বনাথের স্নান হওয়া পর্য্যন্ত যতদূর আমাদের জানা ছিল, সব লিখেও সাত পৃষ্ঠা পূরতে চায় না। বড় বড় হরফে ফাঁক ফাঁক ক'রে লিখে কেউ ছয়, কেউ সাড়ে ছয় পৃষ্ঠা লিখে নিয়ে ক্লাসে গেলাম। গোবিন্দ বল্লে, "আমি মোটে দুধের রচনা লিখিইনি।" কিন্তু মাষ্টার মশাই যখন একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ক' পৃষ্ঠা, তোমার, তোমার?" গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বল্লে, "এক পৃষ্ঠা।" এত কম আর কেউ লিখেনি, তাই সবাই হাঁ ক'রে তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাষ্টার মশাই বল্লেন, "পড়ো দেখি।" গোবিন্দ চেচিয়ে পড়া সুরু করলে, "ক্ষীর,—ক্ষীর অতি সুস্বাদু দুগ্ধজাত সামগ্রী।" মাষ্টার মশাই বাধা দিয়ে বল্লেন, "ক্ষীরের বিষয় লিখতে বলিনি তো!"

গোবিন্দ একটুও ভড়কালো না, বল্লে, "একই কথা স্যার! দুধ জ্বাল দিলেই ঘন হয়ে ক্ষীর হয়, তাই তো সাত পৃষ্ঠা না লিখে মাত্র এক পৃষ্ঠা লিখেছি।"

ক্লাসে চাপা হাসি সুরু হ'ল; কিন্তু মাষ্টার মশাই এ রসিকতা বরদাস্ত করতে পারলেন না। গোবিন্দকে সারা পিরিয়ডটি কান ধ'রে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে যে কি মতলব এঁটে নিলে সেটা জানা গেল পরের সপ্তাহে। সেদিন রচনার বিষয় ছিল,—একখানি পত্র লিখতে হবে কোন বন্ধুর কাছে। মাষ্টার মশাইএর আবার সেই আদেশ হল, "লম্বা চিঠি চাই, খুব লম্বা। দেখি কার চিঠি সব চেয়ে লম্বা হয়।"

আমরা ইনিয়ে বিনিয়ে করুণ মধুর নানারস পরিবেশন ক'রে কেউ দেড়, কেউ দুই, কেউ তিন পৃষ্ঠা লম্বা চিঠি নিয়ে ইস্কুলে গেলাম। গোবিন্দ বললে, "আমার চিঠি এই পকেটে আছে; চিঠি বুঝি খাতায় থাকে?"

আজও তা'র একটা নিগ্রহ হবে বুঝতে পারলাম, কিন্তু চিঠিটা সে কোন্ অজুহাতে ছোট্ট ক'রে ফেলেছে তা ভেবে পেলাম না।

যথাসময়ে মাষ্টার মশাই এক এক ক'রে চিঠির বহর মেপে দেখতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত এলো গোবিন্দের পালা। সে পকেট থেকে একটি গোলবস্তু বের করলে। তোমরা নিশ্চয় ফটো তোলার ফিল্ম দেখেছ, না দেখলেও খবরের কাগজের 'কলম' লক্ষ্য করেছ, গোবিন্দের চিঠির পরিধি ততটুকু; কিন্তু ফটো ফিল্মের মত জড়ানো। চিঠিটুকু হাতে ক'রে সে মাষ্টার মশাইএর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল এবং পড়া সুরু করলে। তারপর চিঠির গোড়াটা একখানা বইচাপা দিয়ে টেবিলের উপর রেখে পড়তে পড়তে পিছুতে লাগল, আর সূতার লাটিম হতে সূতা খোলার মত জড়ানো মোড়ক হতে চিঠি খুলতে সুরু করলে। পিছু হটে হটে ক্রমে সে ক্লাসের অপর প্রান্তে পৌঁছল, তখন দেখা গেল পত্রখানি প্রায় ত্রিশহাত লম্বা। এত লম্বা চিঠি আমরা দূরে থাক্ মাষ্টার মশাইও কখনও দেখেননি, তাই তিনি হতভম্ব হয়ে গোবিন্দের এই কীর্ত্তি দেখছিলেন। এবার তাঁ'র মুখে একটি প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল, বললেন, "তোমার মৌলিকতা আছে সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে স্বীকার করি তোমার চিঠিটাই কলেবরে সবচেয়ে লম্বা।"

গোবিন্দের আজ কোন নিগ্রহ তো হলই না, পরন্তু সত্যি সত্যি সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তা'র দিকে তাকিয়ে থেকে তা'র বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলাম।

সতীঝরা

শ্রীমোক্ষদাচরণ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

দুই তিন দিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর ভোরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আমাদের আসামী বন্ধুরা আসিয়া বলিলেন, 'চল, সতীঝরা দেখে আসি। আজ সেখানে খাসিয়াদের স্নান আছে, বহু খাসিয়া জড়ো হবে।'

সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে সতীঝরার কাছে আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। বহু খাসিয়া রমণী সেখানে স্নানের জন্য সমবেত হইয়াছে ও কলকোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের মত আরও বহু দর্শক সহর হইতে এখানে স্নান দেখিতে আসিয়াছিলেন। পর্ব্ব উপলক্ষে আমাদের দেশে নদীতে যেমন স্নান হইয়া থাকে, এই

খাসিয়াদের স্নান দেখিয়া আমাদের সেই কথাই মনে পড়িল। তবে একটা বিশেষত্ব দেখিলাম, এখানে একমাত্র মেয়েরাই স্নান করিতেছিল। পুরুষেরা বসিয়া বসিয়া চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে হাসি-তামাসা ও গল্পগুজব করিতেছিল। শীতের দেশে পাহাড়ীদের স্নানের বালাই নাই, তাই এই স্নানপর্ব্ব আমাদের কাছে একটু অভিনব মনে হইল। স্থানীয় বন্ধুরা বলিলেন, এই স্নানের সঙ্গে একটা করুণ কাহিনী জড়িত আছে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁহারা এই কাহিনী শুনিয়া আসিতেছেন। আমরা ইহা জানিতে চাহিলে তাঁহারা যখন একে অন্যকে বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, তখন ওয়ার্ডলেকের বুড়া খাসিয়া মালীকে দেখিয়া তাঁহারা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। 'এইবার যাদের কথা, তাদের মুখে শুনতে পাবে,' এই বলিয়া বন্ধুরা তাহাকে ডাকিয়া আমাদের কাছে নিয়া আসিলেন, এবং একটা সিগারেট হাতে দিয়া তাহাকে খাতির করিয়া বসাইলেন। বহুকাল বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া বুড়া চমৎকার বাঙ্গালা বলিতে শিখিয়াছিল। আমাদের অনুরোধে হাসিমুখে সে বলিল,—

"বাবুজী, ঐ যে দূরে টিলাটা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে একটি ছোট বাড়ী ছিল। বড়ঘরের মেয়ে টিয়ার সঙ্গে যখন ঝগরুর বিয়ের কথা প্রচার হল, তখন সারা গাঁয়ের লোক বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। টিয়ার বাপ মা কিন্তু এ বিবাহে মোটেই অসন্তুষ্ট হয়নি। ঝগরুর সুঠাম সুন্দর দেহ ও বীরের মত ব্যবহার তাদের মুগ্ধ করেছিল। তা'রা ঝগরুকে পণ থেকে রেহাই দিয়ে, বিয়ের পর যোগাড় যন্ত্র ক'রে ঐখানে বাড়ীঘর তৈরী ক'রে মেয়ে জামাইকে সেখানে পাঠিয়ে দিল। ঝগরু বনবাদাড়ে তীরধনু নিয়ে শিকার ক'রে বেড়ায়, টিয়া তা'র সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, সন্ধ্যাবেলা দু'জনে ঘরে ফিরে আসে। গরীবের হাতে পড়েছে বলে টিয়ার মনে কোন দুঃখ নেই।

"সেবার আমাদের রাজকুমারের বড় অসুখ হল। রাজা মানত করলেন, যদি তাঁর ছেলে বাঁচে, তবে এবারকার নাগপূজো খুব ঘটা ক'রে করবেন। দেবতার কৃপায় রাজকুমার সেরে উঠলেন। রাজা পূজোর দিন স্থির ক'রে বলির জন্যে 'ডাকু' পাঠালেন। আপনারা হয়ত

দেখেছেন, যে সকল খাসিয়াদের একা একা চলাফেরা করতে হয়, এই নাগপুজোর সময় বেলা থাকতে বাড়ী ফিরবার জন্যে তা'রা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠে। দেবতার কাছে কখন যে কাকে বলি হতে হবে, তার ভয়েই সকলে অস্থির। নাগপুজো আবার রক্ত ছাড়া হয় না। স্বজাতির রক্ত হলেই ভাল হয়, নৈলে যে কোন মানুষের রক্ত হলেও চলে।

"পুজোর দিন সকাল থেকেই বাঁশী ও ঢোলের শব্দে পাহাড়-পর্ব্বত ধ্বনিত হয়ে উঠল। সারা দিন নাচ চলবে, রাত দুপুরে পুজো হবে। টিয়া পাঁড়ার মেয়েদের সঙ্গে নাচ দেখতে যাবে। সন্ধ্যে বেলা ঘরে ফিরে ঝগরুকে নিয়ে রাত্রে যাবে পুজো দেখতে। ঝগরু তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে গেল। টিয়া সেজেগুজে সঙ্গিনীদের নিয়ে নাচ দেখতে চলে গেল।

"রাজবাড়ীর সামনে ফাঁকা যায়গায় নাচ আরম্ভ হয়েছে। সারি বেঁধে মাটির দিকে তাকিয়ে সুবেশা মেয়েরা অতি ধীরে ধীরে নাচ্‌ছে, আর পুরুষেরা হাতে চামর নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তাদের প্রদক্ষিণ করছে। এই নাচে বিবাহিত নরনারী যোগ দিতে পারে না। এ কুমার-কুমারীর নৃত্যোৎসব। শুধু নৃত্যের জন্যেই যে এই সমাগম তা' নয়, বর কন্যার পরস্পর মনোনয়নও এই নৃত্যক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, তাই দেশের সমস্ত কুমার-কুমারী এই নৃত্যে যোগ দিয়ে থাকে।

"সন্ধ্যেবেলা নাচ থেমে গেল। টিয়া সঙ্গিনীদের নিয়ে ঘরে ফিরে এল। সে ভেবেছিল ঝগরু হয়ত এতক্ষণ এসে গিয়েছে, কিন্তু তা'কে দেখতে না পেয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দেখে তা'র চিন্তা ভীতিতে পরিণত হল। প্রতি মুহূর্ত্তে টিয়া ঝগরুর আগমন প্রত্যাশা করছিল; কিন্তু কই, ঝগরু ত এল না। নানা দুশ্চিন্তায় তা'র মন অস্থির হয়ে পড়ল। টিয়ার দেরী দেখে পাঁড়ার মেয়েরা তা'র বাড়ী এসে উপস্থিত হল। সকলে দল বেঁধে পুজো দেখতে যাবে। তা'রা বল্‌লে, ঝগরু হয়ত বাড়ী এসেছিল, টিয়াকে দেখতে না পেয়ে রাজবাড়ী চলে গেছে। সেখানে গেলেই ঝগরুর সঙ্গে তা'র দেখা হবে। টিয়া ভাবল, হয়ত তাই। সে তাড়াতাড়ি সেজেগুজে সঙ্গিনীদের নিয়ে রাজবাড়ী চলে গেল।

"রাজবাড়ীর ভিতর আঙিনায় পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। একটা উঁচু বেদীতে পাশাপাশি দুটা বাটি সাজান আছে। তার একটাতে দুধ রয়েছে। খালি বাটিটাতে রক্ত রেখে দুধ মিশিয়ে নাগদেবতাকে ভোগ দেওয়া হবে।

"পাহাড়-পর্ব্বত থেকে অসংখ্য নরনারী জড়ো হয়েছে পুজো দেখতে। যতই রাত বেড়ে চল্‌ল, সমগ্র জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগ্‌ল। এমন সময় দূরে বনের মাঝে মশাল জ্বলে উঠল। বুঝা গেল বলির যোগড় হয়েছে, মশালধারীরা ইঙ্গিতে তাই জানাচ্ছে। সারা বাড়ী আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। ডাকুরা বাড়ী পৌছামাত্র ঢোল ও বাঁশী বেজে উঠল ও ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পড়ে গেল।

"এই বলি সংগ্রহের কাজটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অদ্ভুত। ডাকুরা বলির জন্যে পাহাড়-পর্ব্বতে লুকিয়ে থাকে। একাকী কোন লোককে দেখতে পেলে একটা ছোট মোটা লাঠি তা'র পায়ে ছুঁড়ে মারে। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে লোকটা যখন মাটিতে পড়ে যায়, তখন তা'কে চেপে ধ'রে ডাকুরা লোহার সরু শলা দিয়ে তৈরি লম্বা বঁড়শির মত এক রকম যন্ত্র হতভাগ্যের নাকের ভিতর ঢুকিয়ে মাথা থেকে রক্ত ও মগজ টেনে বের করে নেয়। মানুষের রক্তই যে এনেছে, প্রমাণ দেওয়ার জন্য মৃতের আঙ্গুলগুলো কেটে নিয়ে আসে। *

"এইবার পূজো আরম্ভ হবে। পুরোহিত ভক্তিভরে বাটিতে রক্ত নিয়ে রাখলেন। একটা থালাতে মৃতের আঙ্গুলগুলো রাখা হল। সমস্ত নরনারী শঙ্কাকুল চিত্তে ভিড় ক'রে সেগুলো দেখতে লাগল। তাদের কোন প্রিয়জনকে যে দেবতা গ্রহণ করেননি তাই বা কে জানে!

"অকস্মাৎ একটা আর্ত্ত চীৎকারে পূজোভূমি যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। থালার উপর আঙ্গুলগুলো দেখেই টিয়ার মনে হল যে, তা'র কপাল ভেঙ্গেছে। ঐ যে ঝগরুর বুড়ো আঙ্গুলের কাটা দাগটা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পাগলপারা হয়ে টিয়া বাড়ীর দিকে ছুটে চল্‌ল। বাড়ীতে ঢুকে ঘর অন্ধকার দেখে টিয়া বুঝতে পারল, ঝগরু ফিরেনি। পূজো-বাড়ীতেও ঝগরুর সাথে তা'র দেখা হয়নি। তবে কি দেবতা ঝগরুকেই টেনে নিলেন! টিয়ার বোধশক্তি যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল।

"ঝরা থেকে পূজোর জন্যে জল নিতে এসেছেন রাজবাড়ীর মেয়েরা। অসংখ্য মশালের আলোকে বনভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঢোল ও বাঁশীর শব্দে পর্ব্বতমালা প্রকম্পিত হচ্ছে। দলে দলে নরনারী এসেছে জল ভরা দেখ্‌তে।

---

* পূর্ব্বে শিলংএর আশেপাশে এরূপ বহু নরহত্যা হইত। সরকারের কড়াকড়িতে এখন অনেকটা কমিয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে থামিয়াছে বলা চলে না। এখনও মাঝে মাঝে লোকজন অন্তর্হিত হয়, পাহাড় পর্ব্বতে মৃতের কঙ্কাল পাওয়া যায়। কয়েক বছর হয় জেল রোডের কাছে দুইজন খাসিয়া যখন একটি নরহত্যা করিতেছিল, তখন হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যায় ও বিচারে তাহাদের ফাঁসির হুকুম হয়।

"ঘর থেকে বেরিয়ে ঝরার উপর পাহাড়ের চূড়োতে এসে টিয়া দাঁড়াল। মনে হল ঝগরু যেন তাকে ঝরার নীচে থেকে হাত তুলে ডাক্‌ছে। পাহাড় বেয়ে নামতে গেলে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে! ততক্ষণ কি ঝগরু সেখানে থাকবে? বিবশা টিয়া ঝরাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"ঝরার জলে টিয়া নিজেকে মিশিয়ে রেখেছে কিনা, তাই তা'র মৃত্যুদিনে মেয়েরা এখানে স্নান ক'রে জল নিয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস আত্মপরিজনের উপর এই জলের ছড়া দিলে সম্বৎসর আর তা'রা ডাকুর হাতে পড়বে না। এই জলধারাতে সতী নিজেকে উৎসর্গ করেছে ব'লে এর নাম হয়েছে 'সতীঝরা'।"

আমরা তন্ময় হইয়া বৃদ্ধের গল্প শুনিতেছিলাম। বড়ুয়ার আহ্বানে সচকিত হইয়া দেখিলাম বাড়ী ফিরিবার সময় বহুক্ষণ হয় চলিয়া গিয়াছে।

আজব হ'লেও সত্যি

শ্রীম—

বিড়ালের দেশ

তোমরা অনেক আজব দেশের কথাই শুনেছ। আজকে আর একটি ঐ রকম আজব দেশের কথা তোমাদের বলবো। এর নাম বিড়ালের দেশ। ভারত মহাসমুদ্রে অতি নির্জ্জনে, মরিসাস্ দ্বীপ থেকে প্রায় তিনশ' মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভেসে আছে ছোট্ট নীচু একটি প্রবাল-দ্বীপ। ভারী অদ্ভুত এই দ্বীপটি। এর নাম হচ্ছে ফ্রিগেট। তোমরা শুন্‌লে অবাক হয়ে যাবে যে, এই দ্বীপে একমাত্র বিড়াল ছাড়া আর অন্য কোন জন-প্রাণীরই অস্তিত্ব নেই। যেদিকে তাকাও দেখ্‌বে শুধু বিড়াল আর বিড়াল,—না আছে মানুষ, না আছে আর কোন জীব। এই জন্যই এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে 'বিড়ালের দেশ'।

তোমরা হয়ত মনে মনে ভাবছো এই নির্জ্জন দ্বীপে এত বিড়াল তা'হলে এলো কোত্থেকে? আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে ঝটিকা-বিধ্বস্ত একখানা জাহাজ থেকে একটি বিড়াল আর একটি বিড়ালী সাঁতার কাটতে কাটতে প্রাণরক্ষার্থ এসে উঠে এই নির্জ্জন দ্বীপে। বর্ত্তমানে যে সব বিড়াল ঐ দ্বীপের অধিবাসী তা'রা ঐ বিড়ালদ্বয়েরই বংশধর।

এই নির্জ্জন দ্বীপ—জনমানবের লেশ মাত্র নেই, কিন্তু এত বিড়াল সেখানে তা'হলে কি খেয়ে বেঁচে থাকে—এরকম একটা প্রশ্নও তোমাদের মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। সমুদ্র থেকে মৎস্য শীকার ক'রেই এরা প্রধানতঃ এদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে থাকে; সাধারণ বিড়াল থেকে এদের আয়তন বেশ বড়, আর এরা হিংস্রও খুব বেশী। এদের মাছ ধরবার প্রণালীতে নূতনত্ব আছে যথেষ্ট। এতে এদের বুদ্ধির পরিচয়ও পাওয়া যায় খুব। ঐ দ্বীপের যে সমস্ত প্রবাল-প্রাচীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করেছে, বহু সংখ্যক বিড়াল এক সঙ্গে চক্রাকারে ঐ প্রাচীরের সমুদ্র-সংলগ্ন অংশে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ভাটার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ভাটার সময়ে জল যখন কমে যায়, তখন ঐ বিড়ালের দল ধীরে ধীরে মৎস্যগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে দ্বীপমধ্যস্থ অল্প জলবিশিষ্ট সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত কোন এক ডোবার মধ্যে। তারপর সেখান থেকে মাছগুলোকে ধ'রে তা'রা তাদের ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণধার নখরের সাহায্যে বিদীর্ণ করে মহানন্দে আহার করে।

আবহাওয়া ভালো থাকলে এদের আহারের জন্য মাত্রই ভাবতে হয় না। কারণ এক একবারেই ওরা ঐ অভিনব উপায়ে পঁচিশ ত্রিশ মণ মৎস্য শীকার করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি দেবী ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষা নেই। দিনের পর দিন সমুদ্রবক্ষ যখন ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ হতে থাকে, তখন আর ঐ উপায়ে মৎস্য শীকার সম্ভব হয় না। তখন চলে এদের 'অনাহার ক্রমাগত

কয়েক দিন ধরে। ক্ষুধার যাতনায় অস্থির হয়ে তখন এরা ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করে। এমন কি এরা তখন একে অন্যকে পর্য্যন্ত আক্রমণ ক'রে বসে। এরা হিংস্র হ'লেও ঝটিকা-বিধ্বস্ত জাহাজের কোন নাবিক প্রাণরক্ষার্থ কখনও ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠ্‌লে তাদের আক্রমণ করে না বা কখনও করেছে বলে শোনাও যায় নি।

প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এদের বেঁচে থাকতে হয় বলেই এরা হয়ে উঠেছে বংশানুক্রমে অতি হিংস্র, আর অফুরন্ত খাদ্য খেয়ে বংশানুক্রমে এদের দৈহিক আয়তনও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। লোকে কথায় বলে—'বিড়াল বনে গিয়ে বাস করলে বাঘ হয়।' কয়েক পুরুষ পরে এরাও তাই হবে না ত!

জেনে রাখা ভালো

ট্যাঙ্কের কথা—ট্যাঙ্ক (Tank) নামটির সঙ্গে বর্ত্তমানে নিশ্চয়ই তোমরা কেউ আর অপরিচিত নও। ট্যাঙ্ক হচ্ছে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের এক মহাস্ত্র। স্থল ও যান্ত্রিক বাহিনীর প্রধান সম্পদই হচ্ছে এই ট্যাঙ্ক। পুরু এবং শক্ত ইস্পাতের পাত দিয়ে গাড়ীর আকারে এই যন্ত্র
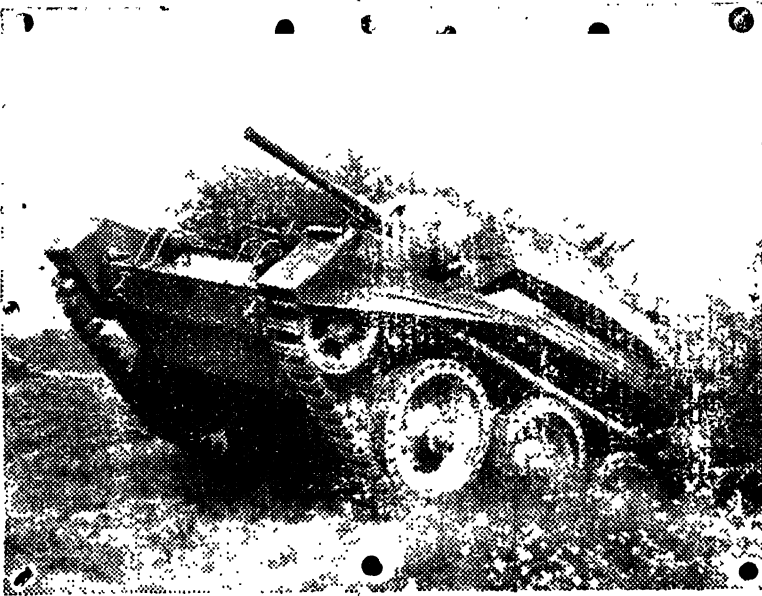
প্রস্তুত হয় আর এর সঙ্গে যুক্ত থাকে শক্তিশালী মেসিন গান। গাড়ীর মত এর কোন চাকা নেই। গতি-সঞ্চারক লৌহ-শৃঙ্খলের ন্যায় বন্ধনী (Belt) দিয়ে এগুলো পরিচালিত হয় ডিজেল ইঞ্জিনের সাহায্যে। ডিজেল ইঞ্জিন চালানো হয় অপরিষ্কৃত তেল (crude oil) দিয়ে।

এই কারণে এর গতি একরূপ অব্যাহত—কোন বাধাই মানতে চায় না। সম্মুখে ধূম্রজালের সৃষ্টি ক'রে এই যন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে চলতে থাকে প্রচণ্ড গতিতে। আর এর দুর্ভেদ্য ইস্পাত-নির্ম্মিত আবরণীর মধ্যে বসে লুক্কায়িত সৈন্যদল গোলা বর্ষণ ক'রে শত্রুদলকে একদম ঘায়েল ক'রে দেয়।

১৯১৪-১৮ সালে ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জলিত হয়েছিল, তা তোমরা শুনে থাকবে। সে যুদ্ধেও এই যুদ্ধেরই মত মিত্রপক্ষে নেতৃস্থানীয় ছিলেন ইংরেজ আর শত্রুপক্ষে জার্ম্মানী। এই যুদ্ধের মধ্যভাগে ইংরেজেরা এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। সমর-বিশেষজ্ঞেরা বলেন—"বিগত মহাযুদ্ধে ট্যাঙ্কের আবিষ্কারই মিত্রপক্ষকে বিজয়-মাল্য লাভের অধিকারী করেছিল।"

এই ভীষণ মারাত্মক অস্ত্রটির নাম ট্যাঙ্ক কেন রাখা হলো, সে কথা জানতে তোমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ইংরিজী Tank কথাটার মানে তোমরা জানো। এর অর্থ পুকুর, জলাধার বা চৌবাচ্চা। কিন্তু এই মারাত্মক মারণাস্ত্রের পুকুর, জলাধার বা চৌবাচ্চার সঙ্গে সাদৃশ্য কতকটা থাকলেও কোন সম্পর্ক ত নেই। তবে এর কেন এরূপ নামকরণ করা হলো? সেই কথাই বলছি। যখন এই অস্ত্র প্রস্তুত আরম্ভ হলো, তখন শত্রুপক্ষ যাতে এই যন্ত্র প্রস্তুতের কৌশল না জানতে পারে, এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে এর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল। এমন কি যে কারখানায় এই যন্ত্রগুলি প্রস্তুত হচ্ছিল সেখানকার শ্রমিকদের পর্য্যন্ত জানতে দেওয়া হয়নি কি উদ্দেশ্যে এগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে। বাইরে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, মিশরের রণক্ষেত্রে জল বহন করবার জন্য এগুলো তৈরী করা হচ্ছে। এমন কি কারখানার খাতাপত্রেও 'জলাধার' বলেই এগুলোকে উল্লেখ করা হতো। সেই থেকেই এই যন্ত্রগুলোর "ট্যাঙ্ক" বা "জলাধার" নামই প্রচলিত হয়ে গেছে।

ফিফ্‌থ্ কলামিস্ট (Fifth-columnist)

—আজকাল যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিফ্‌থ্ কলামিস্ট বলে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। বাংলায় এর মানে করা হয় 'পঞ্চম বাহিনী।' আবার কেউ কেউ এর মানে করেন 'বিভীষণ-বাহিনী'। তোমরা বিভীষণের কথা রামায়ণে পড়েছ। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় বিভীষণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। এই জন্যই লোকে কথায় বলে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। এই পঞ্চম বাহিনাও ঘরের শত্রু বিভীষণ। এদের কাজ হচ্ছে দেশের মধ্যে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত থেকে শত্রুকে সাহায্য করা। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে প্রায় সকল দেশেই এই ছদ্মবেশী বাহিনী দেশের মধ্যে লুক্কায়িত থেকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানাবিধ গোপনীয় সংবাদ সরবরাহ ক'রে, দেশের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রে এবং আরও নানাভাবে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করে।

এই 'পঞ্চম বাহিনী' কথাটা প্রথম আসলো কোথেকে সেই কথাই বলছি। ১৯৩৬-৩৯ সালে স্পেনদেশে এক গৃহ-যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists)

দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সমর্থনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে প্রজাতন্ত্রীদের—যাদের হাতে তখন দেশের শাসন-ক্ষমতা ছিল, (Republican) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে রাজধানী মাদ্রিদ নগরী আক্রমণ করে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো বহির্ভাগ থেকে চারটি সেনা-বাহিনী নিয়ে আক্রমণ সুরু করেন। আর তাঁর সমর্থনকারীরা দেশর মধ্যে আর একটি গুপ্ত-বাহিনী সংগঠন ক'রে বিদ্রোহ, গুপ্তচরবৃত্তি, ধ্বংসমূলক কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা ফ্রাঙ্কোর দলকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে থাকে। এই ছদ্মবেশী যোদ্ধাদেরই বলা হতো ফ্রাঙ্কোর "পঞ্চম বাহিনী" (Fifth Column)। সেই থেকেই এই কথাটার প্রচলন আরম্ভ হয়েছে।

খেলাধূলা

শ্রীম—

রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা

গেলো মাসে আমাদের কাগজ যখন বার হয়, তখনও বোম্বের সুবিখ্যাত রোভার্স কাপের খেলা শেষ হয়নি ব'লে এ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলা হয়নি। ভারতবর্ষে যে-সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তন্মধ্যে রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা অন্যতম। পূর্ব্ব-ভারতে যেমন আই. এফ. এ. প্রতিযোগিতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা পশ্চিম-ভারতে। আই. এফ. এ. খেলার দু বছর আগে এই প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আই. এফ. এ. ১৮৯৩ সালে আর রোভার্স কাপ ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জুতো প্রস্তুতকারক বাটা কোম্পানীর কলকাতায় একটি ফুটবল খেলার দল আছে। এই দলই এবার এই রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বাংলা দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কারণ এ দলে যারা খেলেছে, এদের প্রায় প্রত্যেকেই বাংলার কোন না কোন বিখ্যাত ফুটবল দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বাটাদল বোম্বাইয়ের চ্যাম্পিয়ন দল ডবলিউ. আই. এ. এ. স্টাফদলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিয়ে বিজয়ী হয়েছে। মহামেডান দলের নুর মহম্মদ, রশিদ ও সাবু, ইস্টবেঙ্গলের সোমানা ও এস. ঘোষ এবং কালীঘাট দলের মোহিনী ব্যানার্জ্জি এদের আক্রমণভাগে খেলেছে। ডবলিউ আই. এ. এ. স্টাফ দলে যারা খেলেছে তা'রাও বিশেষ শক্তিশালী খেলোয়ার বলে পরিচিত। এদের দলের সলোমন, চন্দার, স্বামী, ভীমরাও, টমাস, কাদেরভেলু প্রভৃতি ফুটবল খেলায় পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে এক একটি দিকপাল। তাই ব'লে, সেদিনের খেলায় বাটাদলের জয় যে অসঙ্গত হয়েছে তা নয়, কারণ সেদিনের খেলায় তা'রা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

এবারে ভালো দল খুব কমই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। এই প্রতিযোগিতার প্রথম দিকের খেলা তেমন জমেনি। বাটা দল টাটা কোম্পানীর দলকে সেমি-ফাইনালে ৭-১ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। আর উবলিউ. আই. এ. এ. স্টাফ দল হিন্দুস্থান বনস্পতি ম্যানুফেক্‌চারার্স দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত ক'রে ফাইনালে যায়। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় মহামেডান স্পোর্টিং ছাড়া এর পূর্ব্বে কলকাতার আর অপর কোন দলই বাটাদলের মত এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি।

ক্রিকেট খেলা

ক্রিকেট খেলার তোড়জোড়ও এরই মধ্যে সুরু হয়েছে। দেশের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির জন্য বোম্বাইয়ের ক্রিকেট খেলার পরিচালকমণ্ডলী স্থির করেছে তা'রা কোনপ্রকার ক্রিকেট খেলায় যোগ দেবে না। এমন কি নিখিল ভারতীয় রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়ও নয়। এতে অবশ্য এ বৎসরের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অঙ্গহানি হবে। কারণ বোম্বাইয়ের ক্রিকেট দলগুলি খুবই শক্তিশালী।

কলকাতার মাঠেও ক্রিকেট খেলার মরসুম সুরু হয়ে গেলো। এবারের ক্রিকেট খেলা খুবই আকর্ষণীয় হবে বোধ হচ্ছে। কারণ ইংলণ্ডের অনেক নামকরা ক্রিকেট খেলোয়ার এবারে যুদ্ধ সংক্রান্ত চাকুরীতে ভারতবর্ষে আছেন। এরাও রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়—এদের যিনি যে প্রদেশে চাকুরী করেন—সেই প্রদেশের দলের পক্ষ হয়ে খেল্‌বেন। এর মধ্যে হার্ডস্টাফ, গডার্ড, ভেরিটি প্রভৃতি আছেন। হার্ডস্টাফ মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে এক শ রাণ করে এক নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যেই দার্জ্জিলিংএও একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয়ে গেছে। এর পরের মাসে তোমাদের এই সব ক্রিকেট খেলার খবর আমরা দেবো।

—সম্পাদকীয়—

শিশুসাথীর ছোট্ট পাঠক-পাঠিকারা, তোমরা সবাই আমাদের বিজয়ার সাদর অভিনন্দন গ্রহণ কর। তোমাদের জীবন জ্ঞানে গুণে, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে, আনন্দে উৎসাহে ভরপুর হয়ে উঠুক্!

আমরা আমাদের সমস্ত লেখক-লেখিকাকেও বিজয়ার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি। তাঁরা প্রাণের যে দরদ দিয়ে ছোটদের শিক্ষার ও আনন্দের খোরাক জুগিয়ে জুগিয়ে শিশু-সাথীকে সত্যি সত্যি শিশুদের চলার পথে সাথী ক'রে তুল্‌ছেন, শিশুসাথীর উপর তাঁদের সে দরদ দিন দিন বেড়ে উঠুক্!

এ-বছরের সুরু থেকে, কাগজ ও ছাপার সরঞ্জামের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার মধ্যে দাম না বাড়িয়েও শিশু-সাথীকে আরো উন্নততর এবং তোমাদের আরো মনোমত ক'রে গড়ে তুল্‌বার জন্য আমরা অবিরাম চেষ্টা কর্‌ছি। আমাদের চেষ্টা যে সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য কর্‌ছ।

এবার মজার ব্যাপার হয়েছে আমাদের পূজা-বার্ষিকী 'বার্ষিক শিশু-সাথী' নিয়ে। আমরা ফি-বছর যতগুলি বার্ষিক শিশু-সাথী ছাপি, এবারও তাই ছেপেছিলাম; কিন্তু ভয় হচ্ছিল যে, এবার হয়ত বা ততগুলি কাট্‌বে না, কারণ এবার তো আর আমাদের ব্রহ্মদেশ ও সুদূর প্রাচ্যের পাঠক-পাঠিকাদের খোঁজ-খবর নেই, তার উপর নানা গোলমালের জন্য বাঙ্‌লার বাইরের পাঠক-পাঠিকারাও হয়ত বার্ষিক নিতে পারবেন না। কিন্তু হয়ে গেলো ঠিক উল্টো,—যা' শিশুদের পূজা-বার্ষিকীর ইতিহাসে একেবারে অভিনব!

১লা আশ্বিন 'বার্ষিক শিশু-সাথী' বেরুলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু' সপ্তাহের ভিতর সমস্ত কপি ফুরিয়ে গেল। চারদিক থেকে এবারকার বার্ষিকের অজস্র প্রশংসা আস্‌তে লাগল, আর আস্‌তে লাগল 'বার্ষিক পাইনি' ব'লে বহু অনুযোগের চিঠি। অনেকে আগেভাগেই দাম পাঠিয়ে, অনেকে ভিঃ-পিঃতে পাঠাবার জন্য অর্ডার দিয়ে আমাদেরে রীতিমত বিব্রত ক'রে তুল্‌ল। এত যাদের তীব্র আগ্রহ তাদের তো বঞ্চিত করা চলে না! তাই এই মাগ্যি-বাজারে অতি কষ্টে ভালো কাগজ কালী জুটিয়ে গত লক্ষ্মীপুজোর দিন বার্ষিক শিশু-সাথীর দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হয়েছে। তোমাদের মধ্যে যাদের আগেকার অর্ডার ছিল, তাদের বই চলে গেছে। যারা এখনও সংগ্রহ করনি, তা'রা শীগ্‌গীরই সংগ্রহ ক'রে নিও; কারণ এবার ফুরোলে এত বড়ো বই আর ছাপা সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না।

গত দুই মাসের ভিতর দেশের কয়েকজন মহামনীষী ও দেশকর্ম্মী তিরোধান করেছেন। শিল্পানুরাগী মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, বাঙ্‌লার প্রবীণতম নেতা হরদয়াল নাগ, মহামনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নলিনীরঞ্জন চাটার্জ্জি, বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক হীরালাল হালদার এবং কলা ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত আরো কয়েকজন ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এরকম লোকের মৃত্যুতে দেশ নানাভাবেই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। আমরা বাঙ্‌লার শিশুদের পক্ষ থেকে এঁদের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

সব চেয়ে ভীষণ কাণ্ড ঘটেছে গত সপ্তমী পূজোর দিনে (১৬ই অক্টোবর) মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায়। ভীষণ সাইক্লোনে ও বন্যায় এই দুই জিলার অনেকগুলি অঞ্চল একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সরকারী বিবরণ যা এখন পর্য্যন্ত বের হয়েছে, তাতে দেখা যায় এক মেদিনীপুর জেলায়ই নাকি দশহাজার লোক ও বারো আনি গরুবাছুর মারা গেছে; ২৪ পরগণায়ও নাকি হাজারখানেক লোক মারা গেছে। সরকারী বিবরণ মতে ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রায় সমস্ত কাঁচাবাড়ী ভেঙ্গেচুরে একাকার হয়ে গেছে। কত পরিবার যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কে জানে। প্রকৃতির এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা মানুষের নেই। আমরা সুধু ঐ দুই জেলার অধিবাসীদের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতিই জানাতে পারি, আর পারি দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করতে। গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন যে দুঃস্থেরা এখনও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে আছে, তাঁদের সাহায্যের জন্য বহু সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। তোমরা শক্তিমত এই অসহায় নরনারীদের সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না, আমাদের এই অনুরোধ রইল।

মজার ধাঁধা

[উত্তর ১২ই অগ্রহায়ণের মধ্যে শিশু-সাথী কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই]

১। নীচে সতরোটি শব্দ দেওয়া হ'ল। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কতকগুলো বিখ্যাত এবং ভালো ভালো বাংলা বইয়ের নাম। এইগুলো থেকে অন্ততঃ ষোলখানা বইয়ের নাম তৈরী ক'রে তোমরা আমাদের পাঠাবে আর সঙ্গে সঙ্গে পাঠাবে বইগুলোর **গ্রন্থকারের নাম**। একই অক্ষর একাধিক বার ব্যবহার করলে কোন আপত্তি হবে না।

পাথর, দেব, ব্যর্থ, বিশেষ, খণ্ড, কুহু, পক্ষ, বৃষ, বলী, চন্দ্র, কায়া, সমতল, অলক্তক, দানা, মালা, তীর, খেলি।

২। এমন কোন শব্দ তোমরা জান কি যাতে ধর্ম্মোপদেষ্টাদেরও বোঝায় আবার পশুও বোঝায়?

[দু'টি ধাঁধার পুরোপুরি উত্তর ঠিক না হ'লে নাম ছাপা হবে না।]

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। রামচন্দ্র—বেলা ২টা পর্য্যন্ত ।/০ আনা দরে ২টা—

তারপরে ৵০ আনা দরে ২৫টা—

২৭

২। মফিজ বেলা ২টা পর্য্যন্ত ।/০ আনা দরে ৫টা—

পরে ৵০ আনা দরে ২০টা—

২৫

৩। হাবুল বেলা ২টা পর্য্যন্ত ।/০ আনা দরে ১৪টা—

পরে ৵০ আনা দরে ৫টা—

১৯

পাল্টিয়ে নিলেও চল্‌তে পারে।

উত্তরদাতাদিগের নাম

বারীন্দ্রনাথ দত্ত, ধুবড়ী ; শৈলেন্দ্রনাথ, শ্যামাপদ, বেলা, কল্যাণ, বীরু, বামা, কলিকাতা ; সর্ব্বেশ্বর, শ্যামল, বর্দ্ধমান ; অজিতকুমার মণ্ডল, মুকুন্দপুর ; অনন্তকুমার মণ্ডল, মৌখালি ; শাহাজাদপুর ইসমালিক কালচারাল সোসাইটির সভ্যবৃন্দ, শাহাজাদপুর ; রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব্বপুর ; শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাইতি ; রমাপ্রসাদ ঘোষ, সাতক্ষীরা ; জ্যোতির্ম্ময় সেন, ভাগলপুর ; আনোয়ার হোসেন, শাহাজাদপুর ; বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল গজনা ; দুলাল দাশগুপ্ত, সারোয়াতলী ; অবনীকান্ত সেন, বড়থলা ; অজিত, মোসারফ, অসিত, জয়ন্ত, চিপাইদা, সুখদেও, ম'সহর, সালাম, মোজাম্মেল, নানী, মণি ও সুস্মু, ধুবড়ী ; তপেন্দ্রনাথ রুদ্র, বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ; তারকদাস কর্ম্মকার, শ্যামনগর ; চিন্তাহরণ মালো, ছিলদয়ার ; গীতা, খোকন, গৌতম, অঞ্জলী, মঞ্জু, তাপস, জলপাইগুড়ী, ধীরেন্দ্র, বৈঁচিগ্রাম ; যূথিকা, অশোকা, আশীষ, উল্টাডিঙ্গী ; অনিল, অজিত, অঙ্ক, মতিলাল, ভীম, ভকতলাল, সুশীল, শ্রীহরি, লেখা, ভুক্তা, হুকাঞ্চা, পোদ্দারডিহি ; ছবি, নীলি, গৌরী, মনা, সণ্টু, আরণা, খুকু, শঙ্কর, ঘুটু, ফায়না, ঝড়িয়া ; কলু, হালিমা, পুষ্প, ভগবতী, সুধা, বিদ্যুৎ, বাঘডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয় ; দিলীপ, খগেন, অজিত, ভবেশ, রাণা, ননী, লিলু, চামেলী, মিনু, ধুবড়ী ; গৌরী, আশু, বীণা, রেণু, শান্তি, অমলা, শিলং ; বিভু, কিশু, উমাপ্রসাদ, সত্যেন্দ্রপ্রকাশ, পাবনা ; প্রশান্ত সেন, গ্রাহক নং ১৯৫৮৬ ; সুশান্ত সেনগুপ্ত, লক্ষ্ণৌ ; সতীশচন্দ্র দাস পোদ্দার, কলিকাতা ; কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, ইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভবতারণ ভট্টাচার্য্য, ইয়াসিন সরকার, ভক্তিরাম দাস, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাকুলিয়া ; মায়া, বাপু, রাণী, গৌরী, মীরা, নীলু, দীপ্তি, শম্ভু, মাণিক, ছুটু, রাজভাতখাওয়া ; শম্ভু, গোপাল, দুলু, বাঘু, টুকু, নীহার, কমলি, তেজপুর ; রাঙ্গাদা, ইন্দ্রদা, পুষ্প, অমি, প্রভা, মদনগোপাল, চেতলা ;

কাঁঠালপুকুর বালক প্রাইমারী ফাইনাল স্কুলের চতুর্থশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ; তুষারকান্তি দাস, খাপ্পাপুর; দেবাশীষ গুহ, তমলুক; আবদুল কুদ্দুস, সুলতানপুর; অরুণকুমার চাটার্জ্জি, পুতুণ্ডা; রমা ও মিহির গুপ্ত, ভাগলপুর; কল্যাণী, মাধবী, মঞ্জরী, অঞ্জলি, পৃথ্বী, অহি, মণি ও প্রণতি বসু, ইন্দোর; যুথিকা, নমিতা, জীমূত, শান্তি, হীরা, জহর, অমিতাভ, গিরিডি; কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, চাঁদপটিয়া; মীরা, বামনী, পারুল, প্রজ্ঞা, খোকন, ফণি, ও নির্ম্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; প্রভাতকুমার দত্ত, অযোধ্যা; পঞ্চানন ঘোষ, জঙ্গমবাড়ী; বিমলচন্দ্র দত্ত, শ্রীখণ্ড; বাবুরাম মেটে, নয়াচক; মৃণাল, পরিমল, নির্ম্মল, প্রণব, উৎপল, হেনা, লীনা, মীনা, টাঙ্গাইল; সন্ধ্যা ও গীতারাণী ঘটক, কুমটাই চা বাগান; সচ্চিদানন্দ, তারাপদ, বমন, লক্ষ্মীনারায়ণ, কুলোপাড়া; লাবণ্য, বীণা, পীযুষ, তুষার, মৃণাল, সিলেট, রঞ্জন, রমলা, রণেন মণ্ডল, ১৮৫৪২নং গ্রাহক; নীলমণি, সুধা, পারু, বাণী, লালু, গীতা ও গোরা, গিরিডি; রঞ্জু, টুকু, লীনা, মীনা, দুলু, ভনু, কাঁথি; ইন্দ্রলাল দে, গাইবাঁধা; বিশু, আশু, পরিতোষ, মনতোষ, হাওড়া; আফতাফউদ্দীন খান, বানিয়াচঙ্গ; অরুণ, নির্ম্মল, কেনারাম, মাণিক, উমা, ভানু, গঙ্গা, নন্দরাণী, হরিপ্রিয়া, উষা, পুতুল, নবকুমার, হরকুমার, আদ্রা; শক্তিপদ, নরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, সুজাতা, অরুন্ধতী, রবীন্দ্রনাথ হাজরা, নিউদিল্লী; গৌরগোপাল, নৃত্যগোপাল, মৃণালিনী. রিকাবীবাজার; সত্যেন্দ্রনাথ দাস, লাহোর; বিমল, নির্ম্মল, বেবী. মণ্ট, জেণ্টু, তুতুন, পীণ্টু, বেনারস; ব্রহ্মানন্দ, চতুর্ভুজ, অঙ্কুর, উমেশ, শরৎ, হাবুলাল, শিবরাম, রঘুনাথ, প্রফুল্ল, মুকুল, অরুণ, কাজল, ভক্তি, ঘনশ্যাম, ভরত, মুরলী, .মাধব, চিন্তাহরণ, হরেকৃষ্ণ, তারাপদ ও শম্ভু, শায়েরপলমা; সরিৎকুমার ও সতীরাণী নন্দ, বাঁকুড়া; রাধারমণ, মীনা, অনি, শনি, পিকা, মল্ল, বীরা, ও কথা, ঢাকা; আবুল হোসেন মিঞা, অশ্বিনীকুমার সাহা, মনমোহন কর্ম্মকার, রাজৈর; পান্না ও অনিমা, একদুয়াড়িয়া; মঞ্জু, কচি, সন্ধ্যা, রুবু দাশগুপ্ত, চলাদিঘী; চন্দ্রকুমার বসু, জামালপুর; কমলাবালা বিশ্বাস, কালচিনি; গীতা, অনু, শান্তি, শেফালী, বীণা, মীরা, আরনা, সুধা, বুধা, জ্যোৎস্না, মণিমালা, খুকুন, গৌরী, মিটু, স্মৃতি, অরুণ, কাঁকড়, পরেশ, ভাস্কর, অনিল, খিরু, হীরু, ধীরু, নীলু, কার্শিয়াং; তারা, কেষ্টধন, টৌটন, সুকুমার বানার্জ্জি, বেহালা; সুধীন, যুথিকা, অলকা, দীপালী, সমীরণ, মঞ্জু, প্রণব, বাণী, ধানবাদ; পবিত্রকুমার, সৌমিত্রকুমার, তাপ্তি, কৃষ্ণা, কাবেরী দেবী, খুলনা বেলা ও বুদ্ধু, বুড়োশিবতলা; সত্যনারায়ণ মণ্ডল ও শ্রীনিবাস আচার্য্য, পোদ্দারডিহি, বিনায়ক ও ফাল্গুনী, বড়কোটা; কুমারী প্রতিভা দেবী, কালচিনি; রাম, শানু, অমলা, মলিনা, মীনা, শিশির, সমীর, সন্ত, প্রতিমা,. দুলু, শ্রীবোরা; আভা, শোভা, মিনতি, গিনি, রেখা, বড়বেলুন; রফিকউদ্দীন আহাম্মদ, মায়া, ছায়া, জিয়া, বাসু, নীলু, বেলু, আনিসুল ইসলাম, ধুবড়ী; গোপালকৃষ্ণ বসু, কলিকাতা; রবীন্দ্র বানার্জ্জি, স্থল; লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী ও রাণু গ্রাহক নং Spl ৮; অমল মিত্র, শ্যারী, ঢাকা; জগদ্বন্ধু, সর্ব্ববন্ধু, ব্রজবন্ধু ও সুধাংশু রায়, কেউট্যা; ক্ষিতীশ, মকবুল, পরেশ, নরেশ, বকুল, শ্রী, শান্তি, বাচ্চু, সরোজ, মাথাই, মাধবী, নবীনা, ধৃতি, শঙ্কর, সুধীর, অরুণ, জ্যোতির্ম্ময়, আরতি, ফণি, বিনয়, হরি, গোপাল, বিশ্বনাথ, মাষ্টার, গফরগাঁও; গৌরচন্দ্র বিশ্বাস, হীরেন্দ্রনাথ রায় উলপুর; দুর্গাচরণ ঘোষ, জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকপাড়া; প্রদীপকুমার রাহা, কালনা; রত্না ঘোষ, ঢাকা; মিণ্টু, খুকু, মাণিক, রমু, গলু, ডালু, খোকন, দিল, অজিত, রুণু, মেঘল, কেণ্টু বসু, ঢাকা; বৈদ্যনাথ, জ্যোৎস্না, নীলু, খোকা, মঞ্জু, বাসন্তিকা, চকদীঘি; শম্ভু, বেবী, খুকী, রবি, টুলু, ডাবলু, পুতুল, মণ্টু, সলিলেন্দ্র, গ্রাহক নং ১৬৬৭৭; অমলচন্দ্র ধর, ঢাকা; সুধীর মুখার্জ্জী, শ্রীপতিপুর; গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিয়াখোলা; বুলু, মুকুল, তিলক, মঞ্জু, গ্রাহক নং ১৯৪৫৪; বিভূতি দত্ত, কোগ্রাম; রুবী ও ভণ্টু বাবু, শতালি চা বাগান; দীপ্তি সান্ন্যাল, ধুবড়ী; গিরিজাকুমার গুহরায়, নারমা; শ্রীচরণ মাইতি, গ্রাহক নং ২০৬৬৮; শম্ভুনাথ ধর, গ্রাহক নং ১৯৫৮৩; রবীন্দ্রনাথ সেন, পাত্রসায়র; রীণা সেন, পাটনা; কুমারী স্মৃতিরাণী রায়, লক্ষ্ণৌ; মীরা, গৌরী, মধু ও মণ্টু, সমস্তিপুর; হেনরী, চার্লি,

খুকী, বুবা, জাহানারা, রাণু, গপ, কজলি, জর্জ্জ হোসেন, নওগাঁ ; শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, জিওল গড়া ; দেবেন্দ্র, রবীন্দ্র, রতন, মাখন, অর্জ্জুন, অক্ষয়, নবকুমার, ননীলাল, তারাগঞ্জ পার্ব্বতীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যশোদা ঠাকুর, নিতাই, নাসু, কান্দরা ; অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, কাটোয়া; অংশু, কিটি, পদ্মা, ঊষা, উমা, দীপ্তি, তৃপ্তি, স্যাচা, খোকা, শঙ্কর, স্যার, দিদি, সাধনপাড়া ; প্রফুল্ল পাল, শিলচর ; সুনীল রায়, কাথুলী ; আনন্দ, সীতাচরণ, পাঁচু, দুলাল, সতীশ ও সত্য, সোণারপুর ; দুলাল, সুখলতা, বীণা, বিশু, সাধন, কানু, হরেন্দ্র, মণ্টু, ঝণ্টু, মাধব সিং ; সেক্রেটারী, নওজোয়ান ক্লাব, মালদহ ; প্রতিভারঞ্জন ঘোষ, বইচিগ্রাম ; মীরা মজুমদার, ভৈরববাজার ; খোকন, বিজু, রমেন, কলিকাতা ; নীরেন্দ্র, শৈলেন্দ্র অবনীন্দ্র, শিবরাম, অমলকুমার, মীরারাণী, মাজী, জবড়রাপাড়া ; শান্তি, শিশির, সনৎ, বেলু, ভাগলপুর ; ভূপতি, বিজয় পালিমপুর ; সুরুচি, শিবানী, স্বাগতা, অমলা, অমিতা, পলাশ, শম্ভুদা, রাণী, পঙ্কজ, চিরশ্রী, দীপ্তি, ছবি, বেবী, শোভা, সবিতা, বড়দা, মেজদা, সেজদা, ফুলদা, ছোড়দা, টুলি, সলিল, পুতুল, উমা, খুকু, নৃপতি, আলো, বাটুল, অনু, বেলা লীলা, লেখা-বৌদি, বাসন্তী, গোপা, শোভা-বৌদি, বড় বৌদি, তানু, মনা, সুখু, টেপু, পঞ্চুদা, জোয়ারী ; ভগবানশরণ ও গোবিন্দদাস ধর, ঢাকা ; পাঁচুগোপাল দত্ত, শিবপুর ; মিস্ ছবি, কীটি, কুহু, মাষ্টার লবু, কুশু, কানু, বেনু ভট্টাচার্য্য, রায়গড় ; শঙ্করপ্রসাদ চন্দ্র, শিবপুর ; পরিমলকান্তি রায়, মন্দিরবাজার।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Shankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

হাতে লেগে তা'র পায়ের একপাটী জুতো বাইরে পড়ে রইলো [৪১৫ পৃষ্ঠা

একবিংশ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৯ | ৯ম সংখ্যা

পৌষের শীতে

শ্রীনীলরতন দাশ, বি.এ.

হিমেলা বাতাস শীতের শীতল পরশ বহিয়া আনে,
বনে বনে জাগে মর্ম্মরধ্বনি ঝরা পাতাদের গানে।
শষ্পের শিরে শিশির-বিন্দু মুক্তার মালা গাঁথে,
ঘন কুয়াশায় আবরে অবনী শুভ্র হিমানী পাতে।
পাখীরা ভুলেছে কাকলী আজিকে অলিরা গুঞ্জরণ;
থেমে গেছে হায় ঋতু-উৎসব, নীরব কুঞ্জবন!

পোষের শীতে শুধু পল্লীতে পড়ে জীবনের সাড়া,—
বালক বৃদ্ধ যুবক সবাই হরষে আত্মহারা।
সোনার ধান্যে জেগেছে বন্যা বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে,—
কৃষাণ-কৃষাণী সারা দিনমান আছে নানা কাজে মেতে।

কেহ কাটে ধান, কেহ বাঁধে আটি, কেহ বহে ভারে ভারে,—
ঘরে ঘরে তোলে রাশি রাশি ধান, হাসি গান চারিধারে।
পল্লীর গৃহে মহাসমারোহে হবে পৌষ-পার্ব্বণ,
কৃষক-বধূরা ছেলেমেয়ে সাথে করে তা'র আয়োজন।
পিঠা-পায়সের মিঠা সৌরভে হবে ঘর ভরপূর,—
মাঠের স্বর্ণে পূর্ণ ভবন, দৈন্য হয়েছে দূর।

সত্য গল্প

শ্রীআশা চৌধুরী

অজ পাড়াগাঁ। রেললাইন হ'তে অনেকদূরে—ঐ যে দূরে বটগাছটা দেখা যায়—সেখান দিয়ে, শ্মশান পার হয়ে ঐ যে মাটির রাস্তা চ'লে গেছে—ওইটেই চক-মাণিকপুর। গ্রামে ব্রাহ্মণ কয়েক ঘর—বাকী কায়স্থ, হাড়ী, বাগ্‌দী ও দুলে।

ঐ যে বটগাছ, সেখান থেকে খানিক গেলে গোপালের মন্দির, আরও খানিকটা গেলে ডানধারে পীতাম্বর মুখুজ্যের বাড়ী। অন্য পাশে থাকেন গোবিন্দ হালদার। মুখুজ্যে মশায় ছাড়া আরও দু'চার ঘর ব্রাহ্মণ থাকেন পাড়ায়, কয়েক ঘর কায়স্থও আছেন। যে সময়কার কথা বলছি তখন পীতাম্বর মুখুজ্যে সংসার ছেড়ে কাশীবাস করছেন। বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী ও দুটী ছেলে—হরনাথ ও সদাশিব।

দুটী ভাই-ই খুব সুশ্রী। সদাশিবের লেখাপড়ায় মন আছে। হরনাথ টোলের পড়া শেষ ক'রে জমিজমা, বাড়ীঘরের ভার নিয়েছে। হরনাথের উদাসীন খেয়ালী স্বভাব, দু'-একবার বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছেও। কিন্তু তা'র মনটা বড় ভালো। গ্রামের প্রত্যেকের সাথে তা'র নিকট-আত্মীয়ের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে।

বয়সের সঙ্গে হরনাথের খেয়ালী ভাব আরও বেড়ে উঠছিল; মার মনে ভয় হ'ল—ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। তাই শীগ্‌গিরই হরনাথের বিয়ের ঠিক হ'ল।

লক্ষ্মী যখন বউ হয়ে এ গ্রামে এলো—আত্মীয়-কুটুম সারা গাঁয়ের মেয়ে বউ ভেঙে পড়লো। অতি বড় নিন্দুকও স্বীকার করলো যে, এমন রূপ সচরাচর দেখা যায় না। রূপ বটে! কিন্তু রূপবতী বউর আপন-ভোলা স্বামীটি নিজের খেয়ালে মত্ত। তা'র সময় কাটে গান গেয়ে আর দুনিয়ার লোকের বেগার খেটে। তা সত্ত্বেও দিন সুখে শান্তিতে কাটছিল। লক্ষ্মী সত্যি বড় লক্ষ্মী মেয়ে, অল্পস্বল্প লেখাপড়াও সে জানতো, আর তা'র মধুর ব্যবহারে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, পাড়াপ্রতিবাসীরা তা'র প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারতো না। সংসারটা আনন্দে ভ'রে উঠেছিল।

বর্ষাকাল। রান্নাঘরে লক্ষ্মী রান্না চাপিয়েছে। হরনাথ ব্যস্তভাবে সেখানে এসে মাছের চার বানাতে বসলো। মার সন্ধ্যাহ্নিক হ'য়ে গেলে হরনাথকে ডেকে বললেন,—হরি, এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে আর কোথাও বেরোসনি বাবা, যা জ্বর হচ্ছে। ওপাড়ার নিমুটার তো যায়-যায় অবস্থা হয়েছে। আহা বেচারি বউটা—

—না মা, বেশীদূর যাচ্ছি না, চট্ ক'রে দুটো মাছ ধ'রে নিয়ে আসছি। বড় বড় ঘাই দিচ্ছে—ব'লে হরনাথ হাসতে হাসতে ছিপ ঘাড়ে বেরিয়ে গেল।

সারাদিন তা'র দেখা নেই। অন্ধকার হ'ল, লক্ষ্মী তুলসীতলায় সাঁঝের

প্রদীপ জ্বালালো। সদাশিব খুঁজতে বেরিয়েছিল। মা ব্যস্ত হয়ে ঘরবার করছেন। সদাশিব এসে বললো—দাদা নিমুদার সেবায় লেগেছে মা, এখন আর আসবে না। দাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

দশ-বারো দিন হরনাথ এলো না। তারপর শ্রাবণ মাসের দুর্য্যোগ-ভরা এক সন্ধ্যায় হরনাথ নিমুর মৃতদেহ দাহ ক'রে শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরলো। বিবর্ণ মুখ, চোখে কালি পড়েছে—সারাদিন জলে ভিজে তখন শরীর তা'র কাঁপছে। লক্ষ্মী আশঙ্কায় শিউরে উঠলো। রাত্রেই খুব জ্বর এলো,—তারপরই বিকার।

ষোল দিন পরে লক্ষ্মী দুঃসহ আঘাতে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়লো, বৃদ্ধা মায়ের হাহাকারে আকাশ আকুল হয়ে উঠলো—ভরা ভাদ্রে লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!

লকলকে জিভ মেলে চিতা জ্বলে উঠলো। হঠাৎ তীব্র ধারাবর্ষণের সঙ্গে এলো পশ্চিমে ঝড়। শ্মশান-যাত্রীরা আটচালায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল। বৃষ্টি থামলে ওরা বেরিয়ে দেখে শূন্য চিতা খাঁ-খাঁ করছে। ওরা অজানা আশঙ্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। সহসা অদূরবর্ত্তী এক গাছের তল থেকে ক্ষীণ আওয়াজ এলো—ওরে ভাই আমি এখানে! আমাকে বাড়ী নিয়ে চল্।—সবাই আতঙ্কে অবাক। হরনাথ ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললো—আমি এখনও মরিনি।

সকলেই মহাখুশী হয়ে জয়ধ্বনি ক'রে হরনাথকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এলো। পাড়ার বধূরা এসে লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো নিয়ে গেল।

হরনাথ কিন্তু আর সে মানুষ নেই। গলার স্বর একটু বিকৃত,—সর্ব্বদা ক্লিষ্টমুখে ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে ব'সে থাকে। কাউর সাথে মেলামেশা নেই, হাসিগল্প নেই—দিন দিন রুক্ষস্বভাব হয়ে উঠছে। হরনাথের মা ছেলের ধরণ-ধারণ দেখে পূজা পাঠালেন—গ্রামের গোপালঠাকুরের কাছে। প্রসাদী ফুল বেলপাতা নিয়ে ছেলের মাথায় ছোঁয়াতে যেতেই হরনাথ পরম আতঙ্কে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে ভক্ত ব'লে জানতো, আজ এ ভাবান্তরে সে মনে মনে কেঁপে উঠলো।

রাত্রে হরনাথ আর বাড়ী ফেরেনি—সারারাত দুঃস্বপ্নে শিউরে শিউরে উঠলো লক্ষ্মী। পরদিনও হরনাথের দেখা নেই। শাশুড়ী-বউ ভেবে আকুল—কোনও কারণই খুঁজে পান না হরনাথের এ অদ্ভুত আচরণের।

মেঝেয় হরনাথের ঢাকা ভাতের কাছে লক্ষ্মী ঘুমিয়ে পড়েছে—অবহেলায় অযত্নে সোনার দেহ কালি হয়ে গেছে—রুক্ষ মেঘের মতো চুল—কতদিন বাঁধা হয়নি—লুটোলুটি খাচ্ছে। হঠাৎ একটা উৎকট অসহ্য গন্ধে লক্ষ্মীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলতেই দেখে—হরনাথ একাগ্র দৃষ্টিতে ঝুঁকে প'ড়ে তা'কে দেখছে। লক্ষ্মীর শরীরে যেন একটা বরফ-গলানো জল বয়ে গেল—এ যেন তা'র চির-পরিচিত স্বামীর সে কোমল দৃষ্টি নয়—কী একটা অমানুষিক ছায়া ভাসছে এ দৃষ্টিতে, আর গন্ধটাও যেন হরনাথের গা হ'তেই আসছে—মরা মানুষের গায়ের গন্ধ!

লক্ষ্মীকে চোখ মেলতে দেখে, হরনাথ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো। চোখে আর দাঁতে অস্বাভাবিক দীপ্তি।—আঁচলে কী বেঁধে রেখেছ লক্ষ্মী?—শুকনো ফুল? ফেলে দাও লক্ষ্মীটি—আমি তোমার কাছে আসতে পারছি না।
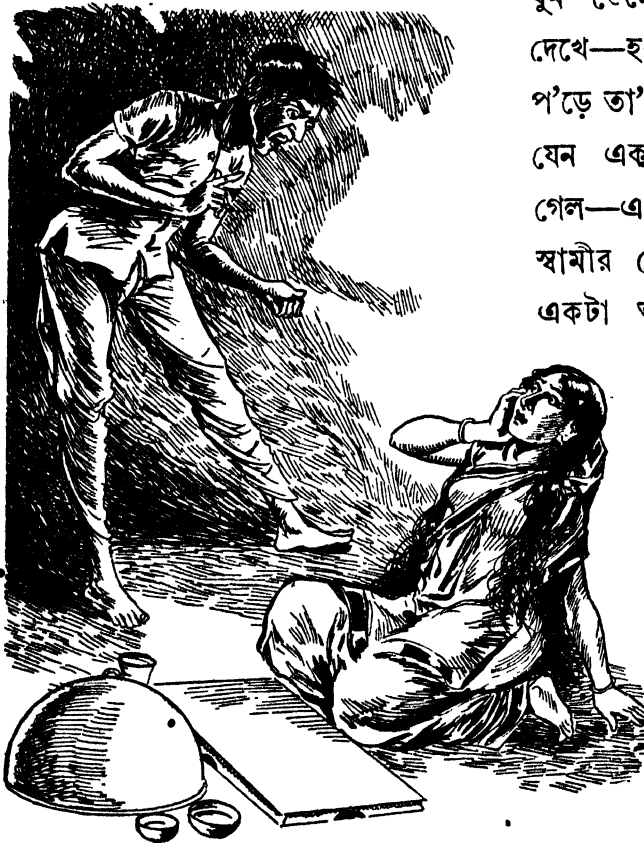
নিশুতি রাতের গভীর নিস্তব্ধতা হরনাথের কর্কশস্বরে যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? ঠাকুরের প্রসাদী ফুল—অমন বললেও যে পাপ হয়!—রুদ্ধস্বরে বলতে বলতে লক্ষ্মী কেঁদে ফেললো।—তোমার পায়ে পড়ি—

হরনাথের পা স্পর্শ করতেই সে যেন যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চীৎকার ক'রে পা সরিয়ে নিলো; দাঁতে দাঁত পিষে—হতবাক্ লক্ষ্মীকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন দগ্ধ ক'রে ফেলতে লাগলো!—তবে শোন, সুন্দর পৃথিবীর প্রাণী তুমি! অতৃপ্ত জীবন ফেলে আমাকে চ'লে যেতে হয়েছিল। আত্মহত্যা—ওঃ সে কী যন্ত্রণা! কী মূঢ়তা করেছি! তোমার স্বামীর আত্মা এদেহ ছেড়ে সত্যি চ'লে গেছে—দেহটা চিতায় অরক্ষিত দেখে আমি তা'তে প্রবেশ করেছি জীবনটাকে আবার ভোগ করতে! বিবাগী হয়ে যাবার হলে হয়ত চ'লে যেতাম—কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারছি না—

অভিভূত লক্ষ্মী যেন হঠাৎ চেতনা পেলো। উন্মাদ হয়ে ছুটে গেল—কুলুঙ্গীতে ছিল গঙ্গাজল, পূজার নৈবেদ্য ফুল,—হরনাথের সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিল। গগনভেদী স্বরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো লক্ষ্মী,—দূর হয়ে যা—আমার স্বামীর দেহ ছেড়ে—দূর্ দূর্—

মুহূর্ত্তে একটা ভোজবাজী হয়ে গেল। বীভৎস একটা করুণ আর্ত্তনাদ ক'রে হরনাথের দেহটা বিবর্ণ হয়ে আছড়ে পড়লো—বদ্ধ কপাটটা ভেঙ্গে দিয়ে একটা ঝড়ো হাওয়া চ'লে গেল। অজ্ঞান লক্ষ্মীর ক্ষীণ প্রাণ-স্পন্দনটুকু আস্তে আস্তে থেমে গেল। *

* সত্য ঘটনার ছায়াবলম্বনে

আর্কিমিডিস্

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

অনেক কালের কথা।

সিরাকিউস্ রাজ্যের সিসিলী নগরীতে সেদিন তখনও পর্য্যন্ত সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে নাই। সায়াহ্নের ম্লান রৌদ্র তখনও গাছের মাথায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। রাজপথে অগণিত লোক চলাফেরা করিতেছে। কোথাও কোথাও বিলাসিনী রমণীগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া গল্পগুজব করিতেছে। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে একটি চমৎকার শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

হঠাৎ সেই অচঞ্চল জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা ছি-ছি করিল, কেহ বা পাগল ভাবিয়া হাততালি দিয়া উঠিল। সকলেরই দৃষ্টি রাজপথের দিকে—সেখানে একজন বয়স্ক লোক দৌড়াইয়া যাইতেছিল—সিক্তদেহ ও সম্পূর্ণ নগ্ন!

লোকটির কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে! তাহা না হইলে প্রকাশ্য রাজপথে কেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া বাহির হইতে পারে! সেই লোকটি বারংবার শুধু একটি কথাই উচ্চারণ করিতেছিল, 'ইউরেকা, ইউরেকা—আমি পাইয়াছি, আমি পাইয়াছি!' অগণিত নরনারী শুধু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া রহিল; কেহই চিনিতে পারিল না, এই ব্যক্তি কে। কেহই বলিতে পারিল না, কি ইহার হারাইয়াছিল এবং কি ইনি পাইয়াছেন। দু'একজন আভিজাত সম্প্রদায়ের লোক শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, 'একি! আর্কিমিডিস্—বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্!'

হ্যাঁ, ইনিই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্। কেন যে এই বৈজ্ঞানিক সিক্তদেহে, উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, সে কথা পরের দিন প্রকাশ পাইল।

সিরাকিউসের রাজা হিরো একটি স্বর্ণ মুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মুকুটটির নির্ম্মাণ-কৌশল এতই সুন্দর যে, রাজা সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল, হয়ত মুকুটে খাদ মিশান আছে। অথচ এমন একটি অপূর্ব্ব জিনিষকে পরীক্ষার জন্য গলাইয়া নষ্ট করিবেন, তাহাও ভাল লাগিল না। মুকুটির কোন ক্ষতি না করিয়া কেহ যদি বলিতে পারিত ইহা খাঁটি সোনায় প্রস্তুত কী না! কিন্তু এমন অসম্ভবকে কে সম্ভব করিতে পারে? একটিমাত্র লোকের দ্বারাই ইহা সম্ভব—তিনি আর কেহ নহেন, বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্।

তাই এই সমস্যা সমাধানের ভার পড়িল আর্কিমিডিসের উপর। মুকুটের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে কতখানি মুগ্ধ করিয়াছিল, সেকথা বলিতে পারিব না, কিন্তু নিছক বৈজ্ঞানিক কারণেই এই সমস্যা

সমাধানের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখনকার মত এই মুকুটই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিল। তিনি এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, অনেক সময়েই তাঁহার স্নানাহারের কথা মনে থাকিত না। অধিকাংশ সময়েই তিনি মুকুটটিকে হাতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

একদিন তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন। স্নানের পাত্রটি জলে সম্পূর্ণ ভর্ত্তি। অন্যমনস্ক ভাবে যেমনই তিনি জলের মধ্যে পা ডুবাইয়াছেন, অমনি দেখিলেন খানিকটা জল উপচাইয়া পড়িয়া গেল। যে প্রশ্ন এতদিন তাঁহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল, আজ স্নানের পাত্র হইতে জল উপচাইয়া পড়িতে দেখিয়াই তিনি সেই সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহার আর মনেও রহিল না যে তিনি স্নান করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহে কোনও আবরণ নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সিক্তপদে, নগ্নদেহে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন—'আমি পাইয়াছি,—আমি পাইয়াছি।'

বাড়ী আসিয়া আর্কিমিডিস্ পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, কোনও জিনিষ জলে পরিপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুকাইলে খানিকটা জল উপচাইয়া পড়িয়া যায়, এবং মনে হয় জলের মধ্যে জিনিষটির ওজন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। তিনি প্রমাণ করেন, যে কোন জিনিষ পরিপূর্ণ জলপাত্রে ডুবাইলে যে জল উপচাইয়া পড়ে, তাহার ওজন যতটুকু, জলের মধ্যে সেই জিনিষের ওজন ঠিক ততটুকুই কম মনে হইবে।

সুতরাং মুকুটটি খাঁটি সোনার হইলে, তাহাকে জলে ডুবাইলে যতটুকু জল উপচাইয়া পড়িবে, ওই ওজনের খাঁটি সোনার একটি তাল জলে ডুবাইলেও ঠিক সেই পরিমাণ জলই গড়াইয়া পড়িবে। যদি তাহা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে মুকুটের সোনা খাঁটি নয়।

এই যে তথ্যটি আর্কিমিডিস্ আবিষ্কার করিলেন, তাহা বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র।

আর্কিমিডিস্ এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি রাজা হিয়েরোর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার বাল্য-জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আজকাল আর জানিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেইখানে কনোনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধুত্ব পরে এতদূর গভীর হইয়াছিল যে, তিনি যখনই কোন নূতন পুস্তক লিখিতেন, কনোনকে না দেখাইয়া তাহা কখনই প্রকাশ করিতেন না।

আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের কাহিনী সুদীর্ঘ এবং বিস্ময়কর। তিনি যে কত জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছেন, আজ আর তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পাইবার উপায় নাই। কিন্তু যে যান্ত্রিক সভ্যতার আমরা এত বড়াই করি, তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই তাপস-বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্।

রাজা হিয়েরো একবার একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার ভিতর হইতে জল বাহির করিবার জন্য ডাক পড়িল আর্কিমিডিসের। তিনি অবিলম্বে এক নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া

জাহাজের খোল হইতে জল বাহির করিয়া ফেলিলেন। যন্ত্রটির গঠন ছিল অতি সরল। একটি জলের পাইপকে একটা পিপার চারিদিকে কয়েক পাক জড়ান হইল। তখন সেই পাইপের নীচের মাথা জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া পিপাটিকে একটু কাত করিয়া ঘুরাইলেই জল পাইপ বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিবে।

তখনকার দিনে রোমান, গ্রীক, কার্থেজবাসীদের মধ্যে পরস্পর সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। রাজা হিরো যদিও জীবনের অধিকাংশ কালই সুখেস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি আর্কিমিডিস্‌কে ডাকিয়া আত্মরক্ষার জন্য নানারকম যন্ত্র এবং কৌশল উদ্ভাবন করিতে অনুরোধ করেন। আর্কিমিডিস্ তাহার উত্তরে সদম্ভে বলিয়াছিলেন, 'আমি যদি পৃথিবীর বাহিরে দাঁড়াইবার জন্য সামান্য একটু স্থানও পাই এবং একটি দণ্ড সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে আমি এই বিশাল পৃথিবীকেও কক্ষচ্যুত করিতে পারিব।'

কিছুদিনের মধ্যেই রোমান সেনাপতি মার্সেলাস্ সিরাকিউস্ আক্রমণ করেন। কিন্তু আর্কিমিডিসের দরুণ কিছুই সুবিধা করিতে পারিলেন না। আর্কিমিডিস্ কতকগুলি কপিকলের সাহায্যে এমন এক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন, যাহার সাহায্যে নগরীর প্রাচীর হইতে ভারী ভারী জিনিষ রোমানদের জাহাজের উপর ছুঁড়িয়া ফেলা যাইত। এই ভীষণ আঘাতেই রোমানদের অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়। কখনও আবার কপিকল ও দড়ির সাহায্যে শত্রুর অনেক জাহাজ শূন্যে টানিয়া তুলিয়াছিলেন। মার্সেলাস্ একবার অনেকগুলি জাহাজ লইয়া সিরাকিউস্ আক্রমণ করেন। শোনা যায়, আর্কিমিডিস্ শুধুমাত্র কতকগুলি আয়নার সাহায্যে জাহাজগুলির উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। চারিদিকে তাঁহার যন্ত্র-কৌশলের এমন খ্যাতি ছড়াইয়া গিয়াছিল যে, আক্রমণকারী রোমানরা যদি নগরীর প্রাচীরের কাছে কোন সামান্য দড়িও দেখিতে পাইত, তাহা হইলেও তাহাদের ভয়ের আর সীমা থাকিত না। না জানি আর্কিমিডিস্ আবার কি নূতন ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন!

আর্কিমিডিস্ একদিকে যেমন অনেক রকম যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তেমনি অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার দান অতুলনীয়। জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে তাঁহার দান অসামান্য।

আর্কিমিডিস্ এত জিনিষ ত আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত জিনিষের উপর তাঁহার একটা মর্ম্মান্তিক ঘৃণার ভাব ছিল। তাঁহার ঘৃণা এতদূর তীব্র ছিল যে, অধিকাংশ আবিষ্কারের কাহিনীই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি বিতৃষ্ণাবশতঃই যে তিনি নিজের আবিষ্কৃত যুদ্ধোপকরণগুলির কথা লিখিয়া যান নাই তাহা নহে; যতদূর মনে হয়, যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তাঁহার লেশমাত্র বিরুদ্ধভাব ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, এই সব আবিষ্কার তাঁহার মনীষার পক্ষে অতিশয় তুচ্ছ। তিনি যে তাঁহার আবিষ্কারের কাহিনী লিখিয়া যান নাই, ইহাই বোধ হয় তাহার একমাত্র কারণ।

অথচ মানুষ হিসাবে তিনি কত না সরল ও নিরহঙ্কার ছিলেন! কোন সামান্য জিনিষ আবিষ্কার করিয়াও তিনি শিশুর মতই আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন।

আর্কিমিডিস্ বুদ্ধি এবং যন্ত্রকৌশলে রোমান সেনাপতি মার্সেলাস্‌কে পুরা তিন বৎসর ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য খৃঃ পূঃ ২১২ অব্দে সিরাকিউসের পতন হয়।

দলে দলে রোমান সৈন্য নগর অধিকার করিয়া ফেলিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা মার্সেলাসের নিকট আসিয়া নতজানু হইয়া রাজপ্রসাদ ভিক্ষা লইয়া গেল। কিন্তু শত কাজের মধ্যেও মার্সেলাস্ কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই যে, এখনও একজন আসিতে বাকী আছেন—তিনি আর কেহ নন, বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্।

যে বৈজ্ঞানিক অসাধারণ প্রতিভাবলে তাঁহার মত দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতিতে এতকাল ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য, তাঁহার আর আগ্রহের সীমা রহিল না। তিনি অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কখন সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাঁহার দুয়ারে উপস্থিত হন।

প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন কাটিল, কিন্তু কেহই আসিল না। তখন তিনি সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, 'কেহ কি আর্কিমিডিস্‌কে খুঁজিয়া আমার সম্মুখে আনিতে পারে না?'

মুখে মুখে তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইয়া গেল, 'এখনই আর্কিমিডিস্‌কে চাই। সেনাপতি তাঁহাকে তলব করিয়াছেন।'

দিকে দিকে লোক ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক তখন নিজ বাড়ীতে গণিতের সমস্যাসমাধানে তন্ময়। তিনি তখন পর্য্যন্ত জানিতেও পারেন নাই যে, সিরাকিউসের পতন ঘটিয়াছে, রোমানেরা নগর অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে!

তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। গোধূলির ম্লান আলোকে ঘরের দুয়ারে বসিয়া আর্কিমিডিস্ গণিতের প্রশ্নসমাধানে ব্যস্ত। এমন সময় একজন সৈনিক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'তুমিই আর্কিমিডিস্? সেনাপতি তোমাকে লইয়া যাইবার হুকুম দিয়াছেন।'

বৈজ্ঞানিক চিন্তা করিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। এবার সেই সৈনিক বেশ উচ্চৈঃস্বরেই তাহার আদেশের মর্ম্ম পুনরায় জানাইল। আর্কিমিডিস্ কি শুনিলেন তিনিই জানেন। তিনি শুধু বলিলেন, 'আঃ! এখন গোলমাল করিও না।' সৈনিকের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তরবারির উপরে হাতের মুঠি আরও কঠিন হইয়া উঠিল। এক পা অগ্রসর হইয়া সে এবার আর্কিমিডিসের হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে বলিল, 'তোমাকে এখনই যাইতে হইবে। সেনাপতির হুকুম!' এতক্ষণে বোধ হয় বৈজ্ঞানিকের একটু হুঁস্ হইল। তিনি দৃঢ়ভাবে সৈনিকের হাতখানি ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন। তারপর মৃদু অথচ কঠিনকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখিতেছ না আমি কত ব্যস্ত? তুমি এখান থেকে যাও। এখানে গোলমাল করিও না!'—তাঁহার কথা আর শেষ হইতে পাইল না।

সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোকেও সৈনিকের হাতের তরবারি ঝলসিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আর্কিমিডিসের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল।

মার্সেলাস্ যখন দেখিলেন তাঁহার একান্ত শুভ ইচ্ছাকে এইরূপ মর্ম্মান্তিক পরিহাসে পরিণত করা হইয়াছে, তখন আর তাঁহার ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা রহিল না। সেই সৈনিকটি যখন নতমস্তকে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইলেন। পরে তিনি মহাসমারোহে আর্কিমিডিসের দেহ সমাধিস্থ করেন। বৈজ্ঞানিকের আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া আনিয়া রাজসম্মানে ভূষিত করিলেন।

তারপর কত শতাব্দী চলিয়া গেল। আর্কিসিডিসের লুপ্তপ্রায় সমাধির উপর হয়ত কাঁটালতা ঘিরিয়া উঠিয়াছে। হয়ত কখনও কখনও দক্ষিণ সাগরের বাতাসে আজও সেখানে দু'একটি বনফুল ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বিশ্বের মানুষের মনে চিরকাল জাগিয়া থাকিবে। মানুষ তাঁহাকে ভুলিবে না।

পাড়াগাঁয়ের মাটি

শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-টি, বিদ্যাবিনোদ

পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা মেটে ঘরে থাকে,
মাটিতেই খেলা করে, মাটি গায়ে মাখে।
মাটির মতন সহে সব অত্যাচার,
প্রাণ খুলে কথা কয় না করি' বিচার।
মাটির বসনে হয় দেহের ভূষণ,
মাটির ফসলে চলে ক্ষুধার নাশন।
মোটা চাল, মোটা ডাল—তাও যে জুটে না,
শত শত অভাবেও আনন্দ টুটে না।

সভ্যতার বাহুখানি পল্লীতে বিস্তারি'
আনিয়াছে মহাতাপ সব শান্তি কাড়ি।
পল্লীর মাটির বুকে যেই ফল ফলে,
নগরের কৃত্রিমতা তারে শুধু দলে।

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

—আট—

আশ্রম

পথ চল্‌তে চল্‌তে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এ পাহাড়ের উপর তুমি কেমন ক'রে এসে পড়্‌লে, তা জান্‌তে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে আমার। সে কথা বল্‌তে তোমার কিছু আপত্তি নেই বোধ হয়। কিন্তু এখন তুমি পরিশ্রান্ত। আশ্রমে চল আগে; জিরিয়ে-টিরিয়ে কিছু খেয়ে দেয়ে নাও। তারপর জানা যাবে সব কথা।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"আপনার যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন। আপনার পরিচয় পেতেও আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে সন্ন্যাসীজি।"

তিনি হেসে বল্‌লেন,—"তা' হবারই কথা। কিন্তু ওই যে সন্ন্যাসী বল্‌লে, আমি কিন্তু তা নই। আমার পরিচয় খুব ছোট ক'রে দেওয়া যেতে পারে। বাঙ্‌লা দেশেরই কোনো একটা গ্রামে ছিল আমার বাড়ি। সংসারের অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা ব'য়ে গেছে আমার উপর দিয়ে। আত্মীয়-পরিজন বল্‌তে ছিল না বিশেষ কেউ। যা'ও-বা দু'চারজন ছিল, এমনি ভাগ্য আমার, সব ম'রে গেল। চাকরি কর্‌তাম। ছেড়ে দিলাম তা'। দিনকতক এজায়গা-ওজায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি। শেষ পর্য্যন্ত কেমন ক'রে যে এই দুর্গম পাহাড়ে এসে আস্তানা গেড়েছি, সে অনেক কথা।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"তা হ'লেই তো আপনি সন্ন্যাসী। গৃহত্যাগ ক'রে এসেছেন যখন—"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"শূন্য গৃহ বাধ্য হয়েই ত্যাগ করেছি। আমি ফলমূলও খাইনে, তপস্যাও করিনে। একটু জায়গা এখানে আবাদ ক'রে নিয়েছি, তা'তে ধান তরকারি সব চাষ করি। খাই-দাই—দিন কাটাই।...এই যে,—এই আমার আস্তানা।"

রঞ্জিত দেখল, সাম্‌নেই একটা পুরান লোহার দরজা। সেই দরজা গাঁথা রয়েছে ডাইনে বাঁয়ে অনেক দূর চ'লে যাওয়া উঁচু এক পাথরের প্রাচীরের গায়ে।

লোহার দরজা খুলে সন্ন্যাসী ভিতরে প্রবেশ করলেন। রঞ্জিতও পিছু-পিছু গেল। তারপর তিনি দরজা আবার বন্ধ ক'রে লোহার খিলান এঁটে দিলেন।

প্রাচীর অনেক বড়। তার মাঝেকার আশ্রমটা জাঁকালো কিছু নয়; কিন্তু ভারি সুন্দর—ছবির মতো সুন্দর। চারদিকে ফুলের বাগান, মাঝখানে পরিষ্কার, ঝরঝরে ছোট একখানি আঙিনার দু'পাশে দুখানা কুটীর। তার একখানা বেশ বড়, আরেকখানা ছোট। নিশ্চয়ই বড়খানা থাকার আর ছোটখানা রান্না করার। কোণে চারদিক-ঘেরা একখানা দোচালা। দেখ্‌লেই বুঝা যায়, তাতে গরু থাকে।

বেড়া থেকে পেড়ে সন্ন্যাসী একখানা আসন পেতে দিলেন। রঞ্জিত বস্‌ল।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"একটু জিরিয়ে স্নান ক'রে কিছু খাও আগে।"

তার জন্য আর বিশেষ তাড়া কি? দুর্গম পাহাড়ের নির্জ্জন দেশে একজন বাঙালীর বসবাস! কৌতূহলেই রঞ্জিতের পেট গিয়েছে ভ'রে। সে জিজ্ঞেস করল,—"আচ্ছা, এ ঘর কি আপনার নিজের হাতে তৈরি?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"না। এ পাহাড়ে কতকগুলো বুনো লোক থাকে। তা'রাই তৈরি ক'রে দিয়েছে ঘরগুলো। বড় ভালবাসে তা'রা আমায়।"

বুনো লোক! রঞ্জিতের আত্মারাম দুরু-দুরু ক'রে উঠ্‌ল। ভয়ে-ভয়ে সে বল্‌ল,—"ওরাই তো কাল আমাদের ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। ওরাই তো পুড়িয়ে মেরেছে আমার সঙ্গেকার সাহেবকে।"

সন্ন্যাসীকে একটুও বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। বল্‌লেন,—"ওরা বোধ হয় নয়। তা হ'লে আমি টের পেতাম। না হ'লেও সাহেবকে যারা মেরেছে, তা'রা এদেরি জাতভাই। নিশ্চয়ই তাদের কিছু ক্ষতি করেছিলে তোমরা। কি করেছিলে, বলো তো? এখানে তুমি এসে পড়লে কেমন ক'রে? তোমাদের সভ্য জগতের কোনো মানুষ তো এখানে আস্‌তে পারে ব'লে আমার ধারণা ছিল না।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"আপনি তো আস্‌তে পেরেছেন।"

সন্ন্যাসী হেসে উঠ্‌লেন,—"আমি আস্‌তে পারবো কি? আমি এসেছি। ইচ্ছে ক'রে এসেছি।"

রঞ্জিত জিজ্ঞাসা করল,—"সভ্য জগৎ থেকে এ জায়গাটা এমনই বা কি দূরে? আমার জামাইবাবুর বাসা থেকে তো স্পষ্টই দেখ্‌তে পাওয়া যায় এই শর্‌দাই পাহাড়।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"শর্‌দাই বল্‌তে শুধু ছোটখাট একটা পাহাড়কে বোঝায় না। এর ওপাশে যে পাহাড় আছে, তাই তোমরা দেখ্‌তে পাও ওদিক থেকে। সে পাহাড় থেকে এখানে আস্‌তে হ'লে মাঝখানে একটা উপত্যকা পেরোতে হয়। তা' সে পাহাড়েরও উপরভাগে অনেক অসভ্য লোকের বসতি।"

সাহেবের সাথে ঘুরতে ঘুরতে রঞ্জিত কোনদিকে কতখানি এসে পড়েছিল, সে খেয়াল তো

নেই। হয়তো এসে পড়েছিল সেই পাহাড়ের পেছনদিকে—দুই পাহাড়ের মাঝের উপত্যকার কাছাকাছি।

একটু চুপ ক'রে থেকে রঞ্জিত বল্‌ল,—"কিন্তু কারো ক্ষতি তো কিছু করিনি আমরা। আমরা এসেছিলাম শিকার করতে। একটা ভাঙ্গা মন্দিরের ভেতর ঢুকে সাহেব শুধু একটা বাঘ মেরেছিলেন।"

সন্ন্যাসী যেন কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেন। জান্‌তে চাইলেন,—"চিতেবাঘ না বড়বাঘ?"

—"বড়বাঘ—মস্ত বড়।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"ওই তো। ব্যাপার বোঝা গেছে। এসব অঞ্চলে বড়বাঘ বিশেষ নেই। কচিৎ কখনো এক-আধটা এসে পড়লে অদ্ভুত উপায়ে বুনোরা তা'কে পোষ মানিয়ে তোলে। জাতবাঘকে ওরা পূজো করে, ওদের না-কি দেবতা। সেই বাঘ তোমরা মেরেছ; তা'রা তোমাদের অমনি ছেড়ে দেবে কেন? ওদের সব চেয়ে জাঁদরেল শাস্তি হোল জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা। এমনিতে মানুষ কখনও ওরা মারেও না, খায়ও না।"

রঞ্জিত থ বনে' ব'সে রইল। মুখ দিয়ে কথা সর্‌ল না।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"জাতবাঘের যত্ন কতো এদের মাঝে! একদল লোক আছে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে থাকে; অন্য পশু শিকার ক'রে এনে বাঘকে খাওয়ায়। ফুল দিয়ে পূজো করে বাঘের। বাঘ নিজের খুশীমতো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়, লোকগুলো ঘুরে মরে সাথে-সাথে।"

অবাক হওয়ার কারণ কি আছে? শ্বেতহাতীকেও তো ভারতবর্ষের অনেক লোকে ভক্তি করে, রঞ্জিত জানে। অথচ শ্বেতহস্তী একটা বিরাটকায় জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। আর গরুও তো অনেকের ভক্তির দেওয়া খইল-খড় পেয়ে থাকে। অবশ্য স্বার্থ আছে গরুর দুধ; বলদের খাটুনি। কিন্তু হাতী আর বাঘ একেবারে স্রেফ দেবতা!

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আমার এখানে এসে প'ড়েছ যখন, কোনো ভয় নেই তোমার। আচ্ছা তোমার পরিচয়টা—"

রঞ্জিত তা'র নাম ব'লে বল্‌ল,—"আমারো সংসারে আপন বল্‌তে আছে শুধু বন্ধু-পরিবার।"

—"বাড়ি কোথায় তোমাদের?"

—"বাড়ি বীজগাঁয়ে।"

বীজগাঁয়ে! সন্ন্যাসী যেন বিস্মিত হলেন। আগ্রহে জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—"কোন্ জেলায়?"

রঞ্জিত জেলার নাম বল্‌ল।

সন্ন্যাসীর যেন উৎসাহ বেড়ে গেল।—"ওখানে থানা আছে আর একটা হাইস্কুল?"

—"আছে।"—রঞ্জিত বল্‌ল,—"আমার বাবা ছিলেন সেই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার।"

সন্ন্যাসীর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল,—"তোমার বাবার নাম ?"

রঞ্জিত তা'র বাবার নাম বল্‌ল। সন্ন্যাসী অধীর হ'য়ে উঠ্‌লেন তা' শুনে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন,—"তোমার ঠাকুর্দ্দার নাম জানো ?"

জানে না আবার ? রঞ্জিত তা'র ঠাকুর্দ্দার নাম বল্‌ল। সন্ন্যাসী বুঝি এখনি দু'হাত তুলে নেচে উঠ্‌বেন !—"তিনি—তোমার ঠাকুর্দ্দা কি বীজগাঁ থানার দারোগা ছিলেন ?"

—"হ্যাঁ, ছিলেন তো !" সন্ন্যাসীর হাবভাব দেখে রঞ্জিতের ভয় হোল। তা'র পরিচয় পেয়ে অপরিচিত এ দূর-জন কেন এত অধীর হয়ে উঠ্‌ছেন ! এঁর কাছে সব পরিচয় দিয়ে সে খারাপ কিছু কর্‌বে না-তো ? সে জিজ্ঞেস কর্‌লে,—"আপনি কি তাঁদের চেনেন ?"

—"দাঁড়াও-দাঁড়াও ; আর একটা কথা।"—সন্ন্যাসী যেন কিসের ব্যাকুলতায় নিজকে আর সাম্‌লে রাখ্‌তে পারছিলেন না ; বল্‌লেন,—"আচ্ছা, তাঁদের—মানে তোমার ঠাকুর্দ্দার আর বাবার মৃত্যু হয়েছে কেমন ক'রে ?"

রঞ্জিত বল্‌লে,—"তাঁদের দুজনকেই কা'রা গোপনে খুন করেছিল। অনেক খোঁজ ক'রেও আসামী পাওয়া যায়নি।"

সন্ন্যাসী রঞ্জিতের মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলেন। অতীতের দুঃখের স্মৃতিতে তা'র মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, বিস্ময়ে সে হতভম্ব হয়ে গেছে।

তিনি বল্‌লেন,—"তুমি অবাক হয়ে গেছ, না ? আশ্চর্য্যের কি আছে ? আমি তাঁদের কথা জানি ; একি সম্ভব হ'তে পারে না ? অনেকদিন পরে জানা লোকের কথা শুনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছি আর কি।"

সন্ন্যাসী ঘরের ভিতর গেলেন। কয়েক মিনিট পরে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর অবস্থা শান্ত, স্বাভাবিক। বল্‌লেন,—"কথাবার্ত্তা পরে হবে। আগে স্নান ক'রে এসো।"

তাঁর হাতে নূতন একখানা খদ্দর কাপড় আর গামছা। রঞ্জিত বল্‌ল,—"এখানে এ খদ্দর কোথায় পেলেন আপনি ?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এখানে তুলার চাষও করি। পাহাড়ে তুলা জন্মায় বেশ। চরকা দিয়ে সুতো কাটি আর তাঁত দিয়ে কাপড় বুনে নিই।"

সন্ন্যাসী ওকে নিয়ে চল্‌লেন স্নান করার জন্ম। কিন্তু কোথায় নাইবে ?

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"ঝরণা-পুকুরে।"

ঝরণা তো ঝরণা, পুকুর হচ্ছে পুকুর। ঝরণা-পুকুর ব্যাপারটা কী আবার ?—রঞ্জিত ভাব্‌ল।

সেই লোহার ফটক পার হয়ে পাঁচিলের বাইরে এসে রঞ্জিত বল্‌ল,—"আপনাকে বাঘে খায় না ?"

—"আমার নাগাল পাবে কি ক'রে ?"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এই পাথরের পাঁচিল ডিঙিয়ে আমার আশ্রমে ঢোকার সাধ্যি বাঘের বাবারও নেই। সব সময় দরজা রাখি বন্ধ ক'রে।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"কিন্তু বাইরে যখন বেরোন—এই যেমন নাইতে, পূজো কর্‌তে, সে সময় যদি বাঘের সাম্‌নে পড়েন ?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আমার চেহারাটা দেখে তোমার মনে হয় যে বাঘ আমার ঘাড়ে পড়্‌ল, আর আমি কিচ্ছুটি না ব'লে তার খাবার হয়ে গেলাম ?"

চেহারার গুমোর করার অধিকার আছে সন্ন্যাসীর। কলিযুগে যেন ভীমের আবির্ভাব হয়েছে আবার পৃথিবীতে। শক্তিও যদি চেহারার অনুপাতে থাকে, তবে সন্ন্যাসীকে আক্রমণ কর্‌তে হ'লে বাঘের ব্যাটা একটু ভেবে চিন্তেই কর্‌বে সে কাজ।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"ভদ্রলোকের ছিপ্‌ছিপে লতানে শরীর নিয়ে বনে থাকা চলে না রঞ্জিত। বাঘের ভয়ের কথা বল্‌ছ; তুমি তো পাড়াগাঁয়েরই ছেলে, সহুরে নও। সাপের ভয়ে কি তাই ব'লে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছ ?...... এই যে—এই আমাদের ঝরণা-পুকুর।"

ঝরণা-পুকুর, রঞ্জিত দেখ্‌ল কী সুন্দর! ঝরঝর ক'রে উপর থেকে জল ঝর্‌ছে রাশিরাশি। ঝরণা চ'লে গেছে ঘুরে ওপাশে; আর তারই একটা শাখা বিশাল এক পাথরের খাঁজ বেয়ে এদিকে এসে বেশ ছোট-খাট একটা পুকুর গ'ড়ে তুলেছে। পুকুর ভর্‌তি ক'রে বাকি জল আবার পথ ক'রে অন্য দিকে চ'লে যাচ্ছে।

—"সাঁতার জানো তো ?"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"জল কিন্তু অনেক।"

সাঁতার জানে না রঞ্জিত, তবে জানে কে ? সে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল পুকুরে।

আঃ, কী আরাম! কী ঠাণ্ডা জল! এমন জল থাক্‌লে বুঝি সাহস ক'রে আগুনেও ঝাঁপ খাওয়া যায়। স্নানে এত স্নিগ্ধ তৃপ্তি রঞ্জিত তার জীবনে আর কখনো পায়নি।

স্নান ক'রে আশ্রমে এসে সে দেখ্‌ল, খাবার তৈরী। রঞ্জিত বিস্মিত হয়ে বল্‌ল,—"আপনি তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। এসব রান্না কর্‌লে কে ?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"রান্না করেছে আমার বন্ধু। মহাবীর তা'র নাম।"

কথাটি না ব'লে রঞ্জিত আসনে ব'সে পড়্‌ল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বল্‌ল,—"আপনি ?—"

"আমার পরে হবে।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"তুমি আরম্ভ করো।"

অনুমতির দরকার ছিল না। যা আগুন জল্‌ছিল উদরে! প্রথমবারের দেওয়া ভাত তো সে দেখ্‌-না দেখ্‌ দিল সাবাড় ক'রে।

দ্বিতীয়বার ভাত নিয়ে সন্ন্যাসীর বন্ধু এল। বাপ্‌! কী বিরাট কলেবর! মহাবীরই বটে! ভীমসেনের দাদা! নামের সাথে চেহারার অমন মিল কমই দেখা যায়।

পেট বোঝাই ক'রে রঞ্জিত উঠ্‌ল।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এবার ঐ ঘরে ঘুমাওগে।" —রঞ্জিত শুয়ে পড়্‌ল। ক্লান্ত দেহ তা'র ভাতের নেশা পেয়ে ঢুল্‌ছিল যেন। চোখের পাতা জুড়ে ঘুম নেমে এল অবিলম্বে। (ক্রমশঃ)

সৈনিক পশুপক্ষী

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্‌-এ

অতি প্রাচীনকাল হতে যুদ্ধে নানাপ্রকার পশুর ব্যবহার হচ্ছে। কিছুদিন আগেও ঘোড়া ছাড়া যুদ্ধের কথা বোধ হয় মানুষের কল্পনাতে আস্‌ত না। অশ্বারোহী সৈনিকেরই সম্মান ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে খুব বেশী; রণে পটু এবং শিক্ষিত এই সকল অশ্ব যে কতবার বিপদ থেকে তাদের প্রভুর প্রাণরক্ষা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। রাজপুতবীর মহারাণা প্রতাপসিংহের প্রিয় অশ্ব চৈতকের গল্প তোমরা কে না জান? অশ্ব সকল দেশে প্রায় সকল সময়েই যুদ্ধের এক অত্যাবশ্যক বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধে হস্তীর ব্যবহার, অন্ততঃ ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে চ'লে আসছে। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় রাজারা বহুসংখ্যক হস্তী ব্যবহার করেছিলেন। অনেকে বলেন, যুদ্ধে হস্তী ব্যবহারই হচ্ছে বহিঃশত্রুর নিকট ভারতীয় সৈন্যের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের কারণ। কেননা হাতীরা তাদের বিশাল শরীর নিয়ে দরকারমত দ্রুতবেগে এদিক ওদিক

ঘুরতে পারে না। তা ছাড়া, যুদ্ধের হট্টগোলের ভিতর তা'রা নাকি ভয় পেয়ে যায়। প্রাচীন ভারতে কেবলমাত্র উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারীরাই হাতীর পিঠে চ'ড়ে যুদ্ধ করতে আসতেন—যথা, রাজা নিজে, রাজকুমারেরা এবং সেনাপতিগণ। অপেক্ষাকৃত নিম্নতম কর্ম্মচারীরা সাধারণতঃ যুদ্ধ করত ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে। এদের নীচে পদাতিক সৈন্য ত ছিলই।

ক্রমশঃ যুদ্ধে হাতীর ব্যবহার লোপ পেল এবং ঘোড়ার ব্যবহারও অনেক কমে এল। যান্ত্রিক যুদ্ধে—ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন এবং সাঁজোয়া গাড়ির সামনে এদের আবশ্যকতা হয়ে এল অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মানুষ যেই তা'র ক্রম-বিকাশমান বুদ্ধিকে দিকে দিকে নিয়োজিত করতে লাগল, অমনি সে বুঝল যে পৃথিবীতে অনাবশ্যক ব'লে কিছু নেই। যে হাতী এ যুগে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ব'লে পরিত্যক্ত হয়েছিল, আমরা দেখতে পাই, জাপানীরা তাকে মালবাহকের কাজে লাগিয়ে আশাতীত ফল লাভ করেছে। থাইল্যাণ্ড এবং বর্ম্মার অনেকাংশ পর্ব্বত এবং গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এসকল স্থানে গমনাগমনের কোন পথ নেই; সুতরাং মোটর-লরী এখানে সম্পূর্ণ অচল। অন্য যানবাহনের পক্ষেও এসকল স্থান একপ্রকার অযোগ্য বললেই হয়। জাপানীরা দেখল যে, একমাত্র হাতীই এই সকল ঘনজঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতময় প্রদেশ দিয়ে দ্রুতবেগে অনায়াসে প্রচুর মালপত্র নিয়ে চলাফেরা করতে পারে; সুতরাং মালবাহকরূপে হাতী ব্যবহার ক'রে তা'রা আশাতীত ফল পেয়েছে। রুশিয়াতে সিবাস্তপোল যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে, বরফ গলে যাওয়াতে রাস্তায় এরকম কাদা হয়েছে যে মোটর-লরী চালান সেখানে অসম্ভব; অমনি জার্ম্মান এবং রুশ উভয়পক্ষই ঘোড়ার গাড়ি ক'রে মাল চালান দিতে আরম্ভ করল। এসব ঘোড়াকে এমন শিক্ষা দেওয়া হল যেন তা'রা গোলাগুলিকে পরোয়া না ক'রে প্রাণপণে ছুটে যথাস্থানে মাল পৌঁছে দেয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে আরও দুটি প্রাণীর বহুল ব্যবহার হচ্ছে; এদের একটি পায়রা এবং অন্যটি কুকুর। পত্রবাহক হিসাবে যুদ্ধে পায়রার ব্যবহার অবশ্য

বহুদিন থেকে হয়ে আসছে। একখণ্ড পাতলা কাগজে খবর লিখে, পায়রার পায়ের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে দেওয়া হয়। শিক্ষিত পায়রা শত্রুর গোলাগুলি এড়িয়ে খবর যথাস্থানে পৌঁছে দেয়। এ ছাড়া, আজকাল পায়রার পায়ে একপ্রকার অতিক্ষুদ্র ক্যামেরা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এ ক্যামেরাতে এমন ব্যবস্থা করা আছে যে, যে সব জায়গার উপর দিয়ে পায়রা উড়ে যায়, সে সকল জায়গার ছবি আপনা আপনি উঠে যায়।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে কুকুরের ব্যবহার এত রকমে হচ্ছে যে, সে সব কথা তোমাদের অনেকেরই হয়ত জানা নেই। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে কুকুরের ব্যবহার সম্বন্ধে এক ইস্তাহার বের করেছেন; এথেকে আমরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, এল্‌সেস্যান্‌, ব্লাড্‌হাউণ্ড এবং সেণ্ট বার্ণার্ড জাতীয় কুকুর বহুকাল ধ'রে যুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। এরা এদের স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং অনুসন্ধিৎসার জোরে, অল্পকালের মধ্যেই সহজে কাজ শিখে নেয়। কিন্তু মুশ্‌কিল হচ্ছে আরামপ্রিয় 'পেট্‌' কুকুরগুলোকে নিয়ে। এরা চট্‌ ক'রে কাজ বুঝতে পারে না, এবং বুঝতে পারলেও আরামপ্রিয় ব'লে অনেক সময় বিপদের সম্মুখীন হতে চায় না। কিন্তু যুক্তরাজ্যের সৈন্যবিভাগ যেরকম ক'রেই হোক এদের যুদ্ধের কাজে পণ্ডিত ক'রে ছেড়ে দেবেন ব'লে প্রকাশ করেছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে কুকুরের কাজ কি কি জেনে রাখ;—প্রথমতঃ সান্ত্রীর কাজ, দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের বহন ক'রে নিয়ে আসবার জন্য ষ্ট্রেচার-বাহকের কর্ম্ম, তৃতীয়তঃ শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন আসছে কি না তা ধরবার কাজ (aeroplane detectors), চতুর্থতঃ যুদ্ধক্ষেত্রের আভ্যন্তরীণ দেশে মাল সরবরাহের কাজ, এবং পঞ্চমতঃ যুদ্ধের 'ফ্রণ্টে' অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ-বাহকের কাজ।

যুক্তরাজ্যে এসব কাজের জন্য কুকুরগুলোকে কি রকম ক'রে বেছে নেওয়া হয় তা শোন। প্রথমে দেখা হয়, তাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্ম্মক্ষম এবং স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না; তারপর দেখা হয়, এরা শত্রুর

গতিবিধির দিকে নজর রাখতে সক্ষম কি না; এও দেখা হয় যে তা'রা হৈ-চৈ এবং গোলাগুলির শব্দে ভয় পায় কিনা। আর দুটি নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কুকুর অন্ততঃ আঠার ইঞ্চি লম্বা হবে এবং তা'র বয়স হবে এক থেকে পাঁচ বৎসরের মধ্যে। উপরিউক্ত তিন বিষয়ে প্রত্যেক কুকুরকে পরীক্ষা করা হয়; এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হলে যুক্তরাজ্যের কুকুর-বাহিনীতে 'প্রাইভেট' হিসাবে তাদের ভর্ত্তি ক'রে নেওয়া হয়। এ বাহিনীটির ইংরাজি নাম হচ্ছে—The United States Dog Expeditionary Force। কিছুদিন প্রাথমিক শিক্ষা দেবার পর এদের ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে পাঠান হয়। সেখানে সত্যিকারের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে এরা নিজেদের কাজে পটু হয়ে ওঠে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, সান্ত্রীর কাজে এরা হয়ে ওঠে সবচেয়ে দক্ষ। শিক্ষিত কুকুর ১৫০ গজ দূর থেকে শত্রুর গন্ধ পায়। তা'র শব্দ শোনবার শক্তি এমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে, যন্ত্রের আগেই সে বুঝতে পারে এরোপ্লেন আসছে কি না। এসব কুকুরকে প্রত্যেক দিন দুঘণ্টা ক'রে কাজ শেখান হয়ে থাকে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার আগে প্রত্যেক কুকুরের কানের উপর নম্বর ছেপে দেওয়া হয়। এই নম্বর থেকেই বুঝে নেওয়া হয়, কুকুরটির মালিক কে, সে কি কাজ করছে, সে বাঁচল কি মরল ইত্যাদি। এই কুকুর-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা কত, আন্দাজ কর ত? ১২,০০০,০০০ কুকুর এ বাহিনীতে সৈন্যের কাজ করছে। দেখছ তো যুক্তরাজ্যের কুকুরেরা সেখানকার মানুষদের চেয়ে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য কম চেষ্টা করছে না।

মুখটা আমার দেখ্‌বো

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

মনের মতো গান গাহি শোন্ পট্‌লা ।
মিথ্যা হোথায় করিস্‌ না আর জট্‌লা ॥
তুম্‌-তা-না-না দ্রিম্‌-দা-না-না নায় না ।
মুখটা আমার দেখ্‌বো, আনিস্‌ আয়না ॥

গাব-ডালে কে গাইছে গভীর রাত্রে ?
পেঁচক বুঝি ?   আগুন জ্বলে গাত্রে ॥
আন্‌তে পারিস্‌ ঘর থেকে তোর গুল্‌তি ?
গানের পেটে টিপ্‌ ক'রে আজ শূল দি ।

পাঁদাড়ের ওই বাঁ-ধার থেকে নিত্য
কল্লা কারা কর্‌ছে ?   জ্বলে পিত্ত ।
ঘরেতে তোর নেই কি কোনো সড়্‌কী ?
হায় রে কানের পরদাটা নেই তোর কি ?

মিথ্যা হোথায় করিস্‌ না আর জট্‌লা ।
গান পেতে চাস্‌ এখানে আয় পট্‌লা ॥
তুম্‌-তা-না-না দ্রিম্‌-দা-না-না নায় না ।
মুখটা আমার দেখ্‌বো, আনিস্‌ আয়না ॥

বাংলার বস্ত্রশিল্প

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

শুধু ভারতে নয়, সারা জগতেই আমাদের এই বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে সুদূর অতীত থেকে আজ অবধি অপরাজেয় এবং অদ্বিতীয়। পশ্চিমের আওতায় অসংখ্য কলের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এই শিল্প বেঁচে আছে এবং যান্ত্রিক সভ্যতার সহস্র আঘাতে আহত হয়েও বেঁচে থাকবে।

আমাদের দেশে উৎপন্ন কার্পাসের সুতোয় হাতে বোনা কাপড় দেশের সমস্ত চাহিদা মিটিয়ে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের নানা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে আসত—এ যেন রূপকথা ব'লে মনে হয় আজ।

ঢাকার জগদ্বিখ্যাত মস্‌লিনের কথা কে না শুনেছে? স্থানীয় তাঁতীদের তৈরি এই বস্ত্র অমরত্ব লাভ করেছে ইতিহাসের পাতায়। ভারতের রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদে এর সমাদরের সীমা ছিল না। ভারতের সীমা পার হয়ে আফগানিস্থান, ইরান, আরব, তুরস্ক পেছনে রেখে ইউরোপের ভেনিস্ থেকে প্যারিস্ অবধি সমস্ত বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রে বাংলার এই মস্‌লিন যখন হাজির হ'ত, তখন তার সমাদর করতেন রাজা-মহারাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা।

মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও উষ্ণীষ বা পাগড়ীর জন্য বাংলাদেশের এই বস্ত্রের চাহিদা এত বেশী ছিল যে, তুরস্ক, আরব, এল্‌জিরিয়া, টিউনিশ্, প্যারিস্ ও আমেরিকায় আমাদের দেশের প্রায় ১৫০ জন মহাজন এখান থেকে এই কাপড় রপ্তানি ক'রে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করতেন। কখনও তাঁরা ডাকযোগে নিজেরাই কাপড় পাঠাতেন, কখনও বা কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের বড় বড় সম্ভ্রান্ত সওদাগরী আফিসের মারফতে পাঠাতেন।

এই পাগড়ীকে বলা হয় কশিদা পাগড়ী; কারণ যে অতি সূক্ষ্ম কাপড় দিয়ে এই পাগড়ী তৈরি হয়, সেই কাপড়কে বলা হয় কশিদা কাপড়। এ কাপড়ও প্রায় মস্‌লিনের মত।

তুরস্কে এর বহুল প্রচলন ছিল, কিন্তু সেখানে ফার্ ক্যাপের (Fur Cap) ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে কশিদা পাগড়ীর চাহিদা গেল একেবারে কমে; আর বাগ্‌দাদে এই শিল্প-শিক্ষার প্রসার হওয়ায় আরবদেশের লোকেরাই এখন এই পাগড়ী তৈরি করছে, সুতরাং সেখানকার চাহিদাও আর রইল না। আবার ফ্রান্সে এক আইন ক'রে সব বিলাস-দ্রব্যের আমদানি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। বাংলার কশিদা কাপড় ও চিকণের জিনিষও ঢুকে গেল ফরাসী সরকারের বিলাস-দ্রব্যের তালিকার মধ্যে। এমনি ক'রে বাংলার এই জগদ্বিখ্যাত শিল্প হয়ে পড়েছে মুমূর্ষু।

শুধু যে কার্পাস-বস্ত্রেই বাংলাদেশ বিদেশের ও কলের প্রতিযোগিতায় অনেকটা কাবু হয়ে গেছে তা নয়, রেশমী কাপড়েও মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল জাপান, ফ্রান্স ও আমেরিকার নকল রেশমের প্রতিযোগিতায়; কিন্তু বাঙালীর জাতীয়তা-বোধ ও বাংলায় উৎপন্ন রেশম ও রেশমী দ্রব্যের উৎকর্ষ এই শিল্পকে আবার জীবিত ও সবল ক'রে তুলেছে। রেশমী বস্ত্র বয়নেও বাংলাদেশকে হঠাতে পারে এমন দেশ খুব কমই আছে। মুর্শিদাবাদের রেশমী কাপড়ের মত মসৃণ, সুন্দর ও টেঁকসই কাপড় ফ্রান্স, আমেরিকা বা জাপান—কোথাও হয় না।

রেশমী সুতো ও কাপড় বাংলাদেশের মাত্র অল্প কয়েকটি জেলায় তৈরি হয় বটে, কিন্তু কার্পাস তুলোর কাপড় তৈরি হয় না সারা বাংলায় এমন জেলা একটিও নেই, এবার তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

আমাদের দেশে এক সময়ে ঘরে ঘরে চলত চরকা। বাড়ীতে বাড়ীতে তখন জন্মাত কার্পাস গাছ। চরকা এবং টেকোয় কাটা একপ্রকার বিশেষ কার্পাস সুতোয়ই তৈরি হ'ত জগদ্বিখ্যাত মস্‌লিন। সে সুতো যে কত মিহি তার ধারণা করাই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শক্ত। আমরা আজকাল যে খুব মিহি শাড়ী দেখতে পাই, তাতে সাধারণতঃ ১০০ থেকে ১৫০ নম্বরের সুতো ব্যবহার করা হয়; আর ২০০ নম্বরের সুতোয় বোনা শাড়ী তৈরি হয় অত্যন্ত কম। বর্ত্তমানে ঢাকায় যে প্রায় মস্‌লিনের মত কাপড় বোনা হয়, যাকে আধুনিক মস্‌লিন বলা চলে, তাতে ৩০০ থেকে ৪০০ নম্বরের সুতো ব্যবহার করা হয়। এই সুতো কলের তৈরি; কিন্তু পূর্ব্বেকার মস্‌লিনের সুতো ৫০০ থেকে ৭০০ নম্বর অবধি তৈরি হ'ত—এই বাংলারই কুটীরে কুটীরে,—এই মাটিতে উৎপন্ন তুলোয়। আজ কার্য্যত এই মস্‌লিন শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে।

শুধু ঢাকার নয়, সারা বাংলারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুটীর শিল্প ছিল এই বস্ত্রশিল্প। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে যারা পুরুষানুক্রমে জাতি হিসাবে বয়নকার্য্যকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তা'রা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—তাঁতী, যোগী ও জোলা। তাঁতী এবং যোগীরা হিন্দু, আর জোলারা মুসলমান। এই তিনটি শ্রেণী এখনও বাংলার সকল জেলায় এবং যে কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে পিতৃপুরুষের এই ব্যবসায়টিকে বাঁচিয়ে রেখেছে অতিকষ্টে।

আজকাল তো আর হাতে সুতো কাটা হয় না; তাঁতী, যোগী, জোলারা কিনে আনে কলের সুতো। বাড়ীর স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা সুতো ভিজিয়ে, মাড় দিয়ে শুকিয়ে নলি পাকায়; আর পুরুষেরা মাকুতে নলি বসিয়ে কাপড় বোনে।

এরা সাধারণতঃ খুব গরীব, তাই নগদ টাকায় বেশী সুতো ও তাঁতের সাজ-সরঞ্জাম প্রায়ই কিনতে পারে না। মহাজন ও বেপারিরা পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে এদের দারিদ্র্যের। মহাজনরা সুতো কিনে দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নেয় এবং কিছু কিছু দেয় মজুরী হিসাবে। এমনি ক'রে মহাজন বা বেপারিরাই বেশ দু'পয়সা ক'রে নেয়, আর তাঁতী দিন কাটায় নিদারুণ অভাব নিয়েই।

বস্ত্রশিল্পের কথা মনে এলেই মস্‌লিনের কথাটাই ভেসে ওঠে মনের কোণে, তাই যেখানে এই জগদ্বিখ্যাত বস্ত্র তৈরি হ'ত সেই ঢাকার কথাই সুরু করেছি আগে। যারা মস্‌লিন তৈরি করত সেই তাঁতীরা ছিল শুধু ঢাকা সহরেই। এখনও ঢাকার নবাবপুর অঞ্চলে তিন-চারটি তেমনি তাঁতী পরিবার আছে "মহত্বের কঙ্কালের" মত।

বর্ত্তমানে যে বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে নানা রকমের নতুন নতুন ডিজাইন্ কাপড় বোনাবার সঙ্গে সঙ্গেই বোনা হয়ে যায় অপূর্ব্ব নৈপুণ্য ও কারুকার্য্যের সঙ্গে। এর সোনা ও রূপোর জড়ীর পাড়ের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। কারিকরেরা এই কাপড় বোনে এখনও সেই হাতেঠেলা মাকুতে পুরোণো নিয়মেই। এই মহাযুদ্ধের ঢের আগেকার দাম শুনলেই খুব সহজে বুঝতে পারবে যে, উৎকৃষ্ট রেশমী বেনারসী শাড়ীও লজ্জা পায় এর পাশে এসে বসতে। পাঁচ বছর আগে একখানি শাড়ীর দাম ছিল ৫০৲ থেকে ১২৫৲ টাকা। আলাদার জামদানি নামেও যে অপূর্ব্ব শাড়ী ঢাকায় তৈরি হয়, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শাড়ীর মেজেটায় ফুল বোনা থাকে। কাপড়টা বোনাবার সময়েই এই ফুল বোনা হয়ে যায়; আর পাড়ের তো কথাই নেই, সোনালি ও রূপোলি সুতোয় সৃষ্টি হয় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খেলা। জামদানি শাড়ী ঢাকা সহরের বাইরে ঢাকা জেলার দেম্‌ড়া, সিদ্ধিগঞ্জ, কাচপুর, ধামড়াই, নপাড়া প্রভৃতি গ্রামে তৈরি হয়।

ঢাকাই শাড়ী নামে কথিত সাধারণ শাড়ী প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় ঢাকা সহরের বহু অঞ্চলে এবং ঢাকা জেলার আবদুল্লাপুর, ধামড়াই ও বালিয়াটি প্রভৃতি গ্রামে। পাঁচ ছ' বছর পূর্ব্বেও এরূপ একখানি শাড়ীর দাম ছিল ৫৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা। ঢাকাই ধুতিও খুব বিখ্যাত। এখনও এই শিল্পকে এই জেলায় বাঁচিয়ে রেখেছে সদর এলাকায় ২০০০, মাণিকগঞ্জ মহকুমায় ১২০০ এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় প্রায় ১৩,০০০ তাঁতী।

ঢাকার পর বস্ত্রবয়নের খ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে টাঙ্গাইলের সব চেয়ে বেশী। আজকাল টাঙ্গাইলের শাড়ী পশ্চিমবঙ্গের বহু সহরেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সুতরাং টাঙ্গাইলের শাড়ীর নাম শোনেনি এমন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ খুব কম। জনপ্রিয়তার জন্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে গেছে খুব বেশী।

এক সময় ছিল যখন এখানকার তৈরি বস্ত্র "আব্-ই-রোয়ান্" জগদ্বিখ্যাত হয়েছিল মস্‌লিনের মতই। যে সকল কারণে মস্‌লিন কার্য্যতঃ লোপ পেয়েছে, ঠিক সেই সকল কারণেই লোপ পেয়েছে এই আব্-ই-রোয়ান্, শুধু আছে তার অমরগৌরবময় স্মৃতিটুকু।

টাঙ্গাইলের এলাকায় বাজিতপুরের তাঁতীরা সাধারণতঃ ১২০ নম্বরের কম সুতো ব্যবহার করে না; অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের সহিত তা'রা কাপড় তৈরি করে ২৫০ থেকে ৩০০ নম্বরের সুতো দিয়ে। ময়মনসিংহ জেলার বহু জায়গাই বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে বাজিতপুর।

ফরিদপুরের গোয়ালন্দ মহকুমায় কোট ও শার্টের ছিটের অতি উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি হয়, আর তৈরি হয় ডুরে ও চেক কাপড় এবং খুব উৎকৃষ্ট বিছানার চাদর। দেওরার তাঁতীরা উৎকৃষ্ট শাড়ী তৈরি ক'রে স্থানীয় বাজারে বিক্রী করে। দেওরার শাড়ী এ অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়।

বরিশাল জেলায় খুব ভাল শাড়ী ও ধুতি বোনা হয় বহু জায়গায়ই; তার মধ্যে উজিরপুর, বানরীপাড়া ও সিদ্ধকাঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাধবপাশার তাঁতীরা সাদা, রঙীন ও ডুরে মশারীর কাপড় বোনায় বিশেষজ্ঞ। এদের তৈরি মশারীর কাপড় অত্যন্ত টেকসই ও সুন্দর।

তাঁতের সংখ্যা এবং তুলো উৎপাদনের পরিমাণের দিক দিয়ে কিন্তু সব জেলার ওপরে স্থান পায় চট্টগ্রাম। প্রায় ১০ বছর পূর্ব্বে আধুনিক উন্নত ধরণের তাঁত চলত ৬,০০০ এক চাটগাঁয়ে এবং প্রাচীন ধরণের শুধু বাঁশের তৈরি তাঁত চলত ১৪,০০০ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে।

এই কলের যুগেও শুধু একটি জেলাতেই অন্যূন ২০,০০০ তাঁত চলা কি সহজ ব্যাপার? পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে যত তাঁত চলে তার প্রায় সবই তৈরি হয় শুধু বাঁশ দিয়ে। এই তাঁত তৈরি করতে তাঁতীকে ছুতোর ডাকতে হয় না, তাঁতীরা নিজেরাই দিব্যি তৈরি ক'রে নেয় খুব কম খরচে। সাধারণতঃ ওখানকারই উৎপন্ন তুলো দিয়ে স্থানীয় লোকেরাই যে সুতো কাটে সেই সুতো দিয়েই তাঁতীরা কাপড় বোনে। তা'রা নিজেরাই প্রয়োজনমত এবং নিজেদেরই প্রচলিত প্রণালীমত সুতোয় রং ক'রে নেয়।

বিন্নি কাপড় হচ্ছে চট্টগ্রাম জেলার বিশিষ্ট কাপড়। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলায় খুব তুলো জন্মায়। চট্টগ্রামে বাদামী রংয়ের তুলোও জন্মায়, সুতরাং এই তুলোয় যে সুতো হবে তার রং আপনা-আপনিই হবে বাদামী। এই স্বাভাবিক বাদামী রংয়ের সুতো দিয়ে যে কাপড় তৈরি হয়, তাকে বলা হয় বিন্নি কাপড়। এ কাপড়ের চাহিদাও খুব বেশী।

কুমিল্লা জেলায় বহু জায়গায়ই কাপড় তৈরি হয় প্রচুর। খুব উৎকৃষ্ট শাড়ী ও ধুতিও যথেষ্ট তৈরি হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার এলাকায় সরাইল ও কালিকচ্ছ গ্রামে এত উৎকৃষ্ট ধুতি ও চাদর তৈরি হয় যে, সস্তার সময়েও তার দাম জোড়া পিছু ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা। ময়নামতীর ছিট ও চেক কাপড় খুব প্রসিদ্ধ। ময়নামতীর তাঁতীরা টুইলের কাপড়ও বুনতে পারে। শুধু এখানেই প্রায় ৩০০ তাঁতী পরিবার নানারকমের বস্ত্র বয়ন ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে। তাঁতীপাড়া গ্রামের প্রায় ৪০ ঘর তাঁতী এত মিহি ও সুন্দর শাড়ী ও ধুতি তৈরি করে যে, ব্যবসাদারেরা এইগুলো কিনে নানান জায়গায় "ঢাকাই শাড়ী" ব'লে বিক্রয় করে। তাঁতীপাড়া তথা কুমিল্লার পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

সম্প্রতি ফেণী বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে খদ্দর তৈরিতে। এখানকার তৈরি খদ্দর কলিকাতায় রপ্তানি হয় প্রচুর পরিমাণে।

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

গুপ্ত-ঘাতকের সন্ধান

"গুড়ুম !"

সুরেশ চমকিয়া উঠিল। নির্জ্জন দ্বীপে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হওয়ায় দুই-চারিটি পাখী কলরব করিয়া উঠিল, বন্য হাঁসগুলি পাঁক-পাঁক করিয়া শূন্যে উড়িল বটে, কিন্তু কোনদিকে মানুষের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

হাত তিনেক দূরে একটা মাটির ঢিপিতে গুলীটা বিঁধিয়া গেল। এই দ্বিতীয়বার অজ্ঞাত আততায়ী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িল। তাহার চক্ষু রাগে উজ্জ্বল হইল, চীৎকার করিয়া "ব্যাটা শয়তান কোথাকার" বলিয়াই একটা প্রবালের ঢিপির আড়ালে লাফাইয়া পড়িল। সেই স্থান হইতে অলক্ষ্যে আততায়ী কোথায় আছে সন্ধান করিতে থাকিল। বহু চেষ্টা করিয়া কাহাকেও দেখা গেল না, এমন কি কোথা হইতে গুলী ছুঁড়িল একটু ধোঁয়াও দেখা গেল না।

দ্বীপের পূর্ব্বদিকের সবটাই তাহার নজরে আসিল, দেখিল তরঙ্গায়িত তীরভূমির ওপারে বিরাট মহিমাময় বঙ্গোপসাগর ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া তটভূমিতে আঘাত করিতেছে।

আবার মনে হইল হয়ত পশ্চিমের সেই উঁচু প্রবালের স্তূপটির দিক হইতেই গুলী আসিয়াছে। বন্দুকটির নিশ্চয়ই খুব বড় পাল্লা, নতুবা অত দূর হইতে নিশানা করে!

আবার মুখ হইতে অজ্ঞাতে বাহির হইল—"ব্যাটা শয়তান!"

সুরেশের ধারণা হইল দ্বীপে একটি নয়, আরও দুইটি লোক আছে। অস্ত্রশস্ত্রে যে ব্যক্তি সুসজ্জিত হইয়া এখানে বাস করিতেছে, সে নিশ্চয়ই একাকী থাকে না। আর সেই অস্ত্রধারী তাহার ন্যায় অসহায় নয়, অসহায় হইলে একজন সঙ্গী পাইয়াও হত্যা করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার সহিত ভাব করিত। কিন্তু এ ব্যক্তি খুন করিতে চায় কেন?

বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া খুনেটা কোথায় আছে তাহা দেখিবার জন্য মাথা হইতে পাগড়ীর মত বাঁধা জামাকাপড় লাঠিটায় জড়াইয়া লইয়া একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, যেন দূর হইতে কেহ দেখিলে মনে করিতে পারে যে সে মাথা তুলিয়া আততায়ীর সন্ধান করিতেছে। বিশেষ বিলম্ব করিতে হইল না, পশ্চিম দিক হইতে একটি গুলী আসিয়া লাঠিটিকে ফেলিয়া দিল। আবার গুলীর আওয়াজে নির্জ্জন দ্বীপ প্রতিধ্বনিত হইল।"

লাঠিটা উঠাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল গুলীটা লাঠির মাথা চিরিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। যদি সত্য সত্যই পাগড়ীটা তাহার মাথায় থাকিত, তবে মাথাটা এতক্ষণে চূর্ণ হইয়া যাইত।

সুরেশ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। এ দ্বীপে তাহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়, হয়তো দ্বীপের ওদিকটায় কোনও গুপ্তরহস্য আছে। রহস্যটা কি! হয়তো বা এ দ্বীপে মুক্তা পাওয়া যায়, ওদিকটাতেই সেই মুক্তা; ওরা চায় না যে অপর কেহ সেই গুপ্তরহস্যের সন্ধান পায়। অথবা কোনও খুনে বদমাইস আইনের কঠোর বিধান এড়াইবার জন্য এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও থাকিতে পারে। যাহাই হউক, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সকলেরই বুঝা উচিত যে—সে অসহায়, নিরাশ্রয়, বিপন্ন; তবুও তাহার প্রতি এত আক্রোশ কেন!

সুরেশ চুপচাপ বসিয়া রহিল, দেখিবে ব্যাপার কতদূর গড়ায়।

সকালবেলায় যখন প্রথম গুলী হয়, তাহার পর হইতে এপর্য্যন্ত সে কোনও লোককে দেখে নাই বা কাহারও সাড়াশব্দ শুনিতে পায় নাই। হয়তো বা তাহার পর হইতে এপর্য্যন্ত লোকটি কোনও গুপ্ত গহ্বরে সারাদিন ঘুমাইয়া থাকিয়া এখন আবার সন্ধানে আসিয়াছে। যাহাই হউক, সে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবে, সহজে হার মানিবে না।

'ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্' হঠাৎ শব্দটা কানে আসিল। মনে হইল নৌকায় বৈঠা চালানোর শব্দ, হ্রদের দিক হইতে আসিতেছে।

আততায়ী হয়তো তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। বাঁশের লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিয়া সুরেশ প্রবালস্তূপের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া অতি সাবধানে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

দেখিতে পাইল একটি লোক ছোট একটি ডোঙ্গা বাহিয়া আসিতেছে। বুঝিল, বন্দুকধারী নিজে এখনও তাহার দিকে তাক করিয়া বসিয়া আছে, সে শিকারের কোন ভাঁজ পাইলেই আবার গুলী করিবে। এ লোকটাকে পাঠাইয়াছে দেখিতে যে সে সত্যই মরিয়াছে কিনা।

মনে ভরসা হইল, ডোঙ্গার লোকটার হাতে বন্দুক নাই, আছে মাত্র একখানা ভোজালী, আর সে লোকও খুবই ভীত হইয়া এদিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

সুরেশের হাসি পাইল, লোকটার সঙ্গে আছে রাইফেল অথচ আড়াল হইতে বাহির হইবার সাহস নাই। তাহার বন্দুক নাই জানিয়াও ভয়! এই কাপুরুষ আসিয়াছে তাহার সহিত লড়াই করিতে!

লোকটা ডোঙ্গা হইতে নামিল, অতি সাবধানে পা ফেলিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অত্যন্ত ভয়ে এদিক ওদিক তাকাইয়া অগ্রসর হইতেছে। হ্রদের জল হইতে সুরেশ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে, এইটুকু আসিতে লোকটার বেশ অনেকটা সময় লাগিল।

চটপট মাথায় আবার পাগড়ীটা জড়াইল এবং লোকটা পৌছিবার পূর্ব্বেই লাঠিটা হাতের পাশে রাখিয়া শুইয়া পড়িল। অর্দ্ধমুদিত চক্ষে দেখিতে পাইল ওদিককার ঢিপিটায় একটা

ছায়া পড়িল। বুঝিল লোকটা এইবার এ ঢিপিটার উপরে আসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কতক্ষণ ছায়াটা নড়িল না, তারপর একটু নড়িয়া দাঁড়াইল, তারপর অদৃশ্য হইল।

সুরেশ চুপ হইয়া শুইয়া রহিল। লোকটা ওপাশের প্রবালস্তূপটার পাশ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল; তাহাকে পা দিয়া একটা নাড়া দিয়া দেখিয়া ভোজালীটা মুঠায় ধরিয়া নিচু হইতে লাগিল। তাহাকে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে, সে কর্ত্তব্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত।

হঠাৎ লোকটা যেন আকাশ হইতে পড়িল! সুরেশ হাতের লাঠীগাছটা দিয়া তাহার পেটে প্রচণ্ড এক আঘাত করিল। সে পড়িয়া গেল, হাতের ভোজালীটা দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

মার খাইয়া মাটিতে পড়িবামাত্র সুরেশ এক লম্ফে যাইয়া তাহার উপর চড়িয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাহার নাকে এক ঘুসী মারিয়া বলিল—"ব্যাটা! টুঁ শব্দটি করবি তো একদম শেষ ক'রে দোবো। আমায় ঐ ভোজালী দিয়ে খুন করতে এসেছিলি, এখন যদি তোকে সাবাড় ক'রে দিই?"

লোকটা বেশ জোয়ান, কিন্তু পূর্ব্বেই সে খুব ভয় পাইয়াছিল, এখন অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া একেবারে নিজের জীবন বিপন্ন মনে করিল। সুরেশ গলা চাপিয়া ধরায় গোঁ-গোঁ করিতেছিল।

সুরেশ তখন হাত বাড়াইয়া ভোজালীটা কুড়াইয়া লইল এবং তাহা লোকটার গলায় ধরিয়া রাখিয়া টুঁটি ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"বল্ তুই কে!"

সে তখন ধীরে ধীরে সুরেশকে জানাইল যে তাহার নাম বিশুয়া। দ্বীপে একজন মাদ্রাজী থাকে, সে সুরেশকে গুলী করিয়া মারিয়াছে বলিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছে। মাদ্রাজীর নাম পাণ্ডুরং।

সুরেশ ও বিশুয়া যখন কথা কহিতেছিল, সেই সময় আবার আর একটি গুলী আসিয়া পাশের প্রবালস্তূপে লাগিয়া ঝুর-ঝুর করিয়া কতকটা মাটি তাহাদের গায়ে ছিটিয়া পড়িল। বুঝিল যে পাণ্ডুরং তাহার ভৃত্যকে অদৃশ্য থাকিতে দেখিয়া সন্দিহান হইয়া গুলী করিয়া তাহাকে শীঘ্র ফিরিতে ইঙ্গিত করিতেছে।

সুরেশ জানিত যে, যতক্ষণ আড়ালে আছে ততক্ষণ ও গুলীতে তাহার ভয় করিবার কোনও কিছু নাই। বন্দুকধারী হ্রদের ওপার হইতে এপারে না আসিলে কিছুই করিতে পারিবে না। ওদিকে সূর্য্যও অস্ত যাইতেছে, অন্ধকার হইলে তাহাকে গুলী করিয়া মারা তত সহজ হইবে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে বন্দীকে কি করিয়া জব্দ রাখা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিল। বন্দী যদিও চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছিল যে যদি একবার সুবিধা পায়, তবে ছুটিয়া পালাইবে।

সুরেশ বলিল—"এই বিশুয়া, মাটির দিকে মুখ দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাক্, নইলে কিন্তু এই ভোজালী দিয়ে গলা কেটে ফেলব।"

বিশুয়া কোন কথা না কহিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিল। সুরেশ তাহার দুই হাত পীঠের দিকে আনিয়া তাহারই পরণের কাপড় দিয়া হাত পা দুইটী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া একটি নারিকেলের ডেগো কুড়াইয়া লইয়া ভোজালীর সাহায্যে বেশ ভাল করিয়া চিরিল। সেই চেরা টুকরাগুলি বিশুয়ার গায়ে বেশ শক্ত করিয়া জড়াইয়া বাঁধিল।

ওদিকে পাণ্ডুরং দমাদ্দম গুলী চালাইয়া যাইতেছিল, তাহার যেন আর বিশুয়ার বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না।

সুরেশ তখন বিশুয়াকে বলিল—"আমি তোকে যে সব কথা জিজ্ঞেস করবো তার যদি ঠিক ঠিক জবাব না দিস্, তবে এই ভোজালী তোর বুকে বসিয়ে দোবো, বুঝেছিস্?"

—"মুই সব তোরে বোলবো, তুই যা' পুছিবি বাবু।"

—"এ যায়গায় মোট ক'জন লোক আছে বল্‌তো।"

—"মোরা দুই গোটা লোক ছিলো, মুই বিশুয়া আউর উ পাণ্ডুরং।"

—"যদি আর কোন লোক দেখতে পাই তবে তোর মাথা কেটে ফেলবো কিন্তু, বুঝলি?"

—"আউর মানুষ না মিলবে রে বাবু, মুই ঠিক বলছি। মুই তো তোর হেথাকে পড়ে আছি, উ পাণ্ডুরংটা একেলা এখন গুটী-গুটী ঘরকে ফিরবেক।"

—"তোরা এখানে থাকিস কোথা?"

—"হই উপাসে ঘর আছে। উখানে রাতে থাকি, দিনে ঘুরিয়ে ফিরি। জাহাজ আসলে, মোর ছুটী হবে।"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল—"জাহাজ! কোন্ জাহাজ?"

—"উই দরিয়া পার হয়ে জাহাজ আসে। ঢের মাল লিয়ে আসে, হেথা রাখে, ফির নিয়ে যায়।"

—"কি মাল আনে?"

—"কোপরা নিয়ে আসে, ঝিনুক নিয়ে আসে, চা নিয়ে আসে, তামাম দুনিয়ার জিনিষ আনে।"

—"সত্যি কথা বলছিস্ তো?"

—"মুই জানের ডর করছে, ঝুট্ কেনে বোলবে?"

ওদিকে কিছুক্ষণ পর পর রাইফেলের গুলী আসিয়া প্রবালস্তূপের মধ্যে বিঁধিয়া যাইতেছে। সুরেশ আর সেদিকে দৃকপাত না করিয়া বলিল—"জাহাজটার নাম কি?"

—"উ জাহাজের নাম সুন্দরম্।"

সুরেশ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"সুন্দরম্!"

—"হাঁ সুন্দরম্। মুই ঝুটা বলবো না। তুই দেখিস্ বাবু, যব্‌খন আসবে।"

সুরেশ বুঝিল যে এই দ্বীপেই বোম্বেটেদের গুদাম। তাহারা লুঠের মাল এখানে আনিয়া রাখে এবং সুযোগমত পরে অন্যত্র বিক্রয় করে। এই লুঠের মাল এখানে গুপ্ত থাকাতেই পাণ্ডুরং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব। (ক্রমশঃ)

অলকবাবু

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

খয়রাডাঙার ময়রা বউয়ের পায়রা প্রথম পেয়ে
অলকবাবুর আনন্দ খুব ঝর্‌লো দু'চোখ বেয়ে।
সয় না সবুর, খাঁচার ভিতর পুর্‌লো পাখীর দেহ,
পাইকপাড়ার পদ্মলোচন বল্‌লে—'খোকন! কেহ
তোমার মতন নয়কো পাগল, বল্‌বে কি সব লোকে,
কমলাপুলির আন্‌বো টিঁয়ে দাওনা উড়িয়ে ওকে।

বকম-বকম বক্‌বে কেবল বাড়ীর ভিতর রয়ে,
পায়রা খাঁচায় দেখেই সবাই হাস্‌বে উতল হয়ে।'
এই কথাতে মাথার টনক নড়্‌লো রাগের চোটে,
ধর্‌লো লগুড় অলকবাবু,—পদ্মলোচন ছোটে ;
কাঁকুড়ক্ষেতের পাশ দিয়ে যায় পান্তিহাটের কাছে,
শেওড়াগাছের ডালের তলায় লুকিয়ে তখন বাঁচে।
লগুড় নিয়েই হাঁপিয়ে যখন ফির্‌লো অলক শেষে,
পায়রা তাহার খাঁচার ভিতর দেখ্‌লো না আর এসে।
রেগেই গরম চেঁচায় ভীষণ, পাড়ার পচন বলে,—
'খয়রাভাঙার পায়রা তোমার হয়তো গেছে চলে।'
অলকরতন ছুট্‌লো যেমন খয়রাভাঙার দিকে,
দুষ্টু পচন খাঁচা খুলেই রাখ্‌লো পাখীটিকে।
সন্ধ্যাবেলায় হতাশ প্রাণে ঢুক্‌লো ঘরের মাঝে,
দেখ্‌লো তাহার পায়রা খাঁচায় সুস্থ সবল আছে।
বল্‌লো না কেউ লুকিয়েছিল দুষ্টু পচন-খাঁদু,
বল্‌লো অলক—'পায়রা আমার জানে অনেক যাদু—'
খাঁদুর কাছেই পদ্মলোচন শুন্‌লো দু'জন মিলে
মজার কাণ্ড ঘটিয়েছে এই—হেসে ফাটায় পিলে।

আমেরিকার আদিকবি

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের একটি উজ্জ্বল প্রভাত। ডাঃ পিটার ব্রায়াণ্ট ডাকের চিঠিগুলি দেখে নিচ্ছেন চটপট। হাতে তাঁর অনেক কাজ। একখানি চিঠি তিনি পরপর দুইবার পড়ে ফেললেন। চোখে মুখে লাগল আনন্দের ছাপ। চিঠিখানি লিখেছেন তাঁর জনৈক বন্ধু—North American Magazine নামক একখানি সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক।

চিঠিখানি হাতে নিয়েই ডাঃ ব্রায়াণ্ট ছেলের পড়বার ঘরে ঢুকলেন। ছেলের নাম উইলিয়াম কালেন ব্রায়াণ্ট। সে বিদেশে গেছে আইন পড়তে। হন্তদন্ত হয়ে ডাঃ ব্রায়াণ্ট ছেলের বাক্স খুঁজতে লাগলেন। হাতড়াতে হাতড়াতে পেলেন একটি কবিতা—উপরে কাঁচা হাতে লেখা Thanatopsis. কবিতাটি একবার পড়ে বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। ছুটলেন প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ীতে, তাকে চেঁচিয়ে ডেকে বললেনঃ ওহে দেখ, কী চমৎকার কবিতা লিখেছে আমাদের কালেন।

বুড়ো বাপ তখনি বসে কবিতাটি একখানি ভাল কাগজে টুকে নিলেন এবং ছেলেকে না জানিয়েই পাঠিয়ে দিলেন North American Magazine-এর সম্পাদক বন্ধুর নামে। কালেনের একটি কবিতা চেয়েই তিনি চিঠি লিখেছিলেন।

যথাসময়ে Thanatopsis ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করল। কালেন ব্রায়াণ্টের কবিখ্যাতি হল সুপ্রতিষ্ঠিত। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাহিত্যের ইতিহাসে হল নতুন সূর্য্যোদয়। কারণ এর আগে কোন মার্কিন কবির লেখা কবিতা প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী কবিতার আসনে বসবার মর্য্যাদা লাভ করে নাই। Thanatopsis-এর কবিই 'first real poet of America' নামে খ্যাত।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার একটি শান্ত নির্জ্জন গ্রামে ব্রায়াণ্টের জন্ম হয়। বাবা ডাক্তার হলেও কাব্য-রসিক। ছেলের কাব্যচর্চ্চায় বাধা দেওয়া দূরে থাক, তিনি তাঁর মস্ত পৃষ্ঠপোষক। বালক ব্রায়াণ্ট মনের সুখে কুপার ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়ে আর শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখে। বাপের চেষ্টাতে অল্প বয়সেই তাঁর কবিতা ছাপাও হতে লাগল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রায়াণ্ট নিউইয়র্কে এসে Evening Post-এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করলেন। সম্পাদক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেলেন। তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা, আত্মসংযম ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা সর্ব্বত্রই তাঁকে বিজয়ীর বরমাল্য এনে দিল। তবু কবিখ্যাতিই ব্রায়াণ্টের সবচেয়ে বড় পরিচয়। নানা কাজের ফাঁকেও তিনি অবসর পেলেই বাণীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেন। তাঁর লেখা The Death of the Flower, The Crowded Street, Oh, the Mother of a Mighty Race মানবপ্রীতি ও দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ। অবশ্য সমালোচকদের মতে অমিত্রাক্ষর ছন্দেই তিনি দক্ষ শিল্পী। তাই তাঁর Thanatopsis অতুলনীয়। শব্দটি কিন্তু গ্রীক। এর অর্থ মৃত্যু-প্রশস্তি। আদর্শবাদী কবি বলেছেনঃ মৃত্যুর ডাক যেদিন আসবে তোমার দ্বারে, সেদিন যেন সে রহস্য-লোক তোমার কাছে অন্ধকার নরকের বিভীষিকা নিয়ে না আসে; সে আহ্বানে সাড়া দিও প্রসন্ন হাসিতে, সুখস্বপ্ন ভোরে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার আদি কবি সেই রহস্য-লোকের পথে যাত্রা করেছেন যার ধ্যানে প্রথম ফুটেছিল তাঁর বাণী-কমল।

কো-আই

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

অনেক দিন আগের কথা। তখন চীনদেশে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ছিল ইউং-লো। সে সময়ে পৃথিবীর কোথাও নাকি অমন পরাক্রমশালী রাজা আর ছিল না।

তখন চীনের রাজধানী ছিল নানকিং শহরে। পুরণো ধরণের শহর বলে নানকিংকে ইউং-লো একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর ইচ্ছা হলো অন্য কোথাও রাজধানী উঠিয়ে নিয়ে সেই শহরটিকে তাঁর নিজের রুচিমত সুন্দর করে সাজিয়ে তুল্‌বেন।

চীনের সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে দেখে তিনি পিকিং নগরীকেই রাজধানীর সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত শহর বলে পছন্দ করলেন। পিকিং সহরের পুরণো বাড়ীঘর সব ভেঙ্গে ফেলা হলো। আর সেই জায়গায় গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো বিরাট বিরাট গগন-চুম্বী সব প্রাসাদ। নগরীর শোভা বাড়াবার জন্য যা কিছু দরকার, তার কোন কিছুই তিনি তৈরী কর্‌তে বাকী রাখলেন না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শহর হয়ে উঠ্‌ল ইন্দ্রের অমরাবতীর মত।

পিকিং নগরীর শোভা বাড়াবার জন্য রাজা ইউং-লো যে সমস্ত অট্টালিকা ও স্তম্ভ ইত্যাদি তৈরী করিয়েছিলেন, তার মধ্যে নির্ম্মাণ-কৌশলে ও গঠন-সৌন্দর্য্যে যেটী সর্ব্বপ্রথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তো সেটী ছিল একটী "ঘণ্টা-স্তম্ভ" বা "ঘড়িঘর"। অজস্র অর্থ তিনি এই "ঘড়িঘর" তৈরীতে ব্যয় করেছিলেন।

"ঘড়িঘরে"র সুউচ্চ স্তম্ভটী তৈরী শেষ হওয়ার পর রাজা স্থির করলেন, তিনি এই ঘড়িঘরের জন্য কাঁসার বিরাট এক ঘণ্টা তৈরী করাবেন। ঘণ্টাটী এমনি বড় হবে, যার জুড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। আর এটা বাজানো মাত্রই পিকিং নগরীর শেষ প্রান্ত থেকেও এর শব্দ বেশ্‌ পরিষ্কারভাবে শোনা যাবে।

রাজরাজড়ার খেয়াল—যেই ভাবা সেই কাজ। ঘণ্টা তৈরীর জন্য রাজ্যের সব সেরা সেরা কারিগরদের আহ্বান করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করে দেওয়া হলো, রাজার মনের মতন করে যে ঘণ্টাটী তৈরী করতে পারবে, এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তা'কে পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের লোভে রাজ্যের প্রায় সব জায়গা থেকেই খ্যাত-অখ্যাত বহু শিল্পী রাজদরবারে এসে হাজির হলো। প্রত্যেকটী শিল্পীর গুণের কথা—ঘণ্টা তৈরীতে তাদের অভিজ্ঞতার কথা রাজা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লেন। শুনে, এই কাজের জন্য যাঁকে তিনি মনোনীত করলেন—নাম তার কুয়ান-উ—ঘণ্টা তৈরীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। চীনের বহু বড় বড় শহরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টা সে এর আগে ঘড়িঘরের জন্য তৈরী করে খ্যাতিলাভ করেছে।

কুয়ান-উর তখন বয়স হয়েছে—প্রায় বুড়ো বল্‌লেই চলে। এই কাজে নিযুক্ত হয়ে সে মনে মনে ভাবৃলে—'আর ক'দিনই বা বাঁচবো। এই বুড়ো বয়সে এই দায়িত্ব হাতে নিয়ে

যদি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারি, তবে পৃথিবীতে একটা কীর্ত্তি রেখে যাওয়া যাবে। আমি আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়োগ করে এমন আশ্চর্য্য একটা ঘণ্টা এই ঘড়িঘরের জন্য তৈরী করে দেবো, যা দেখে পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।'

এই বিরাট ব্যাপারের উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করতেই প্রায় ছ' মাস গেলো কেটে। মুটেদের মাথায় ঝাকায় ঝাকায় এলো হাজার হাজার মন কাঁসা; আর কাঁসা গলাবার জন্য যে আগুন দরকার হবে তার জন্য এলো জ্বালানী কাঠ—গরুর গাড়ীতে—তারও ওজন হবে কয়েক লক্ষ মণ। যে পাত্রে কাঁসা গলানো হবে তা-ও বেশ্ পুরু লোহার পাত দিয়ে তৈরী করা হলো। সে-ও এক মস্ত ব্যাপার! তারপর তৈরী হলো চুলো। চুলো না বলে একটা ছোটখাটো পুকুর বললেও হয়। ঘণ্টা ঢালবার জন্য ছাঁচও তৈরী হলো।

শুভদিনে শুভক্ষণে চুলোয় আগুন দেওয়া হলো। সাতদিন সাতরাত্রি চুলো জ্বল্লো যেন রাবণের চিতা। লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ পুড়ে ভস্ম হলো। তারপর কাঁসা গলানো ঠিক হলো। এর পরে পাত্রের মুখ খুলে দিয়ে, গলানো কাঁসা ছাঁচে ঢালা সুরু হলো। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! কাঁসা ছাঁচে ঢালা সুরু করতেই ছাঁচ ফেটে একেবারে চৌচির! বৃদ্ধ শিল্পী "হায়! হায়!" করে উঠ্‌ল। তার সমস্ত পরিশ্রম—সকল পরিকল্পনা—সবই ত ব্যর্থ হয়ে গেলো। আর রাজা?—রাজা ত চটেই লাল। অর্থের এই বিরাট অপব্যয় দেখে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি শিল্পীকে সম্বোধন করে ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লেন—"এমন কাণ্ড হবে জান্‌লে আমি কক্ষণো তোমায় একাজের জন্য নিযুক্ত করতাম না। তুমি অকারণে আমার অর্থ ও ততোধিক মূল্যবান সময় নষ্ট করলে। আর কোন শিল্পীকে নিযুক্ত করলে সে হয়ত অতি সুষ্ঠুভাবেই এ কাজ সম্পন্ন করতে পারতো।" রাজার এই অনুযোগ শুনে শিল্পীও মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হলো। আরও বহু ঘণ্টা ত সে তৈরী করেছে, কিন্তু এমন ঘটনা ত কোথাও ঘটেনি। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে রাজা পুনরায় তাকে বল্‌লেন—"যাক্, আরও একবার আমি তোমায় সুযোগ দেবো। এবারে কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করা চাই কিন্তু।"

আবার নূতন উৎসাহে শিল্পী কর্ম্মে রত হলো। এবারে কিন্তু সকল রকম সতর্কতাই শিল্পী অবলম্বন করেছিল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সকল সতর্কতাকে ব্যর্থ করে এবারে ছাঁচ ফাট্‌লো না বটে—এবারে আর এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘট্‌লো। ঘণ্টা ছাঁচ থেকে খুলে ফেল্‌বার পর দেখা গেল—ঘণ্টার যায়গায় যায়গায় মস্ত মস্ত সব ফাটল।

আবার এত পরিশ্রম ও এত অর্থ নষ্ট হলো বলে রাজা ত রেগে আগুন! আর শিল্পী?—সে ত ভয়েই অস্থির! তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠ্‌লো। সে অপরাধীর মত নতমস্তকে রাজার কাছে এসে দাঁড়ালো। রাজা তাকে বল্‌লেন—"যাক্, যা হবার হয়ে গিয়েছে। তুমি দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তোমায় আমি আবারও সুযোগ দেব। লোকে কথায়

বলে 'বারবার তিনবার'। এইবারই তোমার শেষ সুযোগ। কিন্তু মনে রেখো এবারে যদি তুমি অকৃতকার্য্য হও—তা হ'লে তোমার শাস্তি হবে—মৃত্যুদণ্ড।"

শিল্পীর কন্যা—কো-আই। শিল্পী গৃহে ফিরে আস্‌তেই তা'র মলিন বিমর্ষ মুখের দিকে তাকিয়ে কো-আই উৎকন্ঠিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলে—"বাবা, এবারও কি তা হ'লে তুমি কৃতকার্য্য......"

কন্যার কথা শেষ হতে পেলো না। শিল্পী বাধা দিয়ে বল্‌লে—"হাঁ, মা তুমি ঠিকই ধরেছ। এবারেও আমি কৃতকার্য্য হতে পারিনি।" তারপর ধীরে ধীরে সেদিনের সমস্ত ঘটনা সে বলে গেল। রাজার শেষ কথাটি—'প্রাণদণ্ড' তা-ও বল্‌তে ভুল্‌লে না। শুনে কন্যা শিউরে উঠ্‌লো।

শিল্পীর একমাত্র সন্তান কো-আই। তাকে অতি ছোট রেখে তা'র মা মারা যান। শিল্পীই বুকের রক্ত দিয়ে ছোট থেকে ওকে মানুষ করেছে। কো-আইয়ের বয়স খুব বেশী নয়—কিন্তু বয়সের অনুপাতে বুদ্ধি তা'র খুবই বেশী।

কো-আই তা'র পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"বাবা, কিছু চিন্তা করো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে। এবারে তোমার কাজ নিশ্চয়ই নিখুঁত হবে। তোমার মত কুশলী শিল্পী এরাজ্যে আর কে আছে!"

কো-আই মুখে পিতাকে সান্ত্বনা দিল বটে, কিন্তু মনে মনে সে পিতার চেয়েও বেশী চিন্তিত হলো। কারণ পিতা ছাড়া সংসারে তা'র আপনার বল্‌তে যে কেউ-ই নেই।

নগরের উপকণ্ঠে পর্ব্বত-গুহায় থাক্‌তেন এক বাক্‌সিদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি যাকে যা বলেন—যে আশীর্ব্বাদ করেন তা-ই সফল হয়।

একদিন সন্ধ্যায় কাউকে কিছু না বলে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কো-আই চল্‌লো সেই পর্ব্বত-গুহার উদ্দেশ্যে।

সন্ন্যাসী শান্তস্বরে কো-আইকে প্রশ্ন করলেন—"কে তুমি মা, কেনই বা তুমি এই অসময়ে একাকী এসে উপস্থিত হয়েছো?"

সন্ন্যাসীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠে কো-আই বল্‌লে—"ঠাকুর, আমার বড়ই বিপদ! আপনি আমায় রক্ষা করুন।"

এই বলে কো-আই কাঁদতে লাগ্‌লো। সন্ন্যাসী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—"কেঁদো না মা। বল কি বিপদ, শক্তিতে যদি কুলোয় তবে অতি অবশ্য আমি তোমাকে রক্ষা করবো।"

সন্ন্যাসীর সান্ত্বনা-বাক্যে শান্ত হয়ে কো-আই সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে নিবেদন করলো।

শুনে সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ হলেন। প্রায় এক প্রহর পরে চোখ খুলে বল্‌লেন—"আমি ধ্যানযোগে জান্‌তে পারলাম যে, যদি কোন কুমারী তরুণীর দেহের সমস্ত রক্ত ঐ গলানো কাঁসার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবেই ঘণ্টা নিখুঁত হয়ে তৈরী হবে—নচেৎ নয়।"

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এই বাণী লাভ করে কো-আঁই হৃষ্ট-চিত্তে গৃহে ফিরে এলো। বাড়ী এসেই সে তার বাবাকে বল্লে—"বাবা, এবারে দেখে নিও নিশ্চয় তোমার ঘণ্টা নিখুঁত হবে।" শিল্পী বল্লেন—"হঠাৎ একথা যে বল্‌ছিস।" কো-আই বল্লে—"আমি বল্‌লামই ত—তুমি দেখেই নিও না।"

শিল্পী এবার আর আয়োজনে কোন ক্রটীই রাখেনি। রাজ্যের প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকেই লোক এলো ব্যাপার দেখবার জন্য। রাজা স্বয়ং এলেন—তাঁর পাত্রমিত্র, উজীর-নাজির, সভাসদ, পারিষদ, সেনাপতি আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে। শিল্পীর এবারে মহাপরীক্ষা—হয় মৃত্যু, নয় পুরস্কার! শিল্পী তাঁর কাজ সুরু করে দিলো। কাঁসা গলানো শেষ হয়ে এসেছে। পাত্রের মুখ খুলে দিয়ে গলানো কাঁসা ছাঁচে ঢাল্‌বার জন্য সহকারীরা প্রস্তুত হয়েছে। এমন সময় জনতার ভিতর থেকে নারী-কণ্ঠে একটা চীৎকার উঠ্‌লো—"বাবা চল্লুম—বিদায়!—জন্মের মত বিদায়!" অতি সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে শিল্পী চমকে উঠ্‌লো।—তা'র কন্যার কণ্ঠস্বর! সে ছুটে এলো।

হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ভিড়ের ভিতর থেকে সহসা ছুটে বেরিয়ে এসে শিল্পীর স্নেহের দুলালী কন্যা কো-আই গলন্ত কাঁসার পাত্রের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। শিল্পী ছুটে গেলো তাকে রক্ষা করতে, কিন্তু পারলো না। শুধু শিল্পীর হাতে লেগে তা'র পায়ের একপাটী জুতো বাইরে পড়ে রইলো। ততক্ষণে কো-আইয়ের দেহ একেবারে গলন্ত কাঁসার সঙ্গে মিশে গেছে। শিল্পী আর্ত্তস্বরে "মা" "মা" বলে চীৎকার ক'রে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লো!

কাঁসা ঠাণ্ডা হলে ছাঁচ খুলে ফেলা হলো। সবাই অবাক হয়ে দেখ্‌লো—এবারে আর ঘণ্টার মধ্যে কোথাও কোন খুঁত নেই—একেবারে নিখুঁত।

তারপর এক শুভদিনে মহা উৎসবের মধ্যে ঐ "ঘড়িঘরে" এই সুবৃহৎ ঘণ্টা টাঙানো হলো। রাজ্যের অসংখ্য লোক এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। টাঙানো শেষ হয়ে গেলে ঘণ্টা বাজানো সুরু হলো। ওঃ! কী মিষ্টি—আর কী গুরু-গম্ভীর আওয়াজ! রাজা ভারী খুশী হলেন।

কিন্তু একটা ব্যাপারই ভারী আশ্চর্য্য করে দিলে সবাইকে। ঘণ্টা বাজানো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদুমধুর সুরে ঘণ্টার ভিতর থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো—প্রথমে একটু আস্তে—তারপর আবার জোরে—তারপর আবার আস্তে—"হি-সেয়—হি-সে-য়-য়—হি-সেয়।" চীনা ভাষায় হি-সেয় মানে হচ্ছে জুতো।

এই শব্দ শুনে কে একজন ভিড়ের ভিতর থেকে বলে উঠ্‌ল—"ওঃ! হতভাগিনী কো-আই দেখছি মরে গিয়েও তার জুতোর কথা ভোলেনি। গলন্ত কাঁসার মধ্যে লাফিয়ে পড়্‌বার সময় পা থেকে যে এক পাটী জুতো বাইরে পড়ে গিয়েছিল তা-ই বোধ হয় চাইছে!"

আজও যারা পিকিংএ যায়, তা'রা সেই সুবৃহৎ ঘণ্টাটী দেখ্‌তে পায়। আজও সেই ঘণ্টা যখন বাজানো হয়—তখনই বাজনা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই করুণ-মধুর সুরে আওয়াজ হতে থাকে—হি-সেয়, হি-সেয়—হি-সেয়—হি—সেয়—য়,—আর সকলকে মনে করিয়ে দেয় পিতার জীবন রক্ষার্থ কন্যার আত্মদানের সেই করুণ কাহিনী—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই করুণ কাহিনী স্মরণ করে সবার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। *

রাখাল বন্ধু

বন্দে আলী মিয়া

রাখাল ছেলে দুইপ্রহরে বাজায় বাঁশের বাঁশী
বাজায় সকল বেলা—
ওর না বাঁশীর রব শুনে গো কাঁপে গাছের পাতা
কাঁপে সকল বেলা।
বাবুই পাখী উড়ে বেড়ায়—বেড়ায় মাঠে মাঠে
জল উছলে ছল্‌কে পড়ে পদ্মবিলের ঘাটে,
সেইখানেতে রাখাল ছেলের মিঠে বাঁশীর রব
হাওয়ায় করে খেলা।
বাজায় সকল বেলা।

আমার দেশে যাইও রাখাল—কই গো তোমায় আজ
খেল্‌বো তোমার সাথে—
গহিন বনে লইয়া বাঁশী চল্‌বো পিছু পিছু
চল্‌বো তোমার সাথে।

* পিকিংএর ঘণ্টা পৃথিবীর সুবৃহৎ ঘণ্টাগুলির অন্যতম। এই ঘণ্টা সম্বন্ধে চীনদেশে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—তা অবলম্বন করেই এই গল্পটী লেখা।

গরুরা সব পথ ভুলে গো ক্ষেতে লাগ্‌বে ঠিক,
সবুজ ঘাসের গন্ধে মোরা ভুল্‌বো সকল দিক্।
তোমার গলায় পরিয়ে দেবো গজমোতির মালা—
　　পরাবো দুই হাতে।
　　খেল্‌বো তোমার সাথে।

দুপুর বেলা বাতাস চলে পাখীর মতন নেচে
　　মাঠের আগুন ভরি,
নাচন লাগে ডালে পাতায় বালুর গায়ে গায়ে
　　সকল জমিন ভরি।
সিঁদূর-বরণ হিজল-পরী বাতাসে দোল্‌ খায় ;
ঝরে' পড়ে কাজল কালো রাখাল ছেলের গায়
মিঠে বাঁশীর মিঠে সুরে মন ভরে যায় রসে
　　সারা দুপুর ধরি।
　　মাঠের আগুন ভরি।

ওই না বাঁশীর রব শুনে রে দিন কাটে না আর
　　রইতে নারি ঘরে।
মাঠের দিকে চাইয়া আমি হলেম বিবাগী
　　রইবো না আর ঘরে।
মন হলো ভার—দিন হলো ভার—কারে আমি কই,
তুমি এসো রাখাল বন্ধু পথ-চেয়ে আজ রই।
তোমার সাথে চইলা যাবো গহিন বনের গাঁয়,
　　মন যে কেমন করে!
　　রইবো না আর ঘরে।

জেনে রাখা ভাল

শ্রীম—

মিউজিয়মের জন্ম-কথা—মিউজিয়ম (Museum) কথাটা শোনবামাত্রই তোমাদের অনেকেরই হয়ত মনে পড়ে যায় কলকাতার চৌরঙ্গীর সেই যাদুঘরের কথা। মিউজিয়মের এই যাদুঘর নামকরণ থেকেই এর সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের সম্পর্কটা কি রকম তা আমরা অনেকটা অনুমান করে নিতে পারি। মিউজিয়ম যে লোক-শিক্ষার কত বড় একটা অঙ্গ, তা আমরা অনেকে একেবারেই বুঝি না। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশের বড় বড় শহরেই মিউজিয়ম আছে এবং সে সব দেশের জনসাধারণ এই সব মিউজিয়ম থেকে নানা বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জ্জন ক'রে থাকে। এই সব মিউজিয়মে সংগৃহীত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য সেখানে নানা বিষয়ে পণ্ডিত লোকও নিযুক্ত থাকেন।

আমাদের দেশে সেরূপ বন্দোবস্ত কোথাও নেই। মিউজিয়মের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব নিদর্শন সংগৃহীত থাকে, তাদের গায়ে আটা লেবেলে পরিচয় লেখা থাকলেও সেগুলো দর্শক সাধারণের অধিকাংশের কাছেই থেকে যায় অপরিচিত। তাই আগন্তুকেরা এর মধ্যে প্রবেশ ক'রে শুধু অবাকই হয়, আর মনে মনে এগুলোকে যাদুকরের ঘরের সব আজব জিনিষ বলে ভাবতে ভাবতে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। মিউজিয়মের যাদুঘর নামকরণের ইতিহাস বোধহয় এই রকমই।

কিন্তু মিউজিয়ম নামের একটা ইতিহাস আছে। গ্রীস দেশের নাম তোমরা জান। গ্রীস দেশের যারা অধিবাসী তাদের বলা হয় গ্রীক। গ্রীকদের পুরাণে শিল্প, কলা ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবীর উল্লেখ আছে। বিভিন্ন নামযুক্ত এই নয়টি দেবী সাধারণ ভাবে মিউজেস্ নামেই পরিচিত। আমাদের ভাষায় মিউজেস্‌কে আমরা বাগ্দেবী বলেই অভিহিত করতে পারি। ক্লিও (Clio) ইতিহাসের, ইউটারপ (Euterpe) গীতি-কবিতার, থালিয়া (Thalia) মিলনান্ত নাটক, কাব্য এবং পল্লীগাঁথার, মেল্‌পোমিন (Melpomene) বিয়োগান্ত কাব্যের এবং নাটকের, টারপ্‌সিকোর (Terpsichore) উষা-সঙ্গীত ও কাব্য, এরাটো (Erato) আদি রসাত্মক কাব্য ও নাটকের, ইউরেনিয়া (Urania) জ্যোতির্ব্বিদ্যার, পলিম্‌নিয়া (Polymnia) ভগবৎ-স্তোত্রের এবং ক্যালিওপ (Calliope) মহাকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এরা দেবতাদের রাজা জিয়াসের (Zeus) কন্যা। এই মিউজেস্‌দের মন্দিরকে গ্রীক ভাষায় বলা হতো মউসিয়ন (Mouseion)। এরই ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে মিউজিয়ম। যেখানে শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক চিত্তাকর্ষক নানারূপ নিদর্শন সংগৃহীত হয়ে লোকশিক্ষার জন্য প্রদর্শিত হয়, সেই প্রদর্শনীকেই এযুগে বলা হয় মিউজিয়ম। সুতরাং মিউজিয়মকে যাদুঘর না বলে মিউজিয়ম বলাই যুক্তিসঙ্গত।

৲ **প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়**—মিশরের প্রধান নগর 'কায়রোতে' অবস্থিত 'আল্ আজ্‌হার' নামক মোশ্লেম বিশ্ববিদ্যালয়ই হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানদের ধর্ম্মনেতা মিশরের ফাতিমি খলিফাদের আমলে ৯৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে খলিফার প্রধান সেনাপতি গাওহার কর্ত্তৃক আল্ আজ্‌হার নামক মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ৯৭২ খৃষ্টাব্দে এর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে খলিফার নির্দ্দেশে এই মসজিদের মধ্যেই একটি ছোটখাটো বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় অল্প কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক নিয়ে। ক্ষুদ্র আরম্ভ থেকেই এই বিদ্যালয় ক্রমে বিরাট মোশ্লেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতঃ ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ঐখান থেকে শিক্ষালাভ করে সহস্র সহস্র অধ্যাপক মুসলমান-প্রধান দেশ সমূহের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে থাকেন। বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর এগার হাজার ছাত্র শিক্ষালাভ করেন। এদের কোন বেতন ত দিতেই হয় না, এমন কি এদের খাওয়া-পরার খরচও মিশর সরকারই বহন করে থাকেন। ছাত্রদের হাত-খরচের জন্যও কিছু অর্থ দেওয়া হয়। মিশর সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন।

প্রতি বৎসর তুরস্ক, মরক্কো, আফগানিস্তান, পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরান, ভারতবর্ষ, বোর্ণিও, জাভা, সুদান, অ্যাবিসিনিয়া, চীন, সোমালিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে অধ্যয়নের জন্য অসংখ্য ছাত্র এখানে এসে থাকেন। বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সূচী কতকটা আধুনিক করা হয়েছে। গণিত, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে বর্ত্তমানে শিক্ষাদান করা হলেও ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদানই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু জ্ঞানী মুশ্লিম মৌলানা আমাদের ভারতবর্ষেও আছেন। জাতীয় মহাসভার সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নাম তোমরা শুনে থাকবে। তিনিও এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করেছেন।

সম্পাদকীয়

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি ৮টার সময় শক্তি-ঔষধালয়ের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাশীধামে পরলোক গমন করেছেন। মুমূর্ষু আয়ুর্ব্বেদকে নবশক্তি ও নব-প্রেরণা দিয়ে তিনি আয়ুর্ব্বেদে রীতিমত একটা নূতন যুগের প্রবর্ত্তন ক'রে গিয়েছেন। শিশুসাথীর জন্মাবধি ইহার সাথে তাঁহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল; তিনি শিশুসাথীকে দরদ দিয়ে ভালবাসতেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমাদের ছোট্ট গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অনেকে মেদিনীপুরের বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য শিশুসাথীর পক্ষ থেকে একটা ফাণ্ড খুলবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। নানা কারণে যদিও আমাদের পক্ষে তা' সম্ভবপর হয়নি, তবু আমরা তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। যে দেশে কচি শিশুদের প্রাণও দুঃস্থের সেবার জন্য এভাবে ব্যাকুল হয়, সে দেশের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, একথা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। এসব শিশুরাই বাঁচিয়ে তুল্‌বে আমাদের মরণোন্মুখ দেশকে "জীয়ন-কাঠির" পরশ দিয়ে।—মেদিনীপুরের বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে,—আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকারা তাদের মারফত বেশ কাজ করতে পারবেন।

লেখক-লেখিকাদের কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে। আমরা প্রতি মাসেই অসংখ্য কবিতা ও গল্প পেয়ে থাকি। শিশুদের কচি মনকে দিকে দিকে প্রসারিত কর্‌বার গুরু দায়িত্ব তাঁদের হাতে। সেদিকে তাঁরা যেন দয়া ক'রে বিশেষভাবে মনোযোগ দেন।

শিশুসাথীর আয়তনের মধ্যে নানাবিধ রচনার স্থান সংকুলান করবার জন্য লেখক-লেখিকারা যদি দয়া ক'রে রচনাগুলিকে যথাসম্ভব বাহুল্য-বর্জ্জিত ও সংক্ষিপ্ত ক'রে লিখেন, তবে কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে বহু উপকার হয়। আর রচনা আমাদের কাছে পাঠাবার আগে কপি ক'রে রাখা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য; তাতে অনেক ঝামেলা ও ডাকব্যয় থেকে বাঁচা যায়। আশা করি লেখক-লেখিকারা দয়া ক'রে এসকল দিকেও একটু দৃষ্টি দিবেন।

নূতন ধাঁধা

[উত্তর ১২ই পৌষের মধ্যে শিশুসাথী কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই।]

এক—

কোন একটি অক্ষরকে কখনও যুক্তস্বরের সাহায্যে, কখনও যুক্ত অক্ষরে পরিণত করিয়া, কখনও যুক্ত অক্ষরের সহিত যুক্তস্বর যোগ করিয়া, কখনও বা শুধু ঐ অক্ষরটিকেই নিম্নের অক্ষর-সজ্জার মধ্যে মধ্যে বসাইয়া যাও এবং প্রয়োজনবোধে বিরামচিহ্ন দাও; তাহা হইলেই দেখিবে যে, নীচের বিরাট এই অর্থহীন অক্ষর-সজ্জা কয়েকটি অর্থ-পূর্ণ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। মনে রাখিও, আগাগোড়া একই অক্ষর ব্যবহার করিতে হইবে।

লয়তিনরদিনেকাশিতরিচিতক্ষিকত্রলয়েরষ্ঠায়ংকটিতবন্ধাবলীরনিন্দার্ণতা ইয়নাথেরতিবেশীগুরীকাক্ষতিতুণ্ডীচয়সায়লয়ড়ারমঅচয়ভাবেন।

[সঙ্কেত : যেমন অক্ষরটি ত, যুক্তস্বরের সাহায্যে তা, তি, তৃ ইত্যাদি, যুক্তঅক্ষরে ত্র, ত্ত, ত্তঁ ইত্যাদি, যুক্তঅক্ষরের সহিত যুক্তস্বর ত্রি, ত্থি ইত্যাদিতে পরিণত করা যায়। বিরাম চিহ্ন—দাড়ি, কমা ইত্যাদি।]

দুই—

কোন এক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাড়ে দশটার ট্রেন ধরিয়া সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন ; এমন সময় একজন চৌকিদার আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "হুজুর, সাড়ে দশটার ট্রেনে যাইবেন না, কারণ কালরাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি সাড়ে দশটার ট্রেন এক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়াছে।" প্রেসিডেন্ট চৌকিদারের কথায় সাড়ে দশটার ট্রেনে না গিয়া, চারিটার ট্রেনে গেলেন। বাস্তবিকই সাড়ে দশটার ট্রেন এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট আসিয়া তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্য চৌকিদারকে একশত টাকা পুরস্কার দিলেন এবং তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। কেন তিনি এইরূপ করিলেন, বল।

[দুইটি ধাঁধার উত্তর ঠিক না হইলে নাম প্রকাশিত হইবে না।]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উত্তরদাতারূপে গ্রাহকদের নাম প্রকাশই আমাদের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু প্রত্যেকটি উত্তর-পত্রের সহিত গ্রাহকদের আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও গ্রামবাসীদের এত নাম থাকে যে, সেই সব নামের জন্য স্থান সঙ্কুলান করিতে গিয়া, আমাদের প্রায় প্রতিমাসেই দুই একটি ভাল রচনা বাদ দিতে হয়। আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকারা যদি এই বিষয়টি চিন্তা করেন, বিশেষতঃ কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে, তবে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

—সম্পাদক

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

এক—

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর। **দীনবন্ধু মিত্র**—লীলাবতী। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—মহুয়া, তপতী, বলাকা, খেয়া, মায়ার খেলা, পলাতকা। **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—চন্দ্রনাথ, দেবদাস, রমা। **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**—নালক। **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত**—তীর্থসলিল। **জগদীশচন্দ্র বসু**—অব্যক্ত।

লামা।

উত্তরদাতাদিগের নাম

[অতি অল্প সংখ্যক উত্তরদাতারই প্রথম ধাঁধাটির উত্তর সন্তোষজনক হয়েছে। তথাপি যাদের উত্তর অনেকাংশে ঠিক হয়েছে, তাদের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয় মনে ক'রে উৎসাহদানের জন্য তাদের নাম আমরা ছাপলাম।]

যাদের দুইটি ধাঁধার উত্তর ঠিক হইয়াছে :—শক্তিপ্রসাদ, নির্ম্মাল্য, হাবুল, নেপু, নেহু, তপু, শম্ভু, গীতা, মীনা, মায়া, আভা, বীথি, ময়নাপুর ; আবদুল হামিদ মিয়া, মোমিন উদ্দীন, আবদুর রহিম, আমীন উদ্দীন, আবুল হোসেন মিয়া, রাজৈর ; অমল, কল্যাণ, দীপক, ছবি, পাপড়ি, উমা, কেটো, টুকুশ, লীলা, শান্তি, ইলু, ইনু, ডলি, খুকু, মাণিক, করুণা, দীপু, শোভা, রতন, সীতা, রজত, ছায়া, বেলু, মায়া, প্যারী ও বিনোদিনী মিত্র, উয়ারী—ঢাকা ; রেণু, রেখা, রুবি, বিমল, পাবু, দেবু, বর্দ্ধমান ; ধীরেন্দ্র, নীরা, সীমা, মদন, গীতা, পোবু, বৈচীগ্রাম ; শান্তি, ছবি, অর্চ্চনা, নিভা, লীলা, কমলা, অঞ্জলী, মঞ্জুলিকা, শিবানী, শিপ্রা, তাপস, বিজয়, মাণিক, পিন্টু, উষাপতি, রণপতি, শ্যামাপতি, রমাপতি, বরিশাল ; মুকুন্দ পাঠচক্রের সভ্যগণ, কালিয়াকৈর ; নীরেন্দ্র, অবনীন্দ্র, শৈলেন্দ্র, অমল, শিবরাম, মীরারাণী, জবডরাপাড়া ; শ্রীমৎ মেধানন্দ শ্রামণের, হাইদচকিয়া ; কনকলেখা, গীতা, মীরা, রমেশ, অপরেশ, অমরেশ, নবদ্বীপ ; রমাপ্রসাদ ঘোষ, সাতক্ষীরা ; আশুতোষ, পরিতোষ, মনোতোষ, বীণা, অর্চ্চনা, সান্ত্বনা, বন্দনা, চন্দনা, অঞ্জনা, রামকৃষ্ণপুর ; গৌরচন্দ্র বিশ্বাস, হীরেন্দ্রনাথ রায়, উলপুর ; মণ্টু, নেণ্টু, লালু, পঙ্কু, পোতুলপুর।

যাদের কেবল প্রথম ধাঁধার উত্তর ঠিক হইয়াছে :—রাণী, তরুণ, তপন, নূপুর, বুলু, মাধুরী, মঞ্জু, মায়া, বেবী, ভাগর, বুদ্ধু, টুনি, প্রশান্ত, খোকা, রাণু, গৌরী, স্বপ্না, মুকুল, শিপ্রা, জমু, ঝণ্টু, রমা ও বাদল, বালিগঞ্জ ; প্রণবানন্দ মান্না, থানা (বোম্বে) ; অরুণ দাশগুপ্ত, বীরশ্রী ; ইলা, সত্যনারায়ণ, টুকু, কানাই, ভীম, সুশীল, অধমতারণ, অনুকা, অজিত, মতি, সপ্তমণ্ডল, পোদ্দারডিহি ; শেফালিকা, তীর্থেন্দ্র, বিমল, অমলা, পোদ্দারডিহি ; সতু, বীণা ও মীরা সেন, শ্রীহট্ট ; দুর্গাচরণ ও সুহৃদরঞ্জন ঘোষ, লোকপাড়া ; শেফালিকা, আরতি, প্রীতিকণা, অন্নপূর্ণা, সীমারাণী, শোভনা, সুনীতি, বিদ্যুৎ, তুষার, নির্ম্মলেন্দু, দিলীপ, পঙ্কজ, রণজিৎ, বিমানবিহারী, বিষ্ণুপুর ; দীপ্তি, মৈত্রেয়ী, শুভেন্দু, ইন্দোর ; সুব্রত গুপ্ত, লাহেরিয়া সরাই ; ছবি, শুক্লা, গুলু, মাষ্টার লবু, কুশু, কানু, বেণু ভট্টাচার্য্য, রায়গড় ; শঙ্করপ্রসাদ চন্দ্র, ডেমারীহাট ; সাহাজাদপুর ইসলামিক কালচারেল সোসাইটির সভ্যবৃন্দ ; সুজাতা বানার্জ্জি, খাজুরী ; ছায়া মিত্র, কলিকাতা ; কণা, লেনা, রাণু, উমা, মাণিক, বুলু, মঞ্জু, সন্তু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ; নীলিমা রায়, পড়ুইকোরা হাইস্কুল ; সচ্চিদানন্দ, কার্ত্তিক, ভক্তিরাম, ইনু, ইয়াসিন, বিভূতি, অমিয়, রামতারণ, গণেশচন্দ্র, বাকুলিয়া।

দ্বিতীয় উত্তর ঠিক হইয়াছে :—খোকন ও পিণ্টু, গোলা (হাজারীবাগ)।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Shankhari Baxar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

বিজয়া

একবিংশ বর্ষ মাঘ, ১৩৪৯ ১০ম সংখ্যা

হিমের পরশ

শ্রীহরেকৃষ্ণ অধিকারী

শীতের রবি পূব্-গগনে হাতছানিতে ডাক্‌ছিল,
গাঁয়ের ছেলে পুকুর-ধারে রোদের রেণু মাখ্‌ছিল।
শিশির-ভেজা ঘাসের বুকে সোনা-আলোর ঝলকানি
রাঙিয়ে দিল নূতন রঙে সারা সবুজ মাঠখানি।

হিমের পরশ সবার প্রাণে অশেষ কাঁপন তুল্‌ছিল,
বনের পাখী কুঞ্জ-শাখে ওই বারতা শুন্‌ছিল।
সোনার ধানে পূর্ণ হ'ল ওই যে গাঁয়ের মাঠগুলি,
মর্ম্ম-বীণায় ঝঙ্কারে সেই চাষার গানের সুরগুলি।

দূরের যত রাখাল ছেলে দুপুর রোদে পিঠ দিয়ে—
দিল্ খুলে আজ বাজায় বাঁশী পুলক-বিহ্বল মন নিয়ে।
ওদের প্রাণে আজকে কভু ব্যথার কথা জাগ্‌বে না,
বন-কুঁড়িরা ওদের ছাড়া কারো কথায় হাস্‌বে না।

পল্লীপথে দল বেঁধে যায় সাঁওতালিদের সেই মেয়ে,
মিষ্টি হাসি আজো ঝরে যাদের সুঠাম ঠোঁট বেয়ে।
টাট্‌কা-ফোটা গাঁদার কুঁড়ি ওদের খোঁপায় ওই শোভে,
আলোয় গানে সবুজ প্রাণে ছন্দ ভরে দূর নভে।

তুহিন-ঝরা হিমেল বায়ে আম্রমুকুল মুঞ্জরে,
কুয়াস-ঢাকা নীল আকাশে ভোরের পাখী গুঞ্জরে।
ঝল্‌সে-ওঠা ঝর্ণা-আলোয় মর্ম্ম-গীতি সুরভরে,
ছোট্ট শিশুর সবুজ প্রাণে মিষ্টি কথার রঙ্ ধরে।

পূজা-কন্‌সেসন

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

হরিহর মিত্তিরের নাম না জানেন কলকাতায় এমন লোক খুবই কম। কারণ লেকে বেড়াতে গেলে তাঁর বাড়ীর সুমুখের মস্ত সাইন-বোর্ডটি নিশ্চয়ই দেখে থাকবার কথা—H². Mitter, F. O. T. C. (London). অথচ তিনি স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়েছিলেন, একথা পাড়ার ভূতনাথবাবুর কাছে কমসে-কম একশ' দিন শুনেছি। তবু তিনি F. O. T. C. (London)! কতদিন দেখেছি স্কুল-কলেজের ছেলেরা এই উপাধি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, F. O.…না হয় Fellow of …কিন্তু T.C. ব্যাপারটা কি?—Transfer Certificate?—তাদের মাথা গুলিয়ে যায়। শেষ অবধি শোনা গেল বিলেতের কোন্ একটা শিশুমঙ্গল সমিতির নিকট হতে বারো পেনী দক্ষিণা দিয়ে এই উপাধিটি সংগ্রহ করেছেন। উপাধিটির পুরোপুরি অর্থ এই—Father of Twelve Children.

আপনাদের বিশ্বাস না হয়, ডিপ্লোমাখানি চার চক্ষে দেখে নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

মিত্তির মহাশয় আজ দশ বৎসর যাবৎ কলকাতার বাইরে যাবার ফিকিরে আছেন। যেবার রেল ষ্টীমার কোম্পানীগুলি পূজা কন্‌সেসন অত্যন্ত লোভনীয়ভাবে দিয়ে থাকেন, সেবার বাড়ীতে একটা-না-একটা অসুখ দেখা দেয়, না হয় বড় সাহেব সস্ত্রীক শিলং-দার্জ্জিলিং ভ্রমণে বার হয়ে যান। হরিহরবাবুকে কলকাতা অফিসে ব'সে ফাইল ঘাঁটতে হয়।

এবার তিন মাস আগে থেকেই হরিহরবাবু ছুটির ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। গৃহিণী ছেলেপেলেদের স্বাস্থ্যের দিকে কড়া দৃষ্টি রেখে রোজ তাদের স্বাস্থ্যের তদারক করছেন। কারও একদিন একটু মাথা ধরলে তিনদিনের মত তা'র আহার-বিহার একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। উপোসের ভয়ে ছেলেপেলেরা তটস্থ, কিন্তু উপায় নেই; আজ পনেরো দিন যাবৎ ছেলেমেয়েরা রসগোল্লার মত কুইনাইন পিল, বাসক সিরাপ—আরো কত কি গলাধঃ করছিল।

পূজোর ছুটির আগের দিন বৈঠক বসল, কোথায় যাওয়া যায়। ছেলেরা ভুগোল খুজে ভারতবর্ষে যতগুলি স্বাস্থ্যকর এবং সুপ্রসিদ্ধ জায়গার নাম আওড়াতে পারল, ব'লে গেল। মিত্তির মহাশয় আলবোলা টানতে টানতে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে সব শুনে গেলেন। গৃহিণী মথুরা, বৃন্দাবনের নামে বার দুই বৃথা ওকালতি ক'রে দেখলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যকর জায়গা চাই, তীর্থস্থান চাই এবং খাওয়া দাওয়ার জিনিসের দাম সস্তা হওয়া চাই,—একাধারে এই তিনের সমাবেশ হলেও চলবে না, গন্তব্যস্থান বাংলাদেশের খুব কাছাকাছি হওয়া চাই। অষ্টম গর্ভের সন্তান হারু ভুগোলের পাতা তন্ন-তন্ন ক'রে হরিহরবাবুর মনোমত স্থান আবিষ্কার ক'রে ফেলল। শিলং স্বাস্থ্যকর স্থান, পথে কামাখ্যা মায়ের মন্দির, এবং চেরাপুঞ্জি সহর শিলংএর খুব কাছাকাছি জায়গা, কমলালেবুর অভাব নেই এবং ঢাকা হতে মোটে চব্বিশ ঘণ্টার পথ। অমনি টাইম টেবিলের খোঁজ পড়ল। রাত্রি বারোটা অবধি জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হল যে, চেরাপুঞ্জি—শিলং—কামাখ্যা ভ্রমণ শেষ ক'রে একবার বিক্রমপুরের বসতবাটিও দেখে আসতে হবে।

শিয়ালদ ষ্টেশনে এসে হরিহরবাবুর চক্ষুস্থির। একখানিও রয়েল ক্লাশের গাড়ী যদি খালি থেকে থাকে! সকলেই দুপুর হতে এসে ব'সে আছে। হরিহরবাবু দমবার পাত্র নন। তিনি সদলবলে গোটা একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী অধিকার ক'রে সেখানে ঘর সংসার পেতে বসলেন।

পোড়াদ ষ্টেশনে একদল টিকিট-চেকার এসে উপস্থিত। হরিহরবাবু চুপ ক'রে ব'সে আছেন। চেকারবাবু বললেন—"আপনাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে।"

হরিহরবাবু অত বোকা লোক নন যে এক কথাতেই ঝনাৎ ক'রে টাকা ক'টি ফেলে দেবেন। তিনি বললেন—"আমাকে জায়গা দেখিয়ে দিন্, আমরা এখুনিই চ'লে যাচ্ছি।"

চেকারবাবু বিরক্তির সুরে বললেন—"সে আমি কি জানি! টাকা দিন্ মশাই!"

"তবে কে জানে মশায় ?" ব'লেই হরিহরবাবু বিক্রম প্রকাশ ক'রে বললেন—"কি বললেন, টাকা দেব ? হরিহর মিত্তিরকে ঠকিয়ে নেবেন টাকা, পুলিশ অফিসের বড়বাবু হরিহর মিত্তির, F. O. T. C. গোদল সাহেবকে কোতল ক'রে ছেড়েছিলাম, আর তুমি এসেছ এখানে ইয়ারকি দিতে"—ব'লেই হরিহর মিত্র চেকারবাবুর গলা টিপে ধরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাত সাতটি পুত্র—হরে, নেড়া, ভেঁটু, গণা, মণি, ভোম্বল ও নয়নচাঁদ বাবাজীরা নাৎসী সৈন্যের মত চেকারবাবুর উপর লাফিয়ে ঝাপিয়ে প'ড়ে কিল, চড়, ঘুষি, কানমলাতে তা'কে অর্দ্ধমৃত ক'রে তুলল। গৃহিণী মাঝখানে প'ড়ে ভদ্রলোকের পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলেন। গাড়ী ততক্ষণে এসে ঈশ্বরদি জংসনে পৌছেচে। একটা মহা হুলুস্থুল ব্যাপার। চেকার-বাবু পুলিশ ডাকতে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে দারোগা, লাল-পাগড়ী, রেলওয়ের লোকজন এসে হাজির। হরিহরবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাসভকণ্ঠে বললেন—"বেটা ছোটলোক, ভদ্র মহিলার গায়ে হাত তোল তুমি, কলকাতা ফিরে নিই, কলভিন সাহেবকে ব'লে......"

স্টেশন মাষ্টার বাধা দিয়ে বললেন—"ব্যাপার কি মশায়, বলুন না খুলে !"—

কে কার কথা শোনে। হরিহরবাবু অগ্নিশর্ম্মা হয়ে গাড়ীর ভিতরে দাঁড়িয়ে আস্তিন গুটাতে লাগলেন, এবং তাঁরই ইঙ্গিতে ছেলেমেয়েরা কোরাস সুরে কান্না জুড়ে দিল। গৃহিণী নথ ঘুরিয়ে বাক্যবাণে সেই চেকারবাবুর চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছিলেন, এমন সময় ভিড় ঠেলে

রামটহল সিপাই আনতমস্তকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বলল—"আরে বড়া বাবু যে, কাঁহাছে আইলবায়ে।"

রামটহলকে দেখে বড়বাবুর ওরফে হরিহরবাবুর যেন প্রাণে জল এল। হরিহরবাবু নীচে নেমে আসতেই রামটহল তা'র হাতের লাঠি গাছি ঘুরিয়ে জনতাকে দূরে ঠেলে দিল। দারোগাবাবু বুঝলেন, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই পুলিশের লোক এবং রামটহলের জানাশোনা, তিনি বেগতিক দেখে স'রে পড়লেন। স্টেশন মাষ্টার বাবু কিছু বুঝেও বুঝতে পারলেন না, পরে রামটহলকে জিজ্ঞাসা করবেন ভেবে গাড়ী ছাড়বার হুকুম দিলেন।

বেচারী চেকারবাবু মারধর নীরবে হজম ক'রে গেলেন, কিন্তু এই বিষয়ে হেড অফিসে একটা রিপোর্ট না দিয়ে ছাড়বেন না মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলেন।

পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল ক'রে হরিহরবাবু সপরিবারে হোটেলে গিয়ে উপস্থিত। মোটে চল্লিশ মিনিট গাড়ী থামে সেখানে। হোটেলওয়ালা গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে গেল। এই কয়টি লোকে পঁচিশ জনের আহার্য্য পানীয় অনায়াসে গলাধঃ ক'রে ফেলল দেখে হোটেলের মালিক মনোহরবাবুর মাথায় হাত দিয়ে বসবার উপক্রম!

কামাখ্যা পাহাড়ে তাঁরা এক রাত্রি ছিলেন এবং উমানন্দ, অশ্বক্রান্ত, বশিষ্ঠাশ্রম দেখে তাঁরা শিলং পাহাড়ে এসে পৌছেন। শিলঙে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে মাত্র তাঁদের দুদিন লেগেছিল।

চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সব জায়গার চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। এ জায়গাটি না দেখে গেলেও নয়। অথচ পেট্রল-দুর্ঘটের দিনে যাতায়াতের খরচও নিতান্ত কম নয়। ছেলেরা মনমরা হয়ে গেছে। গৃহিণী রেল-ষ্টীমার-গাড়ী কোনটাই বেশী সহ্য করতে পারেন না, তাই বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। হরিহরবাবু ঘাবড়াবার লোক নন, তিনি মনে মনে এক বুদ্ধি এঁটে মধ্যাহ্ন-ভোজনের অব্যবহিত পরেই পুলিশ কমিশনারের অফিসের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। পথে পচা ঘোষালের ভ্রাতা বংশীরব এবং টিটিরবের কাছে শুনে গিয়েছেন যে, "টের্টন্ সাহেব বর্ত্তমানে শিলঙের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা"। আর কি কথা আছে,—দে ছুট! পূর্ব্ববঙ্গ-আসাম গবর্ণমেণ্টের সময় টের্টন্ সাহেব হরিহরবাবুর হাতধরা লোক ছিল, সুতরাং তা'র কাছে গেলে চেরাপুঞ্জি ভ্রমণের একটা সুরাহা হতে পারে, এই কথা তিনি মনে মনে আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন।

পুলিশ অফিসে সাহেব-সুবোর ভয়ানক ভীড়। কেউ বড় একটা সাহেবের কাছে যেতে পারে না। হরিহরবাবু কিন্তু গট্‌গট্ ক'রে বিধি-নিষেধ না মেনে (সিংহ রাশি, মঘা নক্ষত্র, আইন-কানুনের বড় একটা ধার ধারেন না তিনি) চাপরাশীর কাতর অনুনয়-বিনয়ে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সাহেবের খাস কামরায় গিয়ে একেবারে সশরীরে হাজির। সাহেব তখন মেজাজ শরিফে ছিলেন। গুড্ মর্নিং শুনতেই ফিরে চেয়ে দেখেন,—বহুদিনের অনুগত, একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য শ্রীযুক্ত হরিহর মিত্তির। বড় খুসী হলেন। অন্যান্য লোকজন তখন ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল। মিত্তির মহাশয়

তখন পুরাণো মনিবের কাছে ইনাইয়া-বিনাইয়া কত কি বলতে লাগলেন। সাহেব শুনে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন—"যখন তোমার যা কিছু প্রয়োজন, আমাকে বলো। ক'দিন থাকবে এখানে? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

হরিহরবাবু এক কথায় জবাব দিলেন—"তোমার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন অসুবিধা নেই।"

সাহেব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, হরিহরবাবু অবসর এবং সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাস' করলেন—"মেম সাহেব কোথায় এবং কেমন আছেন?"

সাহেব বললেন—"লণ্ডনে আছেন।"

হরিহরবাবু কাঁদ-কাঁদ সুরে বললেন—"বুড়ো বয়সে তাঁকে তুমি বিলেত রেখে এসেছ? এ কাজ তুমি ভালো করো নি। তাঁকে আসতে লিখে দাও। এই দেখ না, মিসেস্ মিত্তির আমার সঙ্গে এসেছেন। বাব্বা! কল্‌কাতায় যা বোমার ভয়!"

সাহেব শুনে সুখী হলেন এবং প্রত্যুত্তরে বললেন—"আমার নমস্কার জানাবে মিসেস্ মিত্তিরকে?"

হরিহরবাবু মাথা নেড়ে বললেন—"নিশ্চয়ই জানাবো।" তারপর একটুখানি ভেবে পুনরায় বললেন—"একটি অনুরোধ জানিয়েছেন তোমাকে, যদি অনুগ্রহ ক'রে......"

সাহেব ব্যগ্র হয়ে বললেন—"কি?"

—"সাহেব, চেরাপুঞ্জি যাবার একটু ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

"অল্ রাইট"...ব'লে সাহেব একখানি স্লিপ লিখে দিলেন। শুধু তাতে চেরাপুঞ্জি ভ্রমণ নয়, মায় শিলং হতে ঢাকা সহরে আসবার যে সুযোগ ও সুবিধা হয়েছিল, তা এখানে বলবার দরকার নেই।

ঢাকায় পৌঁছে হরিহরবাবু সদলবলে বিক্রমপুরে যাত্রা করলেন—নৌকাযোগে। নৌকা-পথে যাতায়াত মন্দ নয় এবং ষ্টীমারের চেয়ে কম ভাড়া লাগবে, এই জন্য তিনি নৌকায়ই যাওয়া স্থির করলেন।

দশমীর চাঁদ। কলকল ছলছল বেগে জোয়ারের জল ছুটে চলছে। মাঝিরা হাল ধ'রে ব'সে আছে। হরিহরবাবু কম পাত্র নন। স্রোতের জলে নৌকা ছুটছে, আর মাঝিরা দিব্য আরামে ব'সে ব'সে নগদ পাঁচ পাঁচটি টাকা গাফ মেরে দিবে, এ তাঁর অসহ্য। তিনি মাঝিদিগকে বিষম তাড়া দিতে লাগলেন। ঠিক এমন সময় ছপ্ ছপ্ শব্দে একখানি ছিপ এসে তাঁদের নৌকার কাছে ভিড়ল। কাছাকাছি আসতেই ছিপখানি হতে সশব্দে কে যেন গর্জ্জে উঠল—"এই, নৌকা থামাও, আমরা জল-পুলিশ। নৌকা তল্লাস করবো।"

হরিহরবাবু পুলিশের লোক, সহজে পিছু হটতে জানেন না। প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিও তাঁর

কম নয়! হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"আমরাও স্থল-পুলিশ। দূর থেকেই বিদায় নিন্ মশায়! চালাকী করবার আর জায়গা পেলেন না।"

আবার কে যেন চীৎকার ক'রে উঠল—"সাবধান, নৌকা থামাও!"

নৌকা জোয়ারের মুখে ছুটে চলছিল, মাঝিরাও খুব জোরে বৈঠা টানছিল। কিন্তু ডাকাতের দল এতেও নিরস্ত হল না, প্রাণপণে বিপুল জলরাশি ঠেলে তা'রা যেন ছুটে আসতে লাগল।

ব্যাপার গুরুতর দেখে হরিহরবাবুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর তৃতীয় পুত্র গণার এয়ার গানটি বার ক'রে সশব্দে নদীবক্ষ প্রকম্পিত ক'রে 'গুড়ুম্, গুড়ুম্' শব্দে ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। ছেলেরা কালীপূজোর জন্য আতস বাজি, তুবড়ি, জলবোমা প্রভৃতি ঢাকা হতে চুপি চুপি কিনে এনেছিল। তা'রাও হরিহরবাবুর দেখাদেখি জাপানী গরিলা সৈন্যদের মত অকস্মাৎ জলবোমা, ছুঁচোবাজি যুগপৎ সেই নৌকার মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলতেই, "ওরে বাবারে গেলুমরে, রক্ষা করো" আর্ত্তনাদে একটা বিরাট হৈচৈ সুরু হয়ে গেল। হুড়োহুড়ি মারামারি মাঝি-মাল্লার কাতর ক্রন্দনে এবং লোকজনেরা

ডরে ভয়ে নৌকা হতে লাফিয়ে পড়ায় নৌকাখানি একেবারে কাৎ হয়ে জলে ডুবে গেল। কত লোক ডুবল, প্রবল স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেল, কিছুই ভাল দেখা গেল না।

এতক্ষণে তা'রা একটা গঞ্জের কাছাকাছি জায়গায় এসে পৌছেচে। মাঝিরা বলল—"বাবু, আজ রাতটা এখানেই থাকা যাক। কাল ভোর নাগাদ পৌছে দেব আপনাদের। মাত্র দেড় ক্রোশ পথ। এখান থেকে শেষরাত্রিতে নৌকা ছেড়ে যাব।"

হরিহরবাবু ভালমন্দ কিছু বললেন না।

ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল—"বাবা, ক্ষিধে পেয়েছে।"

গৃহিণী বললেন—"ক্ষিধে পাবে না কেন বলো! সেই কখন দুটি মুখে গুঁজে বেরিয়েছে।"

হরিহরবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"এখানে কিছু পাওয়া যায় মাঝি?"

মাঝি হাই তুলে বলল—"সবই পাওয়া যাবে হুজুর!"

—"আচ্ছা, এখানে কাছে কোনও থানা আছে?"

—"না হুজুর!"

—"তবে বাজারে মহাজনদের ঘর আছে এখানে?"

—"আজ্ঞে।"

হরিহরবাবু মাঝির সাথে উপরে উঠলেন। হাঁকডাক ক'রে জনকয়েক দোকানদারকে ডেকে উঠালেন। তাঁর খাকী রঙের পোষাক, বিরাট চেহারা এবং কথার চালচলনে ভীত-সন্ত্রস্ত দোকানদারেরা যে যা সুবিধামত পারল, নৌকায় রাশি রাশি আহার্য্য, খাবার পাঠিয়ে দিতে লাগল। অন্ততঃ হরিহরবাবুর হাবভাবে তিনি যে এ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম, একথা তা'রা মনে মনে ঠিক ধ'রে নিল। তারপর চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দুপুর রাত্রিতে হরিহরবাবু সপরিবারে মহানন্দে সেই গঞ্জের ঘাটে ব'সে উপভোগ ক'রে নিলেন।

বহুদিন পরে হরিহরবাবু দেশে এসেছেন। গ্রামে বিষম সোরগোল প'ড়ে গেছে। কিন্তু হতভাগ্য সেই ডাকাতদের কথা এবং গঞ্জের দোকানদারদের আতিথেয়তার কথা হরিহরবাবু এজীবনে ভুলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বাকী ছুটিটা স্বদেশে আরামে কাটিয়ে হরিহরবাবু গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছেচেন, এ সংবাদ আমরা দৈনিক খবরের কাগজে দেখেছি যেন মনে পড়ে। যুদ্ধের বাজারে যে পূজা কন্‌সেসন নেই, এ কথা তিনি প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। আবার পূজায় কন্‌সেসন টিকিট হলে তিনি একবার পশ্চিমে ঘুরে আসবেন, এ বিষয়ে গৃহিণীকে বারংবার আশ্বস্ত করেছেন।

অতীশ দীপঙ্কর

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

"জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান কপিল সাঙ্খ্যকার,
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরকহার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।"

—সত্যেন্দ্রনাথ

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রামে 'কল্যাণশ্রী' নামক এক রাজার সন্তানরূপে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা প্রভাবতী দেবী তাঁহাকে 'চন্দ্রগর্ভ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। দীপঙ্করের শৈশব জীবনের বিস্তৃত ইতিহাস আজ দুষ্প্রাপ্য। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বজ্রযোগিনী গ্রামের অনতিদূরে বর্ত্তমান সুয়াপুরের সন্নিকটে 'বাজাসন' নামক গ্রামে তৎকালে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। দীপঙ্করের প্রাথমিক বিদ্যালাভ সেই বিহারেই ঘটিয়াছিল, পরে সম্ভবতঃ গয়াধামের বিখ্যাত বজ্রাসন বিহারেও কিছুকাল তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উচ্চশিক্ষার প্রথমদীক্ষা লাভ হইয়াছিল প্রথিতকীর্ত্তি পণ্ডিত আচার্য্য জিতারির নিকট। ইঁহারই পাদমূলে বসিয়া দীপঙ্কর বিজ্ঞানের পঞ্চশাখায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্র, যোগদর্শন ও তন্ত্রবিষয়েও বহুল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অতঃপর কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুলগুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত গুহ্যজ্ঞান অর্জ্জনে ব্রতী হন। ইঁহার নিকট হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া দীপঙ্কর 'গুহ্যজ্ঞান-বজ্র' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ওদন্তপুর বিহারের আচার্য্য শীলরক্ষিত তাঁহাকে "দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান" এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর মগধের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম্ম বিষয়ে কিছুকাল তিনি শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বশেষ, তৎকালীন সুবর্ণদ্বীপের প্রথিতযশা অধ্যক্ষ চন্দ্রকীর্ত্তির অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত হইয়া, সিংহলপথে বহু মাসে তিনি সেই দ্বীপখণ্ডে গমনপূর্ব্বক দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র অধিগত করেন এবং সাধনজীবনে অতি উচ্চ অবস্থা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া আসিলে তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ অবিসম্বাদিভাবে তাঁহাকে বৌদ্ধশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ছাত্র-জীবনে কয়েকবার মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগের সহিত এবং অধীতশাস্ত্র তীর্থকদিগের সহিত তাঁহার শাস্ত্রবিষয়ে তর্কযুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রতিবারেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে তিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই বিক্রমশীলার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে দীপঙ্কর প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমরা যখনকার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন নালন্দা এবং বিক্রমশীলা— এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই উচ্চশিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রায় একই প্রকার জগদ্‌বিস্তৃত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। তবে, নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ছিল না। বঙ্গাধিপ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিক্রমশীলা সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির অধীন ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া গুণিগণের সমাদরে সে কোন অংশেই নালন্দার পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল না। বিদ্যার সমাদরে, পণ্ডিতবর্গের অভ্যর্থনায়, নিরপেক্ষ শাস্ত্রবিচারের কেন্দ্ররূপে বিক্রমশীলা নালন্দারই মত যথার্থ 'বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য ছিল। দীপঙ্করের সময়ে আচার্য্য জিতারি, রত্নবজ্র, জ্ঞানশ্রীমিত্র, রত্নকীর্ত্তি, নরপান্থ প্রমুখ প্রথিতকীর্ত্তি বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বিক্রমশীলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান, চরিত্র ও তপস্যার দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তৎকালে দেশদেশান্তর হইতে শিক্ষার্থিগণ বিদ্যালাভের আশায় বিক্রমশীলায় সমাগত হইত। এই বিদ্বজ্জন-সমাজে অবস্থিতি করিয়া দীপঙ্কর দিনে দিনে নিজ অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও সাধনশক্তির বলে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দিনে দিনে তাঁহার প্রতিভার খ্যাতি শুধু ভারতের সর্ব্বত্র নহে, পরন্তু তৎসীমা লঙ্ঘন পূর্ব্বক সুদূর তিব্বত, নেপাল, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল।

এইকালে তন্ত্র-অধ্যুষিত তিব্বতে মহাধার্ম্মিক লাঃ লামা ইয়েসি হোড্ রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রেরণায় ২১ জন বৌদ্ধ শ্রমণ বিশেষজ্ঞান লাভের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে যথার্থ শাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে লইয়া গিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করা রাজার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল। তিব্বতের শ্রমণগণ মগধ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্যগণের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিবার কালে কয়েকজন ভারতীয় শ্রমণকে তিব্বতে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। উহাদের প্রমুখাৎ অতীশ দীপঙ্করের গভীর পাণ্ডিত্য ও অনুপম চরিত্র-মাহাত্ম্য বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়া রাজা তাঁহাকে একবার তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য নিরতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে 'গ্যয়ৎসন গ্র্‌সেন্‌গি' নামক জনৈক শ্রমণকে প্রচুর স্বর্ণ ও শতাধিক অনুচরসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গ্র্‌সেনগি বহুশ্রমে বিক্রমশীলায় উপনীত হইয়া শ্রীজ্ঞানের দর্শনলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তিব্বতগমনে সম্মত করাইতে পারেন নাই। কথিত আছে, তিব্বতীয় শ্রমণ এক বৃহৎ স্বর্ণখণ্ড ও রাজার নিমন্ত্রণপত্র দীপঙ্করের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি তিব্বতে গমন করিলে প্রচুর স্বর্ণ ও সম্মান লাভ করিবেন।

কিন্তু ত্যাগব্রত শ্রীজ্ঞান তৎক্ষণাৎ সে স্বর্ণখণ্ড প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমি স্বর্ণ কিংবা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী নহি,—আপনাদের রাজাকে এই কথা নিবেদন করিবেন। অপ্রতিভ গ্যয়ৎসন নিজভ্রম সংশোধিত করিয়া অতঃপর বহু অনুনয় করিলেন, চোখের জলের

মধ্যদিয়া তাঁহার আন্তরিক আকুতি পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেন। এমনভাবে নিবেদন করিলেন যে, দীপঙ্কর অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনাও দিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তখন তিব্বতগমনে সম্মত হইলেন না। ব্যর্থপ্রযত্ন শ্রমণ দেশে ফিরিয়া গেলেন। রাজা লাঃ লামা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তিনি আশা ছাড়িলেন না। যে প্রকারেই হউক শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনিতে হইবে, এবং তাহা একান্তই অসম্ভব হইলে অন্ততঃ তৎপরবর্ত্তী যিনি তাঁহাকেও আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে,—এই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া রাজা নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অর্থসংগ্রহ ও প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা অল্প কয়েকজন পার্শ্বচরসহ গাড়োয়ালরাজ্যের সীমান্তে জনৈক বৌদ্ধবিদ্বেষী গাড়োয়ালরাজকর্ত্তৃক তিনি বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় শত্রুকারাগারেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। শোনা যায়, জীবনের শেষমুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত নিদারুণ কারাক্লেশের মধ্যেও দীপঙ্করেরই চিন্তায় তিনি নিজকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তিব্বতের পরবর্ত্তী রাজা, নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র 'চ্যাংচুব'কে এই অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছিলেন যে, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য তিনি যেন বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। রাজা লাঃ লামা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও শ্রীজ্ঞানকে তিব্বতে আনিবার চেষ্টায় বিধর্ম্মী রাজা কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন,—এই সংবাদটুকু যেন অতীশের পায়ে নিবেদন করা হয়, অতীশ যেন দুঃখী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

'চ্যাংচুব' যথাসময়ে বিনয়ধর নামক জনৈক সংস্কৃতভাষাবিৎ পণ্ডিতকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিনয়ধর পাঁচজনমাত্র অনুচর লইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করেন এবং বহু বিপদ, দুঃখ ও কঠোরতার মধ্যদিয়া দীর্ঘ সময়ে বিক্রমশীলায় পৌঁছেন। বিনয়ধরের শিক্ষক তিব্বতীয় শ্রমণ 'গ্যয়ৎসন' তখন বিক্রমশীলায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই উপদেশে নিজ প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া সানুচর বিনয়ধর শিক্ষার্থিরূপে বিক্রমশীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। দুই-চারিদিনের মধ্যেই শ্রীজ্ঞানের দর্শনলাভের সুযোগও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কথিত আছে, বিনয়ধরের বিক্রমশীলায় পৌঁছিবার অতি অল্পকাল পরেই তথায় অষ্ট সহস্র বৌদ্ধ-ভিক্ষুর এক বিরাট সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। বিরাট চন্দ্রাতপের নীচে সেই সম্মেলন-সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দূরদূরান্তস্থিত বৌদ্ধবিহার ও চৈত্যসমূহ হইতে প্রথিতকীর্ত্তি শ্রমণগণ সেই সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিনয়ধর এবং গায়ৎসনও দর্শক হিসাবে তথায় আসন লাভ করিয়াছিলেন।

ধীরে ধীরে সভারম্ভের কাল সমীপবর্ত্তী হইল, ধীরে ধীরে আচার্য্যস্থানীয় শ্রেষ্ঠ শ্রমণগণ একে একে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে লাগিলেন। প্রথমে আচার্য্য স্থবির বিদ্যাকোকিল সভায় প্রবেশ করিলেন, তৎপর আসিলেন সৌম্যদর্শন বৌদ্ধসাহিত্যপারগ মহাপণ্ডিত নরপাদ। তারপর বিক্রমশীলার রাজা স্বয়ং সভামণ্ডপে উপস্থিত

হইলেন এবং এক সুসজ্জিত উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিনয়ধর তদীয় ভ্রমণকাহিনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, যদিও বিক্রমশীলা রাজশক্তি পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তথাপি সভামধ্যে রাজার উপস্থিতিতে কোন পণ্ডিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন না, কিংবা কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। বস্তুতঃ, বিক্রমশীলা তৎকালে বিদ্যাচর্চ্চারই কেন্দ্র ছিল, পণ্ডিত সমাজের জন্যই তথায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের ব্যবস্থা ছিল, নৃপতির জন্য নহে। সে যাহা হউক, ক্রমে সভার সমুদয় শ্রেষ্ঠ আসন পূর্ণ হইল। কেবল একটিমাত্র আসন তখনও শূন্য। অচিরে ধীর পাদক্ষেপে প্রশান্তমূর্ত্তি একজন প্রবীণ শ্রমণ সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সভামণ্ডপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন একটা চাঞ্চল্যের শিহরণ খেলিয়া গেল। বিনয়ধর অক্লেশে চিনিতে পারিলেন, তদানীন্তন জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী, পণ্ডিতসমাজের শীর্ষস্থানীয় মহাপণ্ডিত শ্রীজ্ঞান সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

এই প্রথমদর্শনের পরও দুই-একবার এই মহাপুরুষের দর্শনলাভের সৌভাগ্য বিনয়ধরের হইয়াছিল এবং প্রতিবারেই একটা প্রবল ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রেরণায় তিনি আবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া তিব্বত যাইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। তারপর, বহুকাল বিক্রমশীলায় অতিবাহিত করিয়া একদিন গ্যয়ৎসনকে সঙ্গে লইয়া নিভৃতে শ্রীজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ প্রার্থনা সবিনয়ে নিবেদন করেন। কি ভাবে তিব্বত রাজ্য তন্ত্রব্যভিচারে নিয়ত অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে, কি ভাবে দেশবাসী নরনারী জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অতীশের দুর্লভ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় একান্ত তৃষিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে, কি ভাবে রাজা লাঃ লামা তাঁহারই পুণ্যনাম জপ করিতে করিতে বিধর্ম্মী রাজার তমোময় কারাগৃহে অশেষ দুঃখের মধ্যে ধীরে ধীরে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন,—তাহা অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বিনয়ধর শ্রীজ্ঞানের নিকট প্রকাশ করিলেন। সংসারত্যাগী ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ সে কাহিনী শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষে অশ্রুধারা বহিয়াছিল এবং আরব্ধ কার্য্যাদি সমাপ্ত করিয়া বৎসরান্তে তিব্বত যাইতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া তিনি স্বীকৃতও হইয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতিক্রান্ত হইল। বিনয়ধর আবার শ্রীজ্ঞান সমীপে নিজ প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। তখন গুরু স্থবির রত্নাকরের অনুমতি এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিহারের আচার্য্যগণের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার প্রাক্কালে রত্নাকর এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে যে, দীপঙ্করের অভাবে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম নিতান্ত মলিন হইবে, বহু বিহার এককালে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্দ্দিনের অমানিশা সমাগত হইবে। কিন্তু তথাপি অতীশের আন্তরিক অভিপ্রায় জানিয়া তিনি তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন নাই।

অনন্তর যথাকালে, শুভদিনে দীপঙ্কর যাত্রা করিলেন। বিক্রমশীলা হইতে যতই তিব্বতাভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পথে পথে বিপুল সম্মান ততই তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। নেপালরাজ অনন্তকীর্ত্তি তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র পদ্মপ্রভ শ্রীজ্ঞানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

এইরূপে সুদীর্ঘ পথে নানা সম্মান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে শ্রীজ্ঞান অবশেষে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিব্বত-সীমান্তে চারিজন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহার জন্য বহু লোকজন সমভিব্যাহারে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তথায় রাজকীয় প্রথানুসারে প্রথমতঃ নানা উপঢৌকন ও অভিনন্দন দানে তাঁহাকে নন্দিত করা হইয়াছিল। তৎপর "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"—এই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে তাঁহাকে স্বাগত অভিবাদন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল এবং 'কল্পতরু', 'চিন্তামণি' এবং 'ভারতের পুণ্য অতিথি' প্রভৃতি বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছিল। অতঃপর রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে—"হে প্রভু, আমরা ধন্য হইলাম, দেশ উজ্জ্বল হইল। তোমার শুভাগমনে সমগ্র তিব্বত ভূখণ্ড পবিত্র হইয়া গেল।"—ইত্যাদি বাক্যে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তিব্বতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যে অপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে অনুরূপ সম্মান আর কাহাকেও তিব্বত কখনও প্রদান করে নাই। তিব্বতের নরনারী তাঁহাকে যেন নরশরীরে আবির্ভূত দেবতাজ্ঞানে অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা ও প্রেম নিবেদন করিয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, শ্রীজ্ঞানই রাজ্যের যথার্থ নিয়ামক; তাঁহার আদেশ যেন কদাচ লঙ্ঘিত না হয়। এইরূপে বহু সম্মানের মধ্যে দীর্ঘকাল শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বাস করিয়াছিলেন এবং প্রায় ত্রয়োদশবর্ষ অন্তে সেইখানেই লাসা নগরের সন্নিহিত 'লেথান' নামক এক পল্লীতে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষাপ্রভাবে সমগ্র তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তৎকালে অর্দ্ধএশিয়ায় শ্রীজ্ঞানের অসাধারণ কীর্ত্তিকাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল। রাজচক্রবর্ত্তীরা পর্য্যন্ত তাঁহার নামে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া নতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পর দীপঙ্করের ন্যায় আর কোন মহাপুরুষ বৌদ্ধজগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তিব্বতে বাসকালে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে-সকল গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত বৌদ্ধজগতে বিশেষভাবে সমাদৃত।

একদা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীকোল আলো করিয়া এই পুরুষপ্রবর আমাদেরই ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজ শিক্ষা, তপস্যা ও চরিত্রমাহাত্ম্যে তদানীন্তন জগতে অতুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া নিজ দেশ, বংশ, জাতি ও ধর্ম্মকে ধন্য করিয়াছিলেন। সে কাহিনী—তাঁহারই দেশবাসী আমরা—চিরদিন যেন কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে স্মরণ করি। তাঁহার অমর জীবনাদর্শ আমাদিগকে যেন চিরকাল উদ্বুদ্ধ করে।

চড়ুই-ভাতি

মিস্ আনা দাশগুপ্তা, বি. এ., বি. টি.

'পান্নাবাবু রান্না করেন,
　　ঘণ্ট রাঁধে আন্না,
উনান সাজায় ক্ষান্তমাসী,
　　পদ্মিপিসি বাটনা।
আনাজ কোটেন বঙ্কুবাবু,
　　বোঁটি কাটে সজনা ;
চড়ুই-ভাতি নদীর ঘাটে
　　মণ্টু যাবি ?—চল্‌না !

রাঙ্গাখুড়ির ছোট্ট ছেলে
　　জুড়িয়ে দেছে কান্না—
এক্ষুণি সে গরম গরম
　　খাবে ছানার ডাল্‌না।
ঘোস্‌-পাড়াদের নন্দিনী ঐ
　　চড়িয়ে দেছে মাংস,
হ্যাংলা ভুলু মোড়ায় ব'সে
　　করছে কেবল ধ্বংস !
রায় মশায়ের গিন্নী বলেন,
　　'মাংস এখন আর না—
বোল্‌তা গাছের শুক্‌নো গুড়ি,
　　না-হয় ব'সে কাট্ না !'

চায়না পিসি ভাজছে লুচি,
　　কেমন ঘোরায় বেল্‌না—
ভুল্‌কো লুচির গন্ধ পেয়ে
　　সন্ধ্যাটা দেয় ধন্‌না।
বন্ধ ক'রে গ্রন্থাবলী,
　　পিণ্টু, মিনু, ঝরণা—
বাব্‌লা গাছের আগ্‌-ডালাতে
　　বাঁধ্‌ছে ক'সে দোল্‌না।

কুঞ্জবাবুর বৌটা রোগে
　　উনান-পারে যান না,
নিষেধ আছে গুরুর বুঝি
　　কারু ছোঁওয়া খান না।
তাইতে তিনি মিষ্টি খাবেন—
　　লুচি, ছানার ডাল্‌না,
পোস্ত-বড়া, চসির পায়েস ;
　　আর কিছুই চান না।

ষষ্ঠী কাকা বড্ড রাগী,
　　গেছেন তিনি খুলনা—
ধমকি ছাড়া কারু সাথে
　　হেসে-ও কথা কন না।

লক্ষ্মী মেয়ে ক্ষেমঙ্করী
দুষ্টু মেয়ে পূর্ণা—
চড়ুই-ভাতির কথা জেনেও
পাঠিয়ে দিলেন কালনা।

বড্ড ক্ষিদে পেট্‌টা জ্বলে,
আন্‌না লুচি ডাল্‌না ?
"সন্ধ্যাবেলা ঘুমোস্ খোকন্
দুধ্‌টা খেয়ে ফেল্‌না।"

ধমক খেয়ে চমকে জেগে
খোকন ওঠায় কান্না—
কোথায় গেল ক্ষান্তমাসী
পদ্মিপিসি, আন্না—।

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

নরস্ত্রের অভিযান

সন্ধ্যার সূর্য্য ধীরে ধীরে ওদিককার পাহাড়ের আড়ালে অস্ত গেল। সাগরের উপর দিয়া অলক্ষ্যে অন্ধকার আসিয়া ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ছাইয়া ফেলিল। আকাশের বুকে সাদা সাদা ফুলের মত অগণ্য নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিল। সুরেশ প্রবালের স্তূপের উপর উঠিয়া বসিল, এখন আর অন্ধকারে কেহ গুলী করিতে পারিবে না।

ওদিকে বিশুয়া গড়াগড়ি করিতেছে দেখিয়া কতকগুলি শ্যামালতা কাটিয়া আনিয়া তাহাকে আরও শক্ত করিয়া বাঁধিল, যেন পলাইতে না পারে। বিশুয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সুন্দরম্ জাহাজখানা মাত্র দুইদিন পূর্ব্বেই এই দ্বীপে আসিয়া কতকগুলি চায়ের বাক্স রাখিয়া গিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিল, এ তাহার বেণীমাধবের সেই মাল। সুন্দরম্ আবার কখন আসিবে তাহা জানিতে পারিল না।

সুরেশ বুঝিল, তাহার আর উদ্ধারের কোনও উপায় নাই। এ দ্বীপে মাত্র একটি জাহাজই যাওয়া-আসা করে, সেটি সেই সুন্দরম্। তাহাতে চৌদ্দ-পনের জন লোক, লোকগুলি দুর্দ্দান্ত খুনে। সুতরাং তাহার আর ভরসা কোথায়!

আপাততঃ দেখা যায় শত্রু মাত্র একজন। যদি এ ব্যক্তির সহিত পারিয়া উঠে তবেই পরবর্ত্তী শত্রুদের কথা চিন্তা করা যাইতে পারে, নতুবা এই শেষ। আর যদি এ ব্যক্তির সঙ্গে

সুবিধা করিতে না পারে, তবে আর এক পথ খোলা আছে, বিশুয়ার ডোঙ্গাটা লইয়া বঙ্গোপসাগর পার হইবার চেষ্টা।

হয়তো পাণ্ডুরংএর বাসায় খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে; কিন্তু তাহা পাওয়া যাইতে পারে যদি সে তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। মৃত্যু তো তাহার শিয়রেই, চুপ করিয়া থাকিলেও পাণ্ডুরং তাহাকে গুলী করিয়া খুন করিতে পারে; কাজেই একবার লড়িয়া দেখাই সঙ্গত। যদিও মাদ্রাজীটা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, তবুও সে ভীরু; সুতরাং সাহস করিলে যে একেবারে নিষ্ফল হইবে তাহা মনে হয় না। আর ভয় করিয়াই বা লাভ কি!

সুরেশ নীচে নামিয়া দেখিল বিশুয়া মরার মত চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সভয়ে বলিল—"বাবু, ইখন তুই মোর মালেক। মোকে খুন করিস না। মুই তোর গোলাম আছি, মুই ভাল মানুষ আছি!"

—"তুই ভাল মানুষ আছিস, যদি ভাল থাকিস তবে আমিও তোর কোন ক্ষতি করব না। আমি যাচ্ছি মাদ্রাজীটার মাথা কাটতে। যদি এসে দেখি তুই গোলমাল করেছিস তবে তোরও মাথা কাটব।"

—"মুই গোলমাল না কোরবো বাবু। মুই চুপচাপ থাকবো।"

সুরেশ বুঝিল যে বিশুয়া আর পলাইবে না, সুতরাং পাণ্ডুরংএর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নদী পার হইয়া ওপারের পাহাড়ে উঠিতে হঠাৎ একটা পাথর গড়াইয়া নদীর মধ্যে পড়িল। পাথর পড়ার শব্দ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া খুব জোরে একটা আওয়াজ হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কুড়ি-পচিশ হাত দুর হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইল ও গুলীটি নদীর ওপারের এক পাথরে যাইয়া লাগিল। সে বুঝিল, আততায়ী আর বেশী দূরে নাই এবং শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়াছে।

সুরেশ অতি সাবধানে হামাগুড়ি দিয়া উপরে উঠিল এবং একটি পাথরের আড়ালে শুইয়া পড়িয়া আর একটি বড় পাথর আবার গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দিল। তখন বৃষ্টির ফোঁটার মত দ্রুম্‌-দ্রাম্‌ করিয়া অসংখ্য গুলী তাহার মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল। সে চুপচাপ পাথরের আড়ালে পড়িয়া রহিল।

গুলী কয়েক মিনিট পর বন্ধ হইল। সুরেশ একটি পাথর লইয়া যেদিক হইতে গুলী আসিয়াছিল, সেইদিকে নিক্ষেপ করিল। পাথরটা টুপ করিয়া পড়িতেই লোকটা আর্ত্তভাবে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল, সে যেন ভূত দেখিয়াছে। তারপরেই সে যেন বনবাদাড় ভাঙ্গিয়া ছুটিতেছে মনে হইল।

সুরেশ লাফাইয়া উঠিল এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতে লাগিল। তাহার মাথায় খুন চাপিয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে অচেনা পথ, আলো অন্ধকারের মেলা, এরই মধ্যে এক পাথর হইতে অপর পাথরে, গাছের পাশ কাটাইয়া, ঝোঁপের মধ্য দিয়া, মাঝে মাঝে ছোটবড় ফাটলগুলি লাফাইয়া

পার হইয়া চলা সহজ নয়। সে যেন অজ্ঞাত শক্তিবেগে সকল প্রতিবন্ধক লঙ্ঘন করিয়া চলিল। বেশ বেগেই ছুটিল, রাস্তা ভাল থাকিলে হয়তো এতক্ষণে আততায়ীকে ধরিয়া ফেলিত।

ছুটিতে ছুটিতে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিল। এখান হইতে দ্বীপের অপর দিকটা আবছায়ার মত দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে বঙ্গোপসাগরের বুকে আকাশের তারাগুলি যেন লুকোচুরি খেলিতেছে। দেখিবার অবসর নাই, সুযোগ পাইলেই আততায়ী আবার ফিরিয়া গুলী করিবে। পাহাড় ক্রমে ঢালু হইয়া নীচে নামিতেছে। নীচের দিকে কতকটা খালি যায়গা, গাছপালা নাই; ছায়ার মত একটি লোক পাহাড় হইতে সেই খালি যায়গাটার মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া চলিয়াছে।

তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সুরেশ আর একটি পাথর ছুঁড়িয়া মারিল, লোকটি আবার বিকট চিৎকার করিতে করিতে উপত্যকার নারিকেল বনে যাইয়া পৌঁছিল। সেও তাহার পেছনে দৌড়াইল। আবার বন্দুকের আওয়াজ হইল, সুরেশের কয়েক হাত দূর দিয়া গুলী চলিয়া গেল।

'ক্যাঁচ্, ছুপ্, খট্টর খট্' শব্দ হইল।

সুরেশ বুঝিতে পারিল যে নিকটেই ঘর আছে। মাদ্রাজীটা ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। সে তখন হামাগুড়ি দিয়া, প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া কিছুদূর চলিবার পর দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল। সম্মুখে প্রায় পনের-ষোল হাত দূরে একটি ঘর। ঘরটি ফাঁকা যায়গায়, সেখানে গাছপালা নাই। সে ছুটিয়া চলিল।

ক্রম্ করিয়া আবার বন্দুকের আওয়াজ হইল। ভাগ্যিস্ সে আঁকাবাঁকা ভাবে চলিয়াছিল, নতুবা এ গুলীটি তাহার গায়ে লাগিত। আবার গুলী করিবার পূর্ব্বেই যাইয়া একটা লম্বা প্রবালস্তূপের আড়ালে বসিয়া পড়িল। সেখানে বসিয়া সুরেশ বেশ নিরাপদ মনে করিতে লাগিল, কারণ অজস্র গুলী তাহার মাথার অনেকটা উপর দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু প্রবালস্তূপের জন্য একটিও তাহার শরীরে আসিয়া লাগিল না। (ক্রমশঃ)

বিদ্যুতের জয়-যাত্রা

শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা

প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া মানুষ যেদিন ঘন মেঘের অন্তরাল হইতে বিদ্যুৎকে বন্দী করিয়া মর্ত্ত্যের বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়াছে, সেদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বিদ্যুতের জয়-যাত্রা— অবিরাম উদ্দাম গতিতে; আজও উহা সমভাবেই সেই জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বিশ্ব-সভ্যতার মান বৃদ্ধি করিতে।

বিদ্যুৎ-আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা। এই আবিষ্কার যে কত নূতন নূতন উদ্ভাবনী কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আবার ইহা যুদ্ধ এবং নানারূপ ধ্বংসমূলক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস-পথেরও সন্ধান দিতেছে।

এই আবিষ্কারের ফলে তারে-বেতারে, টেলিফোন-রেডিওতে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে রাস্তাঘাট ও গৃহাদি সুন্দর ও শোভনরূপে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিরাট বিরাট কলকারখানা অল্প ব্যয়ে চালিত করিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পথ সুগম হইয়াছে। যানবাহন পরিচালনার কার্য্যে এ যুগে বিদ্যুতের ব্যবহারও একরূপ অপরিহার্য্যই হইয়া উঠিয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক রেলওয়ে, ট্রাম, মাল চলাচলের জন্য রোপ রেলওয়ে এখন বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালনা করা হয়। বাষ্প-পরিচালিত যানবাহন অপেক্ষা বিদ্যুৎ-পরিচালিত যানবাহন অধিক দ্রুতগামী। শুধু তাহাই নহে, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতির উপর দিয়া বাষ্প-পরিচালিত ট্রেন সহজ-গতিতে চলিতে পারে না, কিন্তু বিদ্যুৎ-চালিত ট্রেন অনায়াসে এই পথ অতিক্রম করে। এই কারণেই আমেরিকার পার্ব্বত্য অঞ্চল সমূহে ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনের অত্যধিক প্রচলন হইয়াছে।

গৃহস্থালীর কার্য্যেও বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমেই খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। রান্নাবান্নার কাজে, কাপড় কাঁচা ও ইস্ত্রী করা, এঁটো বাসন পরিষ্কার করার জন্যও বর্ত্তমানে বিদ্যুতের ব্যবহার হইতেছে। এমন কি মৃতদেহ দাহ করার কার্য্যে পর্য্যন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উঁচু দালানে উঠিতে লোকের কষ্ট হয়, তাই ইলেক্‌ট্রিক সিঁড়ি বা লিফ্‌টের প্রচলন হইয়াছে। চলচ্চিত্র, সবাক চিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতিও বিদ্যুতেরই অবদান। বিদ্যুতের সাহায্যে কেবলমাত্র সঙ্গীত, সংবাদ, বক্তৃতা ইত্যাদিই যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে প্রেরণ করা যায় তাহা নহে, উহার সাহায্যে আলোক-চিত্র, হস্তলিপি প্রভৃতি প্রেরণও সম্ভব হয়। শুধু কি তাহাই—ধর ইংল্যাণ্ডের কোনস্থানে একটি খুব বড় ধরণের ক্রিকেট ম্যাচ সুরু হইয়াছে,

সঙ্গে সঙ্গেই বেতারে উহা নিউইয়র্কে প্রেরিত হইতেছে। সেখানকার সংবাদপত্র-ওয়ালারা আবার এই চিত্র গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সংবাদপত্রে মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতেছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার একবার ভাবিয়া দেখ ত! ইচ্ছা করিলে ঐ বেতারে প্রেরিত চিত্রকে যাহাতে চলচ্চিত্রে পরিণত করা যায়, তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। এক সময় হয়ত উহা সাফল্যলাভও করিবে। ধর, বোম্বাই নগরী হইতে কোন জনপ্রিয় নেতা বক্তৃতা করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় বসিয়া তোমরা উহা শুধু শুনিতেই পাইবে না, একেবারে সবাক চলচ্চিত্রের মত উপভোগও করিতে পারিবে। ইহাকে ভূতুড়ে কাণ্ড বলিয়া মনে হয় না কি? আরও কত সব আশ্চর্য্য কাণ্ড যে বিদ্যুতের সাহায্যে ঘটিতেছে, তাহা লিখিতে গেলে কয়েকখানা বড় বই-ই হইয়া যায়! এত সমস্ত আবিষ্কার করিয়াও কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট নহেন। দিনের পর দিন তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন বিদ্যুৎকে আরও নূতন নূতন কাজে নিয়োজিত করিতে।

বিজ্ঞানকে মানবের সেবায় নিয়োগ করাই বিজ্ঞানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই ইঁহাদের আবিষ্কার মানুষকে অমৃতের সন্ধান দেয়—মানুষকে সুখে সমৃদ্ধিতে বাঁচিয়া থাকিবার পথ প্রদর্শন করে। সূর্য্যালোকে অতি-বেগুনীয়া রশ্মি (Ultra Violet Ray) নামে এক প্রকার রশ্মি আছে। ইহার নানাপ্রকার জটিল ব্যাধি আরোগ্যের শক্তি আছে—বিশেষ করিয়া লুপাস নামক এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি। যক্ষ্মার জীবাণু দ্বারা মানুষের দেহের ত্বক আক্রান্ত হইলে এই ব্যাধি জন্মে। ক্ষত এবং পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি চর্ম্মরোগও ইহার সাহায্যে আরোগ্য হয়। শিশুদের রিকেট নামক এক প্রকার উৎকট ব্যাধি এই রশ্মিদ্বারা নিরাময় করা সম্ভবপর হয়। এই কারণেই বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম সূর্য্যালোক প্রস্তুত করিতে মনোনিবেশ করিলেন এবং সাফল্যলাভও করিলেন। কৃত্রিম উপায়ে এই রশ্মি প্রস্তুত করিবার কারণ, ইহা সূর্য্যালোক হইতে একই সময়ে অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রোগীর উপর প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে, আর সূর্য্যালোকে উহার পরিমাণও সামান্য। ইহা ছাড়া, একদিন ধর সমস্ত আকাশটা মেঘেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কি হইবে? তখন কৃত্রিম রশ্মি ব্যবহার করা ছাড়া আর উপায় কি? আর পৃথিবীর সমস্ত দেশে সকল সময় সূর্য্যালোক পাওয়াও যায় না। এই জন্যই বিজ্ঞানী বিদ্যুতের সাহায্যে সূর্য্যালোকস্থিত অতি-বেগুনীয়া রশ্মির ন্যায় গুণ সম্পন্ন এক প্রকার কৃত্রিম রশ্মি প্রস্তুত করিলেন। ইহাকে কৃত্রিম সূর্য্যালোক বলা যায়।

কৃত্রিম সূর্য্যালোক প্রস্তুত করিয়াই বিজ্ঞানী কিন্তু সন্তুষ্ট রহিলেন না। আবার কৃত্রিম চন্দ্রালোক প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল। সিড্‌নী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেইলী সাহেব ইহা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষাদ্বারা ইহার কার্য্যকরী ক্ষমতা জনসাধারণকে দেখাইয়াও দিয়াছেন। কি করিয়া কৃত্রিম জ্যোৎস্নালোক প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা বলিতেছি। পৃথিবীর যে সমস্ত স্থান আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নিকট শূন্য বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ পক্ষে উহা কিন্তু শূন্য নহে। উহা

ইথার নামক একপ্রকার পদার্থদ্বারা পরিপূর্ণ। পুকুরের জলে তোমরা কখনও ঢিল ছুঁড়িয়াছ কি? ছুঁড়িয়া থাকিলে নিশ্চয় দেখিয়াছ, ঢিলের আঘাত লাগিবামাত্র পুকুরের বুকে ছোট ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে। ইথারে আঘাত করিলেও ঐ প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আলোক জিনিষটি ইথার-সমুদ্রের ঐ প্রকার তরঙ্গ হইতেই জন্মিয়া থাকে। শুধু আলোকই নহে তাপ, এক্স্-রে, অতি-বেগুনীয়া রশ্মি, রেডিও-তরঙ্গ প্রভৃতি সমস্তই ইথারের তরঙ্গ হইতে জন্মে। ছোট বড় এক এক প্রকার তরঙ্গে এক এক প্রকার জিনিষ জন্মিয়া থাকে। অধ্যাপক বেইলী বলেন—যে উপায়ে ইথার-সমুদ্রে তরঙ্গ উত্থিত হইলে আলোকের জন্ম হয়, অবিকল সেই উপায়েই জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোক ইথারমণ্ডলীতে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহের সাহায্যে ইথার-সমুদ্রে আঘাত করিয়া তরঙ্গ সৃষ্টি করিবার ফলেই এই আলোক সৃষ্টি সম্ভবপর হয়, ফলে প্রচুর আলোক ইথারমণ্ডলী হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।

ব্যাপারখানা খুবই মজার নহে কি? তোমাদের মধ্যে যাহারা গ্রামে বাস কর এই আবিষ্কারের ফলে তাহাদের সুবিধাই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রিতে গ্রামে পথ চলা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! ইহার পর সহরেও আর মিউনিসিপ্যালিটির আলোকের ব্যবস্থা করার দরকার হইবে না। ফলে বহু খরচ বাঁচিয়া যাইবে। কারণ কৃত্রিম জ্যোৎস্নালোক প্রস্তুতে ব্যয় অল্পই হইবে। এক স্থান হইতে আলোক সৃষ্টি করিয়া বহু-বিস্তৃত স্থান আলোকিত করা যাইবে।

দেহের অভ্যন্তরে যদি কোন ব্যাধি জন্মে, তবে ঐ রোগ নির্ণয় করিতে চিকিৎসকদিগকে ভারী অসুবিধায় পড়িতে হয়। অনেক সময়ই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতে হয়। কাহারও বুকের পাঁজরের একখানা হাড় ভাঙ্গিয়া গেল, উহা কতটুকু ভাঙ্গিয়াছে, কি অবস্থায় আছে তাহা বাহির হইতে বুঝিবার কোন সহজ উপায় নাই। যক্ষ্মারোগে মানুষের ফুস্ফুসে ঘা জন্মে। চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঘা পরীক্ষা করিতে পারিলে ভাল হয়। পাকস্থলী, লিভার প্রভৃতিতেও নানাপ্রকার জটিল ব্যাধি জন্মে। ভালরূপে পরীক্ষা না করিতে পারিলে ঐ সব ব্যাধির চিকিৎসাও করা যায় না। অনুমানের বা শুধু রোগলক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিলে সকলক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায় না। এই কারণেই বিজ্ঞানী মনোযোগ দিলেন—কি করিয়া বাহির হইতে পরীক্ষা করিয়া সমস্ত বিষয় জানিয়া চিকিৎসা করা যায়। ফলে আবিষ্কৃত হইল, রঞ্জন-রশ্মি বা এক্স্-রে (X-Ray)। এই রশ্মির এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য শক্তি যে, যে কোন অস্বচ্ছ পদার্থ ই ইহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে। শুধু হাড় এবং লোহা প্রভৃতি কতকগুলি অস্বচ্ছ পদার্থে মাত্র এই রশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অস্বচ্ছ পদার্থের অভ্যন্তরভাগে যে সব পদার্থ আছে, এই রশ্মির সাহায্যে শুধু উহা

চোখেই দেখা যায় না, ইচ্ছা করিলে উহার আলোক-চিত্রও গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই রশ্মির আবিষ্কর্ত্তার নাম উইলিয়ম কোনরেড্ ফন রন্‌জেন। ইঁহারই নাম অনুসারে এই রশ্মির নামকরণ হইয়াছে রঞ্জন-রশ্মি। এই রশ্মিও বিদ্যুতের সাহায্যেই প্রস্তুত হয়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পেও নানাভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার হইতেছে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি। বৃষ্টি না হইলে শস্য জন্মে না। এইজন্য যে দেশে অল্প বৃষ্টি হয়, সেই দেশে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত করাইয়া শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাও বিদ্যুতের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যুৎ যুদ্ধ প্রভৃতি ধ্বংসমূলক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস-পথের সন্ধানও প্রদান করিয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে এক প্রকার অতি মারাত্মক ধরণের মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বিদ্যুতের সাহায্যে। উহার নামকরণ করা হইয়াছে মৃত্যু-রশ্মি (Death Ray)। প্রকৃতই উহা মৃত্যু-রশ্মি। উহার সংস্পর্শে আসিবামাত্র মৃত্যু অনিবার্য্য। বাড়িঘর, গাছপালা, মানুষ বা যে কোন প্রাণী উহার আওতায় আসিয়া পড়ে, তাহাই ধ্বংস হইয়া যায়। কী ভীষণ ব্যাপার একবার কল্পনা করিয়া দেখ! আজ পর্য্যন্ত ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান, বিষ বাষ্প বা গ্যাস প্রভৃতি যত প্রকার মারাত্মক মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভীষণতায় উহার কোনটাই ইহার সমকক্ষ নহে। বিদ্যুৎ-রশ্মিকে কৌশলে ঘনীভূত করিয়া শক্তিশালী প্রতিফলক (Reflector) কাঁচের সাহায্যে ঐ রশ্মি প্রতিফলিত করা হয়। ব্যস্, আর রক্ষা নাই। যতদূর পর্য্যন্ত এই রশ্মি প্রতিফলিত হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমেরিকার এক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এই আবিষ্কার করেন। এই বিশ্ব-ধ্বংসী মারাত্মক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিবার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার এই আবিষ্কার যদি জন-সমাজে প্রচারিত হয়, তবে একদিন ইহারই সাহায্যে বিশ্বের সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়াই এই মহৎ-হৃদয় বিজ্ঞানী অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন এবং পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার বহু আয়াস-লব্ধ আবিষ্ক্রিয়ার ফল ঐ মারাত্মক যন্ত্রটি ধ্বংস করিয়া ফেলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে কখনও আর এইরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন না।

প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানী আরকিমিডিস্‌ও অনেকটা এই ধরণের একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মৃত্যু-রশ্মির মত সেই যন্ত্রটি এত বেশী শক্তিশালী হয় নাই। কারণ সে যুগে ত আর বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয় নাই। তখন কুব্জ-পৃষ্ঠ (concave) কাঁচের সাহায্যে সূর্য্য-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রতিফলিত করা হইত। ফলে, ইহার সীমানার মধ্যে যাহা কিছু পড়িত তাহাই দগ্ধ হইয়া যাইত। রোমান সৈন্যেরা আরকিমিডিসের মাতৃভূমি সাইরাকিউস্ আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের বহু জাহাজ এই যন্ত্রের সাহায্যে দগ্ধ করেন।

সস্তায় বিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার জন্য জল-স্রোত হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণ করিবারও এক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উপায়ে প্রস্তুত বিদ্যুৎ দ্বারা আমেরিকা ও ইউরোপের

বহু কলকারখানা অতি অল্প ব্যয়ে পরিচালিত হয়। আমাদের দেশেও এইরূপে বিদ্যুৎ প্রস্তুতের কারখানা কয়েকটি আছে। দক্ষিণভারতে পাইকারা নদীর জল বাঁধ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বিদ্যুৎ প্রস্তুতের জন্য যে কারখানা এক কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তৈরী করা হইয়াছে, উহা হইতে দক্ষিণভারতের বহু জেলা ও সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

ভবিষ্যতে বিদ্যুতের সাহায্যে নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে কি অঘটন ঘটাইবে, মানুষ ইহার সাহায্যে আরও কত নব নব সুখ-সুবিধা লাভের অধিকারী হইবে, বর্ত্তমানে উহা আমাদের কল্পনার বিষয় মাত্র। এমন দিন হয়ত আসিবে যখন মানুষের নিজ হাতে আর কোন কাজই করিতে হইবে না। সুইচ্ টিপিবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সম্পন্ন হইয়া যাইবে মুহূর্ত্তমধ্যে। ভারতবর্ষে বসিয়া আমেরিকার ক্রিকেট খেলা দেখা সম্ভব হইবে। ইউরোপে বসিয়া আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করা চলিবে। ইচ্ছা হইল অস্ট্রেলিয়ায় যাইবে, তৎক্ষণাৎ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। ইচ্ছামত আকাশ হইতে বৃষ্টি নামাইতে বা থামাইতে পারিবে। পৃথিবীটা এক যাদুর রাজ্যে পরিণত হইবে। আজ এসব অবশ্য কল্পনারই বিষয় সন্দেহ নাই—কিন্তু বিদ্যুৎ-শক্তি যেরূপ উদ্দামগতিতে দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে জয়-যাত্রার পথে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত এইসব কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে।

কামালের আত্মমর্য্যাদা

আকামোশা

তোমরা মোস্তফা কামালের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, আমি তরুণ তুরস্কের জন্মদাতা কামাল আতাতুর্কের কথাই বলছি।

তাঁর জীবনের একটি ছোট্ট ঘটনা তোমাদের শোনাবো।

কামাল ছিলেন তখন একজন সামান্য লেফ্‌টেনাণ্ট্। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির প্রশংসা ধীরে ধীরে দেশে ছড়িয়ে পড়ছিলো। যারা তাঁকে জানতো তা'রা তাঁকে খুবই ভয় করতো। কামালের শরীর ছিল বলিষ্ঠ ও দৃঢ়—চোখ দুটো ছিল নেকড়ের মতো। এই 'নেকড়ে চোখের' জন্য তাঁকে 'ধূসর নেকড়ে' আখ্যা দেওয়া হয়েছিলো। লোকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যখন কথা বলতেন, মনে হত সটাসট্ পিস্তলের গুলি বেরিয়ে আসছে,—সে কথাগুলি ছিল এমনি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট!

যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন কাজে তিনি গেলেন কোন এক বড়দরের সামরিক কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে। আর্দ্দালী 'মোস্তাফা কামাল' নাম লেখা কার্ডখানা সামরিক কর্ম্মচারীর সামনে নিয়ে গেল। মুখ তুলে নামটি পড়েই মনে হলো যেন তিনি ভূত দেখছেন। কামালের

প্রতি তা'র একটা দারুণ ভয় ছিল। তিনি জানতেন যে কামাল কাজের মানুষ, তাঁদের মতো সুলতানের বেতন-পোষা নিরীহ অকর্ম্মণ্য লোক নয়। এঁর সামনে কোনো বাজে কথা চলে না। এরকম একটা লোকের সামনাসামনি কথা বলা মোটেই নিরাপদ নয়—তার ওপর যদি কোন ত্রুটীই হয়ে যায়—তা হলে কি আর রক্ষা আছে? কিন্তু পরক্ষণেই মুখখানা বিকৃত করে এই ভাব দেখালেন যে, ঐ সমস্ত বাজে লোককে প্রশ্রয় দেওয়ার সময় কোথায়!

বিরক্তমুখে আর্দ্দালীকে বললেন—আমি খুব ব্যস্ত।

আর্দ্দালী ফিরে এসে কামালকে বললো—সাহেব ব্যস্ত আছেন। আপনি কি অপেক্ষা করবেন?

কামাল অপেক্ষা করতে লাগলেন। বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

ব্যাপার কি? এখনও সময় হলো না? আর্দ্দালীকে আবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বললেন।

আর্দ্দালী সামরিক কর্ম্মচারীকে এসে বললো—মোস্তফা কামাল…

—শুনতে পাচ্ছো না—আমি এখন কাজে ব্যস্ত—রেগে টং হয়ে তিনি উত্তর করলেন।

কামাল তবু অপেক্ষা করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন, আর কতক্ষণই বা অপেক্ষা করা যায়? অথচ কত লোক দিব্যি তার পরে এসেও দেখা করে যাচ্ছে, আ তাঁর বেলা সময়ই হচ্ছে না? কামাল চটে গেলেন—তাঁর গভীর আত্মসম্মানে ঘা লাগলো।

সামরিক কর্ম্মচারীটির আপিসের কাজ হয়ে গেল, বাড়ী যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আর্দ্দালী সবিনয়ে নিবেদন করলো—মোস্তফা কামাল এখনো অপেক্ষা করছেন।

—ও হোঃ ভুল হয়ে গেছে—হ্যাঁ—তা'কে ডেকে পাঠাও…বাস্তবিক তিনি যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন বলে মনে হলো।

আর্দ্দালী কামালকে বললো—হুজুর আপনাকে তলব করেছেন।

কামাল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে আপিসের নিম্নতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। শান্তভাবে বললেন—আচ্ছা, তাঁকে অপেক্ষা করতে বল।

আপিসের সবাই চমকে গেল। আর্দ্দালীও বিস্মিত হলো।

কামাল আবার বললেন—হ্যাঁ তাই বল…

আর্দ্দালী সাহেবকে তাই জানালো।

বিস্ময়ে মুখব্যাদান করে সামরিক কর্ম্মচারীটি আর্দ্দালীর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করাবার ও করার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে লাগলেন।

তোমাদের কি এরকম আত্মসম্মানবোধ হবে না?

খোকার সাধ

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি.

খোকাবাবুর সাধ হয়েছে হবে বাবার মতো ;
নেবে সে সব প্রাইজ-মেডেল ডিগ্রী আছে যতো।
বাবা যখন করেন যাহা খোকাও করে তাই ;
বাবার কোনো জিনিষ এলে খোকারও তা চাই।
তাই তো আমি সব সময়ে সাবধানেতে রই—
খোকার চোখে কখন পাছে একটু খেলো হই।

ঘুমটা তাহার আসে বটে তাড়াতাড়িই রাতে,
ভোরবেলাতে কিন্তু খোকা ওঠে আমার সাথে।
মায়ের মনে ভাবনা জাগে, বলেন ডেকে, "খোকা,
ঠাণ্ডা লাগবে, অত ভোরে উঠতে আছে বোকা!"
ঠোঁট ফুলিয়ে খোকন বলে, "কী যে বাজে বলো!
বাবার ঠাণ্ডা লাগে না তো!—মুখ ধোয়াবে চলো।"

পড়াশুনা করি যখন, খোকাও পড়ে লেখে,
দেশ-বিদেশের হরেক কথা আমার কাছে শেখে।
আমার সাথেই বসে' করে আহার পরিপাটী,—
তাহারো চাই আমার মতন বগী থালা বাটী।
দুপুরবেলা কলেজ করি।—সে-ও বাড়ী বসে'
খুকীটাকে পড়ার ছলে ঠ্যাঙানি দেয় কষে'।

বিকেলবেলা আমার সাথে যায় সে খেলার মাঠে,
মোহনবাগান গোল দিলে যে চেঁচিয়ে গলা ফাটে।
চুমো দেওয়া যায় না তারে আর তো কোনো ছলে—
সে যে এখন হয়েছে বড়ো,—ভুললে তা কি চলে!
মা ছাড়া কেউ "খোকা" বলে' ডাকলে,—খানিক থেমে
ভারী গলায় বলে, "আমি অরুণকুমার, এম-এ।"

পরশুরাম

[আমার দেখা মানুষ]

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ

—১—

বাংলা ১৩০৫ সনের মাঘ মাস। বার্ষিক পরীক্ষার পর বাড়ীতে আসিয়াছি। সকাল বেলা—অনুমান ৯টা। বাবা ভারি ব্যস্তসমস্ত ভাবে একটা কাঠায় (৵৫ সের ধান মাপিবার জন্য বাঁশের পাত্রবিশেষ) দুই হাতে কতকগুলি চিড়া তুলিলেন। সঙ্গে এক কাঁদি সুপুষ্ট কলা, এক খাবল নুন আর গণ্ডা পাঁচ-সাত লঙ্কা লইলেন। তারপর আমাকে কহিলেন—"দেখ এসে বারবাড়ীর ঘরে পরশুরাম আসিয়াছে।"

গিয়া দেখিলাম,—হাঁ পরশুরাম বটে! পিঁড়ির উপর বসা—তাতেও আমার বুকের সমান উঁচু তা'র মাথা। কাঁচা-পাকা চুল। মুখ কামানো। সামনে হাত পাঁচ-ছয় লম্বা একটি তৈলপক্ক বাঁশ (উহাই তাহার বেড়াইবার ছড়ি),—পাশে একটা গোল রকমের মাছের চুপড়ি, তাহা ভর্ত্তি করা মস্ত মস্ত কই মাছ। সে রকম কই মাছ দেশে এখন আর নাই।

বাবা সেই ব্যক্তিকে খুব সমীহ করিয়া কহিলেন—"দাদু, একটু জলপানি লও।" আমার চক্ষু ত চড়কগাছ! সের পাঁচেক চিড়া—একটু জলপানি!

"আর এই আমার বড় ছেলে!"—বাবা আমার পরিচয় দিলেন।

অবহেলার চাউনীতে আমাকে দেখিয়া বিশেষ করুণার কণ্ঠে কহিল—"দা'ঠাকুর, এই রত্তিটুকুন্ শরীর নিয়া কোন্ কাজটায় লাগ্‌বে!—যাক্—দা'ঠাকুর, এই মাছ কয়টা নিয়ে,—মন্‌টায় মান্‌ল না,—তাই এসে পড়লাম। পাঁচ কুড়ি কই।" (তখন আমাদের দেশে কুড়ি হইত ২৫টায়; অর্থাৎ কুড়িতে ৫টা ফাউ)।

১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে আমার মা মারা গিয়াছেন। ১৩০৪ সালে আমার বিবাহ। ছোট্ট বউ। বাবা আমাদের প্রজা কালী সিংএর বউকে ডাকিয়া কহিলেন—"বৌমা, এই মাছ কয়টা তৈরি ক'রে দেও।...তারপর দাদু, মাছে কি হবে?"

আমার মায়ের মৃত্যুসংবাদে পরশুরাম ব্যথিত হইল। কহিল—"বাচ্চা বৌ দা'ঠাকুর, ওকি আর অতশত রাঁধ্‌তে পারবে! মাষকলাইর ডাইল আর কই মাছে সরষের চচ্চড়ি—ব্যস্। দই কলাও ত আছে একটু? তোমরা বেশ ভরপেট খাও, তারপর প্রসাদ আছে, আমি আছি।"

৫০টা মাছ কালীর বৌ জীয়াইয়া রাখিল—কেউ জানে না। বাকী ৭৫টা মাছে রান্না শেষ।

পরশুরাম সের দেড়েক আউশের চাউলের লাল ভাত আর সম্ভবতঃ পঞ্চাশটি মাছ, গুটী চার-পাঁচ কলা আর সের দুই দই খাইয়া দন্তপাটী বিকাশ করিয়া কহিল—"বেশ সেবাটি হয়ে গেল দা'ঠাকুর!"

আমার বাবার জন্ম ১২৬০ সালের চৈত্র মাসে। পরশুরাম তখন আমাদের পাশের ভিটার প্রজা,—উহাই পরশুরামের বাড়ী বা পৌশার ভিটা। সেই ভিটায়ই তখন কালী সিং থাকে। পরশুরামের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কোলে আমার বাবা প্রতিপালিত, অর্থাৎ পরশুরামের বয়স তখন ৮০।৮৫ বৎসর। দাঁত পড়ে নাই, দৃষ্টি অটুট, দেহের বল—প্রায় পোয়াটেক ওজনের এক একটি কই মাছের ১২৫টা হাতে নিয়া চার-পাঁচ মাইল পথ অনায়াসে আসিয়াছে! তারপর ভোজনটি!

—২—

খাওয়ার পর পরশুরামের গল্প শোনা গেল—

শোন ঠাকুর বাবা, তোমাদের এই পুকুরের পূব-দক্ষিণ কোণে একটা মস্ত বড় যজ্ঞডুমুরের গাছ;—গাঁময় জঙ্গল,—বাঘ, শূয়র, সেজা, পায় পায় পাওয়া যায়। ঐ গাছটার তলায় একটা বাঘুনী দুটা বাচ্চা দিয়াছে। তোমার বাবার ঠাকুর্দ্দা (মাথায় যোড় হাত ঠেকাইয়া) রামপ্রসাদ কর্ত্তা সন্ধ্যাবেলায় ঐখানে দাঁড়াইয়া আমার বাবাকে ডাকিয়া কহিলেন,—সেবা রে (পরশুরামের বাবার নাম—সেবারাম) পুকুরের কোণায় বাঘুনীটা বাচ্চা দিয়াছে,—মানুষ দেখিলে গোঙ্‌রায়—বৌঝিরা রাত্রে বৈকালে ঘাটে আসিতে "সক্ সক্" করে (ঠিক ভয় পায় না—আর সেটা খুব কাপুরুষতার কথাও ত বটেই, সুতরাং "সক্ সক্" ব্যবহার এদেশে আছে)। দে ত খেদাইয়া, মারিস্ না—দু' দুটা বাচ্চা!

বাবা কহিলেন—তুমি একটা মশাল ধর, আমি জাঠাটা নিয়া আসি।

সে সময় পাটশোলা ছিল না। বাঁশের শলা শুকাইয়া আঁটি বাঁধিয়া রাখিতাম। তাতে একটু নেকড়া জড়াইয়া বম্বিরাজ বা ভেরেণ্ডার তৈল মাখিয়া আগুন দিলেই জ্বলিত বিশাল মশাল। বাবা বাঘুনী তাড়াইয়া দিলেন। ... ...

আমাদের পাড়ায় আর পাশের চাঁড়ালদিয়া গ্রামে ন'কুড়ি ঘর নমঃশূদ্রের বাস। তৃতীয় দিনে সকালবেলায় প্রায় শতেক সোয়াশ' নমঃশূদ্র বাবার মাতামহ তপস্বারামের বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত, বাবার বিচার! তপস্বার বয়স তখন শতেকের বেশী। বুড়া সিধা খাড়া হইয়া কহিল,—আমার নাতি নমঃশূদ্র গোষ্ঠীর জাতমারা কাণ্ড করিয়াছে! তোমরা উচিত বিচার কর। রামকর্ত্তার ডাকে সে পাজী জাঠা দিয়া বাঘ খেদাইয়াছে! বাঘের জন্য জাঠা! হো—হো—রে—দেশের ছেলেপেলে রাখা কি আর যাবে—বাঘেই খাবে!

নমঃশূদ্রদল হুঙ্কার দিয়া উঠিল—কি জাঠা দিয়া বাঘ খেদাব? আজই!—কেহ কেহ দুইহাত তুলিয়া আস্ফালনও করিল। বাবা, ঠাকুর্দ্দা নতমুখে কত গঞ্জনাই না শুনিলেন!

তারপর বিচার হইল—দুই কান নিজে ধরিয়া ২০ বার ওঠবোস্ করিবে—আর সমাজের নেমন্তন্নে তিন মাস আসন পাবে না!

সর্ব্ববাদিসম্মতিতে এই হুকুম জারী হইল। বাবার বাবা উঠিয়া পুত্রকে দুটা লাথি দিয়া কহিলেন,—জাতমারা পাজী! উঠ্—কান ধর্—

আমাদের সামাজিক নেমন্তন্ন বড় সহজ ছিল না, বড় খাওয়ায় পাঁচ-সাতশ' পুরুষ ও তিন-চারশ' মেয়ে আসিত। এত পিঁড়ি কোথায় পাইবে। আমাদের দেশে মোটা বাঁশ প্রচুর। সেই বাঁশ দুই টুক্‌রা করিয়া তারপর পিঠটা একটু ছাঁটিয়া দিলেই পিঁড়ি হয়। আমাদের নিয়ম ছিল পিঁড়ি আর ঘটি ভরা জল নিজ নিজ জিম্মা। কেবল প্রধান মাতব্বরদের দুই-চার জনকে কাঠের পিঁড়ি দেওয়া হইত।

ঠাকুর বাবা, যখন দেখিলাম এ পাড়ায় নমঃশূদ্রের থাকার পথ নাই, তালুকদার জমিদার দিনের পর দিন খাজনা আর কত কি খরচা বাড়াইল, তখন নমঃশূদ্র জাতির ভাত বন্ধ হইবার জো হইল; কাজেই আমাদের ন'কুড়ি ঘর ভাঙ্গিয়া ন'কুড়ি জায়গায় ছড়াইয়া গেলাম। আমাদের 'সোনার থাল' জমি অন্যের হাতে গেল! তাই আজ বাঘ-মহিষের স্বাথে লড়িত যাহারা—তাহারা উপবাসী। দেশে বাঘ মহিষ হাতী গেঁড়াও নাই,—জাঠা, লাঠির দিনও নাই;—দেশে তেমন জোয়ানেরও যেন আর দরকার নাই! ঠাকুর বাবা, তপস্যারাম ছড়া কহিত—

হাতীরে আগুন, শুওরেরে জাঠা।
বাঘেরে লাঠি, পাখীরে ভাটা॥

ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পরশুরাম বিদায় হইল;—আর দেখা হয় নাই। তা'র স্মৃতি—তা'র বীরত্বের কথা আজও মনে পড়ে,—আর দুঃখ হয় হতবীর্য্য বাংলা দেশের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া!

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

—নয়—

মোহর!

রঞ্জিত যখন জেগে উঠ্‌ল, তখন বিকাল হয় হয়।

এক মজলিস বস্‌ল তিন জনের। সেখানে রঞ্জিত সব কাহিনী বল্‌ল,—দিদির বাড়ীতে বেড়াতে আসার কথা—শিকারে আসা—সাহেব—বাঘ-মারা—জংলী—পলায়ন—তারপর নিজের সব পরিচয়—কেমন ক'রে তা'র বাবা-মা মারা গেলেন—সব কথা।

আশ্রমের আঙিনায় বিকালের ছায়া পড়্‌ল।

রঞ্জিত বল্‌ল,—"এবার আমায় দিদির বাড়ি ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিন্‌।"

সন্ন্যাসী খানিকক্ষণ তা'র মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন,—"কেন ভাই, আমার এখানে ভালো লাগ্‌ছে না?"

"ভালো লাগ্‌ছে না আবার? খুব ভালো লাগ্‌ছে।"—রঞ্জিত বল্‌ল।—"কিন্তু দিদি যে এতক্ষণ আমার জন্য কেঁদে কেঁদে ম'রে যাচ্ছেন।"

"ম'রে যাচ্ছেন!"—সন্ন্যাসী হেসে বল্‌লেন।—"তুমি তো শুধু হারিয়ে গেছ। মানুষ ম'রে গেলেও তা'র জন্য কেঁদে কেঁদে আত্মীয়-স্বজনরা ম'রে যায় না। আচ্ছা, তুমি ভেবো না। তোমার দিদির কাছে আমি খবর পাঠাবো, তুমি ভালো আছ।"

—"কেমন ক'রে পাঠাবেন খবর?"

—"কেন, আমার বন্ধুকে দিয়ে।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন।—"অবশ্য তুমি কোথায় আছ, সেকথা তাঁদের জানান হবে না। আমার এ জায়গার খোঁজ আমি বাইরের লোককে দিতে চাইনে।"

—"আপনি তো বলেছেন এখান থেকে সে জায়গা অনেক দূর।"

—"হ্যাঁ, অন্তত দু'দিনের রাস্তা।"

—"তবে, বন্ধু চ'লে গেলে আপনার এসব রান্নাবান্না কে কর্‌বে এ দু'দিন।"

সন্ন্যাসী হেসে উঠ্‌লেন, বল্‌লেন,—"আমায় কি তুমি এমনি কুড়ের বাদশা মনে কর্‌লে যে, দু'দিন রান্না ক'রেও খেতে পার্‌বো না? তা ছাড়া, সেখানে যেতে হ'লে বন্ধু তো দু'দিনের রাস্তা ধর্‌বে না। বাইরে যাবার জন্য উপত্যকা ধ'রে খুব ছোট এক গোপন রাস্তা আছে আমাদের। সে পথে এখান থেকে সকালে গিয়ে আবার বিকালের মধ্যে ফিরে আসা যায়।"

রঞ্জিত কিন্তু আকারে-প্রকারে বিশেষ আপত্তি জানাল। সে যেতে চায়। তাই দেখে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আমি কাল সকালেই খবর পাঠাবো। তুমি বরং একখানা চিঠি লিখে রাখ আজ রাত্রেই। তাতে কেমন আছ জানাবে, কোথায় আছ—কার কাছে আছ, জানাতে পাবে না। জানাবে, তুমি নির্বিঘ্নে আছ।"

রঞ্জিত কিছু বল্‌ল না। মুখ ভারি ক'রে ব'সে রইল।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"রঞ্জিত, কতো দিন পরে—আমার সোনার বাঙ্‌লার একজন মানুষের দেখা পেলাম। তাকে আজই ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না যে।"

রঞ্জিত ভেবে দেখ্‌ল, তা'র আপত্তি করা উচিত নয়। সন্ন্যাসী তা'র প্রাণ রক্ষা করেছেন, জনহীন এই হিংস্র জন্তুর বনে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, তা নইলে দিদির দেখা আবার জীবনে পাবার আশা সে কেমন ক'রে কর্‌তো! সে দু'দিন থাক্‌লে যদি সন্ন্যাসী খুশী হন, থাকাই তা'র উচিত। আর কোনো আপত্তি সে কর্‌ল না। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস কর্‌ল,—"আচ্ছা, মহাবীরকে আপনি বন্ধু বলেন কেন?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"যখন আমি চাকরি কর্‌তাম, তখন সে ছিল আমার চাকর। সংসারের সবাই যখন আমায় ছেড়ে চ'লে গেল, ও তখনো রইল আমার কাছে। বাড়ি ছেড়ে এলাম, সঙ্গে সঙ্গে এল। বল্‌লাম,—'মাইনে দিতে পার্‌বো না।' ও বল্‌ল,—'দরকার নেই; আমারো তো কেউ নেই সংসারে।' তখন থেকে ছায়ার মতো সে আছে আমার সাথে-সাথে। আমার কি দরকার তা আমার আগে সে জান্‌তে পায়। এমন কর্‌তে কি বন্ধু ছাড়া আর পারে কেউ?"

মুচ্‌কি হেসে তিনি আবার বল্‌লেন,—"ভারি একগুঁয়ে লোক কিন্তু। তা'র যা ভালো মনে হবে, মাথা ফাটালেও তা ছাড়্‌বে না। এই দেখ না, মাথায় রেখেছিল টিকি। কাট্‌তে বল্‌লাম, বাবু জেদ ক'রে এখন সারা মাথাময় টিকি রেখেছেন।"

তিনি হেসে উঠ্‌লেন। মহাবীরও মন খুলে হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

রঞ্জিত বল্‌ল,—"মহাবীরের মতো অমন একখানা শরীর কি ক'রে বাগানো যায়?"

মহাবীরই উত্তর দিল,—"থাকো না এখানে আমাদের সঙ্গে। দে'খো, পাথরের ঘসা লেগে শরীরটাও পাথর হয়ে যাবে।"

রঞ্জিত হেসে বল্‌ল,—"সন্ন্যাসীজির শরীরে বোধ হয় পাথরের ঘসাটা তোমার চেয়ে একটু কম লেগেছে।"

—"ওই দেখ্‌তেই অমন ননীর শরীর।"—মহাবীর বল্‌ল,—"ভিতরে সব লোহা। ওঁর সঙ্গে তো গায়ের জোরে পেরে উঠিনে আমি।"

কথাটা রঞ্জিতের যেন বিশ্বাস হোল না।

মহাবীর বল্‌ল,—"কাল ভোরবেলা জাগাবো তোমায়। দেখো তখন, ওঁর সঙ্গে লড়্‌তে গিয়ে কী নাকালই হই আমি।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"বিশ্বেস কোরো না। ও ইচ্ছে ক'রে হেরে যায়।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"সে দেখা যাবে। কিন্তু কখন আপনারা কুস্তি লড়েন? ভোরবেলা তো আপনি যান শিবপূজো কর্‌তে। আচ্ছা, মন্দির যে দুটো দেখ্‌লাম, ও পাহাড়ে একটা, এ পাহাড়ে একটা, ও কা'র তৈরি?"

—"দুটো কেন,"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আরো মন্দির আছে কতো এ পাহাড়ে। সে সবের এক ইতিহাস আছে।"

রঞ্জিত আগ্রহ-ভরে বল্‌ল,—"বলুন না।"

—"ওঃ সে এক প্রকাণ্ড গল্প। সে গল্প বল্‌তে যে অনেক সময় লাগ্‌বে।"

—"তা' লাগুক, আপনি বলুন।"—রঞ্জিত বায়না ধর্‌ল যেন।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"সে বল্‌বো পরে। আচ্ছা, এক কাজ কর্‌তে দিই যদি তোমায়, পার্‌বে কর্‌তে?"

—"কি কাজ বলুন!"

—"আচ্ছা বল্‌বো, আমার সঙ্গে এসো।"

সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন। মহাবীর ব'সেই রইল। রঞ্জিত জিজ্ঞেস কর্‌ল,—"বন্ধু আস্‌বে না?"

—"না, কি দরকার? তুমিই এসো।"

কতদূর যেতে দেখা গেল, নানারকম তরকারির বাগান। সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এসব তরকারির চাষ আমরা কর্‌ছি। বেশ হয় তরকারি এখানে।"

তরকারি-বাগানের ওধারের পাঁচিল-ঘেঁসা সরু পথ ধ'রে শেষ মাথায় গিয়ে ফির্‌লেন আবার বাঁদিকে। তরকারি-বাগানের বেড়ার পরেই সেদিকে লম্বা এক ঘাসের ক্ষেত। মস্ত লম্বা লম্বা, চওড়া পাতার ঘাস, তাজা, সবুজ। সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এ সব ঘাস চাষ করেছি গরুর জন্য। সাধারণ ঘাসের চেয়ে ঢের বেশি পুষ্টিকর এগুলো।"

ঘাসের জমির পরে চলেছে ধানের ক্ষেত। এদিকে দেখা গেল, পাঁচিল চ'লে গেছে অনেক দূর পর্য্যন্ত। পাঁচিলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত শুধু তাজা সবুজ ধানের ক্ষেত, হাওয়ায় তা'তে দোল দিয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"পাঁচিলের ঘেরায় যতটুকু সম্ভব চাষ-বাস কর্‌ছি। কিন্তু চাষ আমাদের এর বাইরেও আছে।"

"তুলোর চাষ কোথায়?"—রঞ্জিত জান্‌তে চাইল।

—"তাও বাইরে। ধান-তরকারির শত্রু অনেক; তাই তা'র ব্যবস্থা পাঁচিলের ঘেরায়। তুলো যেখানে-সেখানে হ'তে পারে। ওটা খাদ্য নয় কিনা।"

ধানের ক্ষেতের মাঝখান ভেদ ক'রে সরু রাস্তা চ'লে গেছে। তাই ধ'রে সন্ন্যাসী থামলেন গিয়ে একেবারে কোণের দিকে। সেখানে পরিচ্ছন্ন একটু বনের মতো। তা'র ভিতরে এক পুরান অট্টালিকা। কতো কালের পুরান কে জানে। যতটা সম্ভব সারিয়ে ওকে বসবাসের উপযুক্ত করা হয়েছে। পরিষ্কার উঠান পেরিয়ে সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন সেই বাড়ীর দরজায়। ডাক্‌লেন,—"কালু! মতি! ধনি!"

কা'কে ডাকা হচ্ছে কিছু বুঝ্‌তে না পেরে রঞ্জিত হাঁ ক'রে রইল।

বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এল তিনজন জঙ্গলী মানুষ—যে রকম মানুষের হাতে রঞ্জিত বন্দী হয়েছিল—তেমনি চেহারার তিনজন মানুষ।

ভয়ে রঞ্জিত আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। তবে কি কাল রাত্রে সে বন্দী হয়ে এখানেই ছিল কোন এক মাচার উপর? যেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিল, ছলনায় প'ড়ে কি আবার সেখানেই ফিরে এল? ভয়ে তা'র মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"ভয় নেই তোমার। চেয়ে দেখ, এরা অসভ্য নয়।"

রঞ্জিত কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চেয়ে দেখ্‌ল,—তিনটে লোকই মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম কর্‌ল সন্ন্যাসীকে।

তিনি বল্‌লেন,—"এ ছেলেটি তোমাদের দেখে ভয় পেয়েছে। ওকে বুঝিয়ে দাও তো, তোমাদের দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।"

একটা লোক এগিয়ে এল। এতক্ষণে রঞ্জিতের খেয়াল হোল যে অসভ্য জঙ্গলীদের মতো এরা নেংটি প'রে নেই। এদের পরনে খদ্দর কাপড়। লোকটি বল্‌ল,—"ভয় কি, অ্যাঁ? উনি যে গুরুজী আমাদের। তোমার কিছু ক্ষতি কর্‌বো না তো আমরা।"

রঞ্জিত অবাক। আরে! দিব্যি বাংলা বলে যে! শুধু কথার মাঝে একটু বুনো-বুনো টান আছে। হাঁ ক'রে সে ওদের দিকে চেয়ে রইল।

সন্ন্যাসী তাদের জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—"আর সব কোথায়?"

একজন বল্‌ল,—"তা'রা সব কাজে গেছে। বোমু আর মধু ছাদের ওপর টানা মেলছে।"

—"ও, কাপড় বুঝি এখানেই বোনা হয়?"

—"হ্যাঁ।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"ওরাই বোনে। সুতো কাটে মেয়েরা। তা'রা থাকে আর একটা বাড়িতে, একটু দূরে।"

—"আচ্ছা, তোমরা যাও এবার।"—তিনি বল্‌লেন তাদের।

যাবার সময়ে রঞ্জিতকেও একটি নমস্কার জানাতে তা'রা ক্রটী কর্‌ল না।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"ওরা আর অসভ্য নেই। আট বছর ধ'রে ওদের আমি নানারকম কাজকর্ম্ম, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। বড় বিশ্বাসী ওরা। কথা রাখ্‌বার

জন্তে প্রাণ দিতে পারে। এখানে আছে এরা পঁচিশজন। ক্রমে শিক্ষা দিয়ে সারা শর্দাই পাহাড়কে আমি সভ্য ক'রে তুল্‌তে চাই, রঞ্জিত!"

রঞ্জিত অপ্রস্তুত ব'নে গেল।

সেই অট্টালিকার পাশ দিয়ে সন্ন্যাসী এবার প্রবেশ করলেন বনের ভিতর। যেতে যেতে বন যেখানে গহন, দুর্ভেদ্য হয়ে আছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের কোনো কিছু সেখান থেকে দেখা যায় না। রঞ্জিতের গা ছম্‌ছম্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। ভাগ্যিস্ জায়গাটা প্রাচীরেরই ভিতরে।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"মোহর দেখেছ রঞ্জিত—মোহর—সোনার?"

রঞ্জিত বিস্মিত হোল। হঠাৎ এ কি প্রশ্ন! বল্‌ল,—"গিনি দেখেছি।"

—"গিনির চেয়ে অনেক বড়—অনেক ভারী, খাঁটি সোনার সেকেলে মোহর দেখো নি?"

দেখে নি, রঞ্জিত স্বীকার করল।

সন্ন্যাসী একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন,—"সে রকম হাজার হাজার—ঘড়া ঘড়া মোহর যদি তুমি পাও, তবে কী করো?"

কি কর্‌বে, তা' কেমন ক'রে বল্‌বে রঞ্জিত? আগে তো পেয়ে নিক্। কিন্তু এসব কি কথা? এ নির্জ্জন, অন্ধকার অরণ্যে ডেকে এনে এই রহস্যময় মানুষটি কেন তাকে মোহরের স্বপ্ন দেখাচ্ছে!

—"তুমি শুন্‌লে চমকে উঠ্‌বে রঞ্জিত",—সন্ন্যাসী বল্‌লেন গম্ভীর স্বরে,—"ঘড়া-ঘড়া মোহর আর মণিরত্নের মালিক তুমি।"

—"আমি!"—বিস্ময়ে রঞ্জিত বুঝি ট'লে প'ড়ে যাবে।

—"এ কথা শুনেই মাথা ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ছ না? মনে করো না গল্পই কর্‌ছি।"

ওঃ! গল্প? যখের ধনের রূপকথা? তা শুন্‌তে রাজি রঞ্জিত একশ' বার।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"সে মোহর যেখানে আছে, সেখান থেকে নিয়ে আসার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই আছে। আন্‌তে পার্‌বে?"

—"নিশ্চয়ই পার্‌বো। কিন্তু আপনি আন্‌তে পার্‌বেন না কেন?"

—"ধরো আমার আন্‌বার পক্ষে অদ্ভুত রকমের বাধা রয়েছে। তোমায়ও অনেক বাধা এড়িয়ে তবে উদ্ধার কর্‌তে হবে সে ধনের রাশি।"

—"পার্‌বো।"

—"যদি তা'তে রক্তের খেলা খেল্‌তে হয়? তা'র জন্য মানুষ মার্‌তে হয় যদি?"

—"পার্‌বো মানুষ মার্‌তে।"

—"ভেবে দেখ, তুমি রূপকথার রাজপুত্তুর নও। তুমি শুধু রঞ্জিত। পার্‌বে মানুষ মার্‌তে?—"

ভেবে দেখ্‌ল পার্‌বে রঞ্জিত।

—"সে ধন নিয়ে এসে পরের জন্তে বিলিয়ে দিতে পার্‌বে?"

রঞ্জিত চুপ ক'রে রইল।

সন্ন্যাসী বললেন,—"কেন পারবে না? যে ধন তোমার ব'লে জানা নেই তোমার, সে ধন না হ'লে কোনদিন তুমি আফশোষ করতে না, সে ধন পারবে না বিলিয়ে দিতে একটা জাতির উপকারে?"

—"কোন্ জাতির?"—রঞ্জিত জিজ্ঞেস করল।

—"এই শরদাই পাহাড়ে যদি সেই অর্থে একটা শক্তিশালী, আদর্শ সভ্য জাতি গড়তে চাই, পারবে না খরচ করতে?"

একটু ভেবে রঞ্জিত বলল, —"নিজের জন্য কিছু রেখে আর সব দিয়ে দিতে পারি।"

—"বেশ!" —সন্ন্যাসী বললেন,— "এসো আমার সঙ্গে।"

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি ঢুকলেন এক ঝোপের ভিতর। রঞ্জিতও গেল।

সন্ন্যাসী দু'হাতে জঙ্গল সরিয়ে মাটির উপর থেকে মস্ত একখানা পাথর তুলে একধারে গড়িয়ে রেখে দিলেন। নীচে দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মুখ।

সুড়ঙ্গ নাকি?—রঞ্জিত ভাবল,—নামতে হবে না-কি এর ভিতর? ব্যাপার কি সব?

নামতে হোল না। গর্ত্তের ভিতর থেকে সন্ন্যাসী টেনে তুললেন মস্ত একটা পিতলের ঘড়া। মুখের উপরকার ঢাকা খুলে হাত পু'রে দিলেন ভিতরে এবং হাতে ক'রে তুলে আনলেন একমুঠা মোহর।

রঞ্জিতের দু'চোখ বড় হয়ে উঠল। মোহর তবে সত্যি! কতক্ষণ সে স্তম্ভিত হয়ে

ব'সে রইল। কথা বলার মতো অবস্থা যখন হোল আবার, জিজ্ঞেস করল,—"কোথায় পেলেন?"

সন্ন্যাসী বল্লেন,—"যে শিবমন্দিরে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেখানে।"

—"এখানে এনে রেখেছেন কেন?"

—"ও আপদ হাতের কাছে রাখ্লে মনটাকে বড় মাতিয়ে তোলে। তা ছাড়া বিপদ ঘোরে ধনের সাথে সাথে। তাই এখানে লুকিয়ে রেখেছি।"

রঞ্জিত জিজ্ঞেস করল,—"আমার মনকে মাতিয়ে তুল্বে না?"

—"তাই তো আমি চাই।"—সন্ন্যাসী বল্লেন,—"কতো বছর ধ'রে তোমায় আমি খোঁজ করেছি জানো? আমি প্রার্থনা করেছি ঈশ্বরের কাছে—তোমায় পাবার জন্য। শেষকালে হতাশ হয়ে ভাব্ছিলাম, আবার পাড়ি দেবো কি-না বাঙ্গালা দেশে, যাবো কি-না বীজগাঁয়ে তোমায় নিয়ে আস্বার জন্য। যেতে সাহস হয় না হৈ-চৈ-এর ভয়ে, আর ভয় হয় সেই সোনার দেশের মায়ায় যদি আবার বাঁধা প'ড়ে যাই।"

—"আমাকে না হ'লেই কি চলে না?"

—"না গো, এসবই যে তোমার।"

—"সবই আমার!"

রূপকথা নয়, গল্প নয়, এত সোনাদানা মণিমুক্তা—সবই তা'র। কি ক'রে—কেমন ক'রে এই তেপান্তরের পারের পাহাড়ে তা'র জন্য প'ড়ে আছে এত সব ধনরত্ন!

—"অবাক হবার কিছু নেই,"—সন্ন্যাসী বল্লেন,—"কা'র জন্যে সংসারের কোন্ কাজ ভগবান রেখেছেন, তুমি-আমি তা'র কী জান্বো?"

—"আমি যে এসব কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না।"—রঞ্জিত যেন ভয়ে ভয়ে বল্ল, বিপন্নভাবে।

সন্ন্যাসী বল্লেন,—"কিছু ভেবো না। সব কথা আমি বুঝিয়ে দেবো পরে। আমি যা বলি, তাই এখন কর, তাতে লাভও হবে, আনন্দও পাবে।"

মোহরগুলো তিনি ঘড়ার ভিতর আবার রেখে দিলেন। ঘড়াটা আবার গর্ত্তের মধ্যে রেখে উপরে পাথর চাপা দিলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। ফিরে চল্লেন ঘরের পানে।

যেতে যেতে বল্লেন,—"দেখ, প্রথম যখন আমি ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, কোনো উদ্দেশ্য তখন আমার ছিল না। ভেবেছিলাম ঘুরে ঘুরেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। তিনি আমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এখানে এনে হাজির কর্লেন। তারপর এমন একটি কাজ তুলে ধর্লেন আমার সম্মুখে, যাকে আমি আঁকড়ে না ধ'রে পার্লাম না। বাকি জীবনের তরে সেই হোল আমার করণীয়। এখানে এসে খোঁজ পেলাম এই পাহাড়ি জাতির।

এমন সরল ব্যবহার পেলাম তাদের কাছে যে, এ জায়গা ছাড়্তে আমার আর ইচ্ছে হোল না। তারপর সারা পাহাড় ঘুরে দেখ্বার সময় পেলাম অর্থের খোঁজ। তখন থেকে আরম্ভ কর্‌লাম এদের মানুষ কর্‌তে। সভ্য হ'লে কী শক্তিমান জাতি এরা হবে, ভেবে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। সভ্য বল্‌তে আমাদের দেশের আজকালকার সভ্য সমাজের মতো কর্‌তে আমি চাইনে। আমাদের দেশে সভ্য ব'লে যারা আজকাল বুক ফুলিয়ে চল্‌তে চায়, আসলে বুক ফোলাবার মতো শক্তিই তাদের নেই। আমি চাই এদের প্রকৃত ভারতবাসী ক'রে তুল্‌তে।" (ক্রমশঃ)

বলরাম রায়কে

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, এম. এ.

ভূত এলো, ভূত রে
সাথে চ্যালা, পুত্ রে।
নাঁকি স্বুরে বলে বুঝি ঃ
স্বুঁরে আঁছে ঘুঁত্ রেঁ।
নাঁকি স্বুঁরে স্বুঁর দিলে
স্বুঁরেতেঁ ঘুঁঙুর দিঁলে
মঁধুরেঁ মঁধুর মিলে
স্বুঁর যাঁবে উঁত্রেঁ।
মিহিঁ স্বুঁরেঁ গাঁয় যাঁরাঁ
কেঁনঁ বঁলো গাঁয় তাঁরাঁ ?
গাঁহে কেঁনঁ নঁয় যাঁরাঁ
স্বুঁরেঁ মঁজ্বুঁত্ রেঁ।

ভূত আসে, পুত্ আসে,
ঘুঁত্ ঘোঁটে কুত্ রে।

ভূতে ভয় পায় কে ?
ভয়ে কাত্‌রায় কে ?
ছায়া দেখে' আড়্চোখে
ভয়ে পিছে চায় কে ?
শোনো সব, বলি ভাই ঃ
মিছে কেন ছলি ছাই ;
ভূতে কভু টলি নাই
ভূত এ-ধরায় কে ?
আঁধারের শকুনি,
মিছে ঝাড়ে বকুনি।
রাম বলো, ভয় করে
পাঁদাড়ী পোকায় কে ?

পোকা বুঝি খোকা পেল
বলরাম রায়কে ?

ম্যাজিকের কারসাজী

যাদুকর পি. সি. সরকার

ম্যাজিক দেখাই তাই তোমরা নাম দিয়েছ যাদুকর ;
কেমন ক'রে এসব করি, তা'র কি কিছু পাও খবর ?

'ম্যাজিকের কারসাজী' জানা না থাকিলে উহার চালাকী খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। তাই এই প্রবন্ধে একটি সহজ খেলার কারসাজী প্রকাশ করিতেছি।

ভৌতিক দিয়াশলাই—আমার এই খেলাটি খুবই সহজ অথচ খুবই চমকপ্রদ। দর্শকদের নিকট হইতে একটা দিয়াশলাই চাহিয়া লইয়া, আমি উহাদ্বারা আগুন ধরাইয়া দেখি যে দিয়াশলাইর মধ্যে কাঠি নাই—মধ্যে রহিয়াছে একটি সিল্কের রুমাল। পরমুহূর্ত্তে রুমালটি টানিয়া বাহির করিয়া যেই দর্শকের নিকট খালি ম্যাচ্‌ বাক্সটি ফেরৎ দিতে যাইব, অমনি আর একবার খুলিয়া দেখি যে উহাতে কতকগুলি বিড়ি ভর্ত্তি রহিয়াছে। তাহাকে ধূমপানের বদভ্যাসের কথা স্মরণ করাইয়া খুব গালি দিয়া, যখন সেই বাক্স ফেরৎ দিতে যাইব, তখন দেখা গেল যে উহা দিয়াশলাইর কাঠিতে একদম ভর্ত্তি রহিয়াছে।

এবারে খেলার কারসাজী সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে। একটা দিয়াশলাই লও এবং উহার দুই পিঠে একই মার্কার ছবি লাগাইয়া দেও। ভিতরকার খোলটিকে বাহির করিয়া,
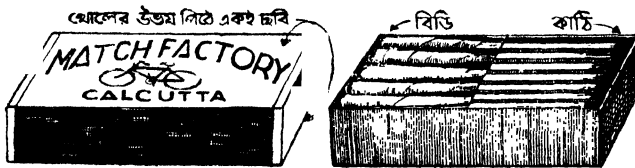
উহাকে উপুড় করিয়া ধর এবং পিঠের উপর সারি বাঁধিয়া কতকগুলি বিড়ি এবং অপর অর্দ্ধেকে কতকগুলি কাঠি আঁঠা দ্বারা আটকাইয়া দেও। প্রদত্ত চিত্র হইতে ইহা আরও সহজে বোধগম্য হইবে।

এক্ষণে পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই খেলার মূলকৌশল অবগত হইয়াছেন। প্রথমতঃ দর্শকের নিকট হইতে যে দিয়াশলাইটি লওয়া হইয়াছিল, কৌশলে সেইটির পরিবর্ত্তে কারসাজী করা এই দিয়াশলাইটি বাহির করিতে হয়। আমরা অতি সহজেই ইহা করিতে পারি; তবে প্রথম শিক্ষার্থীদের নিকট

ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক বলিয়া, তাহারা পকেটে রাখিয়া পুনরায় বাহির করিবার সময় উহা করিতে পারিবে। এক্ষণে বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ। ম্যাচবাক্সটির একদিকে খুলিলে ভিতরে রক্ষিত
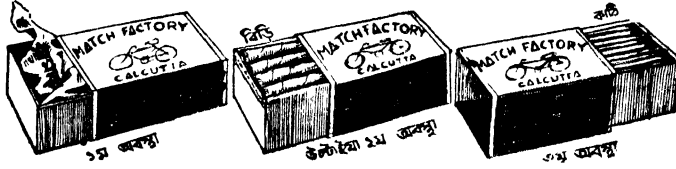
সিল্কের রুমাল বাহির করা চলিবে, কিন্তু বাক্সটি উল্টাইয়া ডালা অর্দ্ধেক খুলিলে বিড়ি বাহির হইবে এবং অপর প্রান্তের দিকে অর্দ্ধেক খুলিলেই কাঠি বাহির হইবে। (চিত্র দেখ)

আশা করি পাঠকবর্গ আমার ম্যাজিকের কারসাজী বুঝিতে পারিয়াছ।

জেনে রাখা ভালো

শ্রীম—

নক্ষত্র-লোকের কথা

তোমাদের যদি কেউ প্রশ্ন করেন—"আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা কত, বল ত?" তা হলে তোমরা কি সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পার? না, পার না। কারণ আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা স্থির করা আজও কারও পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ বলেছেন—"সমগ্র বিশ্বের সাগর-সৈকতের বালুকা-কণার যুক্ত সংখ্যার মতই সম্ভবতঃ একটা কিছু হবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্ররাশির সংখ্যা।" সুতরাং বিশ্বজগতে নক্ষত্রের সংখ্যা যে কত হবে তা জানা ত দূরের কথা, কল্পনা ক'রে বুঝবার শক্তিও যে আমাদের নেই।

সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল আলোর জন্য দিনের বেলা আমরা নক্ষত্ররাশিকে আকাশে দেখতে পাই না। কিন্তু সূর্য্য অস্তাচলে গমন করবার পর যখন পৃথিবীর বুকে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার তখনই আকাশের বুকে মিট্‌মিট্ ক'রে জ্বলতে থাকে নক্ষত্ররাশি। রাত্রির আকাশ যদি নির্ম্মল থাকে, তা হলে আমরা যদি একটি একটি ক'রে গুণতে সমর্থ হই, তবে দেখতে পাব সমগ্র আকাশে রয়েছে প্রায় ছ' হাজার নক্ষত্র। একই গোলার্দ্ধ থেকে অবশ্য ছ' হাজার নক্ষত্র দেখা যাবে না, উভয় গোলার্দ্ধ থেকে রাত্রির নির্ম্মল আকাশে দেখা যাবে এই সংখ্যক নক্ষত্র খালি চোখে—কোন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই। কিন্তু শক্তিশালী দূরবীন্ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে

যে সব নক্ষত্র আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, তা'র সংখ্যা পঞ্চাশ কোটী। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই বিজ্ঞানীরা নূতন নূতন নক্ষত্রের সন্ধান পেয়ে এই সংখ্যাকে ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছেন। ক্রমে ক্রমে যে সব শক্তিশালী দূরবীন্ তৈরী হচ্ছে—বিশেষ ক'রে আমেরিকার মানমন্দির (observatory) সমূহের জন্য, তাতে আশা করা যায় যে, এই সব শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতির অজ্ঞাত রাজ্যের নূতন নূতন অনেক সংবাদ আমরা জেনে নিয়ে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশেষ ক'রেই বৃদ্ধি করতে পারব। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্‌স্টিটিউট অব্ টেক্‌নোলজির মানমন্দিরে দু'শ ইঞ্চি ব্যাসের এক অতি-উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ বসানো হয়েছে। তা'র সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যের বহু সমস্যার সমাধান যা এতদিন করা সম্ভব হয় নি, তা সম্ভব হয়ে উঠেছে এবং বৈজ্ঞানিকেরা আশা করছেন যে আরও অনেক নূতন তথ্য এর সাহায্যে জানা যাবে।

নক্ষত্রলোকে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত নক্ষত্র কোন্‌টি, তোমরা বলতে পার কি? উত্তরে তোমরা হয়ত বলবে ধ্রুবতারা, কেউ বলবে লুব্ধক,—এই রকম আরও কত কি? কিন্তু আমি বলব—সূর্য্য। শুনে অবাক হলে নাকি? সূর্য্যই হচ্ছে নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত নক্ষত্র। সূর্য্য যেমন নক্ষত্রলোকের একটি নক্ষত্র, তেমনি নক্ষত্রগুলিও এক একটি সূর্য্য বই আর কিছুই নয়। নক্ষত্ররাশিও সূর্য্যেরই মত বাষ্পীয় অনলের এক একটি পিণ্ড বিশেষ। সূর্য্যের মত নক্ষত্ররাশির বহির্ভাগেও বাষ্পীয় অনলের ঝটিকা নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে। কোন কোন নক্ষত্র আকারে হয়ত সূর্য্যের সমান বা সূর্য্যের চেয়ে ছোট, আবার কোন কোনটি এত বড় যে, শত সহস্র সূর্য্যকেও যদি তা'র ভিতর পূরে রাখা যায়, তা হলেও বহু স্থান শূন্য থাকবে। আকাশের একটি বিন্দুমাত্র জায়গা জুড়ে রয়েছে সূর্য্য, আর ঐ বিরাট মহাকাশের মহাশূন্যে রয়েছে কোটী কোটী নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, আরও কত কি! অন্যান্য নক্ষত্ররাশি অপেক্ষা সূর্য্য আমাদের অনেক নিকটে রয়েছে ব'লে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ আর তীব্র উজ্জ্বল আলোক আমরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করতে পারি। কাছে রয়েছে ব'লে তোমরা একথা মনে করো না যে সূর্য্য আমাদের পাঁচ, সাত, দশ, একশ, দু'শ, পাঁচশ, পাঁচ হাজার বা দশ হাজার মাইলের মধ্যে আছে। সূর্য্য পৃথিবী থেকে প্রায় নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এত দূরে রয়েছে ব'লেই কিন্তু সূর্য্য আমাদের কাছে এত ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়। সত্যি সত্যি কিন্তু সূর্য্য এত ক্ষুদ্র নয়। এর আকার অতি বিরাট। আমাদের পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে সাত হাজার ন' শ' মাইল আর সূর্য্যের আয়তন ওর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বেশী। আর নক্ষত্রগুলি যে কত বিরাট সে কথা শুনলে ত তোমরা একদম অবাকই হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলিকে তোমরা ছোট্ট এক একটি আলোকের বিন্দুর মতই দেখে থাক। সূর্য্যের চেয়ে আকারে বহুগুণ বড় হয়েও নক্ষত্রগুলি আমাদের কাছ থেকে বহু বহু দূরে রয়েছে ব'লেই এত ছোট দেখায়! আজ পর্য্যন্ত মহাকাশে যে সমস্ত নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে,

তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে পৃথিবী থেকে নিকটে তার নাম হচ্ছে **আলফা সেনটউরী** (Alpha Centauri)। উত্তর অক্ষাংশে এই নক্ষত্রটি দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল গতিতে চ'লে থাকে। এই নক্ষত্রটি থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌছতে কিঞ্চিদধিক চার বৎসর সময়ের প্রয়োজন। ধ্রুব নক্ষত্র থেকে আলো পৃথিবীতে পৌছতে সাতচল্লিশ বৎসর সময় লাগে। অনেক নক্ষত্র থেকেই আলো পৃথিবীতে পৌছতে এই রকম সময়ের দরকার হয়। এমন নক্ষত্রও আকাশে রয়েছে ব'লে পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন, যার আলো যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে যদি পৃথিবীর দিকে যাত্রা সুরু ক'রে থাকে, তবে গেলো বৎসরের শেষ দিকে কোন একদিনে হয়ত এসে সে আলো পৃথিবীতে পৌছে থাকবে। এখন হয়ত তোমরা বুঝেছ, এক একটি নক্ষত্র আমাদের কাছ থেকে কতদূরে রয়েছে আর কেনই বা আমরা এমন এক একটি বিশালকায় নক্ষত্রকে এত ক্ষুদ্র আকারে দেখে থাকি, আর এদের উত্তাপ ও আলোক একেবারেই অনুভব করতে পারি না।

পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলিকে দেখলে স্থির ব'লে মনে হয়। কিন্তু এদের আলোকের বর্ণলিপি (Spectrum) পরীক্ষা ক'রে বিজ্ঞানীরা এখন সিদ্ধান্ত ক'রে নিয়েছেন যে, নক্ষত্রেরা স্থির নয়। তা'রা মহাকাশে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। কোন কোনটি একা একা নিঃসঙ্গ অবস্থায়, আবার কোন কোনটি দল বেঁধে। এরা ভ্রমণকালে কিন্তু কখনও একে অপরের ভ্রমণপথের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে না। এমন কি একটি অপরটির নিকটেও অতি কদাচিৎ এসে থাকে। একটি নক্ষত্রের ব্যবধান অপরটি থেকে কোটী কোটী মাইল। এই থেকেই মহাকাশের বিরাটত্ব তোমরা বিশেষভাবেই বুঝতে পারবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

এক—'প্রলয়' প্রতি পনর দিনে প্রকাশিত পরিচিত পাক্ষিকপত্র। প্রলয়ের পৃষ্ঠায় প্রকটিত প্রবন্ধাবলী পরনিন্দাপূর্ণ; তাই, প্রিয়নাথের প্রতিবেশী পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডী, পাঁচ পয়সায় প্রলয় পড়া পরম অপচয় ভাবেন।

দুই—রাত্রিতে গ্রামে পাহারা দেওয়া চৌকিদারের কর্ত্তব্য। চৌকিদার পূর্ব্বরাত্রে নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দেখায়, কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়াছিল। ইহার জন্য তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে ঐ ট্রেনে যাইতে নিষেধ করায় প্রেসিডেন্টের প্রাণ বাঁচে। স্বীয় প্রাণ রক্ষার জন্য প্রেসিডেন্ট তাহাকে পুরস্কৃত করেন।

উত্তরদাতাদিগের নাম

যাদের দুইটি ধাঁধার উত্তর ঠিক হয়েছে :—অঞ্জলী, আভা, ডেইজী, বিমান, দীপক ও চিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত, বরিশাল; অঞ্জলী সেন, ধুবড়ী; অমলকুমার মিত্র, উয়ারী (ঢাকা); খোকন, পেল্টু, কালিদাস, বিপুল, অঞ্জন, রঞ্জন, অমিত, নরোত্তমপুর; সরলা দেবী, দক্ষিণ বারাসত; অর্চ্চনা, নিভা, লীলা, কমলা, অঞ্জু, মঞ্জু, তাপস, রণপতি, উষাপতি, শ্যামাপতি ও রমাপতি, বরিশাল; গীতা রায় ও গৌরী রায়, নশীপুর; অসিতকুমার বসু, কাঁথী; অমলাংশু ও অসীমাংশু দাশগুপ্ত, বরিশাল; উষা, তাপস ও অসিত, ফরিদপুর; মণ্ডল ব্রাদার্স, পোদ্দারডিহি; নমিতা ও সবিতা সেন, নিউ দিল্লী; চার্লি, খুকী, বুবু, জাহানারা, রানু, নবি, নুরজাহান ও জর্জ্জ হোসেন, নওগাঁ; দিলীপকুমার ও কুমারী আভা ও ইভা মুখার্জ্জি, বেরেলী; প্রশান্ত ও অণিমা, গোলা (হাজারীবাগ); আরতি ও সুব্রত, রসা রোড, কলিকাতা; শ্রীমৎ মেধানন্দ শ্রামণের, হাইদচক্যা (চট্টগ্রাম); সমীর, প্রবীর, দীপ্তি ও লেখা, কুচবিহার; গৌরচন্দ্র বিশ্বাস, হীরেন্দ্রনাথ রায়, নিতাই, কানাই, বলাই, চৈতন্য, উপেন, মতি, বিজয়, ললিতা, বিশখা, রেণু ও ছবি, উলপুর; কুমারী শেফালিকা কর, চক বাজার—বিষ্ণুপুর; পান্না ও অনিমা, একদুয়ারিয়া; রেণুকা, অমল ও সুধাংশু চক্রবর্ত্তী, ঢাকা; মণীশচন্দ্র রায়, মাণিকগঞ্জ; নন্দ, কেষ্ট, লতি, সপু, কৃপা, নিলু, রাম, নিতু, শামু ও দীনবন্ধু লাহিড়ী, বরাহনগর; গীতা, চিত্ত, বাবলু, হাবলু, কৃষ্ণনগর; চিন্তাহরণ মালো, ছিলাদরচর; নিরুপম সোম, পিরোজপুর; কুমারী স্মৃতিরাণী রায়, লক্ষ্ণৌ; রণজিৎ বিশ্বাস, সরোয়াতলী; লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী, সবিতা ও রাণু, মালদহ; অজিৎ, রণজিৎ, অর্চ্চনা, অরুণা, অপর্ণা ও সন্‌জিৎ গুহ-ঠাকুরতা, কাঁথী; প্রণবেশ সাহু ও পান্নালাল বানার্জি, বাঁকুড়া; শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীহারবালা দেবী, গোপালবেড়া; অমিতাভ ভট্টাচার্য্য ও অঞ্জলী দেবী, কাটোয়া; মিনতি ঘোষ, রাজসাহী; মীরা মুখার্জ্জী, ডোম্‌বিব্‌লী—বোম্বে; অমল, শ্যামল, বিমল, মাধুরী, দীপ্তি, শীলা, ময়মনসিংহ; কুমারি ছবি ভট্টাচার্য্য, রায়গড়; শান্তি, শিশির, সনৎ ও বেলু, ভাগলপুর; গোবিন্দ ও ভগবান ধর, ঢাকা; দুর্গা দেবী, পঞ্চকোটরাজ; প্রবাসরঞ্জন ও সুভাষরঞ্জন বিশ্বাস, রীচি রোড—কলিকাতা; বাবু ও মণ্টু, ঝরিয়া; বাণী ঘোষ, বালীগঞ্জ—কলিকাতা; খোকন, অনু, টুকু, বলাই ও কানাই, কল্যাণপুর; পবিত্র, সৌমিত্র, তাপ্তি, কৃষ্ণা, কাবেরী, খুলনা; কুমারী উমারাণী হালদার, মুঙ্গের: বিনায়ক ও ফাল্গুনী, বরকোটা।

কেবল প্রথম ধাঁধার উত্তর ঠিক হয়েছে :—সতু, বীণা ও মীরা, শ্রীহট্ট; বিশ্বনাথ দত্ত, ধানবাদ; আমিনা ও খালিদা, স্বরূপকাঠি; সুনীতি, হিমাংশু, মিনতি ও প্যাঁড়া, খড়দহ; অনিলকুমার রায়, উখরা; কিশু, জীতেন চক্রবর্ত্তী ও সত্যেন রায়, পাবনা; সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য)।

কেবল দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তর ঠিক হয়েছে :—বারীন্দ্রনাথ দত্ত ও অতীন, ধুবড়ি; নবকুমার সাহা, বেনাগাড়িয়া; সুশান্ত সেনগুপ্ত, লক্ষ্ণৌ; সন্তোষরাখাল রায়, নন্দন রোড—কলিকাতা; মাণিক, নাদু, শান্তি, ফচু, নাটু, কানু, বীণা, মণ্টু, বুড়ী, বেবি, উমা, রেবা, শঙ্কর—হাওড়া।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Shankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

একবিংশ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৪৯ ১১শ সংখ্যা

ফাগুনের ফুল-বনে

শ্রীবিজয় চক্রবর্ত্তী

দখিন-দুয়ার খুলেছে কে আজ— ফাগুনে কে এলো বনে ?
আজকে পথিক সামালে বসন, পথ চলে আনমনে।
পলাশ-বনে কে রঙ্ গুলেছে ফুটেছে অশোক-কলি,
শিমুল-শাখায় আবীর ছড়ায়ে কে আজ খেলেরে হোলি ?
বকুল-গন্ধে পুলক-ছন্দে মধুপ-গুঞ্জরণে—
এল শীতান্তে নব-বসন্ত ফাগুনের ফুল-বনে।

বউল ঝরে আজ থোপায় থোপায়, ধরেছে আমের গুটি,
দোলন-চাঁপায় দোলা দিয়ে যায় ভ্রমর এলোরে ছুটি।
দখিনা-বাতাস ঝাউএর শাখায় তুলেছে ব্যথার সুর,
বন-বীথিকায় পাতা ঝরানোর আসে সুর সুমধুর।
পথে যেতে কেরে ঘুঙুর বাজায়— ঝিঁঝির ঝুমুর সনে ?
এল শীতান্তে নব-বসন্ত ফাগুনের ফুল-বনে।

আজ বেলফুল চামেলী-বকুল ঝরেছে পথের বাঁকে ;
সাঁঝের আকাশে চাঁদ চেয়ে রয় শিরীষ গাছের ফাঁকে।
কে দিল তুলির পরশে আঁকিয়া বনের শ্যামল ছবি ?
কেনরে বাতাস হয়েছে উদাস ছন্দ ভুলেছে সবই ;—
এ-পথে ও-পথে আসে ঘুরে ফিরে কাহার অন্বেষণে ?
এল শীতান্তে নব-বসন্ত ফাগুনের ফুল-বনে।

ভজু

শ্রীনিভাননী দেবী

অনেকদিন আগেকার কথা।—

নিবিড় বনের ফাঁকে ফাঁকে দু-চারখানা ছোট্ট কুটীর ছিল। আর সেই কুটীরগুলোতে বাস করতো অর্দ্ধ-অসভ্য কয়েকটা লোক তাদের ছোট্ট ছোট্ট সংসার গুছিয়ে। এদেরই মধ্যে একজনের নাম ছিল মোহন। তা'র সংসার বলতে একটি ছেলে ছাড়া আর কিছু ছিল না। দশবছরের ছেলে ভজুকে মোহন একটু বেশী আদরই দিত, কেননা ওর যে মা নেই—একথাটা মনে হলেই মোহনের শাসন-প্রবৃত্তি কোথায় যেন পালিয়ে যেত। ফলে ভজু বেশ একটু মেজাজী হয়ে উঠেছিল।

ধানকাটার সময় এসেছে। ওরা সবাই যার যার ছেলে বউ নিয়ে এই রোজগারটুকুর আশায় ভিন্‌গাঁয়ে চ'লে গেছে। কিন্তু ভজুর এবার কি খেয়াল হলো, সে ব'লে বসলো,—"বাবা, আমি এখন ধান কাটতে যাব না, ওইসব ছোঁড়াগুলো কেউ এখানে নেই, আমি তীরধনুকটা ভাল ক'রে কাজে লাগাবো।" মোহন সত্রাসে জিজ্ঞাসা করলো—"কি ভাল কাজে লাগাবি ভজু ?"

বাবার ভয় দেখে ভজু একগাল হেসে বললো—"তুই ভয় করিস্ না ; ঐ ছোঁড়াদের মনে বড্ড গরব যে, ওরা খুব ভালো তীর ছুঁড়তে পারে ; কিন্তু এবার আমি ওদের দেখিয়ে দেব যে, আমি ওদের চাইতেও কত ভালো জানি।"

মোহন আশ্বস্ত হয়ে একদৃষ্টে ভজুর পেশীবহুল সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আরো কয়েকদিন পর। সেই জঙ্গলে এসেছে এক সাহেব। তিন-চারদিন ধ'রে সে সেই বনটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। তা'র পর্য্যবেক্ষণের ধরণ দেখে মনে হয়, সে যেন কি একটা

গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। হাতে বন্দুক নিয়ে প্রফুল্লমনে শিষ দিতে দিতে সাহেব যখন গভীর এক জঙ্গলে এসে পড়েছে, তখন আনাচে কানাচে দু-চারটা বন্যমুরগী দেখা যেতেই সাহেব তা'র বন্দুকে ছর্‌রা ভরলো; কিন্তু বন্দুক গর্জ্জে উঠবার আগেই কোথা থেকে একটা তীর সাঁ সাঁ ক'রে এসে একেবারে একটা মুরগীর এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে ফেললো। সাহেবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে হাসতে ভজু এগিয়ে এসে সযত্নে তা'র তীরটা মুরগীর গায়ের থেকে খুলে নিল। তারপর কি কতকগুলো শিকড় টেনে পাখীর পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চললো। ভজুর সুঠাম দেহ ও অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভজু ফিরতেই সাহেব অপূর্ব্ব ভাষায় তাকে ডেকে বললো—"এই টুমি হাসোটো, হামি টোমার সঙ্গে ডু-চারিটা কঠা বোলিটে চাই।"

ভজু অবাক হয়ে এই সাদা মানুষটাকে দেখতে লাগলো। তখনও এদেশে ইংরাজ রাজত্ব এত ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি! বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে গভর্ণমেণ্ট এর মূল্য দিয়েছিল অনেকখানি,—তাই এই সাহেবটিও তা'র সুযোগ গ্রহণ করেছিল। নীলের চাষ নিয়ে যখন তা'রই স্বজাতিরা অতিমাত্রায় লাভবান হয়ে উঠছিল, তখন এই সাহেবের মাথায় অন্য একটা ব্যবসার কথা অঙ্কুরিত হয়ে তা'কে এই সুদূর জঙ্গলে এনে ফেলেছে।

সাহেব ভজুর নামধাম জিজ্ঞাসা ক'রে তা'র বাড়ীতে যেতে চাইলো ও বললো—"হামি টোমার পিটার সঙ্গে ডেখা করটে চাই।"

ভজু কি বুঝলো কে জানে—কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে সে ইঙ্গিতে সাহেবকে তাদের বাড়ীর দিকে পথনির্দ্দেশ ক'রে আগে আগে রওনা হলো। পথে যেতে যেতে কি এক আশা ও আনন্দে সাহেবের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ... ...

সুদীর্ঘ ষোলবছর পর সেই কুটীর কয়খানার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে ; সেখানে গ'ড়ে উঠেছে কলকব্জাসমন্বিত পাকা বাড়ী ও আশেপাশে ছোট্ট ছোট্ট কোয়ার্টার। আর সেই বিরাট জঙ্গল পরিণত হয়েছে পরিষ্কার মাঠে ও সেই মাঠের মাঝে বিরাট ক্ষেত—সবেমাত্র তাতে চাষ সুরু হয়েছে। সেই বুড়ো মোহন আর প্রতিবেশী সমবয়সী লোকেরা কালের কোন্ অতল তলে ডুবে গেছে—তাদের পরিবারবর্গও এদিকে ওদিকে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে কে জানে ?

কেবল এইখানে আজও দেখতে পাওয়া যায় ভজুকে। বিশাল বলিষ্ঠ হাতদুটো কোদাল ধ'রে ক্ষেতে মাটি কাটে, আর তা'রই নেতৃত্বে ভজুর মতই কয়েকটি যুবক প্রবল উৎসাহে কাজ ক'রে যায়।

সাহেবের চাএর প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার সঙ্কল্প কতকটা সফল হয়েছে। ভজুকে সে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে মোহনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। ভজুর মত কয়েকটি যুবক সাহেব ঘুরে ঘুরে যোগাড় করেছে, তা'র মধ্যে ভজুকে উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে আর সকলের সর্দ্দার পদে বসিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে তা'র নাম হয়েছে 'কুলিসর্দ্দার'।

সাহেবের কাজ চলছে খুব তোড়ে জোরে—চা তৈরী হচ্ছে, চালান ক'রে বিক্রীত হচ্ছে—কিন্তু সাহেবের আশানুরূপ চাএর রং আর কিছুতেই লাল টক্‌টকে হচ্ছে না। কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম, সবই বিফলে গেল। ক্রমে সাহেবের চিত্তে একটা তীব্র অসন্তোষ ও অকৃতকার্য্য হওয়ার জন্য নৈরাশ্য এসে জমা হতে লাগলো এবং সে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বেচারা ভজুর উপর।

অবিশ্রান্ত খাটুনীর পর ভজু তা'র সাথী সঙ্গী নিয়ে যখন স্বভাবসিদ্ধ আমোদে মেতে উঠে, মাদল বাজিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে—বাঁশীতে তান ধরে, তখন অজ্ঞাতসারে সাহেবের মুখখানা ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে সাহেবের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হতে লাগলো যে ভজুর গাফিলতিতেই আরো ভালো চা উৎপন্ন হচ্ছে না। সে তাদের খাটবার সময় দ্বিগুণ ক'রে তুললো এবং সময়ে অসময়ে ভজুকে অযথা তীব্র ভৎর্সনা ক'রে নিজের অন্তর্দ্দাহ মিটাতে লাগলো। সাহেবের এ আচরণে ভজু প্রথম প্রথম ব্যথিত হতো খুবই ; কিন্তু সে কি ক'রে বোঝাবে যে, খাটবার শক্তিটাই তা'র আছে,—চা-এর রক্তিম আভা কেন হচ্ছে না—তা যে সে কিছুই বোঝে না। তবু সহ্যেরও একটা সীমা আছে।—এমনি ক'রে বেশীদিন আর গেল না। সাহেবের রূঢ় কথায় ভজুর আশৈশবের মেজাজী মন একদিন বিদ্রোহ ক'রে বসলো ; সে সোজাসুজি জবাব দিল—"সাহেব, তবে আমাকে যেতে দাও, আমি আর থাকতে পারবো না।"

সাহেব চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠলো—"ড্যাম নিগার—হামার খুশীতে আনিয়েছি, হামার খুশীতে যাইটে ডিব।"

ভজু বাঘের মত জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চ'লে গেল। কুলিরা কাজ করছিল একমনে, কুলিসর্দ্দার যেয়ে হুকুম দিল—"কাজ বন্ধ কর।"

কুলিরা বিস্মিত হলেও তা'র আদেশ অমান্য করতে কেউ সাহসী হলো না। ভজু সকলকে

বললো, কেন তা'রা এখানে এভাবে প'ড়ে থাকবে—তাদের গতর আছে; খাটলে দুনিয়ায় অনেক জায়গা তাদের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

পিছন থেকে বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাক এলো—"কুলিসর্দ্দার।..."

সবাই একযোগে চমকে উঠলো—সে গলা স্বয়ং সাহেবের। ভজু দীর্ঘ পদক্ষেপে উন্নতশিরে সাহেবের দিকে অগ্রসর হলো।

এই উদ্ধত অশিষ্ট ব্যবহার সাহেবের আর সহ্য হলো না। হাতের হাণ্টারটা দিয়ে হঠাৎ ভজুকে এক ঝাড়ি দিয়ে বসলো। ভজু চোখের পলকে তা'র হাতের হাণ্টারটা কেড়ে নিল। রাগে ক্ষোভে দুজনের মূর্ত্তিই তখন ভীষণ হয়ে উঠেছে। সাহেব রক্তচক্ষুর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পলকের মধ্যে তা'র বাংলোয় ঢুকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলো। ভজু একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে পিছন ফিরতেই 'গুড়ুম' ক'রে একটা শব্দ হলো—সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভজুর আর্ত্ত চীৎকার...

পরদিন চায়ের টেবিলে 'বয়' সাহেবের কাপে চা ঢেলে দিল। চায়ের রঙ দেখেই সাহেব আঁৎকে উঠল!—রক্তের মত টুক্‌টুকে লাল রঙ চায়ের!

সাহেব সেদিনই বাগান ছেড়ে চ'লে গেল

ইলেকট্রিক কারেণ্ট—এ-সি ও ডি-সি

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

একটা মস্ত বড় সহরের কথা বলি।

সেখানে দালান কোঠা। প্রত্যেক বাড়ীতেই কত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। সব বাড়ীতেই কিন্তু একটি দুটি রেপরোয়া ছেলে আছেই। তা'রা নিজেদের বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকবার পাত্র নয়। কেবল পাড়াময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন খুসী যার তার বাড়ীতে গিয়ে ঢুকছে।

রোজকার মতই একদিন ছেলেরা খেলাধূলায় মেতে আছে, এমন সময়, মনে কর, একটা দৈত্য এসে তাদের তাড়া করল। তখন ছেলেরা কী করবে বলতে পারো?

তা'রা ছুটবে প্রাণপণে। রাস্তার উঁচুনীচু ডিঙ্গিয়ে, সামনে বাধা পড়লে তার পাশ কাটিয়ে, তা'রা ছুটবে। কোনও বাড়ীর দরজা খোলা পেলে কেউ বা তাতে ঢুকে পড়বে। আবার কোন বাড়ীর ছেলেরা ব্যাপার দেখবার জন্য রাস্তায় এসে হয়ত আর ঘরে ফিরে যাবার পথ পাবে না। তা'রাও তখন আর সব ছেলেদের সাথে ছুটতে থাকবে।

তা'রা ছুটতে ছুটতে, মনে কর, সহরের আরেক প্রান্তে গিয়ে পড়ল। কিন্তু একি! সেখানে গিয়ে দেখে দৈত্যটা আগেভাগেই যেন কেমন করে সেখানে গিয়ে পৌছেছে। তাইত! ফের উল্টোদিকে ছুট।

গল্পটা এখন এই অবধিই থাক। এবারে এমন একটা কথা বলছি যার সঙ্গে গল্পটার খুব মিল আছে। একখণ্ড তামার তার নিয়ে লক্ষ্য করে দেখো; দেখবে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, সবটাই জমাট। কিন্তু সত্যই কি তাই! আমরা খালি চোখে ছোট জিনিষ দেখতে পাই না। খুব বেশী ছোট জিনিষ দেখতে হলে ম্যাগ্‌নিফায়িং লেন্স দরকার। আমরা যদি এমন একটা ম্যাগ্‌নিফায়িং লেন্স পাই যা দিয়ে পৃথিবীর সব চাইতে ছোট জিনিষও দেখা যাবে, আর সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে যদি তামার তারটির দিকে তাকাই, তাহলে কি দেখতে পাবো জানো? দেখব, সেই তারটি আসলে মোটেই ভরাট নয়, প্রায়ই ফাঁকা, অসংখ্য মার্বেলের মত ছোট ছোট গুলিতে ভরা। আসলে কিন্তু এরা মার্বেলের মত বড় নয়, ম্যাজিক কাঁচের ভিতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় করে দেখছি বলেই এই রকম মনে হচ্ছে। সমস্ত দালান কোঠা মিলিয়ে যেমন সহর, এই রকম ছোট ছোট বলগুলি দিয়েই তেমনি তামার তারটি তৈরী। এদের কিন্তু আলাদা একটা নাম আছে—সেটি হল পরমাণু। সহরের মধ্যে প্রত্যেক বাড়ীতেই যেমন ছোট ছেলেরা আছে, আর

ঘরের ভিতর রয়েছেন মা, তেমনি এই পরমাণুদের ভিতরে মাঝখানে রয়েছে ছোট একটা গুলির মত জিনিষ, আর তারই চারদিকে সহরের ছোট ছেলেদের মতই কতগুলি খুব ছোট ছোট জিনিষ সব সময়ে ঘুরছে। যারা ঘুরছে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে—ইলেকট্রন। সহরের ঘরবাড়ীতে যেমন দেওয়াল আছে, পরমাণুদের কিন্তু সে রকম কোন দেওয়াল নাই।

সব ইলেকট্রনেরাই যে নিজ নিজ পরমাণুর ভিতরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা নয়। কতগুলি আছে দুষ্ট, বেপরোয়া ইলেকট্রন। তা'রা কখনও নিজ পরমাণু-বাসা ছেড়ে অন্য পরমাণুর ভিতরে গিয়ে ঢু মারছে; আবার কখনও ফাঁকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সব রকম জিনিষের পরমাণু কিন্তু এক রকম নয়। তামার পরমাণু আর লোহার পরমাণু কখনও এক রকম হবে না। তাদের ওজন হবে আলাদা। যতগুলি ইলেকট্রন ঘুরছে তাদের সংখ্যাও সমান নয়। অনেক সময় একই জাতের অথবা ভিন্ন জাতের দু'তিনটা বা তারও বেশী পরমাণু এক সাথে গায়ে গায়ে মিশে থাকে। তাদের বলা হয় অণু। যেমন ধর, একটা অক্সিজেন পরমাণু আর দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এক সাথে মিশে একটি অণু হল। এই ভিন্ন জাতের জিনিষের বন্ধুত্বের ফলে যে অণুটি হল, তার আর হাইড্রোজেনত্ব ও অক্সিজেনত্ব কিছুই থাকে না—সে হয়ে যায় জল।

তাহলেই দেখ অণুর ভিতরে রয়েছে পরমাণু, পরমাণুর ভিতরে রয়েছে ছোট গুলির মত একটি জিনিষ যাকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনেরা সর্ব্বদাই ঘুরছে।

এই যে ইলেকট্রনদের কথা বলা হল, তা'রাই হল বিদ্যুতের টুকরো। পরমাণুর মাঝখানে যে বসে রয়েছে তার উপর ইলেকট্রনদের ভীষণ টান। তবে প্রত্যেক পরমাণুতেই একটা দুটো ডানপিটে ইলেকট্রন আছে, সেকথা ত আগেই বলেছি। তা'রা নিজ নিজ পরমাণু ছেড়ে অন্য পরমাণুর ভিতরে অথবা বাইরে গিয়ে হৈচৈ করছে। সহরে যেমন ডানপিটে ছেলেরা দৈত্যের তাড়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটছিল, এখানেও এই বেপরোয়া ইলেকট্রনেরা যদি কারুর তাড়া খায় তাহলে সেই রকমই ছুটবে। পথে কত পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে! কখনও বা আর কোন ইলেকট্রনের গায়ের উপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু তাহলেও ছোটার বিরাম নেই। কারুর তাড়া খেয়ে ইলেকট্রনেরা যখন একটা দিকেই ছুটে যায়, তখন সেই ইলেকট্রন-স্রোতকে আমরা বলি ইলেকট্রিক কারেণ্ট বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ। তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনেরা যখন শুধু একটা নির্দ্দিষ্ট দিকেই ছোটে তখন তাকে বলি ডি-সি বা ডিরেক্ট কারেণ্ট। বাংলায় বলা যেতে পারে একমুখী প্রবাহ।

কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে ইলেকট্রনদের কেবল এদিক-ওদিক ছুট করাচ্ছে, তখন তা'র ভয়ে ইলেকট্রনেরা একবার একদিকে ছুটবে, আবার পরক্ষণেই ছুটবে তা'র উল্টাদিকে। যখন ইলেকট্রনেরা তার বেয়ে কেবলই যাওয়া-আসা করতে থাকে, তখন তাকে বলি এ-সি বা

অলটারনেটিং কারেণ্ট। বাংলায় বলা যেতে পারে যাতায়াতি-প্রবাহ। অতএব ডি-সি যখন বারবার দিক পালটায় কখনই তাকে বলি এ-সি। আসলে দুজনেই সেই এক ইলেকট্রনের স্রোত। তোমরা অনেক সময়ে বল এ-সি কারেণ্ট। কথাটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ এ-সি মানেই—অলটারনেটিং (এ) কারেণ্ট (সি), তাই তারপরে আবার কারেণ্ট শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

যে শক্তি ইলেকট্রনদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তাকে কিন্তু দেখা যায় না। সে অদৃশ্য থেকেই ইলেকট্রন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এই অদৃশ্য দৈত্যের নাম দিতে পারি প্রবাহক বল। এর ইংরাজী নাম হল ইলেকট্রোমোটিভ্ ফোর্স। নামটা একটু শক্ত লাগছে। তাই না?

বধিরতা বর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সকল লোকেই বলিত তাহারে কালা,
শুনিতে পেত না হত বড় ঝালাপালা।
বধির সে বটে, মূক ত মোটেই নয়,
দুষ্ট এবং হিংসুক অতিশয়।
ধারণা তাহার—হরি অকরুণ অতি
করেছেন ঘোর অবিচার তা'র প্রতি।

২

বোমার হিড়িকে ভরিয়া গিয়াছে দেশ,
বদ্ধ বধির সেই শুধু আছে বেশ।
সাইরেন-ধ্বনি শুনিতে পায় না কানে,
শব্দের লেঠা নাই তা'র অভিধানে।
রেঙ্গুনে বোমা পড়িল তাহার কাছে
মরেছে অনেকে, সেই শুধু বাঁচিয়াছে।

৩

ভীষণ শব্দে শ্বাস ভঙ্গের ফলে
পরাণ হারালো তাহার সঙ্গীদলে।
তখন কাঁদিয়া বধির বলিছে—হরি,
রেখেছ শব্দ গ্রহণে অপটু করি ;
যে ছিদ্র দিয়া মরণ আসিত আজ,
স্বকরে রুদ্ধ করেছ রাজাধিরাজ।

৪

আমি কৃতঘ্ন নিন্দুক অতি হীন
অকুণ্ঠিত যে তব দান চিরদিন।
অকল্যাণকে তুমি কর অবরোধ
মোরা দোষ দিই—নাই হিতাহিত বোধ।
মোর অপরাধ ক্ষম জগদীশ্বর,
বধিরতা মোর নহে অভিশাপ—বর।

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

—দশ—

সংকল্প

সন্ধ্যার পরে রঞ্জিত ঘরের ভিতর গুম্‌ হয়ে ব'সে আছে। রাজ্যের যতো চিন্তা তা'র মাথায় তাল পাকিয়ে উঠ্‌ছে। কিছুই সে বুঝতে পার্‌ছে না। সন্ন্যাসীর কথা সব ঠেক্‌ছে তা'র কাছে হেঁয়ালির মতো।

ধন! এত ধন! এ তা'কে পেতেই হবে। পেয়েই বা সে কর্‌বে কি? সন্ন্যাসী তো এ ধন তা'কে নিয়ে যেতে দেবেন না। কিছু সে নিতে পার্‌বে বৈ-কি! তা তিনি দেবেন। আর না-ই যদি দেন নিয়ে যেতে, তবেই বা কি? নিয়ে সে যাবে কোথায়? নিয়ে যাবে সে কার জন্য? তা'র আছে কে? অবশ্য নরেশদের দিতে পারে যদি কিছু তো ভালো হয়। না দিতে পার্‌লেই বা আর করা যাবে কি? সে যে ইচ্ছে ক'রে দেবে না, তা তো নয়।

এ ধনের রাশি সে উদ্ধার কর্‌বেই। অর্থের বড় মোহ। সেই মোহ পেয়ে বস্‌ল রঞ্জিতকে। মোহরের রাশ সে উদ্ধার কর্‌বেই—কর্‌বে।

মুখে ফুটে উঠ্‌ল তা'র দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রেখা। সামনের দিকে তা'র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল শূন্যে। এমনি সময় সন্ন্যাসী এলেন ঘরে। এতক্ষণ বাইরে তিনি বোধ হয় সন্ধ্যাবেলাকার আহ্নিকাদি সার্‌ছিলেন আর কি। তাঁর পায়ের শব্দ কিন্তু রঞ্জিতের কানে গেল না, এমনি তন্ময় হয়ে ছিল সে। ঘরে এসেই তা'র মুখের পানে তাকিয়ে সন্ন্যাসী ব'লে উঠ্‌লেন,—"বল্‌বো, তুমি কি কর্‌ছ?"

রঞ্জিত চম্‌কে উঠ্‌ল,—"অ্যাঁ—!"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"কিছু প্রতিজ্ঞা বোধ হয় কর্‌ছ মনে মনে। হয়তো প্রতিজ্ঞা কর্‌ছ যে, এ সন্ন্যাসী-না-ভণ্ড ব্যাটার কবল থেকে কালই তুমি নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে চ'লে যাবে—যেমন ক'রেই হোক।"

রঞ্জিত ব'লে উঠ্‌ল,—"না-না-না। আমি মন ঠিক ক'রেছি। মোহর আমি উদ্ধার কর্‌বো।"

"ও, তাই?"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"বেশ-বেশ! আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি আবার বেঁকে বসো না-কি।"

রঞ্জিতের পাশে তিনি বসলেন; ব'সে বললেন,—"দেখ, এবার তোমায় আমি বলি আমার মতলব।"

একটু থেমে বললেন,—"এই যে দেখছ শরদাই পাহাড়, এ যে কতো বড়, তা তুমি ধারণাই করতে পারবে না। এটা পুবদিকে লম্বালম্বি চ'লে গেছে বহু দূর—সার দিয়ে-দিয়ে—সাগরের ঢেউয়ের মতো উত্তর-দক্ষিণে চওড়া বেশি নয় তাই পশ্চিম দিক থেকে দেখে তোমরা একে বেশি বড় ব'লে মনে করবার সুযোগ পাওনি আরো মজা, এর চারদিকে পাহাড়গুলোর মাথা রয়েছে উঁচু হয়ে—দেওয়ালের মতো আর মাঝখানে মাইলের পর মাইল জায়গা রয়েছে প্রায় সমতল। উঁচু যে সব জায়গা তাও ক্রমে ঢালু হয়ে উঁচুর দিকে চ'লে গেছে। পায়ে হেঁটে তুমি ওপরে উঠে যেতে পার বিনা কষ্টে। 'এমন জায়গায় কেউ যদি ছোটখাটো একটা রাজত্বও স্থাপন করে বাইরের লোকের সাধ্য নেই তা টের পায়। টের পেলেও বাইরে থেকে আক্রমণ ক'রে এ রাজ্য জয় করা অসম্ভব। উপরে এরোপ্লেন এসে বোমা ফেলবে, সে সুযোগও নেই এখানে। এ জায়গায় আমি একটা রাজ্য স্থাপন করতে চাই—শান্তির রাজ্য। এ রাজ্য এ পাহাড়ের বাইরে ছড়িয়ে পড়বার লোভ করবে না। সে রাজ্যের রাজা গ'ড়ে তুলবো আমি তোমায়—আমার নিজের হাতে। তুমি হবে, রঞ্জিত, সেই সোনার রাজ্যের রাজা।"

"রাজা! আমি!!"—এ দুটি শব্দ ছাড়া আর কোনো কথা রঞ্জিতের মুখ দিয়ে বেরুলো না।

"হ্যাঁ, তুমি হবে রাজা!"—সন্ন্যাসী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন।

রঞ্জিত কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল সে কথা শুনে—বিস্ময়ে—উত্তেজনায় সে শুধু কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন—"এ পাহাড়ে যত ধনরত্ন আছে, তা'র সব কিছুর অধিকারী তুমি। স অর্থে যে রাজ্যের সৃষ্টি হবে, কাজেই তা'র রাজাও হবে তুমি।"

রঞ্জিতের চারদিকে রহস্যের পাহাড় জমে উঠেছে, তা ভেদ করা তা'র অসাধ্য। বিচলিত কণ্ঠে স ব'লে উঠ্‌লো—"আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, সন্ন্যাসী, বাংলাদেশের আমার বাড়ি থেকে শত শত াইল দূরে পৃথিবীর এক প্রান্তের এই পাহাড়ে যে গুপ্ত ধন আছে, আমি কেমন ক'রে তা'র মালিক 'লাম! আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। আমি পাগল হয়ে যাবো। আমায় খুলে বলুন সব কথা।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"অত ব্যস্ত হয়ো না রঞ্জিত। আচ্ছা, এমনও তো হ'তে পারে যে তামারই কোনো পূর্ব্বপুরুষ এখানে এ অর্থ সঞ্চয় ক'রে গেছেন। সে খবর তুমি জানো না, ামি জানি। হ'তে কি পারে না এমন ঘটনা? সময়ে যখন সব কথা জান্‌তে পাবে, তখন দখ্‌বে, এতে অসম্ভব কিছু নেই। এখন মাথা ঠিক করো দেখি।"

রঞ্জিত কতক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল,—"কিন্তু এই অসভ্যদের নিয়ে—"

"অসভ্যদের সভ্য ক'রে তুল্‌তে হবে।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"তার চেষ্টাই আমি কর্‌ছি। ়তকটা এগিয়েছিও তা'তে।"

"কতো লোক আছে এখানে?"—রঞ্জিত জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

"হাজার দশের কিছু বেশি হবে।"—সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন।

রঞ্জিত বল্‌ল,—"আপনার আশ্রমে শিক্ষা পাচ্ছে তো মোটে পঁচিশ জন।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এখানে আছে পঁচিশ জন, আরেক জায়গায় আছে আড়াইশ'।"

—"তাদের শিক্ষা দিচ্ছে কে?"

"আমারই ছাত্রেরা।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এই আশ্রমে রেখেই এর আগে আমি আরো াঁচিশ জনকে সুশিক্ষিত ক'রে তুলেছি। তা'রাই শিক্ষা দিচ্ছে আবার সেই আড়াইশ' জনকে। প্রথম দলকে শিক্ষা দিতে আমায় বড় বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু সভ্যতার একটি মোহ আছে। ামার সেই প্রথম শিক্ষিত দলের সভ্য চাল-চলন সারা পাহাড়ের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। া'তে আমার কাজ হ'য়ে এসেছে সহজ। এখনকার সেই আড়াইশ' স্ত্রী পুরুষ সারা শবুদাই াহাড়ে সভ্যতার আদর্শ জাগিয়ে তুলেছে।"

—"এতেই এরা বেশ্‌ সভ্য হয়ে উঠ্‌বে?"

"না।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"একটা জাতি একজন্মে সভ্য হয়ে উঠ্‌তে পারে না। সভ্যতা ়গ-যুগের—শতাব্দীর পর শতাব্দীর সাধনার ধন। সভ্যতার কোনো মাপকাঠি নেই। কোনো ়গের লোকই বল্‌তে পারেনি—কোনো কালের লোক বল্‌তে পার্‌বে না যে তা'রা চরম সভ্য য়েছে। সভ্যতা চিরদিনই এগিয়ে চলেছে—আরো—আরো—আরো এগিয়ে।"

এর সব কথা হয়তো রঞ্জিত ভালো ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ল না ; কিন্তু কথাগুলো তা'র ভালো লাগ্‌লো। সে হাঁ ক'রে সন্ন্যাসীর গরিমা-উজ্জ্বল মুখের পানে চেয়ে রইল।

সন্ন্যাসী ব'লে যেতে লাগ্‌লেন,—"শুধু এই পাহাড়িদের নিয়েই এখানে নতুন রাজ্য গ'ড়ে উঠ্‌বে না রঞ্জিত। আমি জানি, আমাদের দেশে কত গুণী আছেন—বিদ্বান আছেন, কত সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী—কত শিল্পী আছেন, পয়সার অভাবে—সুযোগের অভাবে যাঁরা তাঁদের গুণকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেন না। আধুনিক সভ্য জগতে তাঁদের আদর নেই। থাক্‌বে কেমন ক'রে? তাঁরা খাঁটি স্বদেশী, সরল, তেজস্বী। বিদেশীর অনুকরণে তাঁরা সভ্য হ'তে জানেন না, বড় নাম কিন্‌বার জন্য তাঁরা অসাধুতার প্রশ্রয় দেন না, স্বার্থের জন্য তাঁরা পরের খোসামোদ কর্‌তে পারেন না। তাঁরা দালান-কোঠা-গাড়ি-জুড়ি চান না, তাঁরা চান কুটীরতলের স্নিগ্ধ শান্তি। আমি তাঁদের যতজনকে সম্ভব বেছে বেছে এখানে নিয়ে আস্‌বো। আমারই মতো আজকালকার সভ্যতার চাপে তাঁরা হাঁপিয়ে উঠেছেন।"

—"তাঁরা আস্‌বেন এখানে?"

"আস্‌বেন না?"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"তাঁরা পালাতে চান, কিন্তু পথ পান না। তাঁরা এখানে এলে তাঁদের সংস্রবে পাহাড়িরা সত্যিকার সভ্য হয়ে উঠ্‌বে। আজকালকার সভ্য জগতের সভ্য নয়। প্রাচীন ভারতের কথা প'ড়েছ?"

—"প'ড়েছি।"

—"সেই প্রাচীন সভ্যতার যা-কিছু মন্দ তা বাদ দিয়ে আর আধুনিক সভ্যতার যা কিছু খারাপ সে সব ছেড়ে দিয়ে, নতুন সভ্যতা গ'ড়ে উঠ্‌বে এখানে। এখানে যে রাজ্য গ'ড়ে উঠ্‌বে, তার লোকেরা সভ্যতার নামে বিলাসী আর শিক্ষার নামে উচ্ছৃঙ্খল হবে না; তা'রা কাপুরুষ হবে না, কপট হবে না, নীচ হবে না। তা'রা হবে সরল, অমায়িক,—তা'রা হবে সুশিক্ষিত, —তা'রা হবে বীর, শক্তিমান, সাহসী, কুশলী। প্রাণের চেয়ে তা'রা ভালোবাস্‌তে শিখ্‌বে তাদের দেশকে। তা'রা হবে ভাই-ভাই। আর তাদের ভাষা হবে বাঙ্‌লা।"

সন্ন্যাসী থাম্‌লেন। তাঁর মুখে তখন কী এক দীপ্তি! রঞ্জিত নির্ব্বাক-বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে রইল। সন্ন্যাসীর কথায় তা'র মন সায় দিয়েছে।

সৌম্য, গম্ভীর ভাবে সন্ন্যাসী ব'সে রইলেন। মুখে তাকালে মনে হয়, কোন দূর অতীতের কথা ভাবছেন যেন। তেমনি ভাবে কতক্ষণ ব'সে থেকে ব'লে উঠ্‌লেন,—"কি রকম হবে?"

এ কথার কী উত্তর আর রঞ্জিত দেবে? শুধু বল্‌ল,—"চমৎকার!"

কতক্ষণ দুইজনেই চুপচাপ থাকার পর রঞ্জিত জিজ্ঞেস কর্‌ল,—"আচ্ছা, সে ধন আন্‌তে হ'লে রক্তের খেলা খেল্‌তে হবে কেন?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"একজন মহা শক্তিশালী লোক সে ধন পাহারা দেয়; অথচ ধনের মালিক সে নয়, অর্থ সে ব্যবহারও করে না, শুধু পাহারা দেয়।"

—"তা'তে তা'র লাভ ?"

—"তা' সে-ই জানে।"

—"আপনি ঠিক জানেন যে, সে অর্থ তা'র নয় ?"

—"জানি, সে তা'র নয়, এমন কি সেই ধনের রাশি কোথায় লুকান আছে, তা'ও সে জানে না; কিন্তু তারি জন্য সে নরহত্যা করেছে, নারীহত্যা করেছে। এমন দস্যুর শাস্তি হওয়া উচিত নয় ?"

রঞ্জিত কতক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস কর্‌ল,—"কি ক'রে তা'কে মার্‌তে হবে ?"

"কোনো কৌশল ক'রে।"—সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন।

"সর্ব্বনাশ !"—রঞ্জিত শিউরে উঠ্‌ল।

"সর্ব্বনাশের কিছুই নেই।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"বিনাদোষে মানুষ মারে যে, তা'কে হত্যা কর্‌লে পাপ তো হয়ই না, বরং তা'তে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"এ কাজ আপনি নিজে কর্‌লেও তো পারেন।"

"না।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"যাকে আমি রাজা কর্‌তে চাই, তা'র বল-বিক্রম-সাহস-বুদ্ধি একটু পরখ ক'রে দেখা যাক না। আসল কথা, এমন কতকগুলো রহস্যজনক সর্ত্ত এর মধ্যে আছে, যার জন্যে তা'কে হত্যা কর্‌লেও সে অর্থ আমি পাবো না।"

—"আমি পাবো ?"

"হ্যাঁ"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"সে অর্থ তোমারি প্রাপ্য। কিন্তু এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন কোরো না রঞ্জিত।"

রঞ্জিত একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাইল। দেখ্‌ল, সে মুখ নির্ব্বিকার। নিচের দিকে চেয়ে মাথা হেঁট ক'রে সে ব'সে রইল কতক্ষণ, তারপর জিজ্ঞেস কর্‌ল,—"আমি কি একাই যাবো সেখানে ? আপনি যাবেন না ?"

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্‌লেন,—"আমি যদি না-ই যাই ? একলা মানুষের সঙ্গে কি কেউই থাকেন না ?"

রঞ্জিত একটু ভেবে বল্‌ল,—"আগে তাই মনে হতো বটে; এখন কিন্তু মনে হয়, মানুষ যখন সব চেয়ে একা থাকে, তখনো তা'র সাথে একজন থাকেন।"

"কে তিনি ?"—সন্ন্যাসী জান্‌তে চাইলেন।

"বোধ হয় ঈশ্বর।"—রঞ্জিত বল্‌ল।

" 'বোধ হয়' কেন ?"—সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—"তাঁকে বিশ্বাস কর না ?"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"বিশ্বাস কর্‌তাম কিনা, সে কথা আগে কোনো দিন ভেবে দেখিনি; আপনার মতো ক'রে কেউ জিজ্ঞাসাও করেনি কোনো দিন। কিন্তু এখন তাঁকে বিশ্বাস করি।"

—"কি ক'রে বিশ্বাস এলো ?"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"জংলিদের হাতে নিশ্চিত মরণের কবল থেকে ভগবানই সেদিন আমায় রক্ষা করেছেন। তা নইলে আমার বাঁচ্‌বার আর কোনো উপায় ছিল না। তারপর এই গহন পাহাড়ি বনে আপনার বেশ ধ'রে তিনিই আমায় আশ্রয় দিয়েছেন।"

"দিয়েছেন।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"কিন্তু তোমার নিজের যদি চেষ্টা না থাক্‌তো, তা হ'লে কিন্তু তাঁর সাহায্য পেতে না। অলস, নিষ্কর্ম্মা যারা ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন না।"

রঞ্জিত প্রাণে বল পেল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—"পার্‌বে একা যেতে ?"

"পার্‌বো।"—রঞ্জিত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল।

"বেশ্, এই তো চাই।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"সংসারের কোনো কাজেই ভীরুর মতো মুশ্‌ড়ে পোড়ো না, বীরের মতো বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাবে।"

কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে রঞ্জিত বল্‌ল,—"আপনি যে আমায় এখানকার মন্দিরগুলোর ইতিহাস বল্‌বেন, বলেছিলেন।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আমার বল্‌তে হবে না। সে সব তুমি নিজেই জান্‌তে পাবে।"

—"কেমন ক'রে ?"

সন্ন্যাসী এ-কথার কোনো উত্তর দিলেন না। যেন হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে গেছে, এম্‌নি ভাবে বল্‌লেন,—"হ্যাঁ, সেখানে যাবার সময় কাগজ আর পেন্‌সিল সঙ্গে নিতে ভুলো না যেন। আমার হয়তো ভুলও হ'তে পারে, তাই তোমায় আগে থাক্‌তে ব'লে রাখছি।"

—"কাগজ পেন্‌সিল কি হবে ?"

"কতো কি দরকার হ'তে পারে।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"একটা বিচিত্র কাজে যখন যাচ্ছি—"

"আপনিও যাচ্ছেন তা হ'লে!"—রঞ্জিত উল্লাসে ব'লে উঠ্‌ল।

সন্ন্যাসী শুধু গম্ভীরভাবে বল্‌লেন,—"দেখি।"

তারপর আর কোনো কিছুই বলার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ বাইরে চ'লে গিয়ে অত্যন্ত সহজ গলায় হাঁক দিলেন,—"কিগো মহাবীর, তোমার রান্নাবান্নার কতদূর? রাত কিন্তু কম হয়নি।"

রঞ্জিত ভেবে-চিন্তে কূল-কিনারা পেল না,—কি এসব রহস্য! (ক্রমশঃ)

বাংলার মৃৎ-শিল্প

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি. এ.

বাংলার মাটি সত্যি আমাদের মা-টি। ঠিক মায়ের মতই প্রাণভরা স্নেহে এই মাটি আমাদের জোগাচ্ছে অন্ন ও বস্ত্র, ফল ও মূল। যখনই কোনও অভাব বোধ করেছি আমরা, এই মাটিই তা পূরণ ক'রে দিয়েছে। বাংলা দেশের মাটির শিল্পও বাংলা মায়েরই অপূর্ব্ব দান। আজ তোমাদের এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব।

আজ বাংলার পল্লী শ্রীহীন; কিন্তু শ্রী যখন ছিল তখন সারা দেশে এমন কোন বড় পল্লীগ্রাম ছিল না যেখানে দু'চার ঘর কুমোর বাস করত না। কুমোরকেই সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় কুম্ভকার। কুম্ভ কথাটার অর্থ যে কলসী তা কে না জানে? কিন্তু কুমোরেরা কি শুধু কলসীই তৈরি করে? মাটি দিয়ে আমাদের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয় বহু বস্তুই তৈরি করে তা'রা। মাটির হাঁড়িতে বহু গেরস্তের বাড়ীতে ভাত রান্না হয়, মাটির কড়াইয়ে ডাল, তরকারী ও মাছ রান্না হয়। মাটির কলসীতে জল রাখা হয়। মাটির কুঁজোয় জল রাখে না সহরেও এমন লোক দেখা যায় না। আজকাল এই মাটির বাসনকে হটিয়ে দিয়ে সহরে এবং পল্লী-অঞ্চলেও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরে এসে জায়গা জুড়ে বসেছে পেতল, লোহা আর য়্যালুমিনিয়ামের বাসন। লোহার কড়াইয়ের রান্না খেয়ে খেয়ে মাটির বাসনে রান্নার ধারণাও করতে পারে না আজকালকার ছেলেমেয়েরা।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে, বহু লোককে খাওয়াবার ব্যবস্থা যে বাড়ীতেই হয়, সেই বাড়ীতেই খুব বড় বড় পেতলের হাঁড়ি, ডেকচি, গামলা, কলসী, আর লোহার মস্ত মস্ত কড়াই আনতে হয় রান্নার জন্য। পূর্ব্বে এ সব জিনিষের এত প্রাচুর্য্য ছিল না, কাজেই গামলা, হাঁড়ি, ডেকচি, কলসী ইত্যাদি সবই কিনে আনতে হ'ত কুমোরের বাড়ী থেকে। নেমন্তন্ন বাড়ীতে জল রাখবার বিরাট জালা এনে বসানো হ'ত। তা ছাড়া সারা বছরের চাল রাখবার জন্য যে বিশাল জালা হ'ত, তা সত্যই একটা দেখবার জিনিষ ছিল। এতে এক বছর কেন পাঁচ বছর থাকলেও চাল ভাল থাকত, আর ইঁদুরও জব্দ থাকত।

বর্ত্তমানে লোহা, পেতল আর য়্যালুমিনিয়াম্ সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে কুমোরদের; আর আমাদেরও কম ক্ষতি করেনি স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে। এ সত্বেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কিছুতেই বাদ দিতে পারি না মাটির জিনিষ। মাটির হাঁড়ি না হ'লে দই হ'তে পারে কি? সেই দই কিঞ্চিৎ কিনে আনতে হ'লে অথবা সহরের বড় বড় মিষ্টান্নের দোকানে ব'সে খেতে হ'লেও মাটির খুরি চাই। বড় বড় সম্মেলনে জলযোগের সময় কিসে ক'রে জলখাবার দেওয়া হয়? মাটির রেকাবিতে বা থালাতে। বহু লোককে এক সঙ্গে জল খেতেও দেওয়া

হয় মাটির গেলাসে। এ সব থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি মাটির জিনিষের প্রয়োজন আমাদের কত বেশী।

সব মাটিতে এসব জিনিষ তৈরি হয় না। মাটির জিনিষ তৈরি করতে চাই এঁটেল মাটি। অনেক সময়ে বহুদূর থেকেও মাটি কিনে আনতে হয় কুমোরদের, নদী বা খালের পথে নৌকোয় ক'রেই আনে। এই মাটিকে মাখতে হয় এমন ক'রে যে, তা হয়ে পড়ে একেবারে ময়দার মত পালিশ। মাটি বেছে নিয়ে রগ্‌ড়ে পালিশ ক'রে বড় বড় তাল করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, এতে খুবই কঠিন পরিশ্রমের দরকার।

তোমরা অনেকেই কুমোরের বাড়ীতে গিয়ে মাটি দিয়ে নানান জিনিষ তৈরি করতে দেখনি। শুধু যে পুরুষেরাই এই সব কাজ করে তা নয়, অবসর সময়ে বাড়ীর মেয়েরাও করে, আর তাদের কাজে সাহায্য করে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। শীতকালে কুমোর-বাড়ীর উঠোন আর বাগান ভর্ত্তি হয়ে থাকে কাঁচা মাটির হাঁড়ি, কলসী, ঘট, মালসা, ধুনচি, প্রদীপ, পীলসুজ প্রভৃতি জিনিষে। নরম মাটি দিয়ে তৈরি ক'রে এগুলোকে রোদে শুকিয়ে নিতে হয় খুব ভাল ক'রে, তার পরে থাকে থাকে সাজিয়ে বসাতে হয় পোয়ানে পোড়াবার জন্য।

মাটির জিনিষ তৈরি করতে মোটা কাঠের তৈরি চাকা লাগে। গরুর গাড়ীর চাকার মত এতেও আড়াআড়ি ক'রে কাঠ লাগানো থাকে। বাড়ীর বাইরেকার একটা ঘরের মেজেতে, এই চাকার পরিধির চেয়েও বেশী পরিসর নিয়ে হাতখানেক গভীর ক'রে মাটি তুলে ফেললে যে বিরাট গর্ত্ত হয়, তার মধ্যে খুব মোটা শক্ত কাঠ পেতে দেয়, এই কাঠের মাঝখানটায় একটা খুব মোটা লোহার পিন্ বসানো হয়, এই পিনটির ওপরে বসানো হয় চাকাটি। চাকার কেন্দ্র যে পিনেরই ওপরে বসান থাকে একথা বোধ হয় না বললেও চলে। চাকার কেন্দ্রটি ঘিরে খানিকটা কাঠ থাকে, তার ওপরে এক এক তাল মাটি বসিয়ে চাকা ঘুরিয়ে দেওয়া হয় খুব জোরে; আর কুমোর দুই হাত দিয়ে সেই মাটির তাল চেপে ধ'রে কলসী, ঘট ও হাঁড়ির মুখ তৈরি করে এমন অদ্ভুত কৌশলে যে, সত্যিই তাক লেগে যায়। কুমারের এই চাকাকে সংস্কৃত ভাষায় বলে কুলাল চক্র। এই চক্রের ব্যবহার হয়ে আসছে সেই আদ্যিকাল থেকে।

এই কুলাল চক্রে হাঁড়ি, কলসী, ঘটের শুধু গলা থেকে মুখ অবধিই তৈরি হয়, তলাকার অংশটা পেটাই ক'রে করা হয়। নরম মাটি পিটতে যে কামারের হাতুড়ির মত লোহার হাতুড়ি লাগে না, একি আর বলতে হবে? ছোট্ট পাতলা একটু কাঠের তক্তার এক দিকে হাতুড়ির মত একটা হাতল তৈরি ক'রে নেয়। মাটি আস্তে আস্তে পিটে নানারকমের বাসনের আকারে রূপান্তরিত করাটা ভারি ভাল লাগে দেখতে। এই কাজটি বেশীর ভাগই করে মেয়েরা।

কাঁচা জিনিষগুলো রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হয় খুব ভাল ক'রে, তারপরে সেগুলোকে পোড়াতে হয় পোয়ানে। কুমোরের পোয়ান ভারি অদ্ভুত রকমের। মাটিতে বৃত্তাকারে প্রকাণ্ড একটা

গর্ত্ত তৈরি করা হয় খুব গভীর ক'রে। সেই গর্ত্তের মেঝে থেকে দু' তিন ফুট উঁচুতে একটা প্ল্যাটফর্মের মত করা হয় বড় বড় ভাঙা হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি দিয়ে। এর ওপরে খুব শুক্নো কাঁচা হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি বসানো হয় থাকে থাকে। প্রত্যেক থাকের মধ্যে দেওয়া হয় কয়লা, বিচালি ও কাদা। মোট কথা হচ্ছে এই যে, কাদামাটি দিয়ে এক একটি স্তর লেপে দেওয়া হয়, তারপরে আর একটা স্তর সাজানো হয় ঠিক গ্যালারির মত ক'রে; আর প্রত্যেক স্তরের ভেতরে থাকে কয়লা। যেখানে কয়লা খুব সস্তা নয় এবং সহজে পাওয়াও যায় না, সেখানে কাঠই ব্যবহার করা হয়। সব সাজানো হয়ে গেলে বাইরেকার সব দিকটাও মাটি আর বিচালি, অথবা মাটি আর গোটা গোটা শুক্নো কলার পাতা দিয়ে প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, আর আগুন দেওয়া হয় পোয়ানের একেবারে নীচে। দক্ষিণ বঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে কলার পাতা বিক্রী বড় একটা হয় না, বাগান ভরা কলা গাছে গোটা গোটা পাতা শুকিয়ে ঢুলে থাকে, এই শুক্নো পাতাগুলোকে বলা হয় ফাত্রা। পোয়ান সাজাবার পূর্ব্বে কুমোরের বাড়ীর ছেলেরা গাঁয়ের নানা বাগানে ঢুকে এই ফাত্রা সংগ্রহ করে রাশি রাশি। পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষতঃ বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় শুক্নো ঘাস, বিচালি ব্যবহার করা হয় ফাত্রার বদলে, আর কাঠের বদলে দেওয়া হয় কয়লা। ৬ ঘণ্টা থেকে ৮।১০ ঘণ্টা সময় লাগে পুড়তে। আগুন নিবে গেলেই জিনিষগুলো বার করা হয় না, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই বার করতে হয়। এতে লোকসানও খুব কম হয় না। শতকরা ১৫, ২০, এমন কি ২৫টি পর্য্যন্ত হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি ফেটে যায় প্রায় প্রত্যেক পোয়ানেই।

বর্দ্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুর অঞ্চলে প্রায় ১৫০টি কুমোর-পরিবার যত কিছু মাটির জিনিষ তৈরি করে তা আসানসোল, বরাকর ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট স্থানে খুব সমাদর পেয়ে থাকে। এদের তৈরি কুঁজোর বাহার খুব বেশী। হাওড়া জেলার জগদ্বল্লভপুর অঞ্চলের হাঁড়ি এবং সাঁকরাইল থানার এলাকার কলসী ও কুঁজো অত্যন্ত সুন্দর ও টেকসই। চণ্ডীপুরের মাটির খেল্না, রঙীন মাটির বাসন আর উলুবেড়িয়া ও ডোমজুরের তৈরি নানা রকমের কৃত্রিম ফল, ব্রাকেট ও অন্যান্য পাত্র বিশেষ বিখ্যাত। মৃৎশিল্পে হাওড়া জেলার স্থান খুব উঁচুতে।

কলিকাতার কুমারটুলির নাম কে শোনেনি? কুমারটুলির কুমোরদের তৈরি সরস্বতীমূর্ত্তি শুধু কলিকাতায়ই নয়, পার্শ্ববর্ত্তী সব জেলায়ই বিক্রী হয় খুব বেশী দামে। কুমারটুলির তৈরি দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখবার জন্য কি কম ভীড় হয়? সত্যই দেখবার মত ঠাকুর তৈরি করে এরা। এদের তৈরি অন্যান্য মাটির জিনিষও খুব চমৎকার বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে এদের তৈরি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি এসব যেন ঢেকে রেখেছে।

কুমোরের সংখ্যা ঢাকা জিলায় খুব বেশী। একমাত্র ঢাকা সহরেই প্রায় ৪০০ কুমোর-পরিবার বাস করে এবং কুমোরের কাজই করে তা'রা। তা ছাড়া এই জেলার প্রত্যেক মহকুমার এলাকায়ই

বহু গ্রামে কুমোর বাস করে। যে সব কুমোর জাতব্যবসা কচ্ছে এখনও, তাদের সংখ্যা প্রায় ৮০০০। এই জেলার মাটির বাসনের বেশ খ্যাতি আছে। যে জায়গার মাটিতে খুব ভাল বাসন তৈরি হয়, সেই রকম জায়গার মাটি এরা কেনে বিঘা হিসাবে। এক বিঘা মাটির দাম ৫০ থেকে ১০০ টাকা, আর বালি এরা কেনে ২৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা ক'রে ১০০ মণ। খুব সরু বালির দরকার হয় মাটির সঙ্গে।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বহু কুমোর কূয়োর পাট তৈরি করে। পশ্চিম বঙ্গের যেমন প্রায় সকল কুমোরই কূয়োর পাট তৈরি করে, পূর্ব্ববঙ্গের কুমোরেরা সব জায়গায় কূয়োর দরকার হয় না ব'লেই বোধ হয় পাট তৈরি করতে জানে না। কিশোরগঞ্জ এলাকার অনেক কুমোর চমৎকার পুতুল ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি করে, আর বৈয়ম তৈরি করে ভারি সুন্দর। টাঙ্গাইল মহকুমার বাসাইল গ্রামের কুমোরেরা দেব-দেবীর মূর্ত্তি তো গড়েই, তা ছাড়া নানা রকমের মনুষ্যমূর্ত্তিও তৈরি করে খুব চমৎকার।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট ও শান্তিপুর বাংলা দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে আছে মৃৎশিল্পের নৈপুণ্যে। এদের তৈরি পুতুল আর দেব-দেবীর মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এরা যে কৃত্রিম ফল ও মাছ তৈরি করে, তা গঠন-পারিপাট্যে ও রংয়ের সৌষ্ঠবে সত্যিকার ফল ও মাছ ব'লে ভ্রম জন্মায় যে কোন লোকের। মানুষের আবক্ষ-মূর্ত্তি তৈরিতে এরা বিশেষজ্ঞ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, এদের তৈরি নানারকম মডেলের চাহিদা আছে ইউরোপ ও আমেরিকায়ও। যদুনাথ পাল ও বক্কেশ্বর পালের বহু রকমের বিচিত্র মডেলের চাহিদা ইউরোপের বাজারেও খুব বেশী। এ কত বড় গৌরব আমাদের বাংলা দেশের! মৃৎশিল্পেও বাংলা দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী সারা ভারতে নেই, সারা জগতেও অত্যন্ত বিরল।

চাঁদা মামার দেশ

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

হঠাৎ এল নিমন্ত্রণ এক—চাঁদামামার বাড়ী,
বাহন এল হুতোম প্যাঁচা মস্ত একটা ধাড়ী।
পিঠে তাহার কোমল পালক, হাওয়ায় চলে ভেসে
নীল আকাশের সাগর পারে চাঁদামামার দেশে।
মামাবাড়ীর খানা-দানা ইয়ত্তা নাই তার,
যাও যদি তো দেখতে পাবে, বল্‌ব কত আর!
গোয়াল ভরা দোয়াল গরু, মরাই ভরা ধান,
সারি সারি গুয়া-নারিকেল, বরজ ভরা পান।
বাগান ভরা ফলে-ফুলে টুকটুকে সব গাছ,
পুকুর ভরা মস্ত মস্ত রুই-কাৎলা মাছ।
চাঁদামামী চরকা কাটেন, মামা বুনেন তাঁত,
ছেলেরা সব লাঙ্গল চষে, বৌরা রাঁধে ভাত।
মেয়েরা সব কলসী কাঁখে জল আন্‌তে যায়,
চাঁদামামার দেশে তোরা কে যাবিরে আয়।

মানরক্ষা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম. এ., বি. টি.

মহাবীর প্রতাপসিংহের পুত্র রাণা অমরসিংহ তখন মেবারের অধিপতি। রাজধানী হইতে বিতাড়িত প্রতাপ সারা জীবন অসীম দুঃখকষ্টের মধ্যেও স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়াছিলেন। বনে জঙ্গলে পর্ব্বত-গুহায় স্ত্রীপুত্রপরিবার লইয়া কখনও অনাহারে, কখনও অর্দ্ধাহারে দিনপাত করিয়াছেন। পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় অটল মহারাণা পুত্রের শৌর্য্য ও দৃঢ়তার উপর খুব আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর অমরসিংহ স্বাধীনতার জন্য কষ্ট বরণ করা অপেক্ষা ভোগবিলাস অধিকতর পছন্দ করিবে। রাণার এই দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্বাণী অমরসিংহের প্রথম জীবনে ফলিয়াছিল; কিন্তু ঘটনাচক্রের

আবর্ত্তনে এবং রাজপুত সামন্ত বীরদের উদ্দীপনায় তাঁহার জীবনে গভীর পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল; বিলাসের স্বাচ্ছন্দ্য-কুয়াসা কাটিয়া যাওয়ায় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অদম্য ক্ষাত্রতেজ ফুটিয়া উঠিয়া অমরসিংহকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মেবারের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠাইলেন। অমরসিংহ যুদ্ধের কোন উদ্যম করিলেন না। তিনি রণক্ষেত্র অপেক্ষা প্রমোদকক্ষ বাঞ্ছনীয় স্থান মনে করিলেন। কিন্তু প্রতাপের মৃত্যুশয্যা স্পর্শ করিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সালুম্ব্রাপতি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হইয়া অমরসিংহের বিলাসকক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে দেওয়ালে লম্বিত একখানি বৃহৎ বিদেশী আয়না একটি পিতলের মূর্ত্তির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বিস্মিত অমরের মুখে কোন কথা ফুটিবার আগেই তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দিলেন। অপরাপর সর্দ্দারগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। অমরকে তাহারা জোর করিয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া চলিল। অমরের যখন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল, তিনি বুঝিলেন সালুম্ব্রা-অধিপতি উচিত কাজই করিয়াছিলেন; শিশোদিয়া বংশকে তিনি অনিবার্য্য কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অমরের ধমনীতে প্রতাপের রক্ত ঝিলিক দিয়া উঠিল। পিতার পদযুগল স্মরণ করিয়া তিনি মুক্ত অসিহস্তে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। সর্দ্দার ও সৈন্যগণের সমবেত হুঙ্কারে প্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল। যুদ্ধে মোগল-সেনা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গেল। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় অভিযানও বিফল হইল। দিল্লীশ্বর আক্রোশে ফুলিতে লাগিলেন। সামান্য মরুভূমি সদৃশ একখণ্ড প্রদেশের মালিক সমগ্র ভারতের অধীশ্বর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সৈন্যদল পরাভূত করে! উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ—সমগ্র মেবার রেণু রেণু করিয়া বাতাসে উড়াইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত মোগল সম্রাটের নিদ্রা নাই—বিশ্রাম নাই—আনন্দ নাই। বিপুল মোগল-বাহিনী তৃতীয়বার অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইল।

রাজপুতেরাও মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। পূর্ব্বের যুদ্ধে জয়লাভ করায় তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। আবার রণদামামা বাজিয়া উঠিল। রাজপুতবীর দলে দলে রাণার সূর্য্যচিহ্ন-অঙ্কিত রক্তবর্ণ পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল। জাতির সম্মুখে এইরূপ গুরুতর বিপদ যখন আসন্ন, তখন দুই সামন্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম আত্মকলহ উপস্থিত হইল। রাজপুতগণ যে শির অপেক্ষা সম্মান অধিকতর মূল্যবান মনে করে এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

রাজপুত সৈন্যের অগ্রভাগে যে-দল থাকে তাহাকে বলা হয় 'হিরোল'। যে সর্দ্দার এই হিরোল চালনা করেন, তিনি হিরোলপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত সামন্ত ও সৈন্যদলের শ্রদ্ধা স্বভাবতঃই তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এই গৌরবময় অধিকার এতদিন চন্দাবৎ সর্দ্দারগণ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। শক্তাবৎগণ অধুনা শক্তিশালী হওয়ায় শক্তাবৎ সর্দ্দার চন্দাবতের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। চন্দাবৎ সর্দ্দার বলিলেন—এ আমার বংশগত অধিকার। আমাদের

পূর্ব্বপুরুষ চিরদিন রাজপুত সৈন্যের পুরোভাগে স্থান পেয়েছে; আমারও সেই স্থান—আমার বংশধরেরাও এ গৌরব বহন করবে।

শক্তাবৎ সর্দ্দার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—পূর্ব্বপুরুষদের অধিকার হলেই তা বংশে কায়েমী হয়ে যায় না, বিশেষ ক'রে যেখানে বাহুবলের প্রশ্ন আসে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীরভোগ্য হিরোল-চালন-অধিকার। যে দলের শক্তি বেশী এ গৌরব অর্ঘ্য সেই দলপতির প্রাপ্য।

বাহুবলের উপর কটাক্ষ করায় চন্দাবৎ সর্দ্দার তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। কি! তাঁহার বংশগৌরব তাঁহার সময়েই হস্তচ্যুত হইবে? তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তিনি রোষদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—বেশ! তবে এখনই বাহুবলের পরীক্ষা হোক্—রাণার সম্মুখেই আজ মীমাংসা হয়ে যাক হিরোল-চালন কোন্ দলের ভাগ্যে!

—তবে তাই হোক্, বলিয়া শক্তাবৎ সর্দ্দার মহাবীর বল্ল অসিহস্তে দাঁড়াইলেন। দুই ক্রুদ্ধ সিংহ নিজ নিজ দলের লোকদের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া আক্রমণে উদ্যত হইল।

রাণা অমরসিংহ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—নিরস্ত হোন্, এখানে রক্তপাত নিরর্থক! যে-দল প্রথমে মোগলের হাত থেকে অন্তলা দুর্গ অধিকার করতে পারবে, হিরোল-চালন তারই প্রাপ্য।

উভয় সর্দ্দার অসি কোষবদ্ধ করিয়া বলিলেন—উত্তম! তৎক্ষণাৎ উভয় দলে শক্তি পরীক্ষার আয়োজনের সাড়া পড়িয়া গেল। অন্তলা, অন্তলা,—অন্তলা যেন তাহাদের জপমন্ত্র হইয়া উঠিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উভয় দল বিভিন্ন পথে যাত্রা করিল। চারণ কবিগণ উদ্দীপনাময়ী গাথা আবৃত্তি করিতে করিতে দলের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পুরমহিলারা শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি করিয়া সর্দ্দারদের ফুলের মালা আর চন্দনে সাজাইয়া হাসিমুখে বিদায় দিল—তাহারা যেন বিজয়-গৌরব বহন করিয়া ফিরিয়া আসে; সমগ্র মেবার তাহাদের পথ চাহিয়া থাকিবে।

অন্তলা দুর্গ চিতোর হইতে ১৮ মাইল পূর্ব্বদিকে একটি উচ্চভূমির উপর দুর্ভেদ্য প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। দুর্গের মধ্যে পরিখা দিয়া ঘেরা আর একটি অট্টালিকা। দুর্গরক্ষক সেখানে বাস করেন।

শক্তাবতেরা আগে গিয়া পৌঁছিল, কিন্তু বিরাট লৌহ কবাট রুদ্ধ। মোগল-সৈন্য দুর্গের উপর হইতে অবিরাম গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। ওদিকে চন্দাবতেরা ভ্রমবশতঃ এক জলাভূমির মধ্যে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এক মেষপালকের সাহায্যে অন্তলা দুর্গমূলে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রাচীর ডিঙ্গাইবার জন্য কাঠের মই সঙ্গে লইয়াছিল। চন্দাবৎ সর্দ্দার সেই মই বাহিয়া প্রাচীরের উপর উঠিবামাত্র শত্রুর গুলীর আঘাতে নীচে লুটাইয়া পড়িলেন। হিরোল-চালনের আশা তাঁহার চিরতরে লুপ্ত হইল। কিন্তু সৈন্যগণ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সর্দ্দারের যোগ্য সহকর্ম্মী বান্দা ঠাকুর সর্দ্দারের মৃতদেহ উত্তরীয়দ্বারা নিজের পিঠের সঙ্গে বাঁধিয়া রক্তাক্ত কৃপাণহস্তে দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যকরে তাহার তরবারি ঝলমল করিয়া

উঠিল, বামহাতে তাহার রাণার পতাকা। তাহাকে দেখিয়া চন্দাবৎ রাজপুতগণ বিপুল বিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

চন্দাবৎদের হুঙ্কার শব্দে শক্তাবতেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তবে কি তাহারাই প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিল? আর তো দেরী করা চলে না! সর্দ্দার আদেশ দিলেন—চালাও হাতী, ভাঙ্গো দরজা!

মাহুত অঙ্কুশের পর অঙ্কুশ বসায় হাতীর মাথায়, কিন্তু হাতী কবাটে মাথা পাতিতে পারে না; কবাটে বড় বড় ধারালো লৌহশলাকা বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহার আঘাতে ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ উচ্চ বৃংহিতধ্বনি করিতে লাগিল। শক্তাবৎ সর্দ্দার তৎক্ষণাৎ কবাটের লোহার গজালের উপর পিঠ লাগাইয়া মাহুতকে হুকুম করিলেন—শীগ্‌গীর হাতীর মাথা আমার এই বুকের ওপর বসিয়ে চাপ দাও—চালাও—চালাও—

মাহুত ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া সর্দ্দার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—আদেশ অমান্য করলে তোমার মাথা যাবে। চালাও হাতী—ঐ চন্দাবৎদের সিংহনাদ—সব গেল বুঝি—

হাতী এবার সর্দ্দারের বুকের উপর মাথা পাতিয়া দারুণ চাপে কবাটদ্বয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সর্দ্দারের মুমূর্ষু দেহ ভগ্ন কবাটের সঙ্গে পিষ্ট হইয়া রহিল। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শক্তাবতেরা বাঁধভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে লাগিল। কিন্তু সর্দ্দারের এই মৃত্যুবরণ, সৈন্যদের অতুলনীয় বীরত্ব—সবই বৃথা হইল। দুর্গশিখরে দাঁড়াইয়া চন্দাবৎ সহকারী সর্দ্দার বান্দা ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিল—হিরোল হিরোল—চন্দাবৎদের অধিকারে! তাহার বাম কাঁধের উপর সর্দ্দারের মৃতদেহ, ডান হাতে বিজয় পতাকা! তাহাকে দেখিয়া সৈন্যগণ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—জয় চন্দাবতের জয়!—জয় চন্দাবৎ সর্দ্দারের জয়!

চন্দাবৎ সর্দ্দারের মৃতদেহ আগে দুর্গশীর্ষে উঠিয়া বংশের মানরক্ষা করিল। হিরোল-চালনার অধিকার চন্দাবৎদেরই থাকিয়া গেল।

উভয় সর্দ্দারের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য রাণা অমরসিংহ অন্তলায় আসিয়া পৌছিলেন। শক্তাবৎ সর্দ্দার বল্লের প্রাণবায়ু তখনও বহির্গত হয় নাই; বক্ষপঞ্জর ভগ্ন—নিষ্পেষিত দেহ কবাটের লৌহশলাকার সঙ্গে আটকাইয়া রহিয়াছে। রাণাকে দেখিয়া মুমূর্ষু বল্ল উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিলেন—দুনা নাত্তার চৌগুণা জুজার, খোরাসানী মুলতালিকা আগ্‌গল, অর্থাৎ রাজা যত অনুগ্রহ দেখাবেন তাঁদের আত্মোৎসর্গও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

রাণা নত হইয়া উভয় হস্তদ্বারা সর্দ্দারের মস্তক স্পর্শ করিলেন। উৎফুল্ল বীরের চক্ষুপল্লব চিরদিনের মত মুদিত হইয়া গেল।

সবুজ সার

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, বি. এ.

ক্ষেতে আমরা নানা রকমের সার প্রদান করি ভাল ফসল পাবার জন্য। এই সার কি কাজ করে জানো?—একদিকে যেমন উদ্ভিদকে আহার প্রদান করে অন্যদিকে তেমনি জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ জমিকে কৃষিকর্ম্মের অধিকতর উপযোগী ক'রে তোলে। সবুজ সার হলো এই রকমের এক প্রকার সার। আমরা চোখের সামনে সর্ব্বদাই দেখতে পাচ্ছি গাছের অগুন্তি পাতা মাটির বুকে ঝ'রে পড়ছে—বিশাল মহীরুহ থেকে আরম্ভ ক'রে কচি কচি সবুজ গাছগুলি মাটির বুকেই লুটিয়ে পড়ছে। শুধু গাছগাছড়াই বা কেন? এমন আরো কতো কি? এদের চরম পরিণতি কোথায়? এদের সমস্ত সত্বা মাটির বুকেই লীন হয়ে যায়। এরা মাটি থেকে যা নেয়—মৃত্যুতে এইভাবে তার অধিকাংশই মাটিকে ফিরিয়ে দেয়—এইভাবেই স্বাভাবিক নিয়মে মাটির উর্ব্বরতা অক্ষুণ্ণ থাকে। সবুজ উদ্ভিদ্‌গুলি এই যে স্বাভাবিকভাবে মাটিতে মিশে গিয়ে সারে পরিণত হচ্ছে একেই বলে 'সবুজ সার'।

'সবুজ সার' সম্বন্ধে এইটে হলো মোটামুটি কথা; কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত সবুজ সারের প্রয়োগবিধিতে মানুষেরও খানিকটা হাত আছে—সেইটাই তোমাদের বুঝিয়ে বলছি। 'সবুজ সার' বলতে সাধারণতঃ এক জাতীয় বিশেষ উদ্ভিদকে বোঝা যায়—সেগুলি শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ্, ইংরেজিতে যাকে বলে Leguminous plants. তোমরা নিশ্চয়ই শন, ধইঞ্চা, বরবটি, মটরশুঁটি, চিনেবাদাম প্রভৃতির গাছ দেখেছ; এগুলিই হচ্ছে উপরোক্ত শ্রেণীর উদ্ভিদ্। এইসব গাছগুলি যখন একটু বড় হয় তখন উপ্‌ড়ে ফেলে শিকড়ের দিকে চাইলে দেখতে পাবে শিকড়ের গায়ে বসন্তের মতো অজস্র গুটি হয়ে রয়েছে। এই গুটিগুলি কেন হয় জানো? মাটিতে এক রকম জীবাণু আছে (Bacillus Radicicola)—কেবলমাত্র শুঁটিজাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের সূক্ষ্মাংশ দিয়ে এই জীবাণুগুলি প্রবেশ করে এবং জায়গায় জায়গায় তাদের বাসা তৈরি করে। এদের দেহগুলি নাইট্রোজেন উপাদানে তৈরি; এই নাইট্রোজেন এরা আহরণ করে বাতাস থেকে। কিন্তু তার জন্য তো শক্তির প্রয়োজন? সেই শক্তি জীবাণুগুলি পায়, যে গাছের শিকড়ে বাস করে তারই দেহ থেকে আহার্য্য এবং শর্করা শোষণ ক'রে; সুতরাং দেখতে পাচ্ছো এরা জীবন আরম্ভ করে পরাশ্রয়ী হয়ে। কিন্তু অল্পকাল পরেই আশ্রয়দাতা গাছগুলিতে যখন ফুল আসবার সময় হয়, তখন এদের মৃত্যু হয় এবং জীবাণু দেহগুলি ভেঙ্গেচুরে গ'লে যায়। এই দ্রবীভূত জিনিসটাতে নাইট্রোজেন বেশি পরিমাণে থাকে, কেননা ওদের দেহের প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। তখন গাছ নিজের দৈহিক পুষ্টি এবং ফুল ফোটানোর জন্য এই রস গ্রহণ করে।

উদ্ভিদের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন সবচেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু এত পরিশ্রম ক'রে গাছকে নাইট্রোজেন নিতে হয়, তার কারণ গাছ সোজাসুজি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন

গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের মতো এদেরও প্রস্তুত আহার্য্য চাই। মৃত্তিকারসের সঙ্গে বা অন্য কোন প্রকারে তরলভাবে নাইট্রোজেন উপাদান বর্ত্তমান থাকলে তবেই সেটা গাছের গ্রহণযোগ্য হয়। নানারকমের নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ পৃথিবীর বুকে সব সময় অল্প অল্প ক'রে মিশে যাচ্ছে এবং সেই থেকেই মাটির বুকে এই নাইট্রোজেনাত্মক আহার্য্য রসের উৎপত্তি। সুতরাং এই যে জীবাণুদের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ—এইটাই হলো সবুজ সারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আচ্ছা, এখন আবার পরিষ্কার ক'রে বুঝে দেখ জিনিসটা কী হচ্ছে। প্রথমতো জীবাণুগুলির কাজ হচ্ছে নিজেদের দেহ নির্ম্মাণের জন্য বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়ত, যে গাছ এই জীবাণুদের আশ্রয় দিচ্ছে সে গাছগুলির কাজ হচ্ছে এদের গলিত দেহ থেকে নাইট্রোজেন-ঘটিত দ্রব পদার্থ শোষণ ক'রে নিজেদের পুষ্টিসাধন করা এবং ফুল ফোটানো।

সুতরাং দেখ এরা কেমন ভাবে পরস্পরকে সাহায্য করছে। যতক্ষণ জীবাণু জীবিত থাকে, গাছ তাদের নিজের শরীর থেকে আহার্য্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে—আর আশ্রিত বীজাণুগুলি তাদের দেহ দান ক'রে যায় আশ্রয়দাতার পুষ্টির জন্য।

আচ্ছা, এখন আমরা খাবার জন্য তৈরি নাইট্রোজেন শিকড়ে পেলাম। ঠিক এই সময় যদি গাছগুলিকে আর বাড়তে না দিয়ে লাঙল দিয়ে চ'ষে মাটির ভিতর চাপা দিয়ে দিই তাহ'লে কি হবে বলত? গাছের তৈরি খাদ্য মাটিতেই সঞ্চিত থেকে যাবে এবং সবুজ গাছগুলি মাটিতে প'চে মিশে ভালো সার হবে। কেমন, নয় কি? তখন আমরা যে সব ফসল ফলাতে চাই সেগুলির চাষ করলে আশাতীত ফল লাভ করতে পারি।

শুঁটি জাতীয় গাছগুলি এই ভাবেই সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ, 'সবুজ সার' কথাটার তাৎপর্য্য কি। আমাদের দেশে অনেক স্থানে ধইঞ্চা এবং শন উৎকৃষ্ট সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়; কেননা, বর্ষার শেষভাগে এগুলিকে মাটির সঙ্গে চ'ষে চাপা দিয়ে দিলে কপি, বিলাতি বেগুন প্রভৃতি শীতের ফসল বপন করবার পূর্ব্বেই এরা জমির সঙ্গে মিশে গিয়ে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়।

এই সবুজ সারের উপকারিতা অনেক। এই সার প্রয়োগের ফলে ভিজে ভারী জমি ক্রমশ হাল্‌কা হয়ে যায়,—আবার যে জমিতে একেবারে জল থাকে না সেই জমির জলরক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হয়। এই রকম আরও অনেক উপকারিতা এর আছে যা তোমরা বড় হয়ে যখন কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনা করবে তখন বুঝতে পারবে। ইতিমধ্যে তোমাদের বাড়ির কাছাকাছি যে সব কৃষিপ্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম্মাদি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চলে, সে সব স্থানে গিয়ে যদি নিয়মিতভাবে কাজকর্ম্ম লক্ষ্য কর, তবে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে।

ফিরে চল

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল

ওগো পথ-ভোলা—ফিরে চল আজি পল্লীর বনচ্ছায়,
অতীত যুগের শান্তির স্রোত আজিও বহিয়া যায়।
আজো বনে বনে পিক কুহরণে আম্রমুকুল ফোটে,
আজো পল্লীর বল্লী বিতানে গন্ধপুষ্প লোটে।
আজো অশোকের নবমঞ্জরী পলাশ মুকুল সনে,
মধু মন্দার রূপ সম্ভারে ফুটে উঠে বনে বনে।
নব কিসলয়ে দুলে দুলে আজো পল্লী-বধূর বুকে,
অতীত দিনের হারান স্বপ্ন এনে দেয় সম্মুখে।
গন্ধবিধুর ভ্রমর আজিও মধু করে আহরণ,
ফুলে ফুলে শত প্রজাপতি আজো ভুলায় সবার মন!
প্রাণখোলা শত সরল শিশুর মেলা বসে এর বুকে,
ফুটে উঠে শত স্বরগের ছবি—এদের সরল মুখে!
ভুল পথে আর—পথ ভুলে যেন কাঁদিও না অভিমানে,
নব জীবনের নূতন যাত্রা কর ফাল্গুন গানে।

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

জয়-পরাজয়

সুরেশ প্রবালস্তূপের আড়ালে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে আর কি করা যায় ভাবিতে লাগিল। শরীর বড়ই ক্লান্ত, কিন্তু একটা কিছু করিতেই হইবে। অতর্কিত আক্রমণ করিতে না পারিলে একটা মীমাংসা করা যাইবে না।

পাণ্ডুরং বন্দুক হাতে রাখিয়াই জানালার খড়খড়ির মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে দেখিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন নাকি সুরে গড়গড় করিয়া যেন কি বলিতে লাগিল। আওয়াজে মনে হইল গালাগালি দিতেছে, কিন্তু কোন্ ভাষায় বুঝিতে পারা গেল না।

সুরেশ তাহার আওয়াজ শুনিয়া একটু হাসিল। হাতে রাইফেল, তবুও এত ভয়! অথচ প্রতিপক্ষের হাতে মাত্র একটা বাঁশের লাঠি।

পাণ্ডুরং সুরেশকে স্তূপটার আড়ালে বসিতে দেখিয়াছিল এবং একটি গুলীও যে তাহার গায়ে লাগে নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে এখনও স্তূপের আড়ালে আছে কিনা বুঝিবার জন্যই এতক্ষণ নিজ ভাষায় গালাগালি দিতেছিল। এবার ইংরাজী ভাষায় বলিল,—"ওরে ভূত, আয় না উঠে! তুই না আমার বাড়ীতে আসবি! এগিয়ে আয় দেখি কত সাহস তোর! ব্যাটা ভূত, ব্যাটা বাটপার, কুকুর কোথাকার!"

তাহার কথা শুনিয়া সুরেশ আবার হাসিল। লোকটা জানিতে চায় সে কোথায় আছে, তবেই আবার গুলী চালাইবে।

সুরেশ ইংরাজীতেই জবাব দিল,—"দূর ব্যাটা মাদ্রাজী কুকুর! তুই আমায় খুন করবার জন্য বারবার গুলী করেছিস্, বিশুয়াটাকে পাঠিয়েছিলি আমার মাথা কাটবার জন্য! আমি এবার এসেছি তোকে খুন ক'রে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার জন্য।"

আবার দ্রুম্-দ্রাম্ গুলী ছুটিল, কিন্তু সবই মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। সুরেশ হাসিতে লাগিল, মাদ্রাজীটা এত বোকা যে গায়ে গুলী মারিতে হইলে ঘরের বাহিরে না আসিলে চলে না বুঝিয়াও বৃথাই গুলী খরচ করিতেছে।

গুলী থামিলে সুরেশ বলিল,—"ওরে ব্যাটা মাদ্রাজী, তুই যে বিশুয়ার ভরসা করিস্, তাকে তো ইচ্ছে করলেই খুন ক'রে ফেলতে পারি। আর সে তোকে কোন সাহায্যই করতে আসছে না। দেখি কে তোকে রক্ষা করে!"

এই কথা বলিয়াই সুরেশ হামাগুড়ি দিয়া অতি সন্তর্পণে স্তূপটার একপাশে চলিয়া গেল এবং সে স্থান হইতে চট করিয়া বাড়ীর একটি জানালার ঠিক নীচে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র সব গোলমালের একটা সুরাহা করিয়া ফেলে।

ওদিকে পাণ্ডুরং পাগলের মত সেই একই স্থান লক্ষ্য করিয়া রাইফেল হইতে অবিরত গুলী চালাইয়া যাইতেছে। তাহার ধারণা সুরেশ সেই প্রবালস্তূপের পেছনেই লুকাইয়া আছে।

প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিল জানালা খোলা যায় কিনা, কিন্তু দেখিল যে তাহা ভিতর হইতে আঁটা, খুলিবার কোন উপায় নাই। তখন সাবধানে ঘরের এক পার্শ্ব দিয়া গা ঘেঁসিয়া সম্মুখের দরজায় উপস্থিত হইল।

ঘরটির বেড়া সুধু ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল গাছের টুকরা, মাটি হইতে চাল পর্য্যন্ত উঁচু। সম্মুখের দিকে একটি বারান্দা আছে তাহা এবং তাহাতে উঠিবার সিঁড়িগুলিও ঐ প্রকার নারিকেল গাছের টুকরায় তৈয়ারী।

তখনও পাণ্ডুরং পেছনের জানালা দিয়া গুলী বর্ষণ করিতেছে। এই ফাঁকে সুরেশ ভোজালী

দিয়া সম্মুখের দরজার দুইটি খড়খড়ি কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্য দিয়া হাত গলাইয়া দিয়া, দরজার ছিটকিনি খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। ঘরে ঢুকিয়াই দরজাটি আবার ভেজাইয়া দিল। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ বুঝিল, পাণ্ডুরং যে স্থান হইতে গুলী বর্ষণ করিতেছে, তাহা অপর একটি কামরা এবং এই স্থান হইতে একটি বেড়ার ব্যবধানে। অন্ধকারেই হাত দিয়া বেড়াটি ভাল করিয়া পরখ করিয়া দেখিল ও ভোজালী বাহির করিয়া বেড়ার বাঁধ কাটিতে উদ্যত হইল।

ইতিমধ্যে মাদ্রাজীটা গুলী করা বন্ধ করিয়াছিল। সুরেশ বেড়া কাটিতে যাইয়াও থামিল, কারণ একটু শব্দ হইবে, তাহাতে লোকটা সাবধান হইয়া পড়িবে। চুপ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সহসা ঘরের পশ্চাৎ দিকে একটা প্রচণ্ড বজ্রপাতের মত শব্দ হইল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরখানি কাঁপিয়া উঠিল, সুরেশও চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"উঃ! ব্যাটা কি বদমাইস! ডিনামাইট মেরেছে!"

আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজীটা গট্ গট্ করিয়া কি যেন বলিয়া পেছনের দরজা খুলিয়া বাহিরে ছুটিল। সুরেশও তাহার বাহির হইয়া যাওয়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া সম্মুখের দরজা খুলিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া সেইদিকে নিঃশব্দে ছুটিল। নিকটে যাইয়া দেখিল যে, সে যে স্থলে দাঁড়াইয়া ছিল তথায় আর সে প্রবালস্তূপ নাই, সব চুরমার হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজীটা সেই ধ্বংসের পাশে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইতেছে।

পাণ্ডুরংএর মনে হয়তো মহা আনন্দ, কারণ সে ভাবিতেছে যে তাহার শত্রু নিপাত হইয়াছে,

আর চিন্তা নাই। যদি সত্যই সুরেশ যথাসময়ে সেখানে থাকিত তবে তাহার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত।

সিগারেট ধরাইবার সময়েই, সুরেশ যে গুঁড়ি মারিয়া মাদ্রাজীর পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল, লোকটা মনের আনন্দে আর সেদিকে লক্ষ্য করে নাই।

হঠাৎ সুরেশের দুইটি হাত তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, সে গোঃ-গোঃ করিয়া বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। সুরেশ বলিল,—"এখন তবে চাঁদ, কাকে খুন করতে চাও ?"

তখন আরম্ভ হইল তুমুল মল্লযুদ্ধ। পাণ্ডুরং বেশ মোটাসোটা জোয়ান, কিন্তু ভয়ে সে কাবু, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল বেল্ট হইতে রিভলভারটি খুলিয়া লইতে। সুরেশ বাঁ হাতে পেছন হইতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া, ডান হাতে লাঠির ডগা দিয়া তাহার হাতের কব্জিতে গুঁতা মারিয়া, হাত ফিরাইয়া দিয়া বেল্ট হইতে রিভলভারটা খুলিয়া লইল। মাদ্রাজীটা অস্থিরভাবে লাফালাফি করিতেই উভয়ে সেই ডিনামাইট ফাটা গর্ত্তে পড়িয়া গেল।

গর্ত্তে দুইজনে দুইদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। সুরেশের মাথায় একটি চোট লাগায় তাহার উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল একটু বিলম্ব, এই সুযোগে পাণ্ডুরং গর্ত্তের উপরে উঠিয়া পড়িল। সুরেশ চাহিয়া দেখে সে পলাইয়া যাইতেছে। তখন সুরেশও উঠিয়া লাঠীগাছটি কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ধরিতে ছুটিল।

উপরে উঠিয়াই পাণ্ডুরং একবার ঘরের দিকে চাহিয়া কি মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর হঠাৎ ছুট দিল আবার পাহাড়ের দিকে। সুরেশ উপরে উঠিয়া দেখিয়া অবাক হইল যে এত মোটা লোক এত বেগে ছোটে। যাহা হউক সে আর না ছুটিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘর এখন সুরেশের হাতে, সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার ধারে রাইফেলটি পড়িয়াছিল, তাহাতে আর কার্ত্তুজ ছিল না, কিন্তু পাশে এক প্যাক কার্ত্তুজ ছিল, ভরিয়া লইল। জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল মাদ্রাজীটা ফিরিয়া আসে কিনা। বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করা সত্ত্বেও তাহার আসিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

আশ্রয়লাভ

সুরেশের এ সাফল্য আশাতীত। সে যে এত সহজে জয়লাভ করিতে পারিবে এবং বোম্বেটেদের এই ভাণ্ডার যে তাহার অধিকারে আসিবে ইহা কল্পনারও অতীত। অবশ্য দস্যুটা এখনও মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু হাতে রাইফেল থাকিতে সে তাহার জন্য অল্পই পরোয়া করে।

সন্ধান করিয়া ঘরের একপাশে টেবিলের উপর একটি লণ্ঠন পাওয়া গেল, দেশলাই পাইতে খুব বেগ পাইতে হইল না, সুরেশ আলো জ্বালাইল। আলো লইয়া ঘরটির সব জায়গা ভাল

করিয়া দেখিল। ঘরে মালপত্র ভালই আছে, কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়ে তৈয়ারী টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চি, কাঠের সিন্দুক প্রভৃতি। তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র আছে, দুইটি রিভলভার ও একটি রাইফেল। একটি কাঠের সিন্দুক বোঝাই গুলীও আছে। সুরেশ একটি রিভলভার নিজের কোমরে বাঁধিল। আর একটি সিন্দুক খুলিয়া দেখিল ডিনামাইট বোঝাই।

পাশের কুঠুরীটি রান্নাঘর, চাল, ডাল, তেল, নুন, মসলা, বিস্কুটের টীন, বাসনপত্র, চায়ের সরঞ্জাম ও জমাট দুধ প্রভৃতি কিছুরই সেখানে অভাব নাই। সুরেশ ষ্টোভ জ্বালিয়া একটি এলুমিনিয়ামের প্যানে খিচুরী চাপাইয়া দিল।

আহারাদির পর সুরেশ পুনরায় ঘরের দরজা জানালাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া পাণ্ডুরংএর বিছানায় শুইয়া ঘুম দিল। রাইফেল দুইটি তাহার বিছানার নীচে রহিল। ঘুম খুব ভাল হইল না, কারণ মনে দুশ্চিন্তা ছিল।

সকালে উঠিয়া সুরেশ জানালার খড়খড়ি দিয়া ভালমতে চারিদিক দেখিয়া, রাইফেল হাতে লইয়া সাবধানে ঘরের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইল সূর্য্য উঠিয়াছে, চারিদিকে গাছের পাতায়, পূর্ব্বে সমুদ্রের জলে, সোনালী রৌদ্র। আজ রৌদ্র দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইল। আজ তাহার সুপ্রভাত।

মনে হইল বনমালীর কথা, রাজেন বড়ুয়ার কথা, বেণীমাধব ও বেণীমাধবের বিশ্বাসী নাবিকদের কথা। হয়তো তাহারা মনে করিয়াছে যে সুরেশ মরিয়াছে, মনে হইল যে মৃত্যুর নিশ্চিত কোনও প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত বনমালী তাহার সন্ধান করিতে থাকিবে। আবার মনে হইল যদি খোঁজ করিতে করিতে এই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়। একথা ভাবিতে ভাবিতে

তাহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খাপ হইতে দুরবীক্ষণ যন্ত্রটি বাহির করিয়া সমুদ্রের দিকে দেখিতে লাগিল শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ।

রাইফেলটি লইয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিল মাদ্রাজীটার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। হয়তো সে কোথাও ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সুরেশকে কাছে পাইলেই গুলী চালাইবে। খোঁজ করিতে করিতে দেখিল ওপাশের ঝোঁপগুলির আড়ালে কয়েকটি চালাঘর। চালাঘরগুলি দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল, তাহাতে সব লুঠের মাল সাজানো। একটি চালায় তাহার বেণীমাধবের চায়ের বাক্সগুলি বেশ করিয়া সাজানো, আর এক চালায় কোপরা, ওদিকে মুক্তার ঝিনুক, কোথাও পাটের গাঁট, কাপড়ের গাঁট প্রভৃতি। সমগ্র মালের দাম হয়তো কয়েক লক্ষ টাকা হইবে।

তখন মাদ্রাজীটার সন্ধানে চলিল। সে মুক্ত আছে, সুযোগমত আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে। সমুদ্রের তীর, নারিকেলের জঙ্গল সব তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিয়া বাড়ী ফিরিল। স্নানাগারে এক টব জল ছিল, সেই টবে স্নান সমাপন করিয়া চা, মাখন ও বিস্কুট খাইয়া রান্নার ব্যবস্থা করিল।

রান্না শেষ হইলে আহারাদি করিয়া সুরেশ প্রায় বেলা এক প্রহরের সময় আবার পাণ্ডুরংএর সন্ধানে বাহির হইল। (ক্রমশঃ)

পশ্চাতে ফেলেছ যারে

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

বাইরের চেহারাটাই সব কিছু নয়। স্যর আশুতোষের চেহারা ছিল 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের' মতন, কিন্তু ভিতরে তাঁর ছিল মায়ের মতন স্নেহ-কোমল প্রাণ। ঝুনো নারকেলের ছোবড়াটা ছাড়ালে শক্ত আবরণ। সেই আবরণ ভেদ করতে পারলে তবেই না সুমিষ্ট জল আর সুস্বাদু শাঁস।

আমি খেজুর গাছ। নাম শুনেই তোমাদের গা কাঁটা দিয়ে উঠল হয়ত! ভাবছ, আহা কি রূপ!—অষ্টাবক্র মুনির মত বাঁকা, কুঁজো দেহ, ডালাগুলোয় আবার খোঁচা খোঁচা কাঁটা!

এতকাল যেসব খেজুর গাছের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি, এবার সেগুলির উপরও 'গাছি' ভায়ার বেশ একটু কৃপা-দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে। অগ্রাণ পড়তে না পড়তেই গাছি ভায়া এবার খেজুর গাছ ঝুড়তে আরম্ভ করেছে।

এর কিছুদিন আগেও একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। সুপারী যখন দুষ্প্রাপ্য এবং

দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠল, তখন লোকের দৃষ্টি পড়ল খেজুরের আঠির উপর! সুপারীর কাজ খেজুরের আঠি দিয়েই চালাতে লাগল অনেকে। যারা আমায় মোটা আঠির জন্য নিন্দা করেছে, এতদিন পরে তা'রা অবাক হয়ে ভাবল, তাইত! এদেশে ধান-চাল আছে, গম আছে—কাজেই খেজুর খেয়ে এদেশে কেউ বাঁচে না; কিন্তু খোরাসানে, মেসোপটেমিয়ায়, কি আফ্রিকায় যাও, দেখবে—খেজুরের রুটি, খেজুরের মোয়া, যা কিছু সব খেজুরের এবং খেজুর খেয়েই তা'রা বেঁচে থাকে। তাই সেখানে খেজুরের আঠিও খুব সরু।

'তমাল-তালী-বনরাজিনীলা' বাংলায় আমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়নি একথা মানি; কিন্তু খোরাসানে যাও, আরব-পারস্থে যাও, যাও সাহারার মরুতে,—দেখবে, খেজুরবনে ব'সে কত পরিবার কফি খাচ্ছে, জ্যোৎস্না রাতে কত কবি খেজুরকুঞ্জে ব'সে কবিতা লিখছে!

এদেশে আমার চেহারাটাকে এমন বদখদ করল কে? কে বছর বছর আমার শিরশ্ছেদন ক'রে আমাকে অষ্টাবক্র মুনি ক'রে তুলল? একেই বলে—অদৃষ্ট-দোষ! যাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করি, তা'রাই আমাকে দেখতে পারে না।

দেখতে পারে না-ই বা বলি কেমন ক'রে? সন্ধ্যে রাত্তিরে যখন রসওয়ালা 'চাই খেজুর রস' ব'লে হেঁকে যায়, তখন বালক-বৃদ্ধ অনেকেই ত তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে থাকেন! ন'লেন গুড়ের কথা কে না জানে?

ভদ্র ব্যক্তিরা—বিশেষতঃ সহরে যাঁরা বাস করেন তাঁরা গুড়ের নাম শুনে অনেক সময় মুখ বিকৃত করেন দেখা যায়; কিন্তু তাঁরা খবর রাখেন কি,—চিনিতে শ্বেতসার ছাড়া আর কিছুই নাই, কিন্তু গুড়ে শ্বেতসার ছাড়াও কিছু ধাতব পদার্থ এবং কোন কোন খাদ্যপ্রাণ (vitamin) বর্ত্তমান।

আমার কাণ্ডে পুকুরঘাটের সিঁড়ি হয়, ডেগোয় কৃষকের বেড়া হয়, পাতায় পাটি বা তলাই এবং ব্যাগ, ঝুড়ি প্রভৃতি হয়। তারতম্য অনুসারে রস দিয়ে অনেক কিছু হয়। 'জিরান' কাটা সেজো রস খেতে খুব সুস্বাদু। আবার রোদ-পোড়া ফেনা-উঠা রস খেলে মাথা ঘুরবে। রস থেকে গুড় হয়, গুড় থেকে মুড়কী। নতুন গুড়ের মোণ্ডা রাজা মহারাজাকেও উপহার দেওয়া যায়।

বসন্তের প্রারম্ভে আমার মাথা দিয়ে মুকুটের মত 'মঞ্জুরী' বেরোয়। এই মঞ্জুরীর ভিতর থাকে সুগন্ধ রেণু। তারপর বেরিয়ে আসে ফলের কান্দি। গ্রীষ্মকালে আম পাকবার আগেই পাকে খেজুর।

বয়সের কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা ক'রো না। প্রতি বৎসর গাছিরা আমার মাথায় দাগ ক'রে যে তিলক পরিয়ে দেয়—তার দাগ মোছে না জীবনেও। প্রতি বছরের এই দাগ থেকে তোমরা সহজেই আমার বয়সের একটা অনুমান ক'রে নিতে পার।

জননী ও সন্তান

শ্রীঅমিয়মোহন বসু

জননী দেখিছে স্বপন রাতের শেষে
পালিয়ে যাওয়া তা'র কিশোরী মেয়ে
আসিয়াছে পাশে যেন আজ দেবীবেশে
মাকে বলে মেয়ে স্নিগ্ধ চোখেতে চেয়ে।—

—জননি আমার! হারিয়ে আমাকে কেন
কাঁদ অকারণ, বিধাতাকে দোষ দাও?
দোষ নেই তাঁর—বিচার সূক্ষ্ম জেন,
যে যেমন করো ফল সে তেমন পাও!

এখানে—এলোকে আবাস হয়েছে মোর,
তাই কোন্ কাজে ফল কিবা হয় শুনি'
কভু হই খুশী কভু ঝরে আঁখি-লোর।
স্নেহ-দয়া ভুলে হয়ে ওঠ কেন খুনী?

মায়ের পূজাতে আনন্দ করি সবে,
সে শুভকর্ম্মে বলি দেও শিশু পাঠা!
তাহার জননী কেমনে বাঁচিয়া রবে?
মর্ম্মে বাজে না?—দেয় না শরীরে কাঁটা?

কাটায় জীবন নিরীহ হরিণী বনে,
সেথায় কেমন নিঠুর-সখের খেলা!
সে-কথা কখনো ভাবিয়া দেখ কি মনে?
কেন এ স্বভাব—সে-জীবন করো হেলা!

বীরত্ব কোথা সে-কথা গিয়েছ ভুলে,
তাই কাটো পাখী যারা অসহায় অতি,
কার ছেলে কোল দিয়েছিল পাখী তুলে?
শ্রেষ্ঠ জনম মানুষের আজ কী গতি!

দয়ার বীজটি ঘুমিয়ে শিশুর মনে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া ছড়ায় একদা তাহা,
কভু না করিলে নিঠুরতা কারো সনে;
ভুলিছ, জননি, শেখাবে মোদের যাহা!

ভিক্ষা চাহিছে বাহিরে অন্ধ ছেলে
মেয়েটি তোমার তখনো গল্পে র'বে?
দিতে পেরে কেন দীনকে ফেরাও ঠেলে!
বলেছ কি তারে—এক মার ছেলে সবে।

সন্তান তব কৃতী ব'লে গরবিত?
দোষ কি বা তার—আসে যে চঞ্চলতা,
ক্ষুদ্র কতো সে কভু তাকে বলোনি ত!
যাঁর বলে কৃতী—বলো তারে সেই কথা।

শিশু নাহি বুঝে পৃথিবীতে কেন আসা,
কোন্ কাজ ভালো, কী যে বর্জ্জন করা,
সব চেয়ে বড়—দয়া-ক্ষমা-ভালোবাসা,
ভালো বা মন্দ ছেলে যে তোমারি গড়া!

ছেলেকে তোমার চরিত্রবান করা,
সুন্দর করা, ঈশ্বরমুখী হ'তে
শেখাও জননী, প্রশ্রয়ে বিষ ভরা।
উপদেষ্টার থাকিতে হয় সে ব্রতে।

যা' হেরেছি, মাতা, ছোট্ট জীবন ভ'রে
বলিনু, ভেব না অকৃতজ্ঞ তব মেয়ে।
বিচারে বিধাতা নিয়েছে আমারে হ'রে।
মায়ের জাতিরা ধন্য কা'দের পেয়ে?

মানুষ-বোমা

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম. এ.

পৃথিবীতে যুদ্ধ যতই ঘোরতর হয়ে উঠছে, সামরিক অস্ত্রশস্ত্রগুলিও ক্রমশঃ তত মারাত্মক হয়ে উঠছে। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এক ভয়ানক অস্ত্রের কথা প্রকাশ করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে "মানুষ-বোমা"। অস্ত্রটি নাকি জাপান থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমর-বিভাগের বিশেষজ্ঞেরা এ বিষয়ে শীঘ্রই সবিশেষ পরীক্ষা করবেন বলে জানিয়েছেন।

"মানুষ-বোমা" কথাটা একটু গোলমেলে ধরণের। সাধারণত, এরোপ্লেন থেকে বোমা নীচে ফেলে দেওয়া হয়। বোমারু বিমানে বোমা এমনভাবে সজ্জিত থাকে যে চালক সুইচ টিপবামাত্রই বোমা আপনা-আপনি পড়ে যায়। এক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক তার উল্টো ব্যাপার ঘটে,—মানুষ বোমাকে ফেলে না, বোমাই পতনের আগে মানুষকে তা থেকে বের করে দেয়। এ জিনিষটি একধারে বোমা, এবং অন্যধারে একটি ছোটখাট এরোপ্লেন বিশেষ। সাধারণত এর ওজন ৮৫০ থেকে ২২০০ পাউণ্ডের মধ্যে। এই অস্ত্রটির ভেতর একটুখানি খালি জায়গা থাকে, তাতে একজন মানুষ কষ্টেসৃষ্টে থাকতে পারে। চালক সেখানে উপুড় হয়ে শুয়ে, ছোট্ট ঘুলঘুলিজাতীয় জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে বোমাকে চালাতে থাকে। সে একহাতে ধরে থাকে বোমার 'লিভার' জাতীয় যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যেই বোমাকে একদিক থেকে অন্যদিকে দরকারমত ঘোরান ফেরান হয়। বোমারু বিমান অনেক উঁচু থেকে "মানুষ-বোমাকে" ফেলে দেয়। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "মানুষ-বোমার" ভেতরের লোকটি নিজেই বোমাটিকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে সবেগে চালিত করতে থাকে। লক্ষ্যবস্তু থেকে তিনশ ফিট দূরে থাকার সময় এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে; হঠাৎ বোমার ওপরের ঢাকনি আপনা-আপনি খুলে যায় এবং মানুষটি সেই দরজা দিয়ে ছিট্‌কে শূন্যে বেরিয়ে আসে। চালকের গায়ে অবশ্য প্যারাশুট্‌ বাঁধা থাকে; হাওয়ার বেগে সেই প্যারাশুট্‌ এবার খুলে যায়; সুতরাং বোমা যখন আপনা-আপনি সবেগে তার লক্ষ্যবস্তুর ওপর পড়ে, তখন চালক প্যারাশুটে ভর করে হাওয়ায় হেলতে-দুলতে অনেক দূরে ভেসে চলে যায়। শুধু এই ব্যবস্থা করেই "মানুষ-বোমার" আবিষ্কারক ক্ষান্ত হননি। যদি সমুদ্রের ওপর কোন জাহাজের প্রতি এই বোমা নিক্ষেপ করতে হয়, সেখানেও যাতে বোমা-চালক উদ্ধার পেতে পারে—তার ব্যবস্থাও করেছেন। ধর, প্যারাশুট্‌ খুলে যাওয়ার পর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চালক অবশেষে সমুদ্রে

গিয়ে পড়ল। তখন সে কি করে বাঁচবে? চালক যখন বোমা থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসে তখন তার গায়ের সঙ্গে শুধু প্যারাশুট্‌ নয়, লাইফ্‌-বেল্টও আঁটা থাকে। সুতরাং, জলে পড়েই সে ডুবে যায় না, ভাসতে থাকে। লাইফ্‌-বেল্টটি আবার এমন কৌশলে তৈরী যে সেটিকে খুলে ফেলে একটি ছোট রবারের নৌকোতে রূপান্তরিত করা চলে। চালক এই নৌকোটিতে অনেকক্ষণ ধরে নিরাপদে থাকতে পারে। সে সময় যদি স্বপক্ষের কোন জাহাজ তাকে দেখতে পায় তবে ত কথাই নেই। এই বোমা চালকের সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা ও উপস্থিতবুদ্ধি যে কত প্রখর হওয়া দরকার, তা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে। যদি বোমারু বিমান ১৬,০০০ ফিট উঁচুতে প্রতি ঘণ্টায় ২২০ মাইল বেগে চলতে চলতে এই বোমা নিক্ষেপ করে, তাহলে নিক্ষেপের ৩২ সেকেণ্ডের মধ্যেই বোমাটি লক্ষ্যবস্তুর উপর এসে পড়বে। অবশ্য, বোমার নিম্নগতি অনেক জটিল ব্যাপারের উপর নির্ভর করে।

এই "মানুষ-বোমা" নাকি তিন রকমভাবে নিক্ষেপ করা যায়,—প্রথমত, পাশাপাশিভাবে, দ্বিতীয়ত, উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এবং তৃতীয়ত অতি সাধারণভাবে গড়িয়ে দিয়ে। বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে, প্রথম উপায় অবলম্বন করলে বোমারু বিমান লক্ষ্যবস্তুর চার মাইল দূর থেকে এই বোমা ছেড়ে দিতে পারে, দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করলে দু'মাইল দূর থেকে বোমা নিক্ষেপ করা যায়,—ঠিক কোন্‌ কোণ থেকে বোমাটির লক্ষ্যবস্তুর উপর এসে পড়া উচিত, তাই যদি চালকের অভিপ্রায় হয়, তা হলে নাকি এই দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করা হয়। যদি তৃতীয় উপায়ে বোমাটি বোমারু বিমান থেকে গড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হলে বোমা চালকের এই সুবিধা হবে যে, কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি বোমাকে ধাবিত করবার আগে বহুদূর পর্য্যন্ত সে বোমাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

"মানুষ-বোমা" নামক এই ভীষণ অস্ত্রটির ভাল এবং খারাপ দু'দিকই আছে। লক্ষ্যবস্তুর উপর এর পতন অনিবার্য্য হওয়ায় এ শুধু লক্ষ্যবস্তুরই ক্ষতি করবে, ছিট্‌কে যেখানে-সেখানে পড়ে অনাবশ্যক ক্ষতিসাধন করবে না। তবে "মানুষ-বোমার" আক্রমণে লক্ষ্যবস্তুর সমূল-বিনাশ প্রায় সুনিশ্চিত।
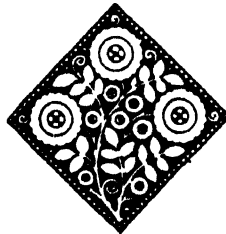
রায়সাহেবী খানা

শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., বি. টি.

সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর পরে বর্ম্মা ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিলেন রায়সাহেব গোবর্দ্ধন গুঁই।

মাত্র পনের বছর বয়সে বাপ-মা-হারা গোবর্দ্ধন গাঁয়ের চক্রবর্ত্তীদের মেঝোকর্ত্তার সঙ্গে একদিন ভাগ্যান্বেষণে দেশ ছাড়িয়াছিলেন।...সে থেকে সাতচল্লিশ বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার সুদূর বর্ম্মা মুলুকে!

চক্রবর্ত্তীদের কাঠের কারবারে সাত টাকা বেতনের সামান্য কর্ম্মচারী হইয়াই একদিন তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তারপর ধীরে ধীরে কি করিয়া তাঁহার নিজস্ব ব্যবসা ফাঁপিয়া উঠিয়া গোবর্দ্ধন গুঁইকে কালক্রমে লক্ষপতি রায়সাহেব গুঁই করিয়া তুলিয়াছে, সে এক বিচিত্র ইতিহাস বটে!

সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর ধরিয়া পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে বর্ম্মা মুলুকের স্থায়ী বাসিন্দাই হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। অর্থ, খ্যাতি, মান, প্রতিপত্তি—সবদিক দিয়াই তাঁহার পাত্র পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ইতিমধ্যে। এমন সময়ে হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল চাপে টাল সামলাইতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি কারবার গুটাইয়া, সোজা পাড়ি জমাইলেন তিনি বাড়ীর পথে—বাংলাদেশে তাঁহার পৈত্রিক ভিটায়।

ছোট্ট সাবডিভিসন; পাড়াগাঁয়েরই সামিল। হঠাৎ রায় সাহেব গোবর্দ্ধন গুঁই-এর আবির্ভাবে সহজেই সরগরম হইয়া উঠিল সমস্ত শহরটা।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার পুরাণো পৈত্রিক ভিটায় সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া উঠে—বিরাট অট্টালিকা। ঘর ভর্ত্তি হইয়া ওঠে নানা বিচিত্র আসবাবে—সোফা, কোচ, ঝাড়, লণ্ঠন, রেডিও, গ্রামোফোন। চাকর, দাসী, পাইক, পেয়াদায় সারা বাড়ী অষ্টপ্রহর জমজমাট হইয়া থাকে।

একে একে ছোট্ট শহরের বাবুরা অযাচিতভাবে আসিয়া খাতির জমাইতে সুরু করেন। স্বয়ং সাবডিভিসন্যাল অফিসার হইতে সুরু করিয়া, জুনিয়র উকীল ছোট সুরেশবাবু অবধি কেহই তালিম দিতে কসুর করেন না।

কিন্তু রায়সাহেব গোবর্দ্ধন গুঁই এত অল্পে তুষ্ট থাকিবার পাত্রই নহেন। পনের বৎসর বয়স হইতে যে লোক নিজের চেষ্টায় তিলে তিলে লক্ষপতি হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার ধনদৌলতের আভিজাত্য এত সামান্যতে তৃপ্ত হইতে পারে না। গণ্যমান্য দশজনকে দেখাইয়া তাক লাগাইবার প্রবল প্রলোভন তাঁহাকে সর্ব্বদাই উস্‌কাইতে থাকে।

হঠাৎ একদিন রায়সাহেবের রঙ্গীন উর্দ্দিপরা এক আরদালি পুরু খামে ভর্ত্তি নিমন্ত্রণ বিতরণ করিয়া এককালে অনেককে অবাক্ করিয়া দিল। বলিয়াছেন শহরের সেরা লোকদের—বিশেষতঃ পৌরসভার সভ্যবৃন্দের কেহই এই পরম সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন না।

আগামী শনিবার, সন্ধ্যায় সকলের চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন স্বয়ং রায়সাহেব। চায়ের নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা ঐ ছোট্ট শহরের লোকদের তখনও তেমন রপ্ত হয় নাই। তাই ঘটনাটা অতি সহজেই সমস্ত শহরে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগাইল; হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, কাছারীতে সবারই মুখে ঐ এক কথা—

"তা'পর! যাচ্ছেন তো?"

"যেতে তো হবেই!—তবে কিনা..." মুখে একটু আশঙ্কা, একটু দ্বিধাজড়িত ভাঁব।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সুবিখ্যাত তিসির আড়তদার শ্রীযুক্ত প্রাণধন পোদ্দার মহাশয়। কাঁচামাল চালান দিয়া অজস্র কাঁচা টাকার মালিক হইয়াছেন তিনি। শহরের সকল রকম সভা-সমিতিতে আজকাল তাঁহার অবাধ আনাগোনা এবং অসম্ভব খাতির। গত বছর জুনিয়র উকীল ছোট সুরেশবাবুকে সাত ভোটে হারাইয়া দিয়া পৌরসভার অন্যতম সভ্য হইয়া বসিয়াছেন। ইদানীং শহরের একজন রীতিমত গণ্যমান্য ব্যক্তি তিনি।

দেখিতে দেখিতে বহু-অপেক্ষিত দিন শনিবারটি আসিয়া উপস্থিত হইল!

বিচিত্র বেশবাসে সাজিয়া একে একে পৌরসভার সকল সভ্যই যথাকালে বিরাট গুঁই-ভবনের দ্বারস্থ হইয়াছেন। গুঁই-মহাশয় ঝানু লোক—ঝাড় লণ্ঠন আলোবাতির জাকজমকে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিতে এতোটুকু কৃপণতা করেন নাই তিনি।

হঠাৎ আলোকোজ্জ্বল মেঝেয় নিজের পোষাকের প্রতিবিম্ব দেখিয়া প্রাণধনবাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য প্রাণধন পোদ্দারের ঠাঁটটা চাকচিক্যে অপর সকলেরই উপর টেক্কা দিয়াছে। ধুতি যে তিনি পরিবেন না, তাহা সকলেই জানিত, কিন্তু কোটপ্যাণ্টলুনের সিলেকশানে তিনি যে এতদূর অরিজিন্যাল হইতে পারিবেন একথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

চশমার অন্তরালে প্রাণধনবাবু পার্শ্ববর্ত্তী প্রমাণ আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে নিজের রুচির তারিফ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে "এই যে আসুন" বলিয়া স্বয়ং রায়সাহেব আসিয়া সকলকেই সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া হঠাৎ সকলেই উপযুক্ত আসন অধিকার লাভের আগ্রহে অল্প বিস্তর বেসামাল হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে ঝক্‌ঝকে দামী প্লেটে সুসজ্জিত খাবার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি টেবিলে সাজাইয়া

দেওয়া হইয়াছে। দশ মিনিটকাল কেবল টক্‌টাক্, ঠুন্‌ঠুন্, সপ্ সপ্ সপ্ ইত্যাদি শব্দ। একযোগে চল্লিশজন মান্যগণ্য ব্যক্তির চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় সাধন!

এক একটা গোলটেবিলে পাঁচটি করিয়া চেয়ার সংলগ্ন। ক্রমে ক্রমে গল্পে গুজবে, চাট্‌নীতে ফোড়নে আসর দিব্যি জমিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে পরিবেশনকারীরা এটা সেটা যাচাই করিয়া যাইতেছে। প্রাণধনবাবুর আশা বৃথা হয় নাই। কারণ তাঁহার খাবার বহর দেখিয়া উপস্থিত সকলেরই তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ স্বয়ং রায়সাহেব উপযাচক তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন—"ম্যুন্‌সিপ্যালিটির নাম রাখলেন মশাই, আপনি। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ—ওহে, এনে দাও আর কিছু—"

"না—না" বলিয়া প্রাণধনবাবু যতই আপত্তি জানান, তাঁহাকে আরও কিছু খাওয়াইবার জন্য রায়সাহেবের রোক্ যেন ততই বাড়িয়া যায়।

নীল রঙের কাচের বাটিতে জলভর্ত্তি করিয়া, ধব্‌ধবে তোয়ালে প্রত্যেক টেবিলে সার্ভ করা হইল। হাতমুখ ধুইয়া, তোয়ালেতে হাতমুখ মুছিতে মুছিতে সকলেই মনে মনে ভাবিলেন, এবার বোধহয় পান, সিগ্রেট—দেশ্‌লাই—মশ্‌লা—ব্যস্‌........

ইতিমধ্যে চট্‌পট্ সকল টেবিলই পরিষ্কার হইয়া গেল। সকলেই উস্‌খুস্ করিতেছেন—উঠিবেন কিনা। এমন সময়ে সকলকেই অবাক্ করিয়া দিয়া চক্‌চকে নূতন ডিস্‌ভর্ত্তি আসিল রকমারি ফলের খাবার—আঙ্গুর, বেদানা, আনারস ইত্যাদি। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে চা—চিনি—দুধ।

পেট ভরিলেও লজ্জায় আর কেহ 'না' বলিতে পারেন না। শুক্‌নো হাতে আবার যা হোক্ কিছু গলাধঃকরণ করিতে হয় অগত্যা।

হঠাৎ তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া রায়সাহেব আরও কী যেন একটা জিনিষ আনিয়া সকল টেবিলে পরিবেশন করিতে আদেশ দিলেন।

কর্ম্মচারীটি ট্রে-ভর্ত্তি আটখানি প্লেটে সেই অপরূপ দ্রব্যটি আনিয়া আটটি টেবিলেই একে একে স্থাপন করিলেন। সেই অপরূপ খাদ্যটি দেখিয়া প্রথমতঃ সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ সম্পর্কে কেহই কিন্তু ওয়াকিবহাল নহেন।

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের প্রাণধনবাবুই সকলের উপরে টেক্কা মারিলেন। এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবার মত পাত্র তিনি নহেন। উহা অবশ্যই চা-সহযোগে গ্রহণীয় কোন ক্যাক্ বা বিস্কুট হইবে মনে করিয়া তিনি সহজ মনে, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা উহাদের একটি সন্তর্পণে তুলিয়া দিব্য মুখে পুরিয়া সযত্নে চিবাইতে সুরু করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, টেবিলের অপর সকলেই 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' নীতি অবলম্বন করিতে বিলম্ব করিলেন না। সাংঘাতিক অপদস্থতার মুখে উদ্ধার পাইয়া প্রথমতঃ সকলেই পোদ্দার-প্রবরকে মনে মনে সাধুবাদ দিলেন।......

কিন্তু, হায়! অনতিবিলম্বে পোদ্দারের সুগোল বদনমণ্ডল অপরূপ ভঙ্গীতে বিকৃত হইয়া উঠিল। সম্বলব্ধ আস্বাদনটি যে মোটেই মুখরোচক নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুখস্থ বস্তুটি একবার এ গালে আবার ওই গালে অদল বদল করিয়াও নিস্তার নাই! তাম্রকূটের তিক্তস্বাদে রীতিমত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন তিনি। সমস্ত মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত ও আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। পোদ্দারের টেবিল-সঙ্গীদেরও তদবস্থা।··· তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিয়া পোদ্দারের অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিল। তিনি না পারেন গিলিতে, না পারেন উদ্গার করিতে।

এ'দিকে তাঁহার টেবিল-সঙ্গীদের অবস্থা তথৈবচ! চিবাইয়া চিবাইয়া ছোবড়া বাহির হইয়া পড়ে, চায়ের সঙ্গে তিক্তবিস্বাদ লালা গলাধঃকরণ করিতে করিতে রীতিমত বমনোদ্রেক হয়, কিন্তু হায়! চক্ষুলজ্জার খাতিরে কাহারও মুখটি খুলিবার উপায় নাই!

হঠাৎ স্বয়ং রায়সাহেবের নজর পড়িল সেই পোদ্দার-প্রবরের টেবিলের প্রতি।··· এ্যাঁ!—ওঁই মহাশয়ের দুই চক্ষু ছানাবড়া হইবার উপক্রম! কী উপায়?···ওগুলি অমন আস্ত চিবাইয়া শেষ করিলে যে জীবন লইয়া টানাটানি বাঁধিবে!···

তাড়াতাড়ি প্লেট হইতে একটা তুলিয়া কায়দামত ধরিয়া বাঁ-দিককার মোমবাতিতে ধরাইয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে ধূমপান করিতে সুরু করেন তিনি। উপস্থিত লোকজন সকলেই তাঁহার দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া থাকেন।···

"তাই তো!"—এতক্ষণে প্রাণধন পোদ্দারের হুঁস্ হয়। নাঃ, বস্তুটি তবে খাদ্য নয়!—পা—নী—য়!!

পাঠক-পাঠিকার বোধ হয় বুঝিতে বাকী নাই যে ঐ অপরূপ বস্তু আর কিছুই নয়; কেবল কতগুলি চড়াদামী কড়া চুরুট!—খোদ বর্ম্মী!···

ইহার পরের কথা আশা করি অপ্রকাশ্য থাকাই বাঞ্ছনীয়।

* ইংরেজী গল্পের ছায়ায়।

সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আজ আমাদের দরজায়ও এসে হানা দিয়েছে; এখন প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকার সমস্যাই প্রবল হয়ে উঠেছে; তাই হাটে মাঠে ঘাটে শুধু একই কথা—চাল-ডাল-তেল-নুনের দাম; সঙ্গে সঙ্গে হা-হুতাশ—আর বুঝি বাঁচা গেল না। চারদিকের যখন এই অবস্থা তখন বাইরের কথা ছেড়ে, এবার আমরা শুধু আমাদের বাঁচবার কথাই বলব।

আসছে চৈত্র মাসে অর্থাৎ আগামী সংখ্যায়ই শিশুসাথীর একুশ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। এই দীর্ঘ একুশ বৎসর যাবৎ শিশুসাথী শিশুসাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে এসেছে। শিশুসাথীর আজীবনের সাধনা যে সিদ্ধ হয়েছে এবং এর ভিতরে বাঙ্গালী শিশুরা যে তাদের প্রাণের সাড়া পেয়েছে, এর পাঠক-পাঠিকার অসম্ভব রকমের বৃদ্ধিই তা'র মস্ত বড় প্রমাণ। এদিক দিয়ে শিশুসাথীর গৌরব করবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ফলে বড় বড় রাষ্ট্রের সাথে সাথে যখন ছোটবড় সকল মানুষেরই জীবনে ঘোর পরিবর্ত্তন এসে পড়েছে এবং কোন প্রকারে বেঁচে থাকার প্রশ্নই সবার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তখন শিশুসাথীর জীবনেও যে সেই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্য কি! সারা বিশ্বের সাথে সাথে আজ শিশুসাথীও এক যুগ-সন্ধিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও শিশুসাথী তা'র পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে বাঁচতে চায়।

শিশুসাথীকে এই যুগ-সন্ধিক্ষণে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার ভার যাদের উপর, সেই সব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছে শিশুসাথীর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় এক সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানিয়েছেন। আমরা আশা করি, সে আবেদনে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ সানন্দে সাড়া দিবেন।

এ মহাসঙ্কটের দিনে কাগজ সুধু দুর্ম্মূল্য হ'লেও কথা ছিল না, কিন্তু ভীষণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেও আমরা আগামী ১৩৫০ সালে শিশুসাথী বের করবার আয়োজন করেছি। কিন্তু, যদি শিশুসাথীর বর্ত্তমান আকারের কাগজ প্রচুর পাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আগামী বছরে শিশুসাথীর আকার বদলিয়ে দেওয়া হবে। শিশুসাথী প্রথম দু'বছরে যেমন ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা আকারে বের হয়েছিল, দরকার হ'লে আগামী বছরে সেই আকারে বের করা হবে।

আগামী বছরে শিশুসাথীকে সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিভাগে ভাগ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায়, এই চেষ্টা সফল হ'লে শিশুসাথীর যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হবে।

লেখক-লেখিকাগণের কাছে আমাদের অনুরোধ রইল, তাঁরা যেন দয়া ক'রে নূতন বছরের শিশুসাথীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য এবং শিশুমনের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য পূর্ব্বেকার মতই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

নূতন ধাঁধা

১। পিতার বোন্ পিসী হলে মাতার বোন্ কি হবে, অঙ্ক কষে বের কর।

২। —অমন ক'রে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেল, লোকটা কি হে ?

—জানো না ? ও বড়ো অদ্ভুত লোক ! ওর মাথা কাট্‌লে চ'ড়ে বসে গাছে, পেট কাট্‌লে উঠে যায় দোকানে, পা-টি যদি কাট তবে সব্বার বড় আপনার জন হবে, আর পেট আর পা কাট্‌লে রোগে প'ড়ে ওর নাম মুখে না নিয়ে তো উপায়ই নেই। বুঝলে কি রকম লোকটা ?—

—শ্রীবিজয় গাঙ্গুলি

ধাঁধার উত্তর পাঠাবার নুতন নিয়ম

ধাঁধার উত্তর সর্ব্বদা পোষ্টকার্ডে দিতে হবে এবং ওর সাথে অন্য কোন লেখা দেওয়া চলবে না। পাঠাতে হবে **"শিশুসাথী—ধাঁধা বিভাগ, ৩।৮ জনসন রোড, ঢাকা,"** এই ঠিকানায় ; সম্পাদকের নামে পাঠালে হবে না। কোনও মাসের ধাঁধার উত্তর তার পরের মাসের ১২ই তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে আসা চাই। যতগুলি ধাঁধা থাকবে তার সকলগুলির উত্তর ঠিক না হ'লে নাম ছাপা হবে না। যারা শিশুসাথীতে প্রকাশের জন্য ধাঁধা পাঠাবেন, তা'রাও দয়া ক'রে শিশুসাথীর ধাঁধা বিভাগে পাঠাবেন এবং সঙ্গে অপর কোন লেখা পাঠাবেন না। সর্ব্বদা ধাঁধার সঙ্গে ধাঁধার উত্তরও পাঠাতে হবে, নচেৎ সে ধাঁধা ছাপানো হবে না। আমরা সকলকেই খুব ভালো ভালো ধাঁধা পাঠাতে অনুরোধ করছি।

কল্যাণীবালা স্মৃতিপদক

প্রতিযোগিতার ফলাফল

এবারকার প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন—**শ্রীমতী সাধনা দত্ত** (নং ১১৬৭৪), ২৯নং মহানির্ব্বাণ রোড, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

এবারকার অন্যান্য প্রতিযোগীর মধ্যে **শ্রীমতী অনিন্দিতা চৌধুরী** (নং ১৩৯১১), **রেখা আমেদ** (নং ১৯৫৯২), এবং **শ্রীমতী অরুণা সেন** (নং ১০৭০০)—এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Shankhari Bazar, Dacca and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.

একবিংশ বর্ষ || চৈত্র, ১৩৪৯ || ১২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য

শ্রীকালিদাস রায়, বি.এ., কবিশেখর

নদীয়ায়—কে এলরে পথ ভুলে।

হরিনাম—বিলায় সে যে যেচে যেচে

নেচে নেচে হাত তুলে॥

পতিত—অধম জনে অভাজনে

প্রেমদানে মাতায় মাতে।

মধুময়—ডাক শুনে তার যায় নেমে ভার

হৃদয় দুয়ার যায় খুলে॥

নাচে ঐ—ব্রজের রাখাল প্রেমের কাঙাল
নিতাই দয়াল তার সাথে।
আনে সে—অথই অপার প্রেমের পাথার
সুরধুনীর দুই কূলে॥

গোকুলের—প্রেমের পাগল ছিঁড়ল শিকল
ভাঙ্‌ল আগল সব ঘরে।
পাগলের—প্রেমের লোরে রসের ভরে
ভাবের ঘোরে চোখ ঢুলে॥
শুনে সে—প্রেমবারতা শুষ্ক মৃতা
আশালতা মুঞ্জরে।
পরাণে—বাজে বেণু সকল তনু
শিহরে কদম ফুলে॥

রত্নাকর

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত, এম. এ.

না—না, রামায়ণে-লেখা রত্নাকর দস্যুর গল্প বলব না। সে-গল্প তো তোমাদের মুখস্থ। আমি বলব রত্নাকর সমুদ্রের কথা: কিশোর-মনের অতলস্পর্শ রহস্য-সাগরের কথা: বিচিত্র, বিস্ময়কর।

মফস্বল সহরের একটা হাইস্কুল। মাষ্টারী করি। বোর্ডিংএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও। কত রকম ছেলের সঙ্গে অহরহ পরিচয় ঘটে। কেউ বোর্ডিং পালিয়ে সিনেমা দেখে। অসাক্ষাতে কত ছেলে বুড়ো-আঙুল তুলে মুখ বেঁকিয়ে বলে: সুপারি ঠন্-ঠন্-ঠন্। আবার কত ছেলে মনের মন্দিরে পূজার আসন পেতে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করে। কখনো রাগ করি। কখনো বিরক্ত হই। কখনো বা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। অনেক কিছুই না-বুঝে ভুল বুঝে বসি। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কড়া তাপে মনের সমুদ্র শুকিয়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু অ-ভাবের শুকনো বালুচর। তাই তো কিশোর-প্রাণের বিচিত্র রহস্য বুঝতে পারি না। চোখে ধাঁধা লাগে। ন্যায় করতে যেয়ে অন্যায়ের বোঝা ভারী হয়ে ওঠে।

একটা স্বকৃত নির্দ্দয় অন্যায়ের কথাই বলব। পার তো তোমরা আমাকে মার্জ্জনা করো'।

যুদ্ধের প্রয়োজনে হঠাৎ আমাদের স্কুল মিলিটারী হাসপাতালে পরিণত হল। স্কুল-সংলগ্ন বোর্ডিংও গেল। অগত্যা আমরা উঠে এলাম একটা ভাড়াটে বাড়ীতে। টিনের ছোট দোতলা বাড়ী। কোনরকমে গোটা দশেক ছাত্রের স্থান-সংকুলান হল। উপরে পার্টিশন-করা তিনটে রুম। একটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অর্থাৎ আমার। অপর দুটিতে চারটি ছেলের সিট। নিচেও তিনটে রুম। ছ'টি ছেলের সিট।

মুস্কিল বাধল সিট বিতরণ নিয়ে। সব ছেলেই উপর তলার সিট-প্রার্থী। অথচ সে-স্বর্গে চারজনের বেশী স্থান নেই। একটি ছেলে তো কোন্ ফাঁকে আমার রুমের দরজায় চক দিয়ে লিখে রাখল রবিঠাকুরের কবিতার অপভ্রংশ:

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই
ছোট সে তরী,
সুপারি-ঠন্-ঠনে
গিয়াছে ভরি।

কোনরকমে সিট-সমস্যার সমাধান হল। নির্দ্দেশ দিলাম: ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থী অমল ও সমরেশ থাকবে আমার পাশের ঘরে; সর্ব্ব-কনিষ্ঠ রমেন ও সুশোভন থাকবে তার পরের ঘরে। অবশিষ্ট ছেলেরা থাকবে নিচে।

কিন্তু গোলযোগ বাধাল সুশোভন। ফোর্থ ক্লাসে পড়ে। ব্যাক-ব্রাসকরা লম্বা চুলের নিচে ছোট মুখখানি আধ-ফোঁটা ফুলের মত সুন্দর। একহারা গৌরাঙ্গ চেহারা। কথা বলে অতি আস্তে। বড় মিষ্টি ওর ব্যবহার।

বোর্ডিংএর সামনে রেল-লাইন। তারপরে খানিকটা খোলা মাঠ। বিকেলে দোতলার বারান্দায় ইজি-চেয়ার টেনে বসেছি। হাতে রবিঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ' খোলা। এমন সময় ধীরে ধীরে প্রবেশ করল সুশোভন। খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাকল: স্যার—
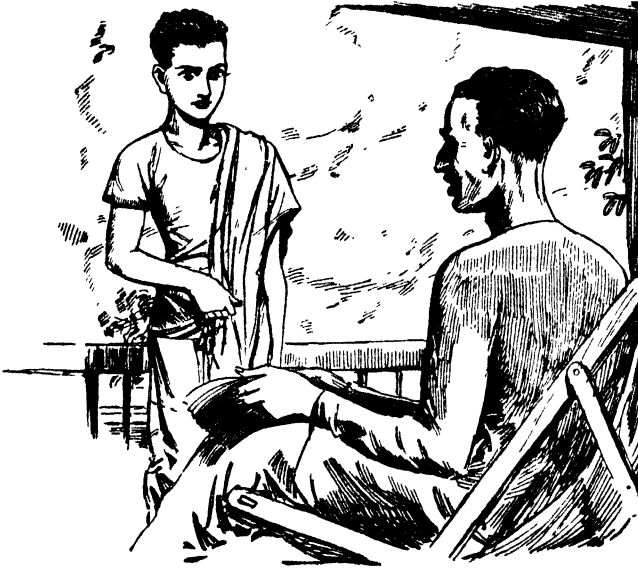
মুখ তুলে বললাম: কি? বল।

বার কয়েক ঢোক গিলে বলল: একটা কথা বলব স্যার?

: হ্যাঁ। বলো কি কথা।

অতি-সঙ্কোচের সঙ্গে সুশোভন থেমে থেমে বলল: আমি দোতলায় থাকব না স্যার। নিচে থাকব।

: কেন? নিচে থাকবে কেন?

: এমনি স্যার!

একটু চুপ করে থেকে বললাম: তা তো হয় না সুশোভন!

: কেন স্যার? সুরেশ-দা তো দোতলায় আসতে রাজী। আপনি বললেই হয়। তা'হলেই আমি সেই সিটে—

বাধা দিলাম শক্ত গলায়: না, তা হয় না। তোমরা দু'জন সবচেয়ে ছোট ছেলে বলেই তোমাদের preference দেওয়া হয়েছে। এখন অন্য কাউকে উপরে আনতে গেলেই সব ছেলে গণ্ডগোল করবে। তাছাড়া, উপরে ভাল সিট ছেড়ে তুমি বা নিচে যাবে কেন?

: এমনি স্যার!

: না। এমনি-তে সব কাজ হয় না। যে ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি, তাই চলবে। যাও।

ম্লান মুখে সুশোভন চলে গেল। বিস্মিত হলাম। একি অদ্ভুত বাসনা! আলো-হাওয়া ভরা দোতলা ছেড়ে ও যেতে চায় স্যাত্‌সেতে নিচতলায়। আশ্চর্য্য!

রাত্রে খাওয়ার পর ঘরে ঢুকল ফার্স্ট ক্লাসের সমরেশ। সুশোভনের উমেদার হয়ে। বলল: সুশোভন স্যার উপরে থাকতে চাচ্ছে না। নিচের দক্ষিণের ঘরের সুরেশের সঙ্গে সিট-exchange করে—

বললাম: আচ্ছা সমরেশ, উপরে ভাল ঘর ফেলে সুশোভন নিচতলায় যেতে চায় কেন বলতে পার?

সমরেশ সঙ্কুচিত হল। বলল: আজ্ঞে স্যার—অমিতাভকে ছেড়ে ও একা একা থাকতে পারে না। তাই ও অমিতাভর রুমেই যেতে চায়।

ভয়ানক রাগ হল। একা একা থাকতে পারে না! ইয়ারকি পেয়েছে! বিরক্ত হয়ে শুধালাম: কেন? থাকতে পারে না কেন?

আমার গলা শুনে সমরেশ ভড়কে গেল। কোনমতে বলল: আজ্ঞে—স্যার—ওরা দু'জন বন্ধু কিনা তাই। কেউ কাউকে না দেখলে—

গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিলাম: থাক্। বুঝেছি। ওদের বলে দিও, ওসব বন্ধু-ফন্ধু এখানে চলবে না। বোর্ডিংটা আড্ডাখানা নয়। যাও।

সমরেশ চলে গেল। হাসি পেল।—একজন অপরকে বেশীক্ষণ না দেখে থাকতে পারে না! কিশোর বয়সের ভাবোচ্ছ্বাস! জীবন-আকাশে রঙিন রামধনু! অলীক। অর্থহীন।

কয়েকদিন পরে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়। দরজা খুলে বারান্দায় এলাম। একি! সুশোভনের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা। ধাক্কা দিলাম। সুশোভন বিছানায় নেই। আস্তে আস্তে নিচে গেলাম। দক্ষিণে সুরেশের ঘর।

অমিতাভ বলছে: এইবার তুই ঘরে যা শোভন। সুপার যদি কোন রকমে টের পায়, তা'হলে আর রক্ষা থাকবে না।

সুশোভন কান্নার সুরে বলছে: না থাকল রক্ষা। কেন আমাকে নিচে আসতে দিল না? তোমাকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি না অমি-দা!

পা টিপে উপরে চলে এলাম। পরদিন সুশোভনকে ডেকে শাসিয়ে দিলাম।

আবার কয়েকদিন পরে।

দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ও-পাশ হতে কানে এল চাপা গলায় আলাপ। কান পাতলাম। অমিতাভ বলছে : শোভন, দরজা খোল্।

দরজা খোলার শব্দ। তারি সঙ্গে সুশোভনের ভয়ার্ত্ত গলা : তুমি শিগ্‌গির ঘরে যাও অমি-দা, সুপার এক্ষুনি জেগে পড়বেন।

নিছক ছেলেমানুষী। সহ্য করতে পারলাম না। সহ্য করা চলেও না। তা'হলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ত্তব্যে ত্রুটি হয়। বোর্ডিংএর ডিসিপ্লিন থাকে না। বারান্দায় বেরিয়ে কঠিন কণ্ঠে ডাকলাম : অমিতাভ, সুশোভন, শুনে যাও এ ঘরে।

ওরা এল। বলির পাঁঠার মত ভয়াতুর।

বললাম : দেখছি, তোমরা ভাল কথার মানুষ নও। You are beyond counsel. কালই আমি তোমাদের নামে রিপোর্ট করব হেড-মাষ্টারের কাছে।

অমিতাভ মরিয়া হয়ে শুধাল : আমাদের অপরাধ কি স্যার ?

অপরাধ ? রাগে জ্বলে উঠলাম : অপরাধ কি তা বুঝতে পারো না বকাটে ছোকরা ? অপরাধ breach of discipline,—বুঝলে ?

অমিতাভ মিনতির সুরে বলল : তা'হলে সে অপরাধ করেছি আমি একা। আমিই সিট ছেড়ে এসেছি। শুধু আমার নামে রিপোর্ট করাই আপনার উচিত। মিছেমিছি শোভনকে—

: থামো। আমার কি উচিত না-উচিত সেটা তোমাকে সমঝাতে হবে না। কি উচিত তা কালই টের পাবে। এখন যাও—এই মুহূর্ত্তে যার যার ঘরে যাও।

তারপর যা হয়। বোর্ডিংএর শৃঙ্খলা-ভঙ্গের অপরাধে সমবেত ছাত্রের সামনে হেড-মাষ্টার ওদের দু'জনকে বেত মারলেন।

দিন কাটে।

পূজার ছুটি শেষ হয়ে শীত এসে পড়ল। বার্ষিক পরীক্ষার আতঙ্কে বোর্ডিং সন্ত্রস্ত। সকলেই মনোযোগী ছাত্র।

হঠাৎ একদিন বৈকালে সুশোভনের জ্বর এল। শরীরে ভীষণ ব্যথা। পরদিন সকালে বসন্ত দেখা দিল। মারি-গুটিতে সারা দেহ ছেয়ে গেল। সুশোভন বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল।

রুম-মেট রমেন ছেলেমানুষ। Small Poxএর নাম শুনেই ভয়ে সারা। তা ছাড়া যে রকম ছোঁয়াচে রোগ। ওকে নিয়ে এলাম আমার ঘরে।

সুশোভন একা পড়ল। আমিও পড়লাম দুশ্চিন্তায়। কে বা চব্বিশ ঘণ্টা কাছে থাকে ! কে বা সেবা-শুশ্রূষা করে ! মহা মুস্কিল !

সে-ভার স্বেচ্ছায় এসে চেয়ে নিল অমিতাভ। বিবর্ণ মুখে এসে বলল : যে-কয়দিন শোভন অসুস্থ থাকে, আমাকে ওর ঘরে থাকবার permission দিন্ স্যার!

বিস্মিত চোখ তুলে তাকালাম। অমিতাভর মুখ উদ্বেগে মলিন, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় স্তব্ধ। অপরাহ্নের ঝড়ো আকাশের মত।

নিজেকে বড় ছোট মনে হল। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বহু-অভিজ্ঞ শিক্ষক আমি। আমি তো সুশোভনের শুশ্রূষার ভার নেবার কথা ভাবি নাই একবারো। অথচ পনের বছরের এই কিশোর বালক বসন্ত-রোগীর ঘরে থাকবার অনুমতি চাইছে আমারি কাছে! কোন্ প্রাণে না করব? তবু ইতস্তত: করলাম: Permission আমি দিলাম। কিন্তু এ বড় ছোঁয়াচে রোগ। তার চেয়ে হাসপাতালে—

শিউরে উঠল অমিতাভ। জোর গলায় বলল : না স্যার, হাসপাতালে ওকে পাঠাবেন না। আপনার কোন চিন্তা নেই স্যার! আমার চেয়ে বেশী করে ওর সেবা-যত্ন কেউ করতে পারবে না।

সত্যি তাই। শুধু কথার কথা নয়। আহার-নিদ্রা ভুলে অমিতাভ রোগ-শয্যার পাশে জেগে রইল। ছায়ার মত ঘিরে রইল ওর কায়া। প্রাণপণ যত্নে সেবা করল। —সুশোভন ভাল হয়ে উঠল।

রোগে পড়ল অমিতাভ। কাল বসন্ত। হৃতশিকার ব্যাঘ্রের প্রচণ্ড আক্রমণ! সারাটা দিন ও বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল। মাঝে মাঝে গোঙানি আর অস্পষ্ট প্রলাপ।

কেমন যেন হয়ে গেলাম।

আমারি চোখের সামনে ছেলেটা প্রত্যক্ষ মৃত্যুকে বরণ করে নিল। এত শক্তি ও পেল কোথেকে?—বন্ধুত্ব?—অন্তরের আকর্ষণ?

মনে পড়ল, সমরেশ বলেছিল : ওরা দু'জন বন্ধু কিনা তাই। কেউ কাউকে না দেখলে থাকিতে পারে না। সেদিন হেসেছিলাম। কিশোর বয়সের ভাবোচ্ছ্বাস। অলীক। অর্থহীন। আজ চোখে জল আসে বার বার। রঙিন ভাবোচ্ছ্বাস তো এ নয়! এ যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ-শক্তি!

মনে বড় ধিক্কার এল। আমিই ওর বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেছিলাম একদিন। সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজে ওর সেবার ভার নিলাম। বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওর রোগজীর্ণ দেহ। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমার কোলে মাথা রেখেই অমিতাভ শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

জীবন দিয়ে ও আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল কিশোর প্রাণের বন্ধু-প্রীতির অতলস্পর্শ গভীরতা—, তার মূল্যহীন মূল্য ৮।

ইলেকট্রিক কারেণ্ট—ব্যাটারী

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

সুইচ্ টিপে দিলে আলো জ্বলে উঠে, পাখা চলতে থাকে। ইলেকট্রিক কারেণ্ট দিয়ে কত কল-কারখানা চালান হচ্ছে। অথচ কি ক'রে এই ইলেকট্রিক কারেণ্ট পাওয়া যায় সে খবর আমরা অনেকেই রাখিনে।

ছোট ছোট ব্যাটারী দিয়ে টর্চের আলো জ্বালান যায়, তা আমরা সবাই দেখেছি। মোটরে ব্যাটারী লাগে। কেউ কেউ ব্যাটারী দিয়ে রেডিও চালায়। ব্যাটারী দিয়ে আরো কতরকম কাজ হয়। তাই ব্যাটারীর কথাই গোড়াতে খানিকটা বলে নিই। অনেকদিন আগে একজন বৈজ্ঞানিক দেখেছিলেন যে আলাদা আলাদা ধাতুর দুটো চাকতি গায়ে গায়ে রেখে, বাইরে থেকে একটা তার দিয়ে তাদের জুড়ে দিলে সেই তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন ছুটতে থাকে, অর্থাৎ ইলেকট্রিক কারেণ্ট বইতে সুরু করে। একটা তামার পয়সার উপর ঐ রকম একটা দস্তার চাকতি রেখে তাদের তার দিয়ে জুড়ে দিলেই হবে। এই হ'ল আদি ব্যাটারী। পরে দেখা গেল চাকতি দুটির মাঝখানে যদি নুনজলে ভিজান একটুকরা নেকড়া দিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে কারেণ্টের জোর বেড়ে যায়। কেন এই ইলেকট্রিক কারেণ্ট বইতে সুরু করে জানো? চাকতি দুটিকে ঐ অবস্থায় রাখলেই তাদের ভিতরে একটা গোলমাল চলতে থাকে, যার ফলে তামার পরমাণুরা ইলেকট্রন হারাতে থাকে, আর দস্তার চাকতির উপরে গিয়ে তাদের আড্ডা জমে। এটা তো স্বাভাবিক অবস্থা নয়। ইলেকট্রনেরা কেন গিয়ে পরের বাড়ীতে ভিড় করবে! কিন্তু ভিতরে যে সব গোলমাল চলছে তার ফলেই ত এই সব ঘটছে, তাই করবারও কিছু নেই। কিন্তু যখন চাকতি দুটোকে বাইরে থেকে একটা তার দিয়ে জুড়ে দেওয়া হ'ল, তখন ইলেকট্রনেরা সেই তারের ফাঁকা রাস্তা পেয়ে, তামার উপর যে সব পরমাণুকে ছেড়ে এসেছিল, তাদের কাছে ছুটে যায়। তাই তারের ভিতর দিয়ে কারেণ্ট বইতে থাকে। এদিকে চাকতি দুটির ভিতরকার গোলমাল তখনও চলছে, আর তার ফলে ইলেকট্রনও জড়ো হচ্ছে দস্তার উপরে—তা'রা আবার তার বেয়ে ফিরে আসছে নিজের পুরাতন জায়গায়। গোড়াকার ব্যাটারী আসলে এই। তারপর এর কত উন্নতি করা হ'ল। একটা কাঁচের বাটিতে খানিকটা এ্যাসিড্ মেশান জল
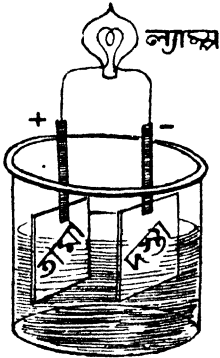
নিয়ে তার ভিতরে হুটো তামার এবং দস্তার খণ্ড ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সাবধান তা'রা যেন গায় গায় না লেগে যায়, তা'হলে কিন্তু কাজ ভাল হবে না। এবারে তাদের একটা তার দিয়ে জুড়ে দিলেই কারেণ্ট বইতে সুরু করবে।

আজকাল আরও কত রকম জিনিষ দিয়ে কত রকমের ব্যাটারী তৈরী করা হচ্ছে। মোটর গাড়ীতে বা অন্য বড়ো কাজে যে সব ব্যাটারী দরকার তাদের গড়ন একটু আলাদা। এখানে আর একটি কথা বলে নিই। আমরা জানি কারেণ্ট আর কিছুই নয়, ইলেকট্রনদের প্রসেশন। এই ইলেকট্রনেরা যেখান থেকে আসছে তাকে আমরা বলি নিগেটিভ্ প্রান্ত, আর যেদিকে যাচ্ছে তাকে বলি পজিটিভ্। তাই এখানে তামার খণ্ডটি হ'ল পজিটিভ্, আর দস্তাটি হ'ল নিগেটিভ্। মোটর-গাড়ীতে বা অন্য জায়গায় সাধারণতঃ যেসব ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় এ্যাকুমুলেটর। ইংরাজীতে accumulate কথাটির মানে হ'ল সঞ্চয় ক'রে রাখা। এখানে কি সঞ্চয় ক'রে রাখে জানো? তোমরা হয়ত ভাবছো ইলেকট্রনদেরই জমিয়ে রাখে, পরে তাদের ছেড়ে দিলেই তা'রা চলতে সুরু করবে, আর কারেণ্ট পাওয়া যাবে। আসলে তা মোটেই নয়। এখানে এমন একটা কিছু আগেভাগেই ক'রে নিতে হয়, যার ফলে ইলেকট্রনদের জোগান চলতে থাকে। ব্যাপারটা আর একটু খুলে বলি।

জল মেশান সালফিউরিক এ্যাসিডের ভিতর ছু'খণ্ড সীসা ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর বাইরে থেকে একটা সীসার খণ্ড থেকে এ্যাসিডের ভিতর দিয়ে আর একটা খণ্ড পর্য্যন্ত কারেণ্ট চালান হতে থাকে। অর্থাৎ ইলেকট্রনেরা এক দিক থেকে ঢুকে এ্যাসিড পার হয়ে আর এক মাথায় গিয়ে উঠছে। আবার সেখান থেকে ফিরে যাচ্ছে, যেখান থেকে কারেণ্ট আসছে সেখানে। যে সীসার খণ্ডে ইলেকট্রন ঢুকছে, সেটি হ'ল পজিটিভ্, আর যেখান থেকে তা'রা বেড়িয়ে যাচ্ছে সেটি হ'ল নিগেটিভ্। এই কারেণ্ট যাবার ফলে, নিগেটিভ্ প্লেট
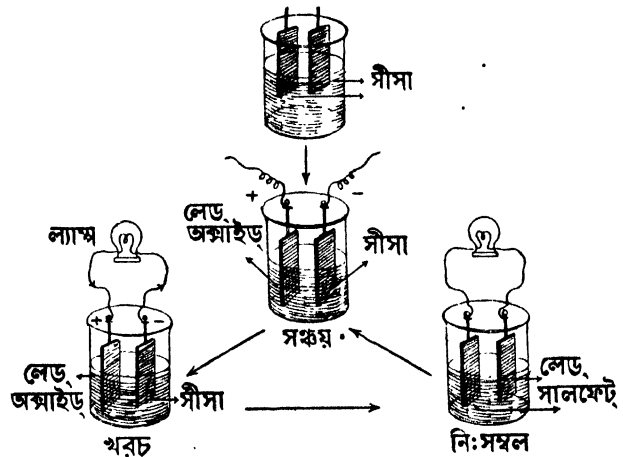
সীসাই থেকে যায়, কিন্তু পজিটিভ্ প্লেট সালফিউরিক এ্যাসিডের সঙ্গে মিশে লেড্-অক্সাইড নামে একরকম জিনিষ হয়ে যায়—খাঁটি সীসা আর থাকে না। এই যে ব্যাপারটি হ'ল এইটিই হ'ল সেই সঞ্চয়,' যার কথা আমরা বলেছিলাম। এখন বাইরের কারেণ্ট বন্ধ ক'রে দিয়ে প্লেট ছুটিকে

একটা তার দিয়ে জুড়ে দিলে ইলেকট্রনেরা ছুটতে সুরু করবে, নিগেটিভ্ প্লেট থেকে পজিটিভ্ প্লেটের দিকে। এদিকে আবার আরও একটা ব্যাপার ঘটতে থাকে। সেটি হ'ল এই যে ধীরে ধীরে দুটি প্লেটই সালফিউরিক এ্যাসিডের সাথে মিশে লেড সালফেট্ বলে একরকম জিনিষ হয়ে যাবে। তখন কারেণ্ট ক'মে ক'মে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ফের এদের কাছ থেকে কারেণ্ট পেতে হলে, বাইরে থেকে আগের মত কারেণ্ট পাঠাতে হবে—যে কারেণ্ট পজিটিভ্ প্লেট দিয়ে ঢুকে নিগেটিভ্ দিয়ে বেরুবে। তখন আবার পজিটিভ্ প্লেট হবে লেড্-অকসাইড, আর নিগেটিভ্ প্লেটটি হবে শুধু সীসা।

তোমরা বলতে পারো, এখানে আগে বাইরে থেকে কারেণ্ট এনে খরচ করা হচ্ছে, তবে সেই ব্যাটারী থেকে কারেণ্ট পাচ্ছি। তাতে আর সুবিধাই বা কী, আর নতুনত্বই বা কী! সুবিধা হ'ল এই যে, একবার কারেণ্ট পাঠিয়ে তা'কে তাজা ক'রে নিলে, তাকে যেখানে খুসি নিয়ে যাওয়া যায়, আর তা'র কাছ থেকে যখন খুসী কারেণ্ট পাওয়া যায়। ব্যাটারী থেকে যে কারেণ্ট পাওয়া যায় তা একমুখী—ডি. সি.

কাগজ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কাগজ ধরার মগজ তুমি
কে বা তোমার তুল্য আছে ?
শুভ্রতনু তুমিই ত শিব
কালী তোমার বক্ষে নাচে।
তুমি সকল গজের সেরা
শঙ্কা করে দিগ্‌গজেরা,
কালকে রাখো বন্দী করে—
শমন তোমার শরণ যাচে।

২

অনন্ত ত তুমিই বাপু
তোমায় ও নাম দেওয়াই চলে,
অবহেলায় রেখায় রঙে
ধারণ করো ভূমণ্ডলে।
বিষ্ণু সম পালন করো,
শাসন পরিচালন করো
নিতুই চিঠা পাট্টা দিয়ে
লক্ষ্মী ফেরে তোমার পাছে।

৩

একটু ভেবে দেখতে গেলে
ব্রহ্মা চেয়ে তুমিই বড় ;
তিনি শুধু মানুষ গড়েন,
মানুষ, ফানুষ, তুমিই গড়।
সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী
তোমার প্রতি সদয় অতি,
তুমিই ধর পীযূষধারা
জগৎ যাহা পিয়েই বাঁচে।

৪

ভেবেছিলাম সবাই মিলে
তোমার গুণের কথাই কবো,
দিনে দিনে কেন এমন
হচ্ছো তুমি সুদুর্লভ।
দর বাড়ায়ে কাজ কিগো আর,
সবাই জানে কদর তোমার,
হে মহাজন—সকল দরই
যাচাই যে হয় তোমারি কাছে।

কৃষ্ণকান্ত বসু

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ্. ডি., বি. লিট্.

ভুটান বাঙ্গালা দেশ হইতে বেশী দূরে নহে। কিন্তু খুব অল্প বাঙ্গালীই কেবলমাত্র ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভুটানে গিয়াছেন। এখন যাতায়াতের যে সব সুবিধা হইয়াছে, একশত বৎসর পূর্ব্বে তাহার কিছুই ছিল না। তখন দুই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ পথের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভুটানে যাইতেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা তীর্থভ্রমণের জন্য নেপাল ও ভুটান অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতেন, আর কতকগুলি কষ্টসহিষ্ণু ব্যবসায়ী বাণিজ্য উপলক্ষে ভুটানে যাতায়াত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা কিরূপ ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, একশত পঁচিশ বৎসরেরও কিছুপূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ভুটানের পথঘাট, রীতিনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের একটি সুন্দর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্ত বসুর নাম এখন খুব অল্প লোকেই জানে। তাঁহার বংশ-পরিচয় আমাদের জানা নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। সেকালে কুচবিহারের সহিত ভুটানের প্রায়ই সীমানা লইয়া বিবাদ হইত। কুচবিহার ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্য। সুতরাং কোম্পানীর

কর্ম্মচারীরা এই বিবাদ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না। এইজন্য ১৮১৫ সালে তাঁহারা সীমান্ত-ঘটিত বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য ভুটানের রাজধানীতে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভুটানের দূতেরা একাধিক বার কলিকাতায় ও অন্যত্র ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারীদিগের সহিত আপনাদের দাবীর কথা আলোচনা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সে পর্য্যন্ত এই জটিল বিষয়ের কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নাই। সীমানার বেশীর ভাগেই ছিল জঙ্গল। সেখানে মানুষের বসতি বেশী ছিল না। হাট-বাজার ত ছিল খুবই কম। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, যে, খুব বিচক্ষণ ব্যক্তিকেই ইংরাজ সরকার ভুটানের দরবারে এই দুরূহ কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনজন ইংরাজ ভুটানের পথে তিব্বত গিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে জর্জ্জ বোগল ১৭৭৫ সালে তিব্বতের অন্যতম প্রধান পুরোহিত টাসি-লামার নিকট দৌত্যে গিয়াছিলেন। পথে তিনি ভুটানের কতকগুলি জায়গা দেখিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে স্যামুয়েল টার্ণার ভুটানের ভিতর দিয়া টাসি লামার দরবারে গিয়াছিলেন। ইঁহারা দুইজনই ছিলেন রাজকর্ম্মচারী। পথের কথা হিসাবে ভুটানের দুই-চারিটি জায়গার বিবরণ ইঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে স্থান পাইয়াছিল। ১৮১২ সালে পাদরী ম্যানিং তিব্বতের রাজধানী লাসায় যান। তিনি ভুটান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই বলিলেই হয়। ১৮১৫ সালে কিন্তু ইংরাজ সরকারের তরফ হইতে কোন ইংরাজ দূত পাঠান হয় নাই। সেবারে দৌত্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল কৃষ্ণকান্ত বসুর উপর। বোগলের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তখন সরকারী দপ্তরে ছিল না। টার্ণার যে পথে গিয়াছিলেন, কৃষ্ণকান্ত সে পথে ভুটানে প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং টার্ণারের বিবরণ তাঁহার বেশী কাজে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সেদিনে অজানা পথে ভুটান যাত্রা করা যে বিশেষ সাহসের পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য।

কৃষ্ণকান্ত রঙ্গপুরের কালেক্টর ডেভিড স্কটের দেওয়ান ছিলেন। ডেভিড স্কট সেকালের একজন বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি। আসামে ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তনের পরে ডেভিড স্কটই নব-বিজিত প্রদেশের সুশাসনের ব্যবস্থার ভার পাইয়াছিলেন। এখন রঙ্গপুর হয়ত মফঃস্বলের আর দশটা সহর অপেক্ষা কোন বিষয়েই শ্রেষ্ঠ নহে। তখন কিন্তু রঙ্গপুর ছিল উত্তরবঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রত্যেক বৎসর তিব্বতের ও ভুটানের ব্যাপারীরা টাঙ্গন ঘোড়া, ভুটিয়া কম্বল, উৎকৃষ্ট মৃগনাভি প্রভৃতি জিনিস লইয়া রঙ্গপুরে আসিত এবং চন্দন, গুগ্‌গুল, নীল, সুপারী প্রভৃতি খরিদ করিয়া ফিরিয়া যাইত। আমাদের এদেশী সওদাগরেরাও রঙ্গপুর হইয়া ভুটান ও তিব্বত যাইত। ১৮১২ সালে পাদরী ম্যানিং সাহেবও রঙ্গপুরের পথেই লাসা গিয়াছিলেন। আবার কুচবিহার, আসাম, ভুটান প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের সহিত রাজনৈতিক বিষয় লইয়া রঙ্গপুরের কালেক্টরই পত্রালাপ করিতেন। তাড়াতাড়ি ফৌজের দরকার হইলে কুচবিহারের রাজা রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকট পত্র লিখিতেন। জিলার আয়তনও তখন এখনকার অপেক্ষা বেশী

ছিল; কালেক্টরের দায়িত্বও ছিল অনেক অধিক। সুতরাং সেকালের হিসাবে কৃষ্ণকান্ত বসু একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই।

বোগল ও টার্ণার রঙ্গপুর হইতে ভুটানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকান্ত গিয়াছিলেন রঙ্গপুর হইতে গোয়ালপাড়া, গোয়ালপাড়া হইতে বিজনি। তারপর সিওলি ও চেরঙ্গের পথে পাচুমাচু উপত্যকা অতিক্রম করিয়া তিনি ভুটানের রাজধানী পুনাখে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়। তাঁহারা কতদিন ভুটানে ছিলেন, কবে রঙ্গপুরে ফিরিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত ভুটানের যে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার এমন আদর হইয়াছিল যে, স্কট সাহেব স্বয়ং তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কাপ্তেন পেম্বার্টন ও স্যার এসলি ইডেন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কৃষ্ণকান্ত বসুর লিখিত ভুটানের বিবরণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমত্তারও সুখ্যাতি করিয়াছেন।

হয়ত কৃষ্ণকান্তের বংশ এখনও লোপ পায় নাই। তোমরা যদি তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরদিগের সন্ধান লইয়া কৃষ্ণকান্তের জীবন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে খুব বড় একটা কাজ হইবে। আমাদের দেশের কত অসমসাহসিক পর্য্যটকের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা কে বলিবে?

গহনগিরির সন্ন্যাসী

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

—এগারো—

যাত্রা

পরের দিন ভোর হবার অনেক আগে মহাবীর এসে রঞ্জিতকে জাগাল, বললে,—"তোমায় ডাকছেন। আমার সঙ্গে এসো।"

রঞ্জিত উঠে গেল।

আশ্রমের পিছনে ব্যায়ামের জায়গা। একপাশে উঁচু একটা বড়ো গোলাকার জায়গার মাটি মিহি ক'রে গুঁড়ান, তেল কুচুকুচে মাটি—মাখনের মাটি যেন।

সন্ন্যাসীর পরনে শুধু একটি আঁট জাঙিয়া, আর বাকি সারা দেহ একেবারে খালি। তাঁর পরিপূর্ণ মুক্ত চেহারা দেখে রঞ্জিত বিস্মিত হলো। নিটোল দেহ, বিশাল বক্ষ, তাঁর সুগঠিত শরীরে মাংসের একবিন্দু বাহুল্য নেই।

মহাবীরও এতক্ষণে জাঙিয়ার রণসজ্জা প'রে এলো। আরম্ভ হলো দু'জনের মল্লযুদ্ধ।

সে কী ব্যাপার! রঞ্জিত দেখে অবাক্ হলো, অমন বিপুলকায় মহাবীর সন্ন্যাসীর সাথে লড়তে গিয়ে পদে পদে মাটিতে প'ড়ে কুমড়ো গড়ায়! দু'জনের দমও যে কতো!

কুস্তি লড়া শেষ হলো ; তবু থামাথামি নেই। দুইজনে আখ্ড়ার দু'পাশে আরম্ভ কর্‌লো বৈঠক মার্‌তে। সেও যেন শেষ হ'তে চায় না। তার পরে চল্‌লো ডন। কে যে কয়শো ডন বৈঠক মার্‌লো, গোনাগুন্তি নেই তা'র।

তাঁদের দু'জনের সাথে রঞ্জিতকেও স্নান কর্‌তে হলো। ভোরের তরুণ অরুণের সোনালি আভায়, ঝিরঝিরে হাওয়ায় স্নান ক'রে কী যে আরাম বোধ হলো, সে রঞ্জিতই জানে। সে তো জল থেকে উঠ্‌তেই চায় না। সন্ন্যাসী তাড়া দিলেন,—"তাড়াতাড়ি উঠে এসো। ঢের কাজ কর্‌তে হবে এখন।"

—"কী আবার কাজ কর্‌তে হবে ?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"এখন গিয়ে ফুল তুল্‌তে হবে, তারপর যেতে হবে মন্দিরে।"

—"কোন্ মন্দিরে ?"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"সেই শিবমন্দিরে।"

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে শুদ্ধ কাপড় প'রে সাজি-হাতে রঞ্জিত সন্ন্যাসীর সাথে ফুল তুল্‌ল। ফুলের যেখানে অন্ত নেই, শ্যামলতার যেখানে সীমা নেই, সোনালি আলোর যেথায় ঝর্‌ণা নেমে আস্‌ছে অফুরন্ত ধারায়, বাতাস যেথায় অবাধ, ভোরের বেলায় সেখানে সাজি ভ'রে ফুল তোলার মতো আনন্দ বুঝি দুনিয়ার আর কোনো কাজে নেই।

মন্দিরে গিয়ে সন্ন্যাসী আগে পূজো কর্‌লেন। তারপর রঞ্জিতকে বল্‌লেন,—"যাও, তুমি এবার পূজোয় বস।"

"আমি তো পূজোর মন্ত্র জানিনে,"—রঞ্জিত বল্‌ল,—"নিয়মও জানিনে।"

"নিয়ম!"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"যেমন তোমার মন চায়, তেমনি ক'রে পূজো কর সেইটাই পূজোর সবচেয়ে বড়ো নিয়ম। আর মন্ত্র কা'কে বল ?"

"মন্ত্র,"—রঞ্জিত বল্‌ল,—"সংস্কৃত মন্ত্র আছে যে পূজোর।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"প্রাচীন যুগের মুনি-ঋষিরা পূজোর মন্ত্র রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় তার কারণ, তাঁদের মাতৃভাষা ছিল সংস্কৃত। তাঁরা নিজের ভাষায় দেবতার কাছে মনের আবেদন জানাতেন। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, আমরা বাংলাতেই পড়্‌বো মন্ত্র।"

রঞ্জিত বল্‌ল,—"তাও তো আমি জানিনে।"

"নিশ্চয় জানো।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"দেবতাকে তোমার যা' জানাবার আছে, যা' প্রার্থনা করার আছে তাঁর কাছে, তোমার নিজের কথায় তাই বলো—একমনে ভক্তিভরে বলো, তবেই পূজো করা হবে।"

রঞ্জিত তাই করল। একাগ্রমনে বার-বার ক'রে বল্‌ল,—"ওগো ঠাকুর! ওগো দেবতা! যাত্রাপথে তুমি আমার সহায় হোয়ো; সকল কাজে তুমি আমায় চালনা কোরো; যে কাজ করা আমার উচিত নয়, তাতে তুমি বাধা দিও; কোনো বিপদে যদি পড়ি, আত্মরক্ষা করার শক্তি আমায় দিও। আমার শিরে তোমার কল্যাণ আশিসুধারা শতধারে ঝ'রে পড়ুক।"

ফুল দিয়ে সাজিয়ে-সাজিয়ে বিগ্রহকে সে আচ্ছন্ন ক'রে দিল। তারপর মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

দু'জনে যখন আশ্রমে ফিরে এলেন, মহাবীরের রান্নাবান্না তখন হয়ে গেছে। বারান্দায় দু'খানা আসন পাতা হয়েছিল। একটু বিশ্রাম ক'রে হাতমুখ ধুয়ে দু'জনে খেতে বস্‌লেন।

খাওয়ার পরে সন্ন্যাসী যেন কি একটু কাজে গেলেন। রঞ্জিত বিশ্রাম কর্‌তে লাগ্‌ল।

অনেক ক্ষণ পরে ফিরে এসে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"চলো, এবার যাত্রা কর্‌তে হবে।"

"আপনিও যাবেন তো?"—রঞ্জিত জিজ্ঞাসা কর্‌লো।

"'চলো' বলেছি।"—সন্ন্যাসী হেসে বল্‌লেন,—"'যাও' তো বলিনি!"

রঞ্জিত নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লো। রঞ্জিতের মনে হয়, ইনি যেখানে থাকেন, পৃথিবীর, দুঃখ, বিপদ, ভয় সব সে দেশ ছেড়ে পালায়।

বেলা প্রহর-দেড়ের সময় রঞ্জিতকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসী যাত্রা কর্‌লেন। যা কিছু দরকার, সব জিনিসপত্র তিনি আগেই গুছিয়ে রেখেছিলেন।

সন্ন্যাসী চল্‌লেন আগে আগে—হাতে তাঁর এক ত্রিশূল। পরিধানে শুভ্র খদ্দর কাপড়, কাঁধের উপর দিয়ে টেনে উত্তরীয়খানি কোমরে আঁট ক'রে বাঁধা। সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক, মহিমময় সাজ। রঞ্জিত এর আগে ত্রিশূল দেখেছে শুধু যাত্রায় আর থিয়েটারে। ওই পদার্থটি যে কোনো কাজে লাগতে পারে, এমন কল্পনা করাও সে বাতুলতা মনে কর্‌তো। কিন্তু সন্ন্যাসীর ত্রিশূলটি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ল, কারো দেহে যদি ত্রিশূলটি দিয়ে আঘাত করা হয়, তবে মাঝখানের সুতীক্ষ্ণ ফলাটি আমূল প্রবেশ করার সাথে-সাথে দু'পাশের ধারালো বাঁকান ফলা দুটি শরীর কেটে ব'সে যাবে।

রঞ্জিতের হাতে একখানি খড়্‌গ দিয়ে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"তোমার সাহেবি সাজের সঙ্গে বেমানান হ'লেও এটা আমি তোমার হাতে দিতেই বাধ্য হচ্ছি। তোমার নিজের আত্মরক্ষা করার জন্যে একটা অস্ত্র হাতে থাকা দরকার।"

আত্মরক্ষার যন্ত্রটি কিন্তু রঞ্জিতের কাছে দুর্ব্বহ ঠেক্‌লো। জিনিসটা বেশ ভারী, অতএব নিচের দিকে ঝুলিয়ে বেশিক্ষণ রাখা যায় না, হাত ভারিয়ে আনে। কাঁধের উপর রেখেও অবিরত সতর্ক থাক্‌তে হয়, খাঁড়ার ধারালো দিকটা সবসময় উপরপানে না থেকে যদি দৈবাৎ একবার কাত হয়ে তা'র ঘাড়ের দিকে চ'লে যায়! যা' ভীষণ ধার ওতে! উঃ!

রঞ্জিত বল্‌ল,—"এ সব প্যাণ্ট, সার্ট-ফার্ট না প'রে আমিও ধুতি চাদর প'রে এলেই ভালো হতো বোধ হয়।"

"মোটেই না।"—সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আমাদের কাছা-কোঁচার সাজ, কাজের সাজ মোটেই নয়। কাপড় প'রে কোনো বীরত্বের কাজে এগোন অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক, বোকামির কাজ।"

"অবশ্য,"—একটু থেমে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"অবশ্য সাহেবদের জবরজং সাজপোষাক আমাদের গরম দেশে অচল। এদেশের জন্যে আঁট্‌সাট পাত্‌লা পায়জামা-টামার সংযোগে একটা কাজের সাজ উদ্ভাবিত হওয়া দরকার।"

কখনো বা কথা বল্‌তে-বল্‌তে আর কখনো বা নীরবে দু'জনে চল্‌তে লাগ্‌লেন।

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, তখন এক মন্দির পাওয়া গেল। চারদিকটা তার বেশ পরিষ্কার। পরিষ্কার অর্থে ঝোপ-জঙ্গল নেই তার চারদিক ঘিরে। তার দরজায় কতক্ষণ বিশ্রাম ক'রে দু'জনে ভিতরে ঢুকলেন। বিশ্রী, অপরিষ্কার তার ভিতরটা। কতকালের কত ধুলোমাটি যে জমেছে তার মেজেতে, কত কালের কত পাতা সঞ্চিত হয়ে যে অবাধে পচেছে, কে তার হিসেব জানে! কেমন একটা মৃদু দুর্গন্ধে নাক ভারি হয়ে আসে। কিন্তু সেখানেই থাক্‌তে হবে। তা ছাড়া আর উপায় কি? দু'জনে গেলেন পরিষ্কার কর্‌তে।

মন্দিরের ভিতরটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল।

এক কোণে একগাদা আবর্জ্জনা জমে আছে স্তূপাকার হয়ে। এখানটা আর পরিষ্কার ক'রে কি হবে? থাক্ না অমনি প'ড়ে। তবু একটু দেখা উচিত, যদি সাপ-টাপ থাকে!

আবর্জ্জনার স্তূপে লাঠির খোঁচা মেরে সব ছড়িয়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল রঞ্জিত। হঠাৎ টুং ক'রে কি একটা আওয়াজ উঠ্‌ল। কৌতূহলে দু'জনার চোখ দপ্ ক'রে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি পচা লতাপাতা আর ধুলোমাটির গাদা সরিয়ে ফেলে দু'জনে দেখ্‌ল, সেখানে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে বড় একটি ধাতুমূর্ত্তি। অনেককাল প'ড়ে থেকে বিবর্ণ হয়ে গেছে। বালি দিয়ে এক জায়গা খানিকক্ষণ ঘস্‌তেই উজ্জ্বল ধাতু চক্‌চক্ ক'রে উঠ্‌ল। ভালো ক'রে দেখে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"মনে হচ্ছে অষ্টধাতুর তৈরি।"

অদ্ভুত মূর্ত্তি। দেখ্‌লে মনে হয় নারায়ণের মূর্ত্তি। কিন্তু হাত তার আটটি। অষ্টভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা তো সন্ন্যাসী কোথাও পড়েননি—শোনেনওনি।

মন্দিরের ভিতর তখন আবছা অন্ধকার। মূর্ত্তিটিকে ঝেড়ে-পুঁছে রেখে সন্ন্যাসী বাইরে এসে প্রকাণ্ড একখানা পাথরের উপর বস্‌লেন। মুখে তাঁর গম্ভীর চিন্তারেখা।

মন্দিরের মধ্যে রঞ্জিত তখন আরেক ব্যাপারে মশ্‌গুল। সন্ন্যাসী বাইরে যাবার পরেই রঞ্জিতও তাঁর পিছু পিছু বাইরে আস্‌ছিল; কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌ল মূর্ত্তিটির মাথার মুকুট যেন আল্‌গা হয়ে একদিকে হেলে পড়েছে।

রঞ্জিত বিস্মিত হলো। মুকুট তা হ'লে আলাদা! রঞ্জিত গেল সেটা ঠিক ক'রে পরিয়ে দিতে। মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে তা'র মাথার উপর তাকাতেই সে চমকে উঠ্‌লো। ভিতরে চক্‌চক্ করছে ও কী! কি যেন জ্বল্‌ছে মূর্ত্তির ভিতরে। এক লাফে সে পুঁটুলি থেকে চক্‌মকি পাথর এনে আলো জ্বালল। সেই আলোকে যা দেখ্‌ল, তাতে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিস্ময়ের প্রচুরতায় চোখ দুটি বুঝি ঠিকরে বেরিয়ে আস্‌বে।

রঞ্জিত দেখ্‌ল, মূর্ত্তিটির ভিতরে নানা আকারের ছোট বড় হীরা-চুনী-পান্নার রাশি। তারই আলো অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্ করছে।

তাহ'লে ওই মূর্ত্তিটি আসলে একটি ধাতুপাত্র। তার বাইরের চেহারাটা নিতান্তই ঘড়ার মত না ক'রে খেয়ালি শিল্পী একটি মূর্ত্তির মত গড়েছে। ওঃ, এতো সব দামী দামী পাথর! রঞ্জিত জানে এগুলোর দাম সামান্য নয়। এই হাত দুই উঁচু পাত্রটার মধ্যে যত মণিরত্ন আছে, পথের ভিখারীর ভাগ্যে তা এনে দিতে পারে রাজার ঐশ্বর্য্য!

রঞ্জিত যদি ওই মূর্ত্তিটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পার্‌তো! কোথায় যাচ্ছে সে এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোন অজানা বিপদের মাঝখানে! রঞ্জিত তো বেশি চায় না। এই যা পেয়েছে, তাই তার পক্ষে প্রচুর—অগাধ—অপরিমেয়। সন্ন্যাসীর সঙ্গে গিয়ে যে ধনের রাশি সে পাবে ব'লে আশা করছে, তা তো সে নিজস্ব ক'রে পাবে না! রঞ্জিত কি পারে না সন্ন্যাসীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে? এখনি—এই মুহূর্ত্তে? কোন ক্রমেই কি তা সম্ভব নয়?

মাথায় এক টুক্‌রা গরম বাতাসের ছোঁয়া লাগ্‌তেই রঞ্জিত চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখ্‌ল, সন্ন্যাসী তা'র পিছনে দাঁড়িয়ে। রঞ্জিতের বুকটা কেঁপে উঠ্‌ল। সন্ন্যাসীর মুখের পানে সে চাইতে পার্‌লো না। সে যেন সুগোপনে তাঁর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেছে।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"খুব অবাক হ'য়ে গেছ, নয়? আশ্চর্য্য যে আমারও বোধ হচ্ছে না, তা নয়; কেননা, আমি এ পর্য্যন্ত দুই-চারটে মোহরের ঘড়াই শুধু পেয়েছি। কিন্তু এমন সাতরাজার ধন আর কখনো দেখ্‌তে পাইনি।" ... ...

খাওয়া-দাওয়ার পাট সে রাতে বন্ধই রইল।

অনেক রাত অবধি দু'জনে কথাবার্ত্তা বল্‌লেন। বিছানা জাতীয় দুটি ব্যাপার আগেই পেতে নেওয়া হয়েছিল। তারি উপর কোনো মতে গা এলিয়ে দিয়ে দু'জনে কথা বল্‌ছিলেন। গভীর রাতে সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"আর কথা নয়, এবার ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক্।"

কিন্তু চোখের সঙ্গে ঘুম পেতেছে আড়ি। অচেনা জায়গা। পাহাড়ি জঙ্গল। কত ভয় কত দিকে। মনে ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্যের ভাবনা। এ অবস্থায় ঘুম কি আসে! তার উপর দরজায় আবার কবাট নেই। সেই হাঁ-করা পথে বাইরের দিকে চাইলে ভয়ে চোখ বুজে আসে। বাইরে চারদিকে নিশাচর প্রাণীর পায়ের শব্দ শুক্‌না পাতায় মর্ম্মর করছে। রঞ্জিত চম্‌কে উঠ্‌ছে।

অনেকক্ষণ অস্বস্তিতে কাটাবার পরে আধো-চেতনার মত একটু ঘুম যেন এল তা'র চোখ জুড়ে। সে ভাবে কাট্‌লোও খানিকক্ষণ। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। যেন ঘুমও হচ্ছে, অথচ বাইরের সব কিছু ব্যাপার শুন্‌তে তো পাচ্ছেই ; দেখ্‌তেও যেন পাচ্ছে।

হঠাৎ একটা ঝটপট শব্দে আঁৎকে উঠে রঞ্জিত একেবারে বিছানার উপর বস্‌লো। দেখ্‌ল, দরজার বাইরে বিরাট রকমের এক বীভৎস ছায়া অস্থিরভাবে হাত-পা ঝাপ্‌টাচ্ছে। একটা বিকট চীৎকারে হঠাৎ রঞ্জিতের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন ধপ্‌ ক'রে বন্ধ হয়ে সারা দেহ হিম ক'রে ঘাম দেখা দিল।

সে শব্দে জেগে উঠে সন্ন্যাসী নিমেষে শিয়রে হাত দিয়ে চকমকি টেনে নিয়ে আলো জাল্‌লেন। আলোয় দেখা গেল, একটি বিরাট মোটা সাপ তার দীর্ঘ শরীরের প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘকে। বাঘ-বাবাজির আর নড়্‌বার ক্ষমতা নেই। তার মাথার দিক সাপের মুখের ভিতর। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ওই দুর্দ্দান্ত জানোয়ারটাকে রাক্ষুসে সাপটা গিল্‌ছে।

রঞ্জিতের গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। নির্ব্বাক বিস্ময়ে দু'জনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই বীভৎস করুণ দৃশ্যের দিকে।

এর পরে ঘুমানোর কল্পনাও আর দু'জনের মাথায় সে রাত্রে এলো না। রাত যে কোথা দিয়ে কাবার হয়ে গেল, তারই খোঁজ রইল না। (ক্রমশঃ)

ছেলেদের আশুতোষ

ছোট্ট ছেলে সুধায় মাকে এসে :
আশুতোষের নাম কেন মা এত ?
কেমন ক'রে এমন বড় হ'ল,
প্রশংসা যার
হাজার লোকে গায় ?
যার তুলনা
তিনিই কেবল শুনি ?

ছেলের কথায়
জননী কন হেসে :
আশু তখন
তোদের মত হবে।
বইটি ছেড়ে থাকত নাকো দূরে।
সন্ধ্যা সকাল
সকল সময়েতে
পড়া নিয়ে থাকত নিজে মেতে।
অসুখ হ'লেও
বইটি নিয়ে ব'সে
নিজের পড়া পড়ত আপন মনে।

অনেক দিনে অনেক ক'রে পিতা
নিষেধ ক'রে
পার পাননি কভু।

বিষম রেগে একদিন তাই তিনি
একটি ঘরে
বন্ধ ক'রে
রাখলেন আশুতোষে।

ভেবেছিলেন :
ছেলে বুঝি পড়া ভুলে যেয়ে
চুপটি ক'রে রইবে পড়ে সেথা।

তেমন ছেলে নয়কো আশু মোটে।
কয়লা নিয়ে
ঘরের মেঝেয় ব'সে
জ্যামিতির এক কঠিন প্রশ্ন নিয়ে
সমাধানে র'লেন মগ্ন হয়ে।

পিতা এলেন চুপি চুপি সেথা।
দেখেন : আশু নিজের কথা ভুলে
কঠিন পাঠে আত্ম-সমাহিত।......

এমনি ধারা নিজের পাঠে আশু
ছেলেবেলায়
অবহেলা ক'রে
সময় কভু দেয়নি বৃথা যেতে।
তাই না দেখো,
আজো তিনি বড়,
চির-স্মরণীয়।

মায়ের কোলে লুকিয়ে ছেলে মাথা
বলে : মাগো,
আশিস্ করো তুমি,
পড়াশুনায় করব নাকো হেলা ;
আশুর চেয়েও অনেক বড় হবো,
জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ হবো, দে'খো।

বাঁচবার উপায়

লেঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, আই. এম্. এস.

অগ্রহায়ণের পরে]

আমার ছোট ছোট বন্ধুরা, অনেক দিন তোমাদের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলবারও সময় পাইনি। আজ সামান্য একটু ছুটি পেয়েছি, তাই দুটো কথা ব'লে যাবো। ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী দৈনন্দিন মোটামুটি খাদ্য-তালিকা, তাহার খরচ সম্পর্কে এবং কি ভাবে সেই গতানুগতিক খাদ্য-তালিকার সামান্য অদলবদল ক'রে সুস্থ ও সবল হওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে তোমাদের কিছু বলেছি। তার মধ্যে দরিদ্র বাঙ্গালী ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদের খাদ্য-তালিকার বিষয়ই আলোচনা করা হয়েছে। আজ আলোচনা করবো একটু বেশ অবস্থা বা সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীদের খাদ্য-তালিকা নিয়ে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সঙ্গতিপন্ন বাঙ্গালীদের খাদ্য-তালিকা মোটামুটি এইরূপ—

কলে ছাঁটা মিহি চাল—	৪ ছটাক	তেল—	½ ছটাক
ময়দা—	২	তরীতরকারী—	৩ ,,
ডাল—	১	ফলমূল—	২ ,,
মাছ বা মাংস—	২	চিনি—	১ ,,
দুধ—	১০	মশলা ইত্যাদি—	½ ,,
ঘি অথবা মাখন—	১	লবণ—	প্রয়োজনানুসারে।

উপরিউক্ত খাদ্য-তালিকা বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে উক্ত খাদ্য-তালিকার মধ্যে আছে—

আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য — ৮৯ গ্র্যাম অথচ প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজন ৬৫ গ্র্যাম

চর্ব্বি ,, ফ্যাট্ ,, ,, — ১১০ ,, ... ৬০ ,,

শর্করা ,, কার্ব্বোহাইড্রেট ,, — ৩৮৫ ,, ... ১৫০ ,,

ক্যালসিয়াম, ফসফরাস্, লোহা ও খাদ্যপ্রাণ ('বি' ছাড়া) যথেষ্ট পরিমাণে।

ঐ খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদিকা শক্তি ৩৩০১ ক্যালরী। অথচ তোমরা জান, কেননা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি তোমাদের বহুবার বলেছি : **কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে** একজন সাধারণ লোকের পক্ষে ২৮০০ হইতে ৩২০০ ক্যালরীর প্রয়োজন মাত্র। তার বেশী নয়, তা'হলেই উপরিউক্ত খাদ্য-তালিকাটি পর্য্যালোচনা করলে কয়েকটি বিশেষ দোষ চোখে পড়ে। প্রথমত: ৬৫ গ্র্যাঃ আমিষের যেখানে নিত্য প্রয়োজন, সেখানে গ্রহণ করা হচ্ছে ৮৯ গ্র্যাঃ। যেখানে মাত্র ৬০ গ্র্যাঃ চর্ব্বির প্রয়োজন

সেখানে গ্রহণ করা হচ্ছে ১১০ গ্র্যাম। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে খাদ্যাংশে চর্ব্বির ভাগ ও আমিষের ভাগই অত্যন্ত বেশী। শর্করা সামান্যই বেশী—ওতে তেমন বিশেষ কিছু এসে যায় না শরীরের পক্ষে। ফলে অত বেশী চর্ব্বি থাকায় সে চর্ব্বির মধ্যে সামান্য অংশটুকু অর্থাৎ ৬৫ গ্র্যাঃ শরীরের কাজে লাগে, বাকী অংশ শরীরের কোষে কোষে জমতে সুরু করে, যেমন নদীর বুকে পলি পড়ে এবং পলিমাটি ক্রমান্বয়ে জমতে জমতে অবশেষে একদিন নদীর বুকে 'চর' দেখা দেয় এবং নদী অকেজো হয়ে পড়ে—তেমনি মানুষের শরীরেও চর্ব্বির পলি জমতে জমতে ক্রমে একদিন তা'র শরীর চর্ব্বি-বহুল নাদুস্-নুদুস্ থল্থলে গোবর-গণেশ প্যাটার্ণের হয়ে পড়ে! ফলে সেই মানুষ হয় অকেজো, আলস্যপরায়ণ ও অকর্ম্মণ্য। অল্প পরিশ্রমে সে হাঁফায়, গরমের দিনে হাঁস-ফাঁস করে, যেখানে তিনগজ কাপড়ে জামা হয়, সেখানে তা'র দশ গজ কাপড় না হলে চলে না। শুধু তাই নয়, চর্ব্বি-বহুল লোকের হৃৎপিণ্ড (heart) অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে যায়। তা'ছাড়া উপরিউক্ত খাদ্য-তালিকায় খাদ্যপ্রাণ 'বি'-এর অংশ অত্যন্ত কম থাকায় 'বেরিবেরি' রোগও দেখা দেয় সহজেই—যার ফলে হৃৎপিণ্ড আরো দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ঐ খাদ্য-তালিকায় শর্করার অংশ বেশী থাকায় 'অগ্নিমান্দ্য' (যাকে তোমরা 'বদহজম' বল) হওয়াও খুব স্বাভাবিক এবং খাদ্য-তালিকায় শাকসব্জীর অংশ না থাকায় 'কোষ্ঠকাঠিন্য'ও হওয়া সম্ভব। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে এতকাল আমরা বড়লোকের খাবারের নাম শুনে যে লোভাতুর হয়ে উঠেছি, তা'র মূলে অনেক দুঃখের কথা আছে। আমার ঘরে খাবারের প্রাচুর্য্য আছে ব'লেই যে 'অন্নগদাই'য়ের মত দিবারাত্র কেবল গোগ্রাসে গিলব, তা আদপেই উচিত নয়। কেননা তাতে শরীরে নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিতে পারে। দিবারাত্র গোগ্রাসে গিলে অসুস্থ শরীর নিয়ে 'আইঢাই' করা, ডাক্তার ও ঔষধের পিছনে কাড়ি কাড়ি অর্থব্যয় ক'রে দুর্ব্বিষহ জীবনযাত্রার চাইতে শরীরের প্রয়োজনানুসারে অল্প পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে সুখ ও শান্তিময় জীবন যাপন করা ঢের ঢের কাম্য!

একেই বলে ভগবানের মার। কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খেয়ে দিবরাত্র হাঁস-ফাঁস করে, আবার কেউ তারই পাশে সামান্য একটু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে তিল তিল ক'রে দিনের পর দিন মৃত্যুকে বরণ করে।

জানি না এই ভাবে মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অত্যাচার আর কতদিন চলবে। শিশুসাথীর পাঠক ও পাঠিকাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সর্ব্বপ্রকার ছেলেমেয়েই আছে। সেই জন্যই আরো বিশেষ ক'রে সকল দিক দিয়ে খাদ্য-তালিকার গুণাগুণ বিচার ক'রে দেখিয়েছি। আশা করি এর পর হতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনী ও সঙ্গতিপন্ন, তা'রা অযথা প্রচুর পরিমাণে আহার ক'রে চর্ব্বিবহুল অকেজো ও রোগজীর্ণ হওয়ার চাইতে আশেপাশের দু'-চার জন গরীব-দুঃখীকে নিজেদের প্রচুর খাদ্যাংশ থেকে অন্ততঃপক্ষে প্রত্যহ সামান্য অংশও দেবে। তোমাদের উদ্বৃত্ত সামান্য ঐ অংশ পেলেই তাদের বাঁচবার উপায় হবে . .

এবার দেখা যাক ধনীদের ঐ খাদ্য-তালিকাকে কি উপায়ে কমবেশ ক'রে বা অদলবদল ক'রে—স্বাস্থ্যকর সুখাদ্যে পরিণত করা যেতে পারে।

কলছাটা মিহি চালের পরিবর্ত্তে ঢেকিছাটা চাল	—	৪	ছটাক খাওয়া যেতে পারে।
সাদা ময়দার পরিবর্ত্তে—যাঁতায় ভাঙ্গা লাল আটা	—	২	„ „ „ „
ঘি অথবা মাখন এক ছটাকের পরিবর্ত্তে—		½	„ „ „ „
তরীতরকারী ৩ ছটাকের উপর, শাকসব্জী	—	২	ছটাক
চিনি এক ছটাকের পরিবর্ত্তে	—	½	ছটাক

এই পরিবর্ত্তনের ফলে খাদ্যের উৎপাদিকা শক্তি ৩৩০০ হইতে ক'মে ২৯৮০ ক্যালরীতে প্রায় দাঁড়াবে, এবং ১০ ভাগ ক্ষতি ধ'রেও আমিষের ভাগ থাকবে ৮০ গ্র্যাঃ, চর্ব্বি ৭৯ গ্র্যাঃ, শর্করা ৩৫০ গ্র্যাঃ। ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস্, লোহা, খাদ্যপ্রাণ 'এ' ও 'সি' যেমন যথেষ্ট ছিল তার চেয়েও বেশী থাকবে। অধিকন্তু ঢেকিছাটা চাল ও লাল আটা হতে খাদ্যপ্রাণ 'বি'-এর অভাবও দূর হবে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিবেরির ভয়ও দূর হবে, এবং শরীরে চর্ব্বি জমবার সুযোগ পাবে না।

তোমাদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পার, তরীতরকারী ত' খেতে বললেন মশাই, কিন্তু কি তরীতরকারী খাবো তা ত' বললেন না। তরীতরকারী হিসাবে আলু, রাঙা আলু, গাজর, বাঁধাকপি, মটরসুটি, নটেশাক, পালংশাক, কুমড়ো ইত্যাদি খাওয়া চলতে পারে। অবশ্য একথাটা আমি সম্পূর্ণভাবে মানি যে, বহুকাল ধ'রে যে খাদ্য খেয়ে আসছি, 'হুট্' ক'রে তার আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে নূতন ধরণের খাওয়া সুরু করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু অভ্যস্ত দ্রব্যের দ্বারা সামান্য ব্যয়ে একটু এদিক ওদিক ক'রে অনুপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে স্বাস্থ্যোপযোগী ক'রে সবল ও সুন্দর স্বাস্থ্য তৈরী করতে পারলে, সকলেই তোমরা প্রসন্নচিত্তে নূতন ধারাকে বরণ ক'রে নিতে পারবে। এই ভরসাতেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উৎপত্তি। একবার ভেবে দেখ ত' একদিন এই ভারতবর্ষে বাঙ্গালী জাতি সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিল, আজ সেই বাঙ্গালীই ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে এবং আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, প্রচেষ্টা ও কর্ম্মদোষে আজ কোথায় নেমে এসেছি! আজ আমাদের স্বাস্থ্য নেই, বুদ্ধি নেই; নেই প্রতিভা, নেই সামর্থ্য, নেই দুমুঠো খাবার। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার জন্য যতটুকু যা প্রয়োজন তা কিছুই নেই। কিন্তু তবু বাঁচতে হবে। তবু মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। তবু বলতে হবে:—

"তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু হীন
হতে পারি দীন তবু নহি মোরা ক্ষীণ;
ভারতে জনমে পুনঃ আসিবে সুদিন
ঐ দেখ প্রভাত উদয়—"

জাপানী মিস্ত্রীর বৌ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

"হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার!"

এই কবিতা পড়েই বুঝতে পারা যায়, পদ্মানদী ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের উৎস, আর "পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ ছিল তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থস্থান"। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে প্রথম প্রথম যে বজরাখানাতে থাকতেন তার নাম ছিল "চিত্রা"।

চিত্রা ছিল ছোট। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজের পছন্দমত বিখ্যাত "পদ্মা" বোটখানি তৈরী করিয়েছিলেন অনেক টাকা খরচ ক'রে। এই বোট তৈরীর জন্যে তিনি শিলাইদহে জাপানী মিস্ত্রী আনিয়েছিলেন। সে বোধ হয় আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখন ঐ কাজের জন্য একজন জাপানী মিস্ত্রী সপরিবারে শিলাইদহ কুঠীবাড়ীর কাছে বাস করত। তা'রা অনেকদিন ছিল। আমরা তখন সেই বেঁটে জাপানী মিস্ত্রী-দম্পতিকে দেখে অবাক হতুম, আর ভাবতুম এই বেঁটে অদ্ভুত লোকেরা এমন সুন্দর কারিকর হয় কেমন ক'রে, আর এত কঠিন পরিশ্রম করেই বা কী ক'রে।

"পদ্মা" বোট তৈরী হচ্চে শিলাইদহের পুরোনো হাটের কাছে, যেখানে অনেকদিন আগে নীলকর শেলি সাহেবদের সেকালের প্রাচীন কুঠীর ভগ্নাবশেষ ছিল। সেই লুপ্তপ্রায় নীলকুঠীর ইটের স্তূপের উপর দিয়ে কীর্ত্তিনাশা পদ্মা কল-কল ক'রে গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে। বোটের সবই তৈরী হয়ে গেছে; তখন কামরাগুলো তৈরী হচ্চে।

জাপানী মিস্ত্রী আর তার বৌ সারাদিন ঠুক্ ঠুক্ ক'রে হাতুড়ী পেটে, ঘ্রোস্ ঘ্রোস্ ক'রে করাত চালায় পদ্মার ধারে সেই নূতন বোটে। বাসায় গিয়ে খায় দায়, ছেলেপিলে নিয়ে আমোদ করে, চুংচুং ক'রে গান গায় স্বামী স্ত্রী মিলে, হাটে বাজারে শিলাইদহের প্রসিদ্ধ মর্ত্তমান কলা কিনে খায়, আর সবার সঙ্গে বেশ মিলেমিশে থাকে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ নদীর ধারে এলেন সেই নূতন বোটের কাজ দেখতে। এসে দেখেন যে জাপানী মিস্ত্রী বা তা'র বৌ সেখানে নেই। তিনি বোটের কামরা তৈরী সম্বন্ধে কিছু নূতন ফরমাশ করবার জন্য মিস্ত্রীবৌকে খোঁজ করলেন। তাকে না পেয়ে ফিরে যাবার বেলায় বোটের পাহারায় মোতায়েন জামাল বরকন্দাজকে ব'লে গেলেন, "কাল সকালে এই সময়ে মিস্ত্রীবৌ যেন এইখানে উপস্থিত থাকে, তাকে আমি কাজের সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেবো। তাকে আজই এই কথা ব'লে রেখো।"

জামাল বরকন্দাজ সেকালের একজন জবরদস্ত বরকন্দাজ ছিল, বেশ জোয়ানমর্দ্দ চালাক চতুর লোক ব'লে তাঁর পশার-প্রতিপত্তিও ছিল খুব। সে প্রায়ই জলকর মহালে মোতায়েন থাকতো। তাই জেলে আর নিকারীরা তাকে খুব ভয় ক'রে চলতো। দুঃখের বিষয়, জামাল বরকন্দাজ নানান কাজের তালে রবীন্দ্রনাথের ঐ হুকুম মিস্ত্রীবৌকে বলতে একেবারেই ভুলে গেছে।

তার পরদিন ভোরে যথাসময়ে রবিবাবু বোটের কাছে এসে দেখেন মিস্ত্রীবৌ তখনও আসেনি। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা ক'রে কুঠীবাড়ীতে খুব বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন। মিস্ত্রীবৌ একটি ছেলের অসুখ হওয়ায় সে ম্যানেজারবাবুকে ব'লে দুই-তিন দিনের ছুটী নিয়েছিল, তা'র স্বামীও'কী যেন কিনবার জন্য কলকাতায় গিয়েছিল। এদিকে জামাল বরকন্দাজ এমন ভুলই ক'রে বসলো যে তাতে ব্যাপার গড়ালো অনেক দূর।

রবীন্দ্রনাথ কুঠীবাড়ীতে মিস্ত্রীবৌকে রান্না করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, জামাল বরকন্দাজ তাকে কোন খবরই দেয়নি কেন? মিস্ত্রীবৌ এই কথা শুনে খুব দুঃখিত হল। সে জানালো "বাবু, আমি এই খবরটুকু পেলেই আজ সকালে বোটের কাছে হাজির থাকতুম। তা আমি মোটেই জানতে পারি নি।"

রবীন্দ্রনাথ কুঠীবাড়ীর মধ্যে চ'লে গেলেন। তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রীবৌ ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত ছুটলো কাছারীতে জামাল বরকন্দাজের কাছে। জামাল বরকন্দাজ তখন কাছারীর মেসের পেছনে ব'সে তামাক খাচ্ছে আর তা'র সহকর্ম্মীদের সঙ্গে গল্প করছে।

জামাল বরকন্দাজের কাঁধে ছিল গামছা। ঝড়ের বেগে মিস্ত্রীবৌ এসে তা'র গলার গামছা ধ'রে টান্ মেরে বল্ল—"তুমি আমায় জানাওনি কেন? বাবু মশায়ের হুকুম আমায় বলোনি কেন? বোকা কোথাকার!" জামাল সত্যিই বড় লজ্জিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

জামাল যতই বলে "ওরে আমার ভুল হয়েছিল"—মিস্ত্রীবৌ ততই রেগে একেবারে ক্ষেপে উঠলো। জামালের গলার গামছায় প্যাঁচ ক'সে টেনে জামালের মত জোয়ান মর্দ্দকে একেবারে কাবু ক'রে ফেললো। জামাল বলে—"আমার ভুল হয়েছিল, আমায় ছাড়্ রে—ছাড়্।" মিস্ত্রীবৌর রাগ পড়ে না—সে শুধু চীৎকার করে—"মুনিবের কাজে এত বড় ভুল? ফাঁকি দিয়ে মাইনে খাও?" মিস্ত্রীবৌ জামালের গলায় গামছা দিয়ে এমন নাস্তানাবুদ করলো যে, জাপানী-বাঘিনীর হাত থেকে তাকে বাঁচায় কার সাধ্য? যারা সেখানে ছিল তা'রা তো হতভম্ব হয়ে গেল জাপানী মেয়ের শক্তি ও সাহস দেখে। মিস্ত্রীবৌ এম্নি ক'রে জামাল বরকন্দাজকে নাস্তানাবুদ ক'রে বকতে বকতে হন্-হন্ ক'রে তা'র বাসায় ফিরে গেল।

জামাল খুব লজ্জিত হয়েছিল। সে বলতো—"বাঘিনীবেটী আমায় খুব জব্দ করেছে।" সকলেই বলাবলি করতো,—স্বাধীন জাপানের মেয়ে! ওর তেজ, ওর শক্তি, আমরা কী ক'রে পাবো!

রিক্‌সাওয়ালা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ঘনটি নিয়ে রিক্‌সা টেনে যাচ্ছে মানুষগুলো,
মোদের মাগো মস্ত সহর মাঝে ;
ওদের পায়ে পথের কত লাগছে গরম ধুলো,
ওদের প্রাণে কতই ব্যথা বাজে !

পেটের দায়ে নিত্য ওরা বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
টানছে গাড়ী চড়িয়ে মানুষ রোজ ;
মানুষ হয়ে মানুষ কেন ওদের ব্যথা-সুরে
যে গান জাগে, নেয় না তাহার খোঁজ !

বাবুর মত ব'সেই মোরা রিক্‌সা গাড়ীর 'পরে—
হুকুম করি পয়সা কিছু দিয়ে ;
দুপুর বেলা রৌদ্র-দাহে ওরাই ধুঁকে মরে,
নেই কি কেহ ওদের জুড়ায় হিয়ে ?

ওদের কথা কেউ কি ভাবে, দিনতো চ'লে যায়,
দেখছি না তো ওদের হাসি মুখ !
মোদের মত ওই যে মানুষ দুঃখ কেন পায় ?
দুঃখ মাঝে পায় কি মাগো সুখ ?

ছয়গাঁও ড্রামেটিক ক্লাব

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

বড় দিনের ছুটিতে গ্রাম লোকে লোকারণ্য। বোমার ভয়ে সহরের লোকজন দেশে আসিয়া হাজির। এক কথায় বলিতে গেলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমাগমে ছয়গাঁও গ্রামখানি একেবারে সরগরম হইয়া উঠিয়াছে।

এমন দিনে সুযোগ এবং সুবিধা বুঝিয়া গাঁয়ের সোখীন তরুণ এবং যুবকের দল থিয়েটারের নেশায় ভীষণ মাতিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বৌ-ঝিরা এবং সহর হইতে সদ্য: আগত প্রগতি-পরায়ণা কিশোরী, তরুণী এবং হাল-ফ্যাসানের যুবতী বধূ, প্রৌঢ়া ও ঠানদিদির দলও ছেলেদের এই মাতামাতিতে প্রকারান্তরে পরোক্ষভাবে বিষম সায় দেওয়ার ফলে স্বয়ং দধিরাম শর্ম্মা (স্থানীয় নাট্যসমিতির অনাহারী সম্পাদক) "কেদার রায়" অভিনয়ের মহড়া সুরু করিয়া দিয়াছিল।

স্থানীয় কালীবাড়ীর আটচালায় কেদার রায় অভিনয় হইবে একথা দধিরামের নিজ মুখে শুনিয়া আসিয়াছি। দধিরাম বাল্যবন্ধু, থিয়েটারের জন্য এক টাকা চাঁদা আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছে, 'না' বলিবার জো নাই।

দধিরামের মুখে আরও অনেক কথা শুনিলাম। কেদার রায় অভিনয়ের জন্য যে সব বিধি-ব্যবস্থা সে করিয়াছে, কলিকাতার কোন প্রথম শ্রেণীর সখের থিয়েটারের দলে নাকি সেরূপ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব! নূতন সাজসজ্জা, মঞ্চ এবং দৃশ্যপট অপূর্ব্ব, এবং অভিনেতাদের প্রশংসাতে দধিরাম একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিতে লাগিলাম, কার্ভালো যিনি অভিনয় করিবেন, তিনি নাকি পলাশপুর গাঁয়ের একচ্ছত্র অভিনেতা, চেহারাও তেমনি সাহেবদের মত। কলিকাতায়ও নাকি তা'র নাম-ডাক বেশ আছে। ননী চক্রবর্ত্তীর নাম আমি জানি কিনা, দধিরামের প্রশ্নের উত্তরে জানাইলাম, ঠিক মনে নাই।

তারপর জমিদার-বাড়ীর নূতন বউ প্রতিভা দেবী থিয়েটারের চা এবং জলযোগের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ঘোষাল-বাড়ীর মেয়েরা আসরের পান-সিগারেটের খরচ দিবেন এবং চাটুয্যেদের বড় বউ ছেলেদের মুখে চূণকালি মাখিবার (অর্থাৎ পাউডার, স্নো, কুমকুম, লালিকা ইত্যাদির) যাবতীয় জিনিষপত্র সহর হইতে আনিয়া দিবেন। নবু সেখ মিঞাদের এবং কর্ত্তাদের কড়ামিঠে তামাকের ব্যবস্থা করিতেছে। ডজন খানেক কল্‌কে এবং আধ ডজন হুঁকা শিরোমণি মহাশয় দিয়াছেন।

বড়বাড়ী হইতে সামিয়ানা, ফরাসের চাদর এবং সতরঞ্চি, ডে-লাইট, হেজাক, এ সমস্তের কোন কিছুর অভাব হইবে না, এ কথা তর্জ্জনী নাচাইয়া দধিরাম কম্‌সে-কম আমাকে বার দশেক শুনাইয়া দিল।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের চোখে ঘুম নাই। এখনও থিয়েটারের চার-পাঁচ দিন বাকী। কালীবাড়ীর চারদিকে ছেলে-ছোকরাদের গর্জ্জনে, উল্লাসে এবং বিকট সঙ্গীতে আশেপাশের শিবার দল তাহাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঘাঁটিতে সরিয়া গিয়াছে। গাঁয়ের চাষাভুষা, মুটেমজুর অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটায় সত্য, কিন্তু তাহারাও এই ক্ষণিক আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। সবারই মুখে সেই এক কথা,—আগামী শনিবার রাত্রি আটটায়,...কেদার রায়......

জোর রিহার্স্যাল চলিয়াছে। পার্ট মুখস্থ এক রকম অনেকেরই হইয়া গিয়াছে; এখন গানের মহলা মাত্র বাকী। হরিদাস বাবাজী গানের ভার লইয়াছে, সেজন্য মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। প্রয়োজনবোধে সে নাকি একখানি কীর্ত্তন গাহিয়া আসর জমাইয়া তুলিবে।

ইতিমধ্যে কার্ভালোর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হইবেন, সেই ননী চক্রবর্ত্তী দিন কয়েক আগে একবার আসিয়া রিহার্স্যাল দিয়া গিয়াছে। সে আর আসিতে পারিবে না, মাত্র অভিনয়ের দিন আসিয়া হাজির হইবে। তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ মায় তরবারী পর্য্যন্ত সে নিজেই নিয়া আসিবে।

পলাশপুর হইতে খানিকটা পথ ননী নৌকাযোগে আসিবে এবং অবশিষ্ট পথটুকু সে পায়ে হাঁটিয়া আসিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, ননী চক্রবর্ত্তীর যাবতীয় পথের খরচ ছয়গাঁও ড্রামেটিক ক্লাবই বহন করিবে এবং তাহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার ভার নিয়াছে ঘোষাল-বাড়ীর ছেলেরা।

বাগ্দীপাড়ার নবু সেখের ছেলে করিম এক সেনাপতির পার্ট পাইয়াছিল। তাহার বাবরি চুল, গোপ দাড়ির জন্য দধিরাম তাহাকে মনোনীত করিয়াছিল, কারণ ক্লাবে গোপ, দাড়ি, চুলের একটু অভাব ছিল। এমন কি, এইজন্য জন কয়েক ছেলে-ছোকরা দু' মাস হইতে নিজেদের চুলদাড়ি না কামাইয়া চেহারাগুলিকে দস্তুরমত স্বাভাবিক মোগল সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষের চেহারার মত করিয়া রাখিয়াছিল।

শনিবার দিন, সকালবেলা কালীবাড়ীর নাট-মণ্ডপে বিরাট হৈ-চৈ সুরু হইয়াছিল। একা দধিরামই একশ'! বিরাট সামিয়ানার নীচে ফরাশ পাতা হইয়াছে। পুরু গালিচার মঞ্চে গ্রামের এবং ভিন্‌গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা আসন গ্রহণ করিবেন। এতদুপলক্ষে চারদিক হইতে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা আসিবেন। মেয়েদের জন্য চিকের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঁচশত ভদ্রমহিলা এক সাথে বসিয়া সেখানে অভিনয় দেখিতে পারিবেন। তাহাদের আদর-যত্নের জন্য কোন রকম ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে না। ঘোষাল-বাড়ীর মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবিকা হইয়াছে।

আয়োজনের যত রকম বন্দোবস্ত হইতে পারে, কোন বিষয়ের অভাব-অভিযোগ নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দলে দলে ভিন্‌গাঁয়ের লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় গৃহিণীর বিষম তাড়া খাইয়া সায়ংসন্ধ্যা কোন রকমে অতি সংক্ষেপে সমাপন করিয়াছেন। সন্ধ্যা-প্রদীপ প্রজ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাড়ীতেই আহারাদি শেষ হইয়া গেছে। সকলেই একটু বিশিষ্ট স্থান সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল।

এদিকে অন্তরালে মাথা ঘুরিয়া দধিরামের পতন ও মূর্চ্ছা। ভিতরে সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিল,—মুকুট রায় বেচারী একাই স্টেজের উপর বিষম ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিয়াছিল, সে তো আর জানে না যে দধিরামের এই অবস্থা,······ঠিক এমন সময় আসরের এক ধার হইতে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, এবং মুকুট রায় বিকট শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,···কে মারলে? কে মারলে?

সঙ্গে সঙ্গেই ননী চক্রবর্ত্তী একলাফে আসর হইতে স্টেজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল, "হামি মারিয়াছে"······সঙ্গে সঙ্গে জনতার ঘন ঘন করতালি এবং বিরাট উন্মাদনা······।

শিরোমণি মহাশয় "সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিলেন। অভিনয় পূরাদমে জমিয়া উঠিল।

দধিরাম চেতনা লাভ করিতেই সহকারী সম্পাদক বলিয়া উঠিল, ননী এসেছে, ননী······"

দধিরাম কোন মতে উঠিয়া বসিল এবং ধীরে ধীরে কহিল—"কি ভাব-ই না জেগেছিল আমার······এমন ভাব জাগলে কথার অভাব হয় বেশী, ভাবের অভাব হয় না! ননী এসেছে,··· বাঁচালে আমায়···"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, কেদার রায় অভিনয়ের পরক্ষণেই দধিরাম অনাহারী সম্পাদকের পদ স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে। এমন বিপদে সে আর জীবনে কোন দিন পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। সেজন্য 'ছয়গাঁও ড্রামেটিক ক্লাব' উঠিয়া যায় নাই। দধিরাম গিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া গ্রামের তরুণদের কৃপায় থিয়েটার ক্লাবটি একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই, বরং এখনও অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া সগৌরবে দাঁড়াইয়া আছে।

নন্দানদীর বাঁকে

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী

বকুল-ঝরা শিউলি-ভরা নন্দানদীর বাঁকে,
স্বপনপুরের রূপকুমারী হাতছানি দে' ডাকে।
বাজিয়ে বেণু চরায় ধেনু রাখাল ছেলে মাঠে,
পল্লীবধূ কলসী কাঁখে ফিরে গাঁয়ের বাটে।
ধীর বাতাসে পাল উড়িয়ে নৌকো ভেসে যায়,
পাতালপুরের জলপরীরা নীল নয়নে চায়।
তরঙ্গে তার ঢেউ খেলে যায় স্বপন লাখে লাখে,
ঘুম-পাড়ানী গানে ভরা নন্দানদীর বাঁকে।

বাবলা-হিজল ফুলে উজল নন্দানদীর বাঁকে,
ছেলেবেলার কতই স্মৃতি জড়িয়ে শত পাকে।
বুড়োবটের শীতল ছায়ে ঝুলন বেঁধে খেলা,
বকুল-ডালে কোকিল ডাকা, প্রজাপতির মেলা।
শিশুকালের মনটি আমার আজিও সেথায় ফিরে,
বুনো হাঁসের সাথে সাথে নদীর তীরে তীরে।
তেপান্তরের রাজকন্যা ঘুমিয়ে সেথায় থাকে,
চাঁদের আলোয় আপনহারা, নন্দানদীর বাঁকে।

মন-ভোলানো কাজল-কালো নন্দানদীর বাঁকে,
নাম-না-জানা কোন্ স্বরগের স্বপনখানি আঁকে।
হাজার মাণিক ঝিলিক্ হানে রবির কিরণ-পাতে,
নীল আকাশের উজল তারা সাঁতার খেলে রাতে।
পূবে জাগে সোণার উষা মধুর হাসি হেসে,
বুকে তাহার আবীর ছড়ায় সন্ধ্যা দিনের শেষে।

প্রাণ-মাতানো মধুরসুরে ঝিল্লী সেথায় ডাকে,
মনটা আমার হারিয়ে আছে নন্দানদীর বাঁকে।

ভট্টাচার্য্যের সন্ধি-বিচ্ছেদ

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

এর আগে তোমাদের কাছে কলির ভীম রাজা রামচন্দ্রের কথা কিছু বলেছি। আজ সেই রাজা রামচন্দ্রের পিতৃদেব রাজা রুদ্ররায়ের কথা কিছু বলব। এসব কথা কিন্তু আমার নিজের তৈরী নয়। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে জার্ম্মাণীতে ছাপানো প্রায় একশো বছর আগেকার "ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিতম্" নামে যে দুষ্প্রাপ্য বইখানি আছে, তার থেকেই আমি আজ বাংলার হারাণো ইতিহাসের দুই-চারিটি কথা তোমাদের জানাবো।

রাজা রুদ্ররায় ছিলেন ধর্ম্মনিষ্ঠ, শিল্পানুরাগী, নিরপেক্ষ এবং সূক্ষ্মবিচারক। তিনিই আলাবক্স নামে একজন নামকরা রাজমিস্ত্রীকে এনে কৃষ্ণনগরে তাঁর রাজবাড়ী, নহবৎখানা, চক প্রভৃতি তৈরী করান। এই রাজবাড়ীর সুচিত্রিত পূজার নাটমন্দির আজও রাজা রুদ্ররায়ের শিল্পানুরাগের পরিচয় দেয়।

রাজা রুদ্ররায় মোগল সম্রাটের যুগে রাজত্ব ক'রে, এবং মোগল বাদশাহের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়েও কখনও আচারভ্রষ্ট হননি। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর রাজা রুদ্ররায়কে একটি স্বর্ণখচিত রাজপোষাক, রাজদণ্ড এবং শিরস্ত্রাণ উপহার দেন। তিনি তাঁকে পতাকা, ধনুর্বাণ এবং জয়ঢাক ব্যবহার করবার রাজ-সম্মানও দিয়েছিলেন; কিন্তু তখনকার দিনে নিয়ম ছিল, সম্রাটের দেওয়া এইসব রাজ-সম্মান দরবার-গৃহে বাদশাহের সম্মুখে ধারণ করতে হ'ত।

রাজা রুদ্ররায় সুসজ্জিত বহুমূল্য রাজপোষাক প'রে শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে, রাজদণ্ড এবং ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে দরবার-গৃহে দাঁড়ালেন, কিন্তু জয়ঢাক তিনি পৃষ্ঠে ধারণ করলেন না।

এই ব্যাপারে পাছে তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হন, এইজন্য অনেকে রাজাকে ঐ জয়ঢাক পৃষ্ঠে ধারণ করতে পরামর্শ দিল। কিন্তু রুদ্ররায় ছিলেন ধর্ম্মনিষ্ঠ। তিনি দরবার-গৃহে সমুন্নত মস্তকে দাঁড়িয়ে বললেন,—'মহানুভব সম্রাটের জয় হোক্! আমি ব্রাহ্মণ,—চর্ম্মনির্ম্মিত জয়ঢাক স্পর্শ করা আমার জাতিধর্ম্ম নয়।'

সেখানে সুবিধাবাদী যাঁরা ছিলেন তাঁরা বুঝলেন, রাজা জয়ডঙ্কা বাজাবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হ'লেন এবার! কেউ কেউ হয়ত' মনে মনে ভাবলেন, কী-ই বা এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত জয়ঢাকটা একবার কাঁধে তুললে!—তারপর না হয় গঙ্গাস্নান ক'রে নিলেই হ'ত।

কিন্তু জাহাঙ্গীর সত্যিই ছিলেন মহানুভব। তিনি রাজার এই স্বধর্ম্মনিষ্ঠায় এবং সত্যকথায় প্রীত হয়ে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা দিলেন যে, ঐ রাজবংশকে দরবার-গৃহে কখনও ঢাক স্কন্ধে করতে হবে না এবং তাঁরা জয়ঢাক ব্যবহার করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাবেন।

এইবার রাজার সূক্ষ্মবিচারের গল্প শোন।

মাটিয়ারীতে একঘর ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরা দু'ভাই! ভাইয়ে ভাইয়ে কিন্তু একেবারে দা-কুমড়ো!—বনিবনাও ছিল না তাঁদের মোটেই। একদিন রাজা রুদ্ররায়ের কাছে এসে এক ভাই বিচার প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁদের দু' ভাইকে মিলে মিশে থাকার কত সুবিধা তা' বুঝালেন, কিন্তু তাঁরা বাড়ী গিয়ে আবার যা তাই!

রাজা রুদ্ররায় তখন তাঁদের পৃথক্ ক'রে দিয়ে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি এবং ঘরবাড়ী সমান ভাগ ক'রে দিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের ঝগড়া থামে না!

অবশেষে রাজা তাঁদের ভট্টাচার্য্য উপাধিকেও দুই ভাগ ক'রে এক ভাইকে করলেন 'ভট্ট', আর এক ভাইকে করলেন 'আচার্য্য'! রাজা আচার্য্য পরিবারকে মাটিয়ারী থেকে গৃহবিবাদের জন্য সরিয়ে এনে কুড়ুলকান্দিতে বাস করতে দিলেন। আজও মাটিয়ারীতে 'ভট্ট' পরিবার এবং কুড়ুলকান্দিতে 'আচার্য্য' পরিবার বাস করছেন।

জেনে রাখা মন্দ নয়

শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্‌. এ.

পৃথিবীতে এরূপ হিংস্র জানোয়ার বহু আছে যারা শক্তিতে, সাহসে এবং হিংসায় এমন ভয়ানক যে, নিরস্ত্র মানুষ বা অন্য দুর্ব্বল প্রাণী তাদের কবলে পড়লে নিজেকে নিতান্ত অসহায় মনে করে। লক্ষ্য করে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় যে, এই সকল ভীষণ হিংস্র জানোয়ারকে এড়িয়ে চলবার সঙ্কেত মানুষের সাহায্যের জন্য ভগবান বহু যায়গায় সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সকল সঙ্কেত জানা থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্ব্বল প্রাণী সবলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। মোটকথা, চোখ কান খোলা রেখে পৃথিবীতে বাস করলে আমরা অনেক হিংস্র জন্তুর হিংসা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

পশুরাজ সিংহের কথা নিয়ে আরম্ভ করছি। আজকাল সিংহ আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। যে সকল সঙ্কেত থেকে আফ্রিকার শিকারী এবং বুনো অধিবাসীরা সিংহের আগমন জানতে পারে সেগুলো জেনে রাখা মন্দ নয়। সিংহের একটি অতি প্রিয় খাদ্য হচ্ছে জেব্রা। জেব্রারা দল বেঁধে বড় বড় লম্বা ঘাসযুক্ত মাঠে চরতে থাকে। সিংহ কাছে এলে তা'রা যদি কোন রকমে জানতে পারে, অথবা একটা জেব্রা যদি সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে অন্য জেব্রারা দল বেঁধে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। তাদের সম্মিলিত ক্ষুরধ্বনি বনের নিস্তব্ধতার ভেতর বহুদূর থেকে শোনা যায়। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা জেব্রাদলের ভীতি-বিহ্বল দৌড় এবং চঞ্চল ক্ষুরধ্বনি থেকে বুঝতে পারে যে, নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে পশুরাজের আগমন হয়েছে। সুতরাং তা'রা সাবধান হয়। সিংহের উপস্থিত-বার্ত্তার আর একজন প্রধান ঘোষক হচ্ছে উটপাখী। উটপাখী হচ্ছে অতি সতর্ক প্রাণী এবং সিংহকে সে যমের মত ভয় ক'রে থাকে। কাছাকাছি সিংহ এসেছে বুঝতে পারলেই একজন চেঁচিয়ে ডেকে আর একজনকে সাবধান করে দেয়, তারপর সকলে তুমুল কোলাহল করতে করতে ছুটে চলে। উটপাখীর ভাবভঙ্গী দেখে অন্য প্রাণীরাও সতর্ক হয়।

বাঘের পেছনে ফেউএর কথা তোমরা সকলেই জান। ফেউ হচ্ছে শেয়ালজাতীয় প্রাণী; এরা বাঘের আশেপাশে থাকে এবং "ফেউ ফেউ" করে চীৎকার করে বাঘের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিয়ে অন্য প্রাণীকে সতর্ক করে। ফেউ বাঘের পেছনে এমন করে ঘুরে বেড়ায় কেন বলতে পার? কারণ হচ্ছে, বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদটুকু পাওয়া।

হায়না ভারি চালাক জানোয়ার। বনের ভেতর থেকে সে মাঝে মাঝে শিশুর কান্নার মত একরকম শব্দ করে। এই শব্দ অভিজ্ঞ প্রাণীকে সতর্ক করে দেয়, কিন্তু অনভিজ্ঞকে তার কবলে এনে ফেলে। মনে কর তুমি নতুন শিকারে গেছ; হঠাৎ বনের ভেতর থেকে কচিগলায় ছোট ছেলের মত কে কেঁদে উঠল। তুমি হয়ত বীরত্ব দেখিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে হায়নার কবলে পড়লে। অভিজ্ঞ শিকারী বা অন্যান্য বন্য জন্তু কিন্তু এই শব্দ শুনে লুকিয়ে পড়ল।

ভালুক সাধারণতঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু জেনে অথবা না জেনে ভালুককে যদি কোন রকমে উত্তেজিত করা যায় তবে আর রক্ষা নেই। ভালুকের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বাঘের চেয়েও ভয়ানক। তিনটি জিনিষের সঙ্গে ভালুকের সংস্রব খুব বেশী। সুতরাং এই তিনটি জিনিষকে এড়িয়ে চললেই ভালুককে অনেকটা এড়িয়ে চলা যায়। প্রথম হচ্ছে বনের মধ্যের উই-ঢিপি, দ্বিতীয় বুনোগাছে মৌচাক এবং তৃতীয় পাকাফলযুক্ত মহুয়া গাছ। বনের মধ্যে উই-ঢিপি খুঁড়ে উই খেতে ভালুকেরা বড় ভালবাসে। সুতরাং কাছাকাছি উই-ঢিপি থাকলে বুঝতে হবে যে, হয় ভালুকের আস্তানা কাছেই আছে, নয়ত সে প্রায়ই এখানে আসে। বুনো গাছের মৌচাক সম্বন্ধে এই রকম অনুমানও প্রায়ই ঠিক হয়। অনেক সময় কাঠুরেরা বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দেখতে পায় যে, কাছাকাছি কোন মৌচাক থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে মৌমাছিরা উড়ছে; তখন তা'রা সহজেই বুঝতে পারে যে ভালুক-মশাই চাকে খোঁচা মেরেছেন। পাকা মহুয়াফল ভালুকদের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য। এই ফল খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে ভালুককে রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকতেও দেখা গেছে। কোথাও মহুয়া ফল পেকেছে এই সন্ধান পেলে সন্ধ্যার পর থেকে দলে দলে ভালুক সেখানে আনাগোনা আরম্ভ করে। শিকারীরা কাছাকাছি ওঁৎ পেতে থাকে এবং সাধারণ লোকেরা সন্ধ্যার পর থেকে প্রায়ই মহুয়া গাছের পাশ দিয়ে হাঁটে না।

এক একটা কুমীর নদীতে ঢুকে প্রায়ই উপদ্রব সুরু করে। যে ঘাটে লোকেরা স্নান করে বা জল নেয় তার আশেপাশে কুমীর মশায় চোখদুটি তুলে ভাসতে থাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন এক টুক্‌রো পোড়া কাঠ ভাসছে, যেই কেউ জলে নেমেছে অম্‌নি তাকে লেজের ঝাপ্‌টা মেরে তার পা কামড়ে ধরে হিড়্‌-হিড়্‌ করে তাকে গভীর জলে টেনে নেয়। কুমীর যখন চোখদুটি তুলে জলের ওপর ভাসে, তখন একরকম ছোট ছোট পাখী প্রায়ই কুমীরের মাথার ওপর উড়তে উড়তে চীৎকার করতে থাকে। যারা একথা জানে তা'রা এ পাখী দেখলেই সাবধান হয়।

আমেরিকাতে র‍্যাট্‌ল্‌ সাপ বলে একরকম ভয়ানক বিষধর সাপ আছে। এ সাপ কাউকে কামড়ালে তার দেহ তৎক্ষণাৎ অসাড় হয়ে যায় এবং অবিলম্বে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এর দংশন থেকে কোন প্রাণীকে বাঁচাবার কোন রকম ঔষধ নেই। এই সাপের লেজের শেষে চক্রাকার ঘণ্টার মত কতগুলো অস্থিখণ্ড আল্‌গাভাবে আটকান থাকে। সাপ নড়তে আরম্ভ করলেই ঐ অস্থিগুলো খট্‌-খট্‌ শব্দ আরম্ভ করে। এই সাপদের ভেতর আবার শেয়ালের মত এক মজার অভ্যাস আছে। একটা সাপ খট্‌-খট্‌ আওয়াজ করলেই পাশাপাশি অন্যান্য সাপগুলো খট্‌-খট্‌ আওয়াজ করে ওঠে। এ শব্দ শুনে অন্য প্রাণী সতর্ক হয়ে যায়, তা না হলে যে কত হাজার হাজার প্রাণী প্রতিবৎসর এর দংশনে প্রাণ দিত তার ঠিক নেই। এ ছাড়া, আমাদের দেশেও মাঠে ঘাটে সাপ বেরুলে অনেক সময় শালিক এবং ফিঙে পাখীর দল সাপের উপর উড়তে উড়তে ভীতিজনক চীৎকার করে থাকে।

গোরিলা নামক ভয়ানক প্রাণীর কথা তোমরা অবশ্যই শুনেছ। এদের কেবলমাত্র

আফ্রিকাতেই দেখতে পাওয়া যায় এবং সেখানেও এদের সংখ্যা অত্যন্ত কমে এসেছে। গভীর বনের গভীরতম অংশে গোরিলারা বাস করে; সুতরাং মানুষের সঙ্গে এদের দেখা-সাক্ষাৎ প্রায়ই হয় না। কিন্তু আফ্রিকাতে অনেক বুনো জাতির বাস। শিকার করেই তাদের প্রাণধারণ করতে হয়। এই সব বুনোরা শিকার করতে করতে অনেক সময় গভীর জঙ্গলের ভেতর ঢোকে। ঢুকেই তাদের ভয় হয় কাছাকাছি গোরিলার বাস আছে কি না;—কারণ এমন কোন মানুষ বা জানোয়ার আফ্রিকাতে নেই যে গোরিলাকে যমের মত ভয় না করে। তখন তা'রা কি করে জান? তা'রা কান পেতে শুনতে থাকে কাছাকাছি কোন শব্দ হচ্ছে কি না। ব্যাপার হচ্ছে এই যে গোরিলারা কোন কারণে উত্তেজিত হলেই,—আর এদের উত্তেজনা অতি সামান্য কারণেই হয়ে থাকে—বুক চাপড়াতে থাকে। এই বুক চাপড়ানোর আওয়াজ বড় ভয়ানক। নিস্তব্ধ বনের ভেতর দামামার আওয়াজকেও এই শব্দ হার মানিয়ে দেয়। বহুদূর থেকে এই শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়। এই আওয়াজ শুনলে এমন কি পশুরাজ সিংহ পর্য্যন্ত লেজ নীচু করে ছুট্ মারে।

শিকারী পাখীর ডানার শব্দে অনেক সময় শিকার সতর্ক হয়। হিমালয়ের ঈগল দেখতেও যেমন প্রকাণ্ড, এর লক্ষ্যও তেমনই অব্যর্থ। খুব উঁচুতে সে যখন ওড়ে, তখন নীচের অতি ছোট খরগোসটিও তার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। শিকার যেই দেখা, অমনি সে শোঁ-শোঁ করে নীচে নামতে থাকে। তার ডানার কি আওয়াজ! মনে হয় যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। শিকার সেই শব্দ শুনে অনেক সময় ঝোপঝাড়ের আড়ালে কিংবা গর্ত্তের ভেতর ঢুকে প্রাণ রক্ষা করে।

অরুচির আহার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আমাদের গ্রামে তা'র বাস।
নাম হ'ল—নিবারণ দাস।
ব্যায়রামে ভুগিয়া এবার,
ধরিয়াছে বেজায় অরুচি।
মাছ, ভাত, ডাল, রুটি, লুচি—
কিছু মুখে রোচে নাকো তা'র।

বিয়ে বাড়ী হ'ল নিমন্ত্রণ
অনিচ্ছায় গেল নিবারণ,
অনিচ্ছায় বসিল খাইতে;
গণ্ডা বারো লুচি মাত্র খেয়ে
রহিল সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চেয়ে,
লাগিল সে মুখ বাঁকাইতে।

এক হাঁড়ী দই নিয়ে শেষে
মেখে দুই-কুড়ি সন্দেশে
অরুচির মুখে তাই খায় ;
বাড়ীওলা বলে—"ওহে একি
কিছুই ত খেলে নাকো দেখি
অঘটন ঘটালে যে হায় !"

অবশেষে অনুরোধে তাঁর
এলো আট গণ্ডা লুচি, আর
সেই মতো ডাল-তরকারী,
পোয়া পাঁচ এলো দরবেশ,
কিছু ফের আইল সন্দেশ,
দই এলো ফের এক হাঁড়ী।

নিবারণ সেগুলি নিঃশেষে
খেয়ে ফেলে বলে ম্লান হেসে—
"রোগে ভুগে মাস তিন-চারি
ধরেচে অরুচি বড় জোর
খিদে-টিদে সব গেছে মোর,
কিছু আর খেতে নাহি পারি।"

গৌর সে খাইতেছিল পাশে,
ব্যাপার দেখিয়া কাঁপে ত্রাসে,
মাথা তার বন্‌-বন্‌ ঘোরে !
নিবারণে সভয়ে সে কয়—
"তাই ত গো দাস মহাশয়,
এই খেয়ে বাঁচিবে কি কোরে।"

অতঃপর মনে মনে কয়—
'হেথা থাকা নিরাপদ নয়।'
—সচকিতে উঠি গেল গৌর।
অরুচির মুখে যদি হায়,
নিবারণ তাহাকেও খায়,
এই ভয়ে দিল এক দৌড়।

বঙ্গোপসাগরে জলদস্যু

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বোম্বেটের শেষ

বাহির হইবার পূর্ব্বে সুরেশ ঘরের দরজা-জানালাগুলি ভালরূপে বন্ধ করিয়া গেল।

চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সে বিশুয়ার নিকট আসিল। তাহাকে দেখিয়াই বিশুয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মুই যায় নাই। মুই তোর গোলাম হোবে, তোর কাম কোরবে। মুই পালাবে না। মুই ভাল মানুষ বাবু, তুই মোকে মারিস্ না। হামি উয়ার সাথ্ যাবেক না, উটা হামাকে হরঘড়ি মারে। মুই তোর নোকর বাবু!"

লোকটার ভাব দেখিয়া সুরেশ বুঝিল, নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই সে পাণ্ডুরংএর সঙ্গে রহিয়াছে।

সুরেশ বিশুয়ার বাঁধ খুলিয়া দিল এবং তাহাকে মাখন, পাঁউরুটি, চিনি ও বিস্কুট খাইতে দিল। বিশুয়া কৃতজ্ঞতায় বারবার সুরেশের পায়ে পড়িতে লাগিল।

উভয়ে আস্তানার দিকে ফিরিয়া চলিল। রাস্তায়ই দেখে পাণ্ডুরং দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে ছোট একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ব্যাপার কি বুঝিবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। বিশুয়া সুরেশকে টানিয়া লইয়া মুখ মাটিতে গুঁজিয়া সটান উবু হইয়া শুইয়া না পড়িলে একটা বিষম অনর্থই ঘটিত। কতকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা যেন সম্বিৎ হারাইয়া পড়িয়া রহিল।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর, তাহারা ভয়ে ভয়ে চাহিয়া দেখিল, পাণ্ডুরং নাই। সে যে জায়গায় দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে একটা গহ্বরের মত হইয়া গিয়াছে। অগ্রসর হইয়া দেখিল, পাণ্ডুরংএর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। বিশুয়া আনন্দে হাততালি দিতে লাগিল।

সুরেশ ঘরে ফিরিয়া দেখিল, ঘরের একধারের বেড়া খোলা। ডিনামাইটের বাক্সটাও খোলা পড়িয়া আছে এবং কয়েকটি ডিনামাইট নাই। বুঝিল, বেচারা পাণ্ডুরং ডিনামাইট দিয়া তাহাকে মারিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ছুঁড়িতে দেরী হওয়ায় উহা তাহার হাতেই ফাটিয়া গিয়াছে এবং তাহার জীবনান্ত ঘটাইয়াছে।

পাণ্ডুরংএর অপমৃত্যুর কয়েকদিন পরে সুরেশ একদিন বারান্দায় একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া রাইফেল সাফ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল বেণীমাধব, বনমালী আর রাজেন বড়ুয়ার কথা। এমন সময়ে বিশুয়া আসিয়া বলিল,—"বাবু, মোকে ছুটী দে।"

সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"সে কি রে, যাবি কোথা ?"

—"উই জাহাজ আসছে। তুর সাথে থাকলে উই পিয়ারীলাল মুকে খুন করি লিবে।"

ব্যস্তভাবে সুরেশ বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল; দেখিল, দূরে একটা পাল দেখা যায়। ঘর হইতে দূরবীন আনিয়া দেখিল সত্যই সেই সুন্দরম্।

বিশুয়াকে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হইল না। অবশ্যই সুরেশের জন্য বিশুয়ার মায়া হইল। সে সুরেশকে আত্মরক্ষার পরামর্শও দিল; কিন্তু সে কিছুতেই পিয়ারীলালের হাতে পড়িয়া প্রাণটা খোয়াইতে চাহিল না। সে ডোঙ্গায় উঠিয়া সুন্দরমের বিপরীত দিকে তাড়াতাড়ি বাহিয়া চলিল। প্রাণের ভয়ে বেচারা বিশুয়া একাকী অকূলে ভাসিল।

এদিকে সুন্দরম্ দূর হইতে পাণ্ডুরংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সঙ্কেত করিল সুরেশ ফাঁকা আওয়াজ করিয়া সেই সঙ্কেতের উত্তর দিল।

দ্বীপ হইতে কিছু দূরে থাকিতেই জাহাজের পাল নামাইয়া লওয়া হইল। এবার একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিতে হইবে। খাঁড়িতে প্রবেশ করিবার মুখে একটা পাহাড় খাড়

উঠিয়াছে। জাহাজ ফাঁড়ির মুখে আসিবামাত্র চারিদিক কাঁপাইয়া ভীষণ শব্দ হইল সঙ্গে সঙ্গে আরোহী সহ সুন্দরম্ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল;—কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, বেচারার বুঝিবার একটু সুযোগও পাইল না।

বেণীমাধবের জয়যাত্রা

বেণীমাধব সুরেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বনমালী দূরবীন দিয়া চারিদিক দেখিতেছিল।

রাজেন বড়ুয়ার পাশে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। টেলিফোনে কান পাতিয়া শুনিল বনমালী বলিতেছে,—"বাঁয়ে মোড় চালাও।"

—"কেন?"

—"ঐ ডিঙ্গিখানা ধরতে হবে।"

জাহাজখানি তীরবেগে নৌকার দিকে যাওয়ায়, নৌকার লোকটা যেন বড় বিচলিত হইল। কিন্তু উপায় নাই। জাহাজ নৌকার পাশে যাইতেই, বনমালী লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই তোমার কি নাম? কোত্থেকে আসৃছ?"

—"মোর নাম বিশুয়া। হামি সুন্দরমের নোকর আছি।"

সুন্দরমের নাম শুনিয়াই বনমালী ও রাজেন লাফাইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল,— "তোর সেই জাহাজ কোথায়?"

—"সুন্দরম্ সুরশ বাবু ডুবাই দিছে। জাহাজর সব আদমি মর গিছে।"

—"তুমি সুরেশ বাবুকে চেনো?"

—"মুই দুই হপ্তা সুরশ বাবুর সাথ ছিলো। সিতো হই দ্বীপত আছে।"

বনমালী মানচিত্র খুলিয়া দ্বীপটির অবস্থান বুঝিয়া লইল। বিশুয়া তাহাদিগকে সেই দ্বীপে লইয়া যাইতে স্বীকার করিল।

বিশুয়া বেণীমাধবের এখন একজন কেষ্টবিষ্টু হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই তাহার সুবিধা, আদর-আপ্যায়নের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছে। মাল্লারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহাকে পান খাইতে দিতেছে, রাজেন বড়ুয়া তাহার সিগারেট যোগায়, চা তো সে দিনে চারি-পাঁচ বার পায়।

সকালবেলায় বনমালী দেখিতে পাইল, নীল সাগরের বুকে একটা ক্ষুদ্র বেগুনীরঙ্গের বিন্দু। মানচিত্র খুলিয়া দেখিতে পাইল, সমুদ্রের এই জায়গায় কয়েকটি জনহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। অমনিই জাহাজের পাগলা ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। লোকজন সব ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। বনমালী সকলকে দেখাইয়া বলিল,—"ঐ বোধ হয় সেই দ্বীপ। কেমন হে বিশুয়া, তাই নয় কি?"

বিশুয়া পান খাওয়া রাঙ্গা মুখের দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল,—"উটাই হবেক।" জাহাজ একটু মোড় ঘুরিয়া সোজা দ্বীপের দিকে চলিতে লাগিল।

বনমালী দূরবীন লইয়া দেখিতেছিল। আরও একটু নিকটে আসিলে দেখিতে পাইল দ্বীপের এক জায়গা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। সে ছুটিয়া রাজেনের পাশে যাইয়া বলিল,—"রাজেন! দেখেছো আর সন্দেহ নেই! এই দেখ ধোঁয়া উঠছে। বাবু এখানে আছেন আর বেঁচে আছেন, এই হলো তার সঙ্কেত।"

রাজেন বড়ুয়া দূরবীনটা দিয়া দেখিয়া আনন্দে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল।

জাহাজ সেই খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়া, ভাঙ্গা সুন্দরমের গা ঘেষিয়া চলিয়া নোঙ্গর করিল। সকলে বিস্মিত হইল জাহাজ দেখিয়াও কোন লোক অগ্রসর হইতেছে না। ঘরের আশে পাশেও লোক দেখা গেল না। তখন ডিঙ্গি করিয়া বনমালী, রাজেন ও বিশুয়া তীরে উপস্থিত হইল।

তীরে যাইয়া বনমালী চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল,—"বাবু,—ও বাবু,—সুরেশবাবু,—ও সুরেশবাবু। ও সু-রে-শ বাবু—উ-উঃ—"

ডাকিতে ডাকিতে তাহারা যাইয়া ঘরে ঢুকিল। তালাবদ্ধ দেখিয়া সকলে পাহাড়ের আগুন লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে চলিল।

পাহাড়ে উঠিবার পর বনমালী রাইফেলটিতে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল।

সুরেশ দ্বীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এই নির্জ্জন দ্বীপে একাকী ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে কত কথাই উঠিতেছিল। এই দ্বীপ হইতে উদ্ধারের আশা দিনের পর দিনই লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের শব্দে বুঝিতে পারিল কোন লোক দ্বীপে আসিয়াছে। লোকগুলি শত্রু না মিত্র তাহা আগে জানা দরকার। সে-ও উপরদিকে একটা গুলী ছুঁড়িল। গুলীর শব্দে ক্ষুদ্র গহ্বরটি ভরিয়া গেল।

কতক্ষণ পর সুরেশ শুনিতে পাইল, "মালীক বাবু,—" এ রাজেনের স্বর।

আবার শুনিল, আরও কাছে, বনমালী বলিতেছে—"সুরেশ বাবু,—সুরেশ রায়,—"

সুরেশ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল,—"এই যে, এইদিকে!"

বিশুয়া বলিল,—"বাবু! মোর বাবু! মুই তোর নোকর বাবু! মুই আসিছে।"

সুরেশ বলিল,—"তোর ঋণ এ জীবনে সুধতে পারবো নারে বিশুয়া।"

পরদিন সুরেশের লুণ্ঠিত মাল তুলিয়া লইয়া বেণীমাধব পূর্ব্বদিকে ছুটিল।

সুরেশ স্থির করিল গবর্ণমেণ্টের জাহাজ আসিয়া অপর লোকের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবে।

—শেষ—

বর্ষ-বিদায়

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এম. এ., কাব্য-সাংখ্যতীর্থ

[পুরাতন বৎসর যায়-যায়। আকাশের গায়ে ম্লানমুখে সে দাঁড়াইয়া আছে। শিশুসাথীর দরদী ছোট্ট পাঠক তাহাকে বিদায় দিতেছে, আর সে-ও তাহার উত্তর দিতেছে।]

শিশু।—আজ ত ফুরায়ে এল গোণা দিন ক'টি তব,
কোথা তুমি যাবে এবে, পুরাণো বছর ?
এমন সুন্দর ধরা মধুর সুষমা-ভরা
ছাড়ি' বল যাবে কোন্ আকাশের 'পর ?
প্রভাত-গগন-গায় দেখিতে পাবে না আর
তপন-কিরণছটা নয়ন-রঞ্জন ;
নিদাঘ মধ্যাহ্ন-শেষে মৃদু সমীরণ এসে
করিবে না দেহে তব মধুর ব্যজন।
অথবা বাদল-দিনে ঘন মেঘ ঘুরে ঘুরে
গাবে না কানেতে তব বরষা-মঙ্গল ;
দেখিতে পাবে না আর বাদল-দিনের শেষে
সন্ধ্যার ম্লান দুটি আঁখি ছল্‌ছল্।
আসিবে শরৎবালা লয়ে শেফালির মালা—
বিছায়ে সরসী-জলে কমল-আসন,
দেখিবে জগৎ-মাঝে তুমি নাই—তুমি নাই—,
এসেছে তোমার স্থানে অজানা—নূতন।
হেমন্তের ক্ষেতভরা পাকা ধান রাশি রাশি—
দূর্ব্বার পাতে পাতে নীহারের হার,—
সবাই বিফল প্রাণে তোমারে খুঁজিয়া যাবে,—
তুমিও তাদের, হায়, দেখিবে না আর।
কুয়াশায় ম্লান মুখে ফাঁকা মাঠ—ফাঁকা বুকে
আসিবে শীতের বেলা কাঁপিতে কাঁপিতে ;
তোমারে খুঁজিবে তা'রা,— তুমিও তাদের হারা ;
কেহ আর কাহারেও পাবে না দেখিতে।

শাখী-ভরা ফুল ল'য়ে　　পাগল সে ঋতুরাজ
আসিবে পড়িতে লুঠে বুকেতে তোমার ;
দেখিবে সে তুমি নও,—　　সেই স্নেহভরা বুক
নাই আর—নাই আর—তুমি নাই আর।
এমন স্নেহের সাথী—　　এমন সুন্দর ধরা—
এমন মোদের ছেড়ে এতদিন পর
কোথা তুমি যাবে চলে', পুরাণো বছর ?

পুরাণো বছর।—সময় হয়েছে আজ,　　যেতে যে হবেই ভাই
আজ শুধু চেয়ে আছি ওপারের পানে।
একে একে সব স্মৃতি—　　সব স্নেহ—সব প্রীতি—
জাগিতেছে ধীরে ধীরে আজি এই প্রাণে।
তবু যেন মনে হয়　　এ সব আমার নয়,
জগতের খেলা মোর অবসান আজ।
মায়াময় এ ধরায়　　আছি একদিন আর,
একদিন আছে আর জগতের কাজ।
আকাশ, সাগর, হ্রদ,　　কানন, শেখর, নদ,
ফুল-গন্ধে মাতোয়ারা পাখীদের গান,
প্রভাত সাঁঝের বেলা　　আলোতে ছায়ার খেলা,
ক্ষেত-ভরা শ্যামলিমা—ধরণীর দান,
বরষার মেঘরাশি,　　শরতের মৃদু হাসি,
শীতের অলস বেলা, বসন্ত প্রয়াণ,
সব আজি জাগে প্রাণে ;　　সব যেন কানে কানে
বলে মোরে—"আজি তোর খেলা অবসান।"
ঐ যে পোহায়ে যায়　　জীবনের শেষ নিশি,
ঐ যে অনন্ত মোরে করে আবাহন ;
নূতন আসিছে ঘরে,　　বরি' লও সমাদরে ;
সময় ফুরায়ে গেছে,—চলিনু এখন
তোমাদের ছেড়ে, ভাই, জন্মের মতন ॥

সম্পাদকীয়

শিশুসাথীর প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিশুসাথীর একুশ বছর শেষ হ'য়ে গেল। তোমাদের জীবনেও একটি বছর বেড়ে যাবে এই মাসের সঙ্গে সঙ্গেই। যাঁর অসীম কৃপায় আমরা একটি বছর কাটিয়ে উঠ্‌লাম, এস, সর্ব্বাগ্রে আমরা সবাই মিলে কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁরই পায়ে প্রণতি জানাই।

গত বছর এম্‌নি দিনে বোমার হিড়িকে কলকাতায় যখন ভাঙন ধরল, তখন বিপাকে পড়ে তোমাদের আরো দশজনের মত শিশুসাথীও চলে এল কলকাতা ছেড়ে ঢাকায়। তারপর কত কিছু হলো। যাঁ'রা বোমার কল্পনায় একদিন তল্পীতল্পা নিয়ে কলকাতা ছেড়েছিল, তা'রা সত্যিকার বোমা পড়ার সময় ঘাব্‌ড়ালোও না একটু, থেকে গেলো সেখানেই। শিশুসাথী কিন্তু ঢাকায় থেকেই নূতন নূতন ফন্দী আঁটতে লাগ্‌ল, তোমাদেরে আনন্দ দেবার জন্য। তা'তে শিশুসাথী কতটুকু কৃতকার্য্য হয়েছে তা' তোমরাই জানো ভালো।

দেশে অন্নবস্ত্রের সমস্যা তো আছেই, তার উপর দাঁড়িয়েছে কাগজের সমস্যা! এ-ও যে কি দারুণ তা' তাঁরাই বোঝেন যাঁরা তোমাদের কাগজ যুগিয়ে থাকেন। ভগবানের কৃপায় আর তোমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছায় শিশুসাথী এই বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়েও সারা বছর তোমাদের আনন্দের খোরাক যুগিয়েছে সাধ্যমত। এ কৃতিত্ব শিশুসাথীর নয়—তোমাদের সকলের।

এস, আমরা পুরাণো বছরকে বিদায় দিই। নিয়ে যাক্ সে আমাদের যত পুঞ্জীভূত গ্লানি, যত ক্ষুদ্রতা, যত হীনতা; —দিয়ে যাক্ আমাদের অন্তরকে ধুয়ে মুছে নির্ম্মল ক'রে। নিয়ে যাক্ আমাদের দীনতা, আমাদের জড়তা, আমাদের দুর্ব্বলতা; —দিয়ে যাক্ আমাদেরে সাহস আর অভয়। নিয়ে যাক্ আমাদের সকল অশান্তি, সকল দুঃখ; —রেখে যাক্ বিমল আনন্দ আর অখণ্ড শান্তি!

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। পিতার বোন : মাতার বোন : : পিসী : নির্ণেয় সম্পর্ক

$$\therefore \text{নির্ণেয় সম্পর্ক} = \frac{\text{মাতার বোন} \times \text{পিসী}}{\text{পিতার বোন}} = \text{মাসী}$$

২। মাতাল।

উত্তরদাতাদিগের নাম

মীরা ও নীলা দেববর্ম্মা, আগরতলা ; অবনীকান্ত সেন, বড়খলা ; জহুরুল হক, শিলং ; অমূল্য চক্রবর্ত্তী, কমল মজুমদার, বড়খলা ; সতীন্দ্র, রথীন্দ্র, সুরেন্দ্র, রামেন্দ্র, রণেন্দ্র, বীণাপাণি, শান্তি পোদ্দার, নিতাইগঞ্জ ; মণিমালা, মতিমালা, মধুসূদন, অরুণ, কিরণ, রমেন ও খোকা দাস, ঢাকা ; অমলকুমার মিত্র, গৌহাটী ; সমীরেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা ; ভারতী দেবী, রায়গঞ্জ ; নজরুল, নুরুল, আজিজুল, ঝরণা, রেজী, কুষ্টিয়া ; এন. খান, টি. মোল্লা, এম. উল্লা, ঢাকা ; বাণী, মানী আমু ও তনু দত্ত, হবিগঞ্জ ; কাইতলা জে. এম-ই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ; প্রমোদরঞ্জন বর্ম্মন, বড়খলা ; কণিকা, অমলেন্দু, বিজয়েন্দু, শুভেন্দু, নবেন্দু, জ্যোতিরেন্দু ও বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত, বরিশাল ; অভিভূষণ চৌধুরী, রাজসাহী ; পুষ্পরাণী, উষা, লক্ষ্মী, মদন, আলীপুর ; খসু, শমু, বিশু, বেলা ও মিনতি, খড়দহ ; বাণী ঘোষ, বালিগঞ্জ ; চন্দ্রিমা, নমিতা, রমলা, মীরা ও রেখা চক্রবর্তী, কুষ্টিয়া ; অঞ্জলী সেন, খুড়ো ; বারীন্দ্রনাথ দত্ত, খুবড়ী ; গোবিন্দ সাধুখাঁ, ভূতনাথ, রবীন, ব্যাকুল, কার্ত্তিক ও নৃপেন্দ্র, সিঙ্গুর ; "উই আর সেভেন", সরিষাবাড়ী ; শান্তি মজুমদার, পাবনা ; ইন্দ্রানী রায়, সুব্রত, শঙ্কর লাহিড়ী, বগুড়া ; মহম্মদ সিদ্দিক বেপারী, বাড়ৈখালি ; মালিকা, পিলু, হেনা, রাজসাহী ; শিশির সরকার, হাবড়া ; ভদ্রাসন গোবিন্দচন্দ্র একাডেমির ছাত্রবৃন্দ ; বাবু, মণ্টু, তরু, ঝরিয়া ; মণীশচন্দ্র রায়, মাণিকগঞ্জ ; পুলক, অরুণ, বনি, উমা, ঝরণা, বাবু, নেবুল, খেনু, আশা, উষা, কনক, উমা, মীরা, শান্তি, রেণুকা, নন্দা, মায়া, আরতি, কল্যাণী, লীলা, বুড়ি, প্রীতি ও তাজু, মাণিকগঞ্জ ; নাকু হালদার, খড়দহ ; বিশ্বনাথ, দেবতোষ ও মনতোষ, শিবসাগর ; রেখা, মণ্টু, মোহন, দিনাজপুর ; গোপাল, ভোলা, কালা, ভুটু, চিত্ত, ঝুনটু, মাছিমপুর ; তুষারকান্তি দাস, খাগ্রাপুর ; পঙ্কজ দত্ত, মণীন্দ্র ঘোষ, ভানু, ধীরেন্দ্র, মাখন, চানু, লীটু, জয়কালী ; টুকুল, বিশু, মঞ্জু, শম্ভু, শ্যামল, মাণিক ও বুব্বু, বরিশাল ; পীযূষ, অনিমেষ, সুভাষ ও আশীষ, ঘারিন্দা ; বিমলচন্দ্র দত্ত, ২০২৩৬নং গ্রাহক ; রণজিৎকুমার বসাক, মাহুলিয়া ; শান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর ; রমানাথ মজুমদার, নরসিংহপুর ; শেফালী ভট্টাচার্য্য, শ্রীহট্ট ; মিতা, অজয়, জয়ন্তী, কাটোয়া ; মণ্টু, ঝণ্টু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ; সুধাময় ও চৈতালী মিত্র, হাবড়া ; বিজনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ; করুণাকান্ত মজুমদার, বিভূতিভূষণ মজুমদার, কালীঘাট ; কানু চট্টোপাধ্যায়, বেণারস ; গৌরহরি, মৃদুল, হরিপদ, শিবনারায়ণ, বিশ্বনাথ, বেলুড়মঠ—হাবড়া।

কৃষ্ণকণা, উমাপতি সাহা, 'আনন্দনীড়', ঢাকা ; প্রার্থনা ও জ্যোতির্ম্ময় রায়, পাটনা ; করালী ও কল্যাণী মুখার্জ্জি, বোলপুর ; কুমারী আভা, শোভা, মিনতি, গিনি ও রেখা, বড় বেলুন ; নিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গভর্ণরস্ ক্যাম্প, বিহার ; চিতু, অনিত, সত্য, অনিল, নন্দী সাহেব, পরিতোষ, কানাই ও শ্রীহরি, পোদ্দারডিহি ; মানসী ও অরুণিমা, বরিশাল ; কমলাবালা বিশ্বাস, কালচিনি ; মাণিক, নাড়ু, শান্তি, ফচু, নাটু, কানু, গৌরী, বীণা, মণ্টু, বুড়া, উমা, বেবি, রেণু, আমু, রেবা ও শঙ্কর, জয়পুর (হাবড়া) ; প্রতিভারাণী দেবী, কালচিনি ; বরুণকুমার সরকার, রাউতভোগ ; গৌর, নিতাই, কানাই, বলাই, হীরেন, হরেন, নবেন, শৈলেন, কিরণ, উপেন, অজয়, বিজয়, বিজয়, চৈতন্য, শান্তি, মতি, কমলা, চপলা, বিমলা, সরলা, ললিতা, বিশখা, কল্যাণী, কুসুম, ছবি, রেণুকা ও মঞ্জুলিকা, 'কল্যাণী ভবন'—উলপুর ; অপর্ণা মল্লিক, হাজারীবাগ ; গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর ; রঘুনন্দন হালদার, মৃদু (রাঁচি) ; কাজল, টিকু, সুধীর দাস ও সুরজিৎ দাস, উয়ারী (ঢাকা) ; উষারাণী রক্ষিত, হাজারীবাগ ; নবেন্দুনারায়ণ দাশগুপ্ত, যাদবপুর ; খোকন, অমু, টুকু, বলাই ও কানাই, কল্যাণপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ; ডুলু ও রঞ্জু, ১৯৫১৬নং গ্রাহক ; মৃণাল, পরিমল, নির্ম্মল, প্রণব, উৎপল, হেনা, মীনা, লীনা, টাঙ্গাইল ; মুকুন্দ পাঠচক্রের সভ্যগণ, কালিয়াকৈর ; পরিতোষ নিয়োগী, মালদহ ; চাবাড়া বিদ্যামন্দির ক্লাবের সভ্যবৃন্দ ; বিনয় ও বিজন, আমবাড়ী চা-বাগান ; অরুণকুমার দাশগুপ্ত, বীরশ্রী ; শামু, বুজন, তারু, কুরু, বিরু ও কুলু, সিঙ্গি (বর্দ্ধমান) ; গোলাম হোসেন, শৈলেন, মরতুজা, নিতু, মুতু, দোলু, উলফু ও মুরীভাবী, খলিশাকুণ্ডী ; নিমাই, খুকু, জলি, ভুলু, নারকি ও অন্নপূর্ণা ঘোষ, শিবসাগর ; হেনরী, চার্লি, খুকী, জাহানারা, গগ, আনোয়ারা, নবী, কামাল, বুবু, নুরজাহান ও জর্জ হোসেন, নওগাঁ, দীপক, জ্যোতি, ডলি, বাচ্চু, প্রতিভা, মুকুল, মীরা, রুবি, সুধীর, হাবলি, গৌতম, শঙ্কর, চন্দন, গগন, সতু, খোকা, বুবু, ঝিকমিক, সুনীল, হাবলা, উতু, বুটু, কিশলয়, কুণাল, স্বাতী, এষা, চন্দ্রা, পেলারাম, ফেকু, রবি, শিপ্রা, বুব্বু, জয়দেব, শুকদেব, দীপ্তিময়, সাহেবগঞ্জ ; মঞ্জুলা সান্যাল, গভর্ণরস্ ক্যাম্প, বিহার ; গীতা, গৌরী, অঞ্জু, মঞ্জু, কানু, পুতুল, নসীপুর ; স্নেহকণা, অনিলবরণ, সুনীলবরণ, বেগুড়ুবি চা-বাগান।

কল্পনা ও প্রতিভা, ১৮৮৮৪নং গ্রাহিকা ; চন্দনকুমার বসু, জামালপুর ; গোপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ, কলিকাতা ; সুধীরকুমার পুরকাইত, বাবুগঞ্জ ; চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, কাশীপুর ; প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গরলগাছা ; মাণিক, কেনারাম, হরু, বংশী, ভোলা, গঙ্গা, ভরত, ভক্তি, শক্তি, তিনু, তারাপদ, শরৎ, নবকুমার, অরুণকুমার, নির্ম্মলকুমার ও হরকুমার মণ্ডল, আন্দ্রা ; তপেন্দ্রনাথ রুদ্র, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ; অনিলকুমার রায়, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

আলেখ্য দাস, সুধীর রায়, ওখ্রা ; রুণু ও বেল, গিরিডি ; অজিতকুমার মণ্ডল, মুকুন্দপুর ; করুণাপ্রসাদ রায় চৌধুরী ঢাকা ; আশীষকুমার মুখার্জ্জি, উত্তরপাড়া ; স্মৃতিরাণী রায়, লক্ষ্ণৌ ; নীরেন্দ্র, শৈলেন্দ্র, মদনচন্দ্র, অবনীন্দ্র, অমলকুমার বাজি, রামানুজ, অভিরাম মণ্ডল ও মীরারাণী দাসী, পারা বোর্ড এম. ই. স্কুল ; প্রণবেশ সাহু, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, পান্নু ও নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, গড় রাইপুর ; অমিয়, সুকুমার, সুবাস, প্রণব, নির্ম্মল, পমু. সমীর, সমু, নীহারিকা লতিকা, সুনন্দা সন্ধ্যারাণী, স্নিগ্ধা, শেফালী, দেবা, ধীরেন, বীরেন, সুশান্ত, সরল, পবিত্র, দিলীপ ও শঙ্কর, খড়দহ ; কুমারী শেফালিকা ও প্রীতিকণা কর, বিষ্ণুপুর ; উর্ম্মিলা, রমলা, কল্যাণ, হারু, ভবানী, সুনন্দা, আড়কান্দি ; নীলিমা রায়, পরৈকোর (চট্টগ্রাম) ; দীপালি, চামেলি, দীপেশ, ভূপেশ, ধীরেশ, লতিকা সেন, বোম্বে ; পবিত্র, সৌমিত্র, তাপ্তি, কৃষ্ণা, কাবেরী নূপুর, খুলনা ; শম্ভু, বেবি, খুকী, রবি, রঞ্জু, পিলি, রাণী, কিয়নঝাড় ; ব্যোমকেশ নন্দী, বহুবাজার (কলিকাতা), দেবীপ্রসাদ বসু রায় চৌধুরী, কাটিহার ; ভবানী, চাবু, গজ, মন্টু, হালু, তাতু ও সরোজ, বৈচীগ্রাম ; রমা রায় চৌধুরী নিউদিল্লী ; অমরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পুরুলিয়া ; অনন্ত, মাখন, পশুপতি, নলিনী, কীর্ত্তিবাস, দশগ্রাম ; রঞ্জু, টুকু, রাণী, গতু কাঁথি ; সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নিউ দিল্লী ; কুমারী সুমিত্রা মজুমদার, দেরা কোলিয়ারী ; অরুণা, অশোক ও দিলীপ মিত্র বাঁকুড়া ; প্রশান্তচন্দ্র সেন, ২০১০৭নং গ্রাহক ; কাঞ্চন, বেবি, রুবি, রেখা, খুকী ও লালা, বর্দ্ধমান ; তারা দেবী, নবদ্বীপ।

মায়া, উমা, ভাস্কর ও খুকুমণি, তেজপুর ; উত্তানপদ ভট্টাচার্য্য, পানপুর ; মঞ্জু ও রঞ্জু বসাক, পাটনা ; অণিমা, অমিয় মৃগাঙ্ক, নীলা, বুবু, লক্ষ্মী, বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বেণারস ; শ্রীচরণ, ভোলানাথ, শীতল, তারক, বিজন ও বীণাপাণি জোতকেশব উঃ প্রাঃ বিদ্যালয় ; সুনীলেন্দু, সলিলেন্দু ও বাণী ঘোষ, আগরতলা ; বীরু, সুজাতা, খুকু, গজু, টুনু, শিবানী মায়া, মান ও বিশ্বরঞ্জন গুপ্ত, বেণারস ; অজিত, রণজিত, অর্চ্চনা, অর্পনা, অরুণা ও সহজিৎ গুহ-ঠাকুরতা, কাঁথি ; খোকন পীণ্টু, গোলা (হাজারীবাগ) ; চিন্তাহরণ মালো, ছিলাদর চর ; গুরুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীপুর ; মোহনলাল (মণিরাম) আগরওয়ালা ও সুপ্রকাশচন্দ্র (বৈদ্যনাথ) চক্রবর্ত্তী, সুজানগর, (পাবনা) ; প্রতিভারঞ্জন ঘোষ, বৈঁচীগ্রাম প্রণতি, মিনতি, শিবু, কুঁচি, পীযুষ, বিজয়, বলাই, খোকা, হিমাংশু—সাউথ কুজামা কোলিয়ারি (ঝরিয়া) ; পান্না ও অনিমা সেন, একতুয়ারিয়া ; পাঁচুগোপাল দত্ত, শিবপুর ; উর্ম্মিলা, চৈতন্য, কৃষ্ণ, সুরেশ্বর, মতি, রবিন, হরেন, বীরেন বিমল, কালী ও গোবিন, সুধীর, জীবন, নিতাই, সুরেন, ভূষণ, নানু, বিনোদ, প্রমোদ, রাম, অনাদি, প্রমথ, রেণু নারায়ণগড় ; মিনু, ঢাকা ; সাধনজ্যোতি বর্ম্মন, মালদহ ; রেণু, সমীর, রমা, বাণী, শুভ্রা, ১৮০১৮নং গ্রাহক ; অনিন্দ্য সুন্দর, পলি, জীবন ও মল্ল, ঢাকা ; মঞ্জু দাশগুপ্তা, ময়মনসিংহ ; সত্যকিঙ্কর, ভজন, বিবু, সমাধি, মেঘু, শশাঙ্ক, সারদা গৌরহরি, রাণীবাঁধ (বাঁকুড়া) ; রেণুকা চাটার্জ্জি, বর্দ্ধমান ; গীতারাণী ও সন্ধ্যারাণী ঘটক, ধুমটাই টী ষ্টেট ; জয়ন্তী চাটার্জ্জি, গোয়ালিয়র ; সুধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাটিহার ; জামবেড়িয়া শিশু সমিতির সভাগণ ; অনিল, অজিত, অণিমা অরুণা, রঞ্জু, নমি ও সলিল দত্ত, আজমীর ; মণি, মতি, তারা, আশা, আবু, দেবদাস, ছুকী, ছাকা, আনো, শফী, নুর ফজু, পিয়োলীগুনান ক্লাব, যশোহর ; শঙ্করপ্রসাদ চন্দ্র, শিবপুর ; কুমারী আরতি, অঞ্জলী, অণিমা, অনুপমা, অশ্রুকণা ও অনিলকুমার সেন, কাঁথি ; ছুটিলাল শর্ম্মা ও প্রার্থনা বসু, জঙ্গলবাধাল ; রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধুবড়ী ; আভা, ছায়া মায়া, দিলীপ, পিণ্টা, ইভা, অর্চ্চনা, বেরেলী ; কুমারী গীতা বল, শিয়াখালা ; মাখনলাল চক্রবর্ত্তী, চাটগ্রাম ; প্রশান্ত ও অণিমা, বারোমেস্তা ; রেণুকা গুপ্তা, বারিপদা ; দীপ্তি, মৈত্রেয়ী ও শুভেন্দু ধর, ইন্দোর ; শৈলেন, বেলারাণী, মাণিক শীলা, চাঁদু, অশোক, ভোঁদড়, বাদল, গৌর, দিলীপ, মিহির, প্যালা, ভানু, তারা, বিজয়, লালু ও আলু, মুদিয়ালি রোড— কলিকাতা ; তপনপ্রসাদ রায়, বাগাঁচড়া ; শৈলেন্দ্রনাথ দাস, বারদ্বারী ; কিরণচন্দ্র বিশ্বাস, ঘোষের ডাঙ্গা ; কুমারী উমারাণী হালদার, মুঙ্গের ; টিলি ভুচু, জনবুড়ী, কলোকচি, মনোখোকন, বুলিফুলসা, সুদক্ষিণা ও দিব্যাংশু, কলিকাতা জ্যোতিরেন্দ্রনাথ মুস্তোফি, কাঠমাণ্ডু (নেপাল) ; কুমারী রাধারাণী বসু, বারিপদা ; রেখা ও নির্ম্মলা মৈত্র, নয়া দিল্লী হিমানী কারকুন, কিশোরগঞ্জ ; মঞ্জুশ্রী দেবী, দেওভোগ ; কনক, গীতা, মীরা, অমরেশ, অপরেশ ও রমেশ সেন তমালতলা—নবদ্বীপ ; অঞ্জলি দেবী ও অমিতাভ ভট্টাচার্য্য, কাটোয়া ; পদ্মা গুপ্তা, পাবনা ; কালীকুমার সরকার পালৈ ; গোবিন্দ, ভগবানশরণ, ঢাকা ; সুধাকৃষ্ণ মণ্ডল, দক্ষিণারঞ্জন দত্ত, রামচরণ সরকার, আনন্দপুর ; অপূর্ব্বেন্দু সরকার কুমারী নীলিমারাণী, নীরেন্দ্র, স্বর্ণেন্দু ও স্বর্ণারাণী সিংহ, দুবরাজপুর।

Printed by Trailokya Chandra Sur at the Asutosh Press, 52, Shankhari Bazar, Dacca
and Published by him from Asutosh Library, 3/8, Johnson Road, Dacca.